কাঁটায়-কাঁটায়

নারায়ণ সান্যাল

পি. কে. বাসু— কাঁটা সিরিজের গোয়েন্দা কাহিনী

কাঁটায়-কাঁটায়
কাঁটায়-কাঁটায়
কাঁটায়-কাঁটায়
কাঁটায়-কাঁটায়

চতুর্থ খণ্ড

'অভিপূর্বক নী-ধাতু অ'-এর কাঁটা 13

ন্যায়নিষ্ঠ ন্যাসনাশীর কাঁটা 101

দ্বি-বৈবাহিক কাঁটা 173

যমদুয়ারে পড়ল কাঁটা 263

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

'অভিপূর্বক নী-ধাতু অ' -এর কাঁটা

রচনাকাল : প্রাক্‌পূজা '93

[শারদীয়া 'প্রতিদিন'-এ '94-এ প্রকাশিত]

পুস্তকাকারে প্রকাশ : বইমেলা '95

গ্রন্থ ক্রমিক : '95

অলঙ্করণ : সন্দীপন ভট্টাচার্য
অলকনন্দা সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ শিল্পী : অরূপেশ জানা

উৎসর্গ : ক্যাপ্টেন সত্যচরণ লাহিড়ী

রবীন্দ্র-সেতুর বদলে বিদ্যাসাগর-ব্রিজ দিয়ে এলে যে এতটা সময় সংক্ষেপে হবে তা উনি আন্দাজ করতে পারেননি। হাওড়ার জেলা আদালতের আঙিনায় বাসুসাহেবের গাড়িটা যখন পৌঁছলো তখনও মধ্যাহ্ন বিরতির প্রায় আধঘন্টা বাকি। হাওড়ার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নীরদবরণ মুখার্জির সঙ্গে ওঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট : 'নুন-রিসেস'-এ। কয়েকটি কাগজে সই করিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কৌশিক কিংবা কোন জুনিয়রকে পাঠিয়েও কাজটা সারা যেত; কিন্তু নীরদবরণের সঙ্গে ওঁর একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এককালে। একই রোটারি ক্লাবের মিটিঙে দেখা-সাক্ষাতের সুবাদে। তাই নিজেই এসেছেন, দেখা করে সই নিতে।

ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আছেন শুনে বাসুসাহেব গুটিগুটি সেখানে গিয়ে দর্শকের আসনে বসলেন। পিছন দিকে দর্শকদের ভিড়ে।

যে কোন কারণেই হোক আদালতে লোক হয়েছে যথেষ্ট। শুনলেন, চুরির মামলা। গহনা চুরি। আসামী স্ত্রীলোক। পোশাক-পরিচ্ছদ দীন ও মলিন; কিন্তু রীতিমত সুন্দরী, সুতনুকা। সুঠাম চেহারা। নাক-মুখ খুবই আকর্ষণীয়; আর আশ্চর্য গভীর, অতলান্ত ওর চোখ দুটো। কিন্তু রং খুব

A-PDF Page Crop DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to re

ফর্সা নয়। ময়লাই। বয়স আন্দাজ চব্বিশ-পঁচিশ। মলিন বসন সত্ত্বেও তাকে ঠিক ঝি-ক্লাসের বলে মনে হচ্ছে না।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় বসে আছে মাঝবয়সী একজন। মনে হয় খেটে-খাওয়া মানুষ। দাড়ি কামায়নি। টুইলের ডোরাকাটা হাফশার্ট পরনে। প্যান্ট আর চপ্পল। প্রতিবাদীর তরফে সাক্ষীকে যিনি জেরা করছেন তিনি তরুণ-বয়স্ক। সুদর্শন, সুসজ্জিত কিন্তু অনভিজ্ঞ বলে মনে হল বাসুসাহেবের।

উকিলবাবু বললেন, রাতটা ছিল কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী, তাই তো?

—তা তো বলতে পারবো না হুজুর, আমি পাঁজি দেখিনি।

—না, মানে বেশ অন্ধকার ছিল?

—আজ্ঞে না। রাস্তায় জোরালো বাতি জ্বলছিল। তাছাড়া হোটেলের সামনেও নিয়নবাতির সাইনবোর্ডের জোর আলো ছিল। মানুষজন চিনতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

—ও, তার মানে, রাস্তার সব কিছু তুমি দেখতে পাচ্ছিলে?

—আজ্ঞে সে কথা তো বারে বারেই বলছি।

—না, মানে আসামীকে চিনতে পেরেছিলে ঠিক?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এই নিয়ে তিনবার সে কথা বললাম হুজুর।

—তুমি তখন মোটরগাড়িটা থেকে কত দূরে?

—তা বিশ-পঞ্চাশ হাত হবে, মেপে দেখিনি।

—তুমি ঐখানে দাঁড়িয়ে কী করছিলে তখন?

—ঐ যে বললাম, তখনো ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। আমি বৃষ্টিটা ধরার অপেক্ষা করছিলাম, গাড়ি-বারান্দার তলায়।

—রাস্তায় তখন আর কেউ ছিল না?

—আজ্ঞে না। শুধু আমারা দুজন। বৃষ্টি পড়ছিল বলে লোকজন—

—তোমায় যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দাও। ফালতু কথা বলবে না। তুমি কী দেখলে? ঐ মেয়েটি সে সময় কী করছিল?

—আবার সেকথা বলব? এইমাত্র তো বললাম..... ঠিক আছে। ঠিক আছে। আবার বলছি। আমি ছিলাম মেয়েটির পিছনবাগে। সে আমাকে দেখতে পাচ্ছিল না। সে গাড়ির পিছনদিকের ডিকিটা খুলে তার ভিতর থেকে একটা স্যুটকেস বার করছিল...।

—জাস্ট আ মিনিট। সে মোটরগাড়ির পিছনের ডিকিটা খুলল কী করে? সেটা খোলাই ছিল, না কি তালা খুলে ডালাটা ওঠালো?

—আজ্ঞে তা বলতে পারব না। আমি যখন ওকে প্রথম নজর করি তার আগেই ও ডিকিটার ডালাটা দুহাতে ধরে তুলেছে। তারও আগে সে কী করেছিল, কীভাবে ডিকিটার ডালা খুলেছিল

boiRboi.net

তা আমি জানি না।

—অলরাইট। তারপরে কী হল?

—মেয়েটি স্যুটকেসটা দুহাতে ধরে রাস্তায় নামালো আর তার ডালাটা খুলল।

—এবারেও সে চাবি দিয়ে খুলল কি না, তা তুমি দেখনি?

—আজ্ঞে কী করে দেখব? আমি তো তখনো তার পিছনবাগে ছিলাম।

—তারপর কী হল?

—স্যুটকেস থেকে কী সব বার করে ও দুপকেটে ভরতে শুরু করে দিল।

—কিসের দুপকেটে?

—আগেই তা বলেছি হুজুর। ওর গায়ে বর্ষাতি ছিল। সেই বর্ষাতির দুপকেটে...

—কীরকম বর্ষাতি ছিল ওর গায়ে?

—ঐটাই কিনা হলপ নিয়ে বলতে পারব না, তবে ঠিক ঐরকম একটা ডাকব্যাক রেনকোট।

আসামীর পরিধানে ঘটনার সময় যে বর্ষাতিটা ছিল বলে বাদীপক্ষ দাবি করেছেন ইতিপূর্বেই সেটি পিপলস একজিবিট হিসাবে আদালতের দেওয়ালে একটা হ্যাঙারে ঝোলানো ছিল।

—তারপর কী দেখলে বল?

—তারপর মেয়েটি স্যুটকেসটা বন্ধ করে তাড়াতাড়ি গাড়ির ডিকিতে নামিয়ে দিল, আর তখনই গাড়ির ডিকির ডালাটা বন্ধ করে দিল।

—তারপর?

—তারপর সে আমার দিকেই আসছিল। হঠাৎ আমাকে দেখে চমকে উঠল। পাশ কাটিয়ে মোটেলের ভিতর ঢুকে গেল।

—মেয়েটি সেসময় কী রঙের শাড়ি-ব্লাউজ পড়েছিল তা কি তোমার মনে আছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। হলুদ রঙের তাঁতের শাড়ি, লাল পাড়, আর ঐ লাল রঙেরই ব্লাউজ। এখনো উনি তাই পরে আছেন।

—তারপর কী হল?

—আজ্ঞে বৃষ্টিটা ধরে গেছে দেখে আমি নিজের কাজে চলে গেলাম।

—রাত তখন কত হবে?

—আজ্ঞে আমি ঘড়ি দেখিনি, তবে এটুকু মনে আছে যে, মোটেল-ঘরে তখন টিভিতে সাড়ে-সাতটার বাংলা খবর হচ্ছে।

—তারপর তুমি থানায় এজাহার দিতে গেলে?

—আজ্ঞে না। তা তো বলিনি। আমি যখন ফিরছি রাত তখন আন্দাজ নয়টা— তখন দেখি মোটেলের সামনে পুলিশের জিপ এসেছে। কীসব তদন্ত হচ্ছে। আমার কৌতূহল হল। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে শুনলাম যে, হোটেলের সামনে দাঁড়ানো একটা গাড়ির ডিকির ভিতর

থেকে নাকি গয়না চুরি হয়েছে। এই নিয়ে পুলিশি তদন্ত হচ্ছে। তাই শুনে আমি এগিয়ে গিয়ে ইন্সপেক্টর সাহেবকে জানাই আমি কী দেখেছি।

উকিলবাবু এরপর কী প্রশ্ন করবেন স্থির করে উঠতে পারছিলেন না। উনি নিজের আসনে ফিরে এলেন। আসামীর সঙ্গে নিম্নকণ্ঠে কী যেন আলোচনা করতে থাকেন।

ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব তরুণ আইনজীবীকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি জেরায় আর কোনও প্রশ্ন করবেন?

আসামীর উকিল তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো। আবার তার জেরা শুরু করল, তুমি যখন ওর পিছনে ছিলে তখন কী করে বুঝলে যে, সে স্যুটকেসের ডালা খুলছিল?

—কী করে বুঝলাম এ প্রশ্নের কী জবাব দেব, হুজুর? স্বচক্ষে দেখলাম সে নিচু হয়ে স্যুটকেসের উপর ঝুঁকে পড়েছে, দেখলাম ডালা দুটো উঠে গেল, দেখলাম তা থেকে কী সব বার করে নিয়ে পকেটে ভরল। এরপর আপনারে কেমন করে বোঝাই যে, আমি কেমন করে বুঝলাম সে ডালা খুলেছিল?

—তুমি চেয়ার থেকে উঠে হুজুরকে দেখাবে মেয়েটি কী ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুঁকে স্যুটকেসটা খুলেছিল?

সাক্ষী উঠে দাঁড়াল। বিচারকের দিকে পিছন ফিরে সে সামনের দিকে ঝুঁকে দেখালো ব্যাপারটা। তার হাঁটু ভাঁজ খেল না। তারপর আবার চেয়ারে গিয়ে বসল, বেশ হাসি হাসি মুখে।

উকিলবাবু বললেন, একটা কথা আমাকে বুঝিয়ে বল তো। তুমি তো তখন জানতে না যে, ঐ গাড়িতেই মেয়েটি আসেনি। তাহলে তুমি একদৃষ্টে ওভাবে ওকে দেখছিলে কেন?

সাক্ষী হাসি হাসি মুখে বললে, ওঁর বয়স পঞ্চাশ হলে নিশ্চয় অত খুঁটিয়ে দেখতাম না হুজুর। ইতিমধ্যে বৃষ্টিতে ওঁর শাড়ি-শায়া ভিজে সপসপে হয়ে গিয়েছিল। তাই উনি যখন সামনের বাগে ঝুঁকে স্যুটকেস থেকে কিছু বার করছিলেন তখন আমি হুজুর একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিলাম।

—ওঁর পিছনদিকটা?

—আজ্ঞে, শুদ্ধ ভাষায় যাকে ...মানে, ইয়ে 'নিতম্ব' বলে আর কি!

তরুণ উকিলবাবুর কান দুটি লাল হয়ে উঠল।

সরকারি উকিল ক্লান্তভাবে বলেন, 'নুন-রিসেস'-এর আগেই কী এই সাক্ষীকে জেরা করাটা শেষ করা যায় না?

বিচারক তরুণ উকিলের দিকে তাকালেন।

সে সপ্রতিভভাবে নিবেদন করল, 'ইফ দ্য কোর্ট প্লিজ, আমার আর মাত্র দু-তিনটি প্রশ্ন আছে, কিন্তু তা পেশ করার আগে আমি আসামীর সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে চাই। মহামান্য আদালতের নিশ্চয় স্মরণে আছে যে, এটা একটা আদালত-কর্তৃক অ্যাসাইন্ড কেস। পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই এটা আমাকে হঠাৎ গ্রহণ করতে হয়েছে।'

বিচারক বললেন, 'ঠিক আছে। আপনি মধ্যাহ্ন-বিরতির পরেই বাকি জেরাটুকু করবেন।

আদালত অ্যাডজর্নড হয়ে রইল। আবার দুটোর সময় আদালত বসবে। আসামী পুলিশের জিম্মায় থাকবে।'

বিচারক উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের চেম্বারের দিকে এগিয়ে গেলেন।

আদালত ফাঁকা হতে শুরু করেছে। বাসুসাহেব এগিয়ে গিয়ে বিচারকের চেম্বারের দরজায় সৌজন্যসূচক করাঘাত করেই পাল্লাটা খুলে ফেললেন। মুখার্জিসাহেব একটা চুরুট ধরাচ্ছিলেন, বললেন, 'আসুন, আসুন। আপনি পিছনে এসে বসেছেন দেখেছি। চলবে?'

চুরুটের বাক্সটা বাড়িয়ে ধরেন।

বাসু বললেন, 'নো থ্যাঙ্কস। আমি পাইপাসক্ত। চুরুট চলে না। কেসটা কিসের?'

মুখার্জিসাহেব চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'গহনা চুরির। নাইন্টি পার্সেন্ট চান্স গিলটি ভার্ডিক্ট হবে। তবে আমি চেষ্টা করব আইন-মোতাবেক ন্যূনতম শাস্তি দিতে।'

বাসুসাহেব রীতিমতো চমকে উঠলেন। কেস চলাকালে কোনও বিচারক কখনো এ জাতীয় কথা বলেন না। বলতে নেই। ইনি অবশ্য 'জজ' নন 'ম্যাজিস্ট্রেট'। সে কথাই বললেন বাসু, 'কেস তো শেষ হয়নি, এখনি গিলটি ভার্ডিক্ট হবে ধরে নিচ্ছেন কেন?'

'পুলিশ কেসটাকে বজ্র-আঁটুনি দিয়ে বেঁধে ফেলেছে। মেয়েটি কপর্দকহীনা। সরকারি খরচে আদালত একজন ইয়াং লইয়ারকে নিয়োগ করেছে। আমিই করেছি। সিনিয়ররা এসব কোর্ট-অ্যাপয়েন্টেড কেস নিতে চান না। তাছাড়া জুনিয়রদের উৎসাহিত না করলে তারাই বা দাঁড়াবে কী করে?'

বাসু বলেন, 'সামান্য একটা গহনা চুরির কেসে এত লোক হয়েছে কেন আদালতে?'

'দুটো হেতুতে। প্রথমত, গহনার মালিক একজন সুবিখ্যাত বোম্বাইওয়ালা চিত্রতারকা, পুষ্পাদেবী। দ্বিতীয়ত, গহনার মূল্য দুই লক্ষাধিক টাকা। দর্শকদের আশা ছিল, চিত্রতারকা আদালতে স্বয়ং উপস্থিত থাকবেন। তাই এত ভিড়। কিন্তু তিনি আসেননি। কই দিন, কী কাগজে সই দিতে হবে?'

।। দুই ।।

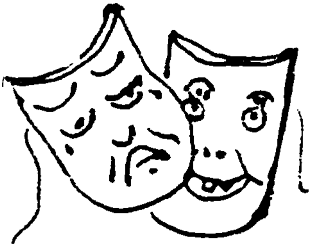

কাজকর্ম সেরে বিচারকের খাশ কামরার বাইরে এসে দেখেন জনশূন্য আদালতে একজন মাত্র লোক দাঁড়িয়ে আছে। ওঁকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে দেখেই লোকটা এগিয়ে এল। নিজে থেকেই বলল, 'আমার নাম প্রসেনজিৎ দত্তগুপ্ত।'

বাসু বলেন, 'চিনেছি। আপনিই এ মামলার কোর্ট অ্যাপয়েন্টেড ডিফেন্স কাউন্সেল। কী ব্যাপার? আমাকে কিছু বলবেন?'

—'না, বলার কী আছে? আমাকে তুমিই বলবেন, স্যার। আপনাকে একটা প্রণাম করব বলে দাঁড়িয়ে আছি। হাইকোর্টে আপনাকে দেখেছি, দূর থেকে। ল পাশ করার আগেও ক্লাস

পালিয়ে আপনার কেস অ্যাটেন্ড করতে গেছি। আপনার আর্গুমেন্ট শুনবার আকর্ষণে।'

প্রসেনজিৎ নত হয়ে ওঁকে প্রণাম করল। বলল, 'আজকের দিনটা আমি জীবনে ভুলতে পারব না। কারণ এটাই আমার জীবনে প্রথম কেস। যদিও কেসটা হারব। আর আজই আপনাকে প্রণাম করার সুযোগ এসে গেল।'

বাসু বলেন, 'আমার এখানকার কাজ মিটে গেছে। বাড়ি ফিরে যাব। তুমি কী করবে, প্রসেনজিৎ? লাঞ্চ করবে না?'

প্রসেনজিৎ হেসে বলল, 'আমরা ব্যারিস্টার নই স্যার, উকিল। সকালেই একপেট ভাত খেয়ে আদালতে এসেছি।'

'কেসটা কেমন বুঝছ?'

'অ্যাবসোলিউটলি হোপলেস। অথচ মুশকিল কী জানেন, স্যার? আমি অন্তর থেকে বিশ্বাস করতে পারছি না যে, রুবি ঐ গহনাটা চুরি করেছে।'

'রুবি নিশ্চয় ঐ আসামীর নাম। চোরাই মালটা কী? কোথায় পাওয়া গেছে?'

'একপাটি জড়োয়া ব্রেসলেট। ওর ভ্যানিটি ব্যাগে।'

'একপাটি? শুনলাম দু-লাখ টাকার গহনা।'

'বাদবাকি কোথায়, তা পুলিশ এখনো জানে না।'

বাসু বললেন, 'স্ট্রেনজ্! সব গহনা পাচার করে ও একপাটি ব্রেসলেট ভ্যানিটি ব্যাগে রেখে দেবে কেন? প্রসিকিউশনকে এভিডেন্স সাপ্লাই করার ঠিকা নিয়েছে নাকি?

'বলুন তো স্যার! কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীটা একেবারে ঝুনো নারকেল। এক চুল টলাতে পারছি না তাকে।'

বাসু বললেন, 'প্রসেনজিৎ! তুমি একটা নির্জন ঘরে আমাকে নিয়ে যেতে পার? তোমাকে কয়েকটা টিপস দিতাম। মিথ্যে-সাক্ষী যারা দেয় তাদের পেড়ে ফেলার বিশেষ কতকগুলো প্যাঁচ আছে।'

প্রসেনজিৎ উৎসাহে লাফিয়ে ওঠে। নাজিরবাবুর কাছে নিয়ে বাসুসাহেবের পরিচয় দিতে তিনি স্বয়ং এগিয়ে এলেন। নত হয়ে নমস্কার করলেন। আর একটি ঘরের তালা খুলে দিয়ে বললেন, 'আপনারা কথা বলুন, স্যার। কেউ ডিসটার্ব করতে আসবে না।'

ফ্যানটা খুলে দিয়ে নাজিরবাবু প্রস্থান করলেন দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে।

বাসু ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, 'শোন প্রসেনজিৎ, জেরা যখন করবে তখন ঝড়ের মতো একটার পর একটা প্রশ্ন করে যাবে। কাগজপত্র দেখবে না, ডাইনে-বাঁয়ে তাকাবে না। সাক্ষীর ভ্রূমধ্যে টার্গেট স্থির করে মেশিনগান চালিয়ে যাবে।'

প্রসেনজিৎ বলল, 'থিওরিটিক্যালি বলা সহজ। কিন্তু বাস্তবে কী হয় দেখলেন তো? সহদেব কর্মকার— মানে ঐ পুলিশের ভাড়া করা সাক্ষী— আমার প্রতিটি প্রশ্নের কী রকম রসিয়ে রসিয়ে জবাব দিচ্ছিল দেখেছেন? আমাকে 'টন্ট' করে করে?

'তুমি ওকে টন্টিং জবাব দেবার সুযোগ দিচ্ছিলে কেন? অলরাইট। লেটস্ প্লে এ গেম। ধরা যাক, তুমি সহদেব কর্মকার, আর আমি প্রসেনজিৎ দত্তগুপ্ত। আমি তোমাকে জেরা করব। তুমি আমাকে 'টন্টিংলি' জবাব দাও দেখি।'

প্রসেনজিৎ উঠে দাঁড়ালো। বলল, 'রেডি'।

বাসু বললেন, 'সহদেব তুমি যখন নয়টার সময় ফিরে এলে তখন তুমি বলেছ যে, পুলিশ তদন্ত করছিল। তখন গাড়ির মালিক ফিল্ম-স্টার মিস পুষ্পা সেখানে নিশ্চয় ছিলেন না?'

প্রসেনজিৎ বললে, 'আজ্ঞে না। সে কথা তো আমি বলিনি! তিনি ছিলেন বৈকি। তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে ছিলেন।'

'তাঁর পরিধানে কী রঙের শাড়ি ছিল?'

'কী রঙের শাড়ি ছিল? তা আমার মনে নেই!'

'কী রঙের ব্লাউজ ছিল তাঁর গায়ে?'

'আমার মনে নেই। তিনি ভিড়ের মধ্যে ছিলেন তো।'

'কী রঙের পাড় ছিল তার শাড়িতে?'

'কী আশ্চর্য! আমি তো মানে... তাঁকে এত লক্ষ্য করে দেখিনি।'

'তখন, মানে সেই রাত নটায় বৃষ্টি পড়ছিল কি?'

'আজ্ঞে না।'

'তার মানে পুষ্পাদেবীর গায়ে রেনকোট ছিল না।'

'আজ্ঞে না।'

'রাস্তার জোরালো বাতি এবং মোটেলের নিয়ন বাতি তখনো যথারীতি জ্বলছিল।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'পুষ্পাদেবীর বয়স পঞ্চাশের কম?'

'কী আশ্চর্য! আমি তাঁর বয়স কী করে জানব?'

'পুষ্পাদেবীর বয়স পঞ্চাশের কম?'

'বলছি তো স্যার, আমি জানি না।'

'পুষ্পাদেবীর বয়স পঞ্চাশের কম? তিনবার একই প্রশ্ন করলাম, সহদেব। এড়িয়ে যাবার চেষ্টা কর না সহজ প্রশ্নটা। জবাব দাও।'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'তিনি ঐ আসামীর বয়সীই। দু-পাঁচ বছর এদিক-ওদিক হবে।'

'আজ্ঞে তাই।'

'এবার তুমি হুজুরকে বুঝিয়ে বল কী কারণে তুমি পুষ্পাদেবীর মতো সুন্দরী, তরুণী, সুবিখ্যাত চিত্রতারকার পরিধানে কী ছিল জান না, অথচ রেনকোটের নিচে আসামী কী রঙের

শাড়ি পরেছিল, কী রঙের ব্লাউজ, শাড়ির কী রঙের পাড় তা লক্ষ্য করেছ, মনে করে রেখেছ। শ্রুতিধর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মতো অনর্গল ভাষায় তা হুজুরকে শুনিয়ে চলেছ। বল, আনসার দ্যাট কোশ্চেন.....'।

প্রসেনজিৎ কিছু বলার আগেই, বাসু চট করে এক পা এগিয়ে ও পাশ ফিরে বলেন, 'অবজেকশন য়োর অনার, আর্গুমেন্টেটিভ।'

বলেই উনি নিজের জায়গায় ফিরে যান। দেওয়ালে টাঙানো স্যার আশুতোষের একটি ছবিকে উদ্দেশ করে বলেন, 'মি লর্ড! আমি দেখাতে চাইছিলাম, এই সাক্ষী আদ্যন্ত পুলিশের নির্দেশ মেনে তোতাপাখির মতো বুলি কপচিয়ে যাচ্ছে। পুষ্পাদেবীর মতো সুবিখ্যাত চিত্রতারকাকে ও লক্ষ্য করে দেখেনি, অথচ বর্ষাতির নিচে আসামীর শাড়ির পাড় কী রঙের ছিল তা ওর মনে আছে। হাউ? এ কি বিশ্বাসযোগ্য?

প্রসেনজিৎ বলে, 'ওয়ান্ডারফুল... এ ভাবে...'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমার জেরা শেষ হয়নি। এরপর আমি ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে আসামীকে ঐ ডাকব্যাক বর্ষাতিটা গায়ে দিয়ে পিছন ফিরে ঝুঁকতে বলব। তারপর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে বলব, আপনি যে প্রোফাইল এখন দেখছেন, য়োর অনার, তাই দেখা যাবে যদি ঐ ভাগ্যহীনার গায়ে আমি এখন চার পাঁচ বালতি জল ঢেলে দিই, তবু ওর শাড়ি বা সায়া সপসপে হয়ে ভিজে যাবে না। বর্ষাতির জন্য তখনো ঐ হতভাগিনীর ভদ্রভাষায় যাকে 'নিতম্বের প্রোফাইল' বলে, তা এই অভদ্র, অসভ্য ভাড়া করা সাক্ষী তার পিচুটি-ভরা চোখ মেলে দেখতে পাবে না, য়োর অনার! এতেই প্রমাণিত হচ্ছে : সহদেব কর্মকার ঘটনাস্থলে আদৌ ছিল না। আদ্যন্ত সাজানো বুলি তোতাপাখির মতো কপচিয়ে যাচ্ছে। আমার এই অ্যানালেসিস যদি ভুল হয়, তাহলে মহামান্য সহযোগী সরকার পক্ষের উকিল এই সাক্ষীকে রি-ডাইরেক্ট প্রশ্ন করে প্রতিষ্ঠা করুন— এক : কী কারণে সহদেবের মতো 'পীপিং-টম' সুন্দরী চিত্রতারকার সাজপোশাক লক্ষ্য করেনি, অথচ ঐ ভাগ্যতাড়িতার মলিন শাড়ির পাড়ের রংটা পর্যন্ত মনে রেখেছে? দুই : বর্ষাতি গায়ে দেওয়া সত্ত্বেও আসামীর শাড়ি-সায়া ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে কি করে ভিজে সপসপে হয়ে গেল? তিন : বর্ষাতি-পরা মেয়েটির নিতম্বের প্রোফাইল দেখবার মতন রঞ্জন-রশ্মির দৃষ্টি ঐ পীপিং-টম কোথায় পেল!'

প্রসেনজিৎ এগিয়ে এসে ওঁকে দ্বিতীয়বার প্রণাম করল।

বাসু বললেন, 'নিজের উপর আস্থা রাখ, প্রসেনজিৎ! তুমি প্রাণপাত করে লেখাপড়া শিখেছ, ল পাশ করেছ, ভদ্র শিক্ষিত বংশের সন্তান তুমি— তোমাকে টন্টিং টোনে মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে ঐ অভদ্র অসভ্য লোকটা পার পেয়ে যাবে? বিকালে জেরায় ওকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে হবে! উইশ য়ু বেস্ট অব লাক।'

।। তিন।।

বাসুসাহেবের হাতে এখন কোন কেস নেই। পরদিন সকালে ল-লাইব্রেরিতে বসে একটা চটি বই পড়ছিলেন। বেলে-কাগজে মলাট দেওয়া। যাতে দূর থেকে বোঝা না যায় কী বই। এমন খানকতক মলাট দেওয়া বই আছে ওঁর ল-জার্নালের এক চিহ্নিত ফাঁক-ফোকরে। যার সন্ধান সুকৌশলীও জানে না। হাতে কাজ না থাকলে বহুবার-পঠিত এ বইগুলো উনি আবার পড়েন। লুইস ক্যারলের 'অ্যালিস', মার্ক টোয়েনের 'হাক্ ফিন', ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী', রবীন্দ্রনাথের 'সে' অথবা সুকুমার রায়ের কোনও বই।

রানু তাঁর হুইল চেয়ারে পাক মেরে ল-লাইব্রেরিতে এলেন। বললেন, 'একটি মেয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

বাসু বলেন, 'মর্মান্তিক বারতাটা তো ইন্টারকমেই জানাতে পারতে।'

'পারতাম। আশঙ্কা হল, তুমি যদি দেখা না কর। মেয়েটি কোন লীগ্যাল অ্যাডভাইস নিতে আসেনি। শুধুমাত্র তোমাকে একটা প্রণাম করতে এসেছে।'

'শুধুমাত্র প্রণাম করতে? হঠাৎ প্রণাম কেন?'

'তা বলেনি। শুধু বলেছে ওর নাম রুবি রায়। হাজতে ছিল। ছাড়া পেয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।'।

'হুঁ! ওর পরনে কি হলুদ রঙের তাঁতের শাড়ি? লাল পাড়? আর ঐ লাল রঙেরই ম্যাচিং ব্লাউজ?'

রানু অবাক হয়ে বলেন, 'তুমিও যে পাকা ডিটেকটিভের মতো শুরু করলে! এসব টিকটিকিসুলভ বদ-অভ্যাস তো তোমার ছিল না। কী করে জানলে?'

বাসু বইখানা হাত-সাফাই করে ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, 'এলিমেন্টারি ওয়াটসন। মেয়েটির আর দ্বিতীয় পোশাক নেই। আমি জানি। ও কপর্দকহীনা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রানু বললেন, 'ভুল হল, মিস্টার হোমস্। মেয়েটি একটি স্কাই-ব্লু রঙের অস্টিন চালিয়ে এসেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'গাড়িটা কার?' ও বললে, 'ওর'। ও আদৌ কপর্দকহীনা নয়।'

'আয়াম সরি দেন। তা পেন্নাম করতে দিলে কি ফী লাগে?'

'লাগে। একশ টাকা। কারুর যদি দাঁতটি নড়ে, চারটি টাকা মাসুল ধরে। প্রণাম করার ইচ্ছে জাগে, একশ টাকা ট্যাকসো লাগে। বুঝলে? রেফার : সেকশন টোয়েন্টিওয়ান!'

'মানে?'

রেফারেন্স পাবে। চোরের উপর বাটপাড়ি করে, আমিও ওটা মাঝে মাঝে লুকিয়ে পড়ি যে। 'আবোল-তাবোল।'

বাসুসাহেব হো হো করে হেসে ওঠেন।

* * * * * * *

প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই বাসু বলেন, 'কী ব্যাপার? পেন্নাম কেন?'

'আপনি যেন জানেন না?'

'আমি তো জানি, তুমি জানলে কী করে?'

'মিস্টার দত্তগুপ্তই বললেন।'

'অন্যায় করেছে। আইনজীবীদের মন্ত্রগুপ্তি অভ্যাস করতে হয়। বস।'

মেয়েটি বসল। বললে, 'ওঁর দোষ নেই। সকালে তিনি রীতিমতো আমতা-আমতা করছিলেন। নিশ্চিত জেল হবে বুঝে নিয়ে যখন নিজেকে প্রস্তুত করছিলাম তখনই হঠাৎ ঘটে গেল একটা অঘটন। আফটারনুন সেশনে প্রসেনজিৎবাবু একটা 'নোভার' মতো বেমক্কা জ্বলে উঠলেন।

'কিসের মতো? 'Nova? 'নোভা' কাকে বলে তুমি জান?'

'কেন জানব না?'

'তুমি কতদূর পড়াশুনা করেছ?'

রুবি নিজের মলিন পোশাকের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'বি. এস-সি, থার্ড ইয়ার পর্যন্ত। বাবা মারা যাবার পর পরীক্ষাটা দেওয়া হয়নি। ফিজিক্সে অনার্স ছিল...

'যাক সেকথা। যে কথা বলছিলে...'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রসেনজিৎবাবু কালবৈশাখি ঝড়ের মতো যেন ধেয়ে এলেন। উপর্যুপরি প্রশ্নের ধাক্কায় সহদেব কর্মকার ফ্ল্যাট। ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব আমাকে বেকসুর খালাস দিলেন। আদালতের সিনিয়ার উকিলের দল মিস্টার দত্তগুপ্তকে অভিনন্দন জানিয়ে ফিরে যাবার পর আমি ওঁকে প্রশ্ন করেছিলাম : 'ম্যাজিকটা হল কী করে?'

বাসু বললেন, 'কিন্তু আর একটা ম্যাজিকের সমাধান যে এখনো হয়নি, রুবি। তুমি কপর্দকহীনা, না অস্টিন গাড়িটার মালিক?'

'দুটোই সত্যি স্যার। কিন্তু ব্যাখ্যা করতে অনেক সময় লাগবে।'

'লাগুক না। আমার এখন মক্কেল-টক্কেল নেই। হাতে কোনও কেসও নেই, বল। গল্পটা শোনাই যাক। রানু, মানে আমার বেটার হাফকেও ডাকি বরং।'

।। চার।।

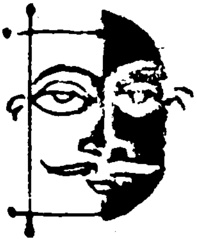

রুবি শৈশবেই মাতৃহীনা। বাপের কাছে মানুষ। আসানসোলে। বাবা ছিলেন মেহনতি মানুষ। লেখাপড়ার সুযোগ পাননি। সেই দুঃখে মেয়েকে স্কুলে-কলেজে পড়িয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আসানসোলে আপকারগার্ডেন্সে এক ডাক্তারবাবুর গাড়ির ড্রাইভার। ডাক্তারবাবু নিঃসন্তান। ওরা বাপ-বেটিতে থাকত ঐ বিরাট বাড়ির আউট-হাউসে। শুধু লেখাপড়াই নয়, মেয়েকে যত্ন করে ড্রাইভিং শিখিয়েছিলেন। এছাড়া কলেজে অভিনয় করেও রুবি প্রচুর সুনাম অর্জন করে। পরপর দুবছর বার্ষিক স্যোশালে নাটক-উৎসবে নায়িকার পার্ট করে। স্থানীয় কাগজে ওর খুব সুখ্যাতি বের হয়।

তার পরেই উপর্যুপরি দুর্দৈবের আঘাত। একই বছরে ছয় মাস আগে-পিছে প্রয়াত হলেন ডাক্তারবাবু আর ওর বাবা। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী— রুবি তাঁকে 'মামণি' বলে ডাকত— ওকে আউট-হাউসে থেকে পরীক্ষাটা শেষ করতে বললেন। কিন্তু রুবির ঘাড়ে তখন ভূত চেপেছে। যে বহিরাগত নাটক-অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপর কলেজের ইউনিয়ন থেকে নাটক পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সেই লোকটিই ওর মাথা ঘুরিয়ে দিল। তার দৃঢ় বিশ্বাস, রুবি সিনেমা ও টিভিতে সুযোগ পেলে প্রচণ্ড সুনাম করবে। ফিল্ম স্টার! প্রচুর অর্থ, প্রচুরতর গ্ল্যামার। মামণির অজ্ঞাতে ও সেই ভদ্রলোকের কাছে অভিনয় শিক্ষার ক্লাস নিতে থাকে। ভদ্রলোকের নাম জগৎ মল্লিক। খুব চোস্ত হিন্দি বলতে পারেন এতে সন্দেহ নেই। রুবিও হিন্দিতে দড়। জগৎ মল্লিকের ডাক নাম : ঝানু। বলতেন : বম্বের কোনও স্টুডিওতে জগৎ মল্লিককে কেউ চেনে না; কিন্তু ঝানুদাকে সবাই এক ডাকে চেনে।

অস্বীকার করে লাভ নেই রুবি রায় ঐ ঝানু মল্লিকের প্রেমে পড়েছিল। যদিও রুবির বয়স কুড়ি, আর ঝানুর বত্রিশ। কোনক্রমে দুজনে বোম্বাইতে পৌঁছতে পারলেই কেল্লা ফতে। স্ক্রীন টেস্ট, ভয়েস টেস্ট। তারপরেই রুবিকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে; বাসুদা, হৃষিদা, মৃণালদা ওকে নিয়ে টানাটানি শুরু করে দেবেন। নতুন মুখ কে না চায়?

বাবার জমানো টাকার পুঁটুলিটা রুবি তুলে দিয়েছিল তার ঝানুদার হাতে। কথা ছিল, ঝানুদা বোম্বাইয়ে পৌঁছে একটা ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া করবে। তারপর রুবিকে টেলিগ্রাম করে জানাবে। তখন রুবি একাই বোম্বে চলে যাবে। রেজিস্ট্রি বিয়েটা হবে বোম্বাইতে। রুবির বিশ-ত্রিশটা বিভিন্ন পোজে তোলা রঙিন ফটোও সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল ঝানুদা। হৃষিদা-বাসুদাদের দেখাবে বলে।

বলা বাহুল্য, এরপর আর রুবি তার ঝানুদার সন্ধান পায়নি। রুবি কোনক্রমে কলকাতায় বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মৃণাল সেনের স্ত্রীর মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে দেখা করে। মৃণাল সেন বলেন, ঝানু মল্লিক নামে তিনি কাউকে চেনেন না— বনফুলের 'মন্ত্রমুগ্ধ' কাহিনীর একটি চরিত্র বাদে। তিনি বোম্বাইয়ে হৃষিকেশ মুখার্জিকেও ফোন করেন— নিজ ব্যয়ে— এবং রুবিকে জানান যে, ঝানু মল্লিক নামে বোম্বাই চিত্রজগতে কোনও চরিত্র নেই। তাঁর পরামর্শে রুবি পুলিশে একটা

ডায়েরি করে রাখে।

এই হচ্ছে রুবির কপর্দকহীনতার ইতিহাস।

আর গাড়িটা? সেটাও এক বিচিত্র গল্প কথা। ঝানু মল্লিক ওর সর্বস্ব নিয়ে পালিয়ে যাবার পর, থানায় এজাহার দেবার পর, সেকথা মামণির কাছে লুকিয়ে রাখা সম্ভবপর হল না। উনি বকাঝকাও করলেন, ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেনও প্রচুর। রুবি তখনো জানত না যে, তার দুর্দশার কাল শেষ হয়নি। এ চার বছর সে মামণিকে নিয়ে রোজ সকাল-সন্ধ্যা গাড়ি করে বেড়াতে নিয়ে যেত। সকালে প্রাতঃভ্রমণে, আর বিকালে আশ্রমে, মহারাজের ভাষণ শুনতে বা সমবেত ভজনপূজনে যোগ দিতে। সেটুকুও সহ্য হল না ভগবানের। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন মামণি। ক্যান্সার। রুবি প্রাণ দিয়ে সেবাশুশ্রূষা করল। মামণির এক ভাসুরপো এলেন— জেঠিমার সেবা করতে নয়, তাঁর সৎকার এবং সৎকারান্তে সম্পত্তির দখল নিতে।

মৃত্যুর দিনতিনেক আগে এক রাত্রে মামণি ওর হাতে তুলে দিলেন একটা টাকার প্যাকেট। বললেন, 'এটা তোর। আর এই খামখানা রাখ। আমার শ্রাদ্ধশান্তি মিটে গেলে এটা শীতলবাবুকে দেখাস। তিনি ব্যবস্থা করবেন।'

সে রাত্রে রুবির কান্নার বিরাম ছিল না।

আশ্চর্য! কাগজ ছিল দুখানা। শীতলবাবু আসানসোলের একজন সিনিয়র উকিল, মামণির স্বামীর বন্ধু। তাঁকে একটি পত্র লিখে উনি অনুরোধ করেছেন অস্টিন গাড়িটির মালিকানা রুবি রায়ের নামে ট্রান্সফার করে দিতে। সংলগ্ন পত্রটি ছিল একটা কাঁচা 'সেল ডীড'। ডাক্তারবাবুর মৃত্যুর পর রুবির বাবার কাছে নগদে বিশ হাজার টাকা নিয়ে তিনি নাকি আকাশী-নীল ঐ অস্টিন গাড়িটা তাকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। জাল বিক্রয়পত্র। কিন্তু এছাড়া ভাসুরপোর গ্রাস থেকে গাড়িটা উদ্ধার করে রুবিকে দান করার ক্ষমতা শয্যালীন মৃত্যুপথযাত্রিণীর ছিল না। উইল করে দেবার সুযোগ ছিল না আদৌ।

মামণির শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাবার আগেই ব্লু-বুক জমা দিয়ে নাম পালটানোর ব্যবস্থা করলেন শীতলবাবু। গাড়ির মালিকানা পেল রুবি। কিন্তু আউট-হাউসে থাকার অধিকারটা পেল না। আগে খেয়াল হলে মামণির কাছ থেকে কিছু বাড়িভাড়ার রসিদ করিয়ে নিতে পারত। করেনি। কারণ তার লক্ষ্য-মুখ অপরিবর্তিতই ছিল। ও স্থির করেছিল, প্রথমে টালিগঞ্জে চেষ্টা করবে, টিভি সেন্টারেও। অভিনয় ওকে করতেই হবে। কলকাতার কয়েকজন নামকরা পরিচালক ও প্রযোজকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরবে। ইতিমধ্যে কিছু অর্থোপার্জন করতে হবে তাকে। তারপর বোম্বাই পাড়ি দেবে। মামণির দেওয়া হাজার তিনেক টাকা আর গাড়িখানা নিয়ে দুঃসাহসী মেয়েটি রওনা হয়েছিল গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে কলকাতামুখো।

বেলুড়ের কাছাকাছি পৌঁছে ওর গাড়িতে কী-যেন ট্রাবল্ দেখা দেয়। পথপার্শ্বের অভিজ্ঞ এক মোটর-মেকানিক ওকে জানালেন, পুরানো মডেলের অস্টিনের স্পেয়ার পার্টস জোগাড় করা অসম্ভব। লেদ-মেশিনে সেই পার্টস বানিয়ে গাড়ি চালু করতে দু-তিনদিন লাগবে।

ঘটনাচক্রে কাছেই ছিল একটা মোটেল। সদ্য গড়ে উঠেছে। বেলুড়ের যাত্রীদের চাহিদা মেটাতে। রুবি একখানা ঘর ভাড়া নিল। সেখানেই পেল একটা দারুণ খবর। বোম্বাইয়ের বিখ্যাত চিত্রতারকা পুষ্পাদেবী নাকি পরদিন ঐ মোটেলে এসে উঠবেন।

ওমা! সে কী? কেন? বিচিত্র যোগাযোগ।

পুষ্পাদেবী বাঙালি। বাবা নেই। মা আছেন। বেলুড়ের এক আশ্রমে সন্ন্যাসিনীর জীবনযাপন করেন তিনি। সংসারের বাইরে। পুষ্পা প্রায় রুবিরই সমবয়সী দু-এক বছরের বড়। উল্কার বেগে তার গ্ল্যামার বৃদ্ধি হয়েছে। পুনা ইনস্টিটিউট থেকে বেরিয়ে হৃষীকেশ মুখার্জির একটা বইতে ছোট্ট একটা চরিত্র পায়। দারুণ সুনাম করে তাতে। তারপর বছরখানেকের মধ্যেই পাঁচ-সাতটা ছবিতে কনট্রাক্ট পায়। সম্প্রতি গোয়ালিয়রের রাজপরিবারের এক দূর-সম্পর্কের নওজোয়ান জনার্দন গায়কোয়াড়ের সঙ্গে পুষ্পার এনগেজমেন্ট হয়েছে। জনার্দন ধনকুবের। কোটিপতি। অনেকগুলি মিলের মালিক। বিবাহটা হবে— জনার্দনের ইচ্ছা গোয়ালিয়রে, পুষ্পার ইচ্ছা বোম্বাইতে— এখনো তারিখ ও 'ভেনুটা' স্থির হয়নি। এ বিবাহে পুষ্পার সন্ন্যাসিনী জননী উপস্থিত থাকতে পারবেন না এ কথা বলাই বাহুল্য। সে আশাও ওরা করে না। তবে মায়ের 'তথাকথিত' অনুমতি পেতে ওরা যুগলে বেলুড়ের সারদা আশ্রমে এসে মাকে প্রণাম করে যাবে, এটাই স্থির ছিল। পুষ্পা একদিন আগে এসেছে— মায়ের সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করার বাসনা নিয়ে। তার সঙ্গে এসেছে প্রমীলা পাণ্ডে— ওর ঘনিষ্ঠতম বান্ধবী। প্রমীলা বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বউ। যদিও স্বামী অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে অন্যত্র থাকে। পুষ্পা আর প্রমীলাকে দমদম এয়ারপোর্টে রিসিভ করেছে পুষ্পার পাবলিসিটি এজেন্টের লোক মোস্তাক আহমেদ। সংবাদটা প্রেসের কাছ থেকে গোপন রাখতে বেচারির জিব বেরিয়ে গেছে। যাহোক, প্রেসের লোক পুষ্পাকে এয়ারপোর্টে ততটা ঘিরে ধরতে পারেনি। আহমেদ একটা ভাড়া করা লেটেস্ট-মডেল কন্টেসাও হাজির রেখেছিল এয়ারপোর্টে।

সারদা-আশ্রমের নিজস্ব অতিথি-আবাস আছে। কিন্তু সেখানে ঠাঁই হতে পারে না পুষ্পা বা প্রমীলার। দুপক্ষের জীবনদর্শন ও জীবনযাত্রায় আশমান-জমিন ফারাক। তাই পরিচয় গোপন রেখে পুষ্পা এসে উঠেছে ঐ মোটেলে। একটা লাল-পাড় সাদা সিল্কের শাড়িও নিয়ে এসেছে, সেটা পরে আশ্রমে যাবে মায়ের সাক্ষাতে। মোটেলটা বড় রাস্তায়, আশ্রম থেকে দূরে নয়। পরদিন জনার্দনের এসে পড়ার কথা। ভায়া দমদম। তাকে রিসিভ করতে এই কন্টেসাখানাই যাবে।

বৈভবের প্রতীক ঐ কন্টেসাখানা আশ্রমে নিয়ে যাওয়াতে পুষ্পা রাজি নয়। সেটা ভাল দেখায় না। বোম্বাই থেকে প্রমীলার মেড-সার্ভেন্ট রুক্মিণীও এসেছে। তার জিম্মায় ঘরদোর রেখে ওরা ট্যাক্সি নিয়ে সারদা-আশ্রমে গেল সকালেই। পুষ্পা আর প্রমীলা। দুপুরে ওখানেই প্রসাদ পাবে। মুশকিল হল এই যে, মোটেলের গ্যারেজ-ঘরের মাপ লেটেস্ট-মডেল কন্টেসার চেয়ে ছোট। ম্যানেজার আশ্বস্ত করেছে, তাতে অসুবিধা নেই। গাড়িটা রাস্তার ধারেই পার্ক করা থাকবে। গাড়ির উপর ওয়াটার-প্রুফ হুড পরানো থাকবে। আর পাহারাদার থাকবে রাত দশটা থেকে

সকাল ছয়টা।

দুর্ভাগ্যবশত পুলিশের মতে চুরিটা হয়েছে সন্ধ্যেরাতে। সেসময় বৃষ্টি পড়ছিল। কন্টেসা গাড়ির চালক গেছিল স্থানীয় সিনেমা হলে 'শোলে' দেখতে। মোটেলের একটি জমাদারনি বলে, সেও দেখেছে কে যেন গাড়ির পিছনদিকটা খুলছিল। সন্ধ্যা রাতে। সাতটা-সাড়ে সাতটায়। ও ভেবেছিল যাদের গাড়ি তারাই খুলছে। লক্ষ্য করে দেখেনি। কারণ জমাদারনির মনে আছে, মেয়েটির পরনে ছিল একখানা জমকালো শাড়ি— যে শাড়ি পরে সে প্রথমে এসেছিল। তাই।

রুবি বিকালে বেরিয়েছিল। রাত আটটায় ফিরে আসে। তখনো চুরির কথাটা জানাজানি হয়নি।

ট্যাক্সি করে পুষ্পা আর প্রমীলা ফিরে আসে রাত নয়টায়। তারপর তাদের নজর পড়ে ব্যাপারটা। কন্টেসা গাড়ির পিছনদিকের ডিকিটা খোলা। পুলিশ আসে সাড়ে নয়টায়। রুবি এসব কিছুই জানে না। রাত সাড়ে এগারোটায় কে যেন তার ঘরে বেল দেয়। ও উঠে গিয়ে দোর খুলে দেখে পুলিশ। বেশ কিছু লোকও এসে ভিড় করেছে। তাদের মধ্যে ছিল ঐ সহদেব কর্মকার। সে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, 'ঐ তো, ঐ ভদ্রমহিলাই। ঐ দেখুন— যা বলেছিলুম, হলুদ শাড়ি, লাল পাড়, লাল ব্লাউজ।'

বাসু জানতে চাইলেন, 'আর ব্রেসলেটটা? সেটা কে কেমন করে ঢুকিয়ে দিল তোমার ভ্যানিটি ব্যাগে?'

রুবি বলল, 'থাক না স্যার ও প্রসঙ্গ। মুক্তি যখন পেয়েই গেছি।'

'না, না। মুক্তিই পেয়েছ, কিন্তু কেসটা মেটেনি। অন্তত আমার কৌতূহলটা মেটেনি। বল, একপাটি ব্রেসলেট কে কোন সুযোগে তোমার ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে দিল?'

রুবি হাসল, বলল, 'আপনি, আমাকে উদ্ধার করেছেন ঠিকই, কিন্তু আমি তো স্যার আপনার মক্কেল নই। বলব সত্যি কথাটা?'

'তুমি চুরি করেছিলে? কেমন করে? কোথায়?'

রুবি আবার শুরু করে, 'আজ্ঞে না। আমি চোর নই!'

।। পাঁচ ।।

'—ঘটনার দিন সন্ধ্যায়.....'

'জাস্ট আ মিনিট : ঘটনার দিন বলতে নিশ্চয় যেদিন চুরিটা হয়, তাই না? সে ক্ষেত্রে সেটা কত তারিখ ছিল? কী বার?'

'আজ্ঞে হুজুর, তারিখটা ছিল সাতাশে মে, বুধবার এ বছর, মানে এই উনিশ শ' সাতাশি সন, তেরশ চুরানব্বই; তিথিটা ছিল হুজুর, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী। তবে, নখ্‌খত্তরটা মনে নেই।'

বাসু হো-হো করে হেসে ওঠেন। বলেন, 'দ্যাটস আ গুড ওয়ান। ফিজিক্স অনার্সের ছাত্রীরাও তাহলে আজকাল তারাশঙ্কর পড়ে। হুঁ। যা বলছিলে বলে যাও। 'ঘটনার দিন সন্ধ্যায়.....'

'সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আমি মোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ি। ঐ মোটর রিপেয়ারিং শপে যাই। সরেজমিনে জানতে, গাড়িটা মেরামত হতে আর কতদিন লাগবে। আকাশ মেঘলা ছিল, তাই ওয়াটার-প্রুফটা হাতে নিয়ে যাই। সত্যি কথা বলতে কি, মোটেলের কাউন্টারে যে ভদ্রলোক বসে থাকেন তিনি কিছু মিছে কথা বলেননি, তাঁর সাক্ষ্যে। তিনি সত্যিই দেখেছিলেন, সন্ধ্যা সাড়ে-পাঁচটা নাগাদ আমাকে বাইরে বেরিয়ে যেতে। কাঁধে ওয়াটার-প্রুফ। তবে আমার শাড়ি-ব্লাউজের রংটা তিনি বোধহয় পুলিশের শেখানো মতো বলেছিলেন। সেকথা ওঁর মনে না থাকাই স্বাভাবিক। যা হোক, আমি কাউন্টারে চাবিটা জমা দিয়ে যাই। চাবির নম্বর 2/1— বাই দ্য ওয়ে, আপনি কি মোটেলটা দেখেছেন, স্যার?'

'না, কেন বল তো?'

'তাহলে একটু বর্ণনা দিই। বুঝতে সুবিধা হবে। একতলায় পাঁচটা গ্যারেজ। রোলিং শাটার। দোতলায় তিনটি সাধারণ ভাড়া দেবার ঘর। প্রত্যেকটিতে সংলগ্ন বাথরুম ও কিচেনেট। আমার ঘরটা ছিল বারান্দার শেষপ্রান্তে। তার নম্বর 2/1, মাঝের ঘরখানা ফাঁকা ছিল। এপাশের ঘরে বাসিন্দা ছিল; কিন্তু কে ছিল তা জানি না। সে ঘরটার নম্বর 2/3; দোতলার বাকি দুটো ঘর ম্যানেজারের কোয়ার্টার্স-কাম-অফিস। তিন তলায় পাশাপাশি দুখানি মাত্র ঘর। ভি.আই.পি. রুম এয়ারকন্ডিশন করা। ডবল ভাড়ার। সে দুটি ভাড়া নিয়েছিলেন পুষ্পা আর প্রমীলা।'

রুবি বাসুসাহেবের কাছে স্বীকার করল যে, পুষ্পাদেবীর সঙ্গে আলাপ করার জন্য সে উদগ্রীব ছিল। যদি ওঁর মাধ্যমে বোম্বাইয়ের কোন প্রযোজক বা পরিচালকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু পুষ্পা একেবারে আত্মগোপন করে থাকাই চাইছিলেন। ঘরের বাইরে বার হবার সময় রাজস্থানী কুলবধূদের মতো আকণ্ঠ ঘোমটা টেনে বার হচ্ছিলেন। রুবির তাই সঙ্কোচ হচ্ছিল। সে লক্ষ্য করে দেখেছিল— মোটেল রেজিস্টারেও পুষ্পা সই করেননি। দুটি ঘরই প্রমীলা পাণ্ডের নামে বুক করা।

রুবি মোটর-রিপেয়ারিং শপে ছিল রাত সওয়া-সাতটা পর্যন্ত। আধঘণ্টা টানা বৃষ্টির পর ঐ সময়ে বর্ষণের বেগ কিছুটা কমে। রুবি বর্ষাতি গায়ে দিয়ে মোটেলের দিকে ফিরতে শুরু করে। কিন্তু পথে নামতেই আবার ঝেঁপে বৃষ্টি এল। সে একটা বাসস্ট্যান্ডে যাত্রীশেডের তলায় আশ্রয় নেয়। মিনিট পনেরো সেখানেই ছিল। ঠিক যখন টিভিতে বাংলা সংবাদ হচ্ছিল। তাই ঐ সময়ের জন্য তার কোনই 'অ্যালেবাই' ছিল না। বাস শেডের নিচে আরও লোক ছিল বটে, তবে সবাই ওর অচেনা।

মোটেলে ফিরে আসে আটটা নাগাদ। তখন ঝিরঝিরে বৃষ্টিটা থেমে গেছে। এই সময় একটা সামান্য ঘটনা ঘটে, যার অবশ্য কোনও তাৎপর্য নেই।...

বাসুসাহেব বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, 'উঁ, হুঁ, হুঁ। তাৎপর্য আছে কি না আমাকেই তা বিচার

করতে দাও। আমাকে সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানাও— ঐ ব্রেসলেটটার ব্যাপারে।'

'শুনুন তবে। আমি কাউন্টারে এসে চাবিটা চাইলাম। ম্যানেজার ভদ্রলোক কী একটা বই তন্ময় হয়ে পড়ছিলেন। অন্যমনস্কভাবে পিছনদিকে হাত বাড়িয়ে 'কি-বোর্ড' থেকে একটা চাবি নিয়ে আমার হাতে দিলেন। আমি চলতে শুরু করেই দেখি, সেটা 2/3 ঘরের চাবি। তাই ফিরে এসে বলি, 'এটা নয়। আমার চাবির নম্বর 2/1', তখন ভদ্রলোক চোখ তুলে আমাকে দেখলেন। চাবিটাকেও দেখলেন। তারপর বললেন, 'এক্সকিউজ মি, আপনার নামটা যেন কী?' আমি তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'রুবি রায়। আমার ঘরটা বারান্দার ও প্রান্তে। আমি নিঃসন্দেহ; আমার চাবির নম্বর 2/1'। ভদ্রলোক বললেন, 'সো সরি।' বলে 2/3 চাবিটি ফেরত নিয়ে 2/1 চাবিটি আমার হাতে দিলেন। আমি কিছুটা এগিয়ে গিয়ে অকারণেই পিছন ফিরে তাকালাম। দেখি, ভদ্রলোক কিন্তু তাঁর বইটার পৃষ্ঠায় ফিরে যাননি। সেটা ওঁর গ্লাসটপ-টেবিলে উপুড় করে রাখা আছে। উনি অ্যাটেন্ডেন্স-রেজিস্টারখানায় কী যেন দেখছিলেন। সে যাই হোক, উপরে এসে তালা খুলে ঘরে ঢুকলাম। ভ্যাপসা গরম গেছে সারা দিন। স্থির করলাম, স্নান করব। দরজায় ছিটকিনি দিয়ে বাথরুমে গেলাম স্নান করতে। হোটেলে বা মোটেলের বাথরুম সচরাচর যেমন হয়। টাওয়েল-র‍্যাকে মোটেলের তোয়ালে, সোপ-হোল্ডারে মোটেলের সাবান। আমি স্যুটকেস থেকে শ্যাম্পু বার করেছিলাম। সেটা রাখব বলে সংলগ্ন কাবার্ডের পাল্লা খুলতে গিয়েই চমকে উঠি। কাবার্ডটা ছোট্ট। মাত্র দুটি কাচের তাক। একটা পাল্লা বন্ধ ছিল, একটা পাল্লা খোলা। দুরন্ত বিস্ময়ে দেখলাম, নিচের তাকে রাখা আছে একটা জড়োয়া ব্রেসলেট।

'স্নান করা মাথায় উঠলো। আলোর কাছে এসে ভাল করে পরীক্ষা করলাম। না, নকল জিনিস নয়, সাচ্চা পাথর বসানো সোনার জড়োয়া ব্রেসলেট। লকিং অ্যারেঞ্জমেন্ট নিখুঁত— যা নকল ব্রেসলেটে থাকে না।

'বুঝতে পারি, এ ঘরের পূর্বতন বাসিন্দা স্নানের আগে হাত থেকে ব্রেসলেটটা খুলে রেখেছিলেন। স্নানান্তে সেটা হাতে পরতে ভুলে যান। এক পাটি কেন? অনেকেই এক পাটি ব্রেসলেট পরে, বিশেষ করে অপর হাতে রিস্ট-ওয়াচ পরলে। প্রথমে, স্বাভাবিকভাবে ভাবলাম, ব্রেসলেটটা ম্যানেজারবাবুর কাছে জমা দিই। কিন্তু তখনই মনে হল— ব্রেসলেটটার দাম না হোক পাঁচ-সাত হাজার হবেই। সাচ্চা হীরে-পান্না হলে আরও বেশি হবে। ভদ্রলোককে বিশ্বাস কী? যে মেয়েটির গহনাটা খোয়া গেছে সে হয়তো মনে করতে পারবে না কোথায় খুলে রেখেছিল। তাই স্থির করলাম, পরদিন সকালে লোকাল থানায় চলে যাব। একটা এফ. আই. আর. লজ করে ওটা থানায় জমা দিয়ে রসিদ নেব। শুধু তাই নয়, একজন স্যাকরা ডেকে রীতিমতো ওজন করিয়ে, পাথর গুনতি করে ভ্যালুয়েশন কষে বার করে পাকা কাজ করে রাখব, যাতে আসল ব্রেসলেটটা বদলিয়ে কেউ একইরকম 'ইমিটেশন' গহনা না বানিয়ে ফেলতে পারে। সেক্ষেত্রে গহনা চুরির অপরাধটা বুমেরাং হয়ে আমার ঘাড়েই ফিরে আসতে পারে। থানা বলতে পারে, আসল গহনার বদলে আমিই ঐ নকলটা জমা দিয়ে গেছি। এইসব কথা ভাবতে ভাবতে মাথায় একটা ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া এসে গেল : কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই তিনতলায় চলে

যাব। আমি জানতাম, দক্ষিণদিকের ঘরটা পুষ্পার। সে ঘরে বেল দেব। বলব, আমি বিপদে পড়ে ওঁর শরণাপন্ন হয়েছি। উনি একজন বিখ্যাত মহিলা। উনি গহনাটা থানায় জমা দিলে ওসব তঞ্চকতা হবার আশঙ্কা থাকবে না। আমার এই 2/1 ঘরের পূর্ববর্তী বাসিন্দার পার্মানেন্ট অ্যাড্রেসে আমরা একটা টেলিগ্রাম করব। এই সূত্রে পুষ্পার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবে। আমার সততায় সে মুগ্ধ হবেই। আমি ওর অটোগ্রাফ চাইব। হয়তো ওর বিয়েতে ও আমাকে নিমন্ত্রণ করবে। সে তো দারুণ ব্যাপার। সেক্ষেত্রে সহজেই ওর সাহায্যে বোম্বাই চিত্রজগতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যাব...।'

রুবি থামতেই বাসু বলেন, 'তারপর?'

'ঐ গল্পটা কার যেন, স্যার? পঞ্চতন্ত্রের না ঈশপের? সেই যে এক কুম্ভকার মনে মনে ভাবছিল রাজা হলে সে কী করবে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কাকে যেন কঁ্যাৎ করে এক লাথি মারল আর তার হাঁড়ি-কলসির স্তূপ.....

'বুঝলাম। রাত ভোর হবার আগেই এল পুলিশ। তাই তো?'

ইতিমধ্যে বিশুকে নিয়ে রানু ফিরে এসেছেন। বিশু একটা চাকাওয়ালা ট্রলি ঠেলে-ঠেলে নিয়ে আসছিল। তাতে ওঁদের তিনজনের ব্রেকফাস্ট। সুজাতা-কৌশিক দু-চারদিনের জন্যে কিসের ইনভেস্টিগেশনে কলকাতার বাইরে গেছে। সুকৌশলীর নিজেদের কাজে।

রুবি চমকে উঠে বলে, 'এসব কী?'

রানু বলেন, 'এসব কী মানে? ব্রেকফাস্ট। আমরাও খাব। তুমি বরং ঐ বাথরুমে গিয়ে মুখে-চোখে জল দিয়ে এস। হাজতে কাল রাত্রে তোমাকে এমন কিছু পোলাও-কালিয়া খাওয়ায়নি যে, আজ সকালে অজীর্ণ হবে।'

রুবি হাসতে হাসতে বাথরুমের দিকে চলে যায়।

সেই সময়েই টেলিফোনটা বেজে উঠল।

ব্যারিস্টার-সাহেবের চেম্বার বন্ধ থাকলে টেলিফোন লাইনটা ডাইরেক্ট করা থাকে। রানু তুলে নিয়ে শুনলেন। 'কথামুখে' হাত চাপা দিয়ে কর্তার দিকে ফিরে বললেন, 'হাওড়া থেকে প্রসেনজিৎ দত্তগুপ্ত ফোন করছেন।'

বাসু হাত বাড়িয়ে যন্ত্রটা গ্রহণ করে বললেন, 'কনগ্র্যাচুলেশন্স ইয়াং কাউন্সেলর। দিস ইজ পি. কে. বাসু।'

প্রসেনজিৎ উচ্ছ্বসিত। সে ভাবতেই পারেনি, বাসুসাহেব আজ সংবাদপত্র ঘেঁটে খবরটা ইতিমধ্যেই পড়ে ফেলেছেন। বাস্তবে তা উনি পড়েননি। সিনেমা-তারকার গহনা চুরির ব্যাপার বলে সব কাগজেই খবরটা ছাপা হয়েছে। অধিকাংশ সংবাদদাতা তরুণ আইনজীবীর উচ্চঃ প্রশংসা করেছে।

বাসু বললেন, 'মক্কেলকে সব কথা খুলে বলেছ ক্ষতি নেই। কিন্তু আর কাউকে বল না। কৃতিত্বটা তোমারই। দেখ প্রসেনজিৎ, উড়ন-তুবড়ির মাল-মশলা তার নিজস্ব। সে শুধু একটু

আগুনের ছোঁয়ার প্রত্যাশায় থাকে। আমি ঐ অগ্নিসংযোগটুকু করে দিয়ে এসেছিলাম মাত্র। ভাল কথা, রুবি রায়ের ব্যাপারটা কিন্তু আমার মতে মেটেনি। সে বেচারি খালাস পেয়েছে বটে, কিন্তু তার হিউমিলিয়েশনের জন্য সে খেসারত দাবি করতে পারে। সে কথা কিছু ভেবেছ?'

'না, সে কথা তো ও আমাকে কিছু বলেনি।'

'ও কেমন করে জানবে ওর অধিকারের সীমা? যা হোক, রুবির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগটা দায়ের করেছিল কে? পুষ্পা?'

'না, পুষ্পাদেবী বরাবরই ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিলেন। এফ. আই. আর. সই করেছিলেন প্রমীলা পাণ্ডে, কিন্তু সে তো পুলিশেরই পরামর্শে।'

'হতে পারে। কিন্তু অভিযোগ দায়ের করেছিল প্রমীলা, সই করেছিল প্রমীলা। আমি হয়তো খেসারত দাবি করব। যেহেতু ও তোমার মক্কেল তাই হয়তো ওরা তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে চাইবে।'

'ব্যাপারটা মানে? কোন ব্যাপারটা?'

'কী আশ্চর্য! বিনা দোষে আমাদের মক্কেল দু'দিন হাজতবাস করল। এখন কোথাও চাকরির জন্য দরখাস্ত করতে হলে ওকে লিখতে হবে যে, ওকে একবার পুলিশে ধরেছিল। প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস হয়েছে— এসবের খেসারত নেই? শোন, তোমার কাছে কেউ যদি অ্যাপ্রোচ করে তুমি বলবে যে, রুবি রায় বর্তমানে আমাদের জয়েন্ট মক্কেল। আমি সিনিয়র, তাই কেসটা তুমি আমাকে রেফার করে দেবে, বুঝলে?'

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে নজর হয় ইতিমধ্যে রুবি আর রানু এসে বসেছেন টেবিলে।

রুবি বলে, 'সত্যি সত্যি কিছু খেসারত পেতে পারি নাকি?'

'তার কিছুটা নির্ভর করছে ওদের ইচ্ছার উপর। কিছুটা আমার ওকালতির প্যাঁচে। তোমার পুঁজি এখন কত?'

'গুনে দেখিনি। বড় মাপের নোট আর একখানাও নেই। পঞ্চাশ, বিশ, দশ টাকার কিছু আছে। আর খুচরো। গুনে দেখতে সাহস হচ্ছে না। কেন স্যার?'

'তুমি চাকরি খুঁজছো?

'নিশ্চয়ই। মাথার উপর ছাদ, নিরাপত্তা, আহার্য আর হাত-খরচা। এটুকু হলেই সবরকম সম্মানজনক কাজ করতে রাজি। কলকাতায়।'

'হুঁ। খাবারটা খেয়ে নাও আগে। টোস্ট ঠাণ্ডা হয়ে গেলে অখাদ্য হয়ে যায়।

।। ছয় ।।

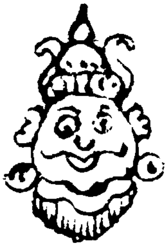

প্রাতরাশ শেষ করে উনি চেম্বারে এসে বসলেন। রানুও এলেন। রুবিও।

বিশু খাবারের ডিশগুলো সাফ করতে শুরু করল।

বাসু বললেন, রানু, আমার অ্যাড্রেস বুকে দেখ তো রায় সুনীল কুমার, সল্টলেক বি. বি. ব্লক। টেলিফোনে পাও কি না দেখ।

অচিরেই দূরভাষণে যোগাযোগ হল। বাসু জানতে চাইলেন, কী খবর সুনীল? বেবি-সিটার বা মেট্রন জাতীয় কাউকে জোগাড় করতে পারলে?'

সুনীল রায় বলেন, 'না দাদা। মনোমত একটি মেট্রন জোগাড় করতে আমরা কর্তা-গিন্নি হন্যে হয়ে গেলাম।'

'বাচ্চাটার বয়স কত?'

'তিন বছর। কেন, আপনার খোঁজে কেউ আছে?'

বাসু সেকথার জবাব না দিয়ে জানতে চান, 'তোমরা তাহলে দুজনেই চাকরি করতে যাচ্ছ কি করে? কোন 'আপনজন' জাতীয় পিসিমা-মাসিমা জোগাড় করেছ নাকি?'

'নাঃ। মল্লিকা উইদাউট পে ছুটি এক্সটেন্ড করেছে। আমার মনে হয়, এখন একটাই সল্যুশন বাকি। ফার্স্ট স্টেপ— ধর্মান্তর গ্রহণ। সেকেন্ড স্টেপ— দ্বিতীয়বার বিবাহ করা।'

'সেটা নিতান্তই সাময়িক সমাধান। কারণ এভাবে তো বারে বারে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। দ্বিতীয় পত্নী সন্তানসম্ভবা হলে তৃতীয়বার বিবাহ করতে পার। কিন্তু জানই তো আইনস্টাইনের মতে বিশ্বপ্রপঞ্চ চতুর্মাত্রিক। ফোর্থ ডাইমেনশনে গিয়ে ঠেকে যাবে। তার চেয়ে আমি একটা সহজ সল্যুশন দিই, শোন।'

'বলুন দাদা।'

'তুমি একটা গাড়ি কিনবার তাল করছিলে। কিনেছ?'

'না। কিন্তু হঠাৎ একথা কেন?'

'আমি একজনকে পাঠাচ্ছি। সে তোমার অনেক-অনেক কাজ করে দেবে। সকালে ড্রাইভ করে তোমার বাচ্চাকে নার্সারি স্কুলে পৌঁছে দেবে। তারপর তোমাদের দুজনকে অফিসে পৌঁছে দিয়ে বাচ্চাটাকে বাড়িতে নিয়ে আসবে। স্নান করাবে, খাওয়াবে, খেলা দেবে। যতক্ষণ না তোমাদের মধ্যে একজন ফিরে আসছ।'

সুনীল বলে, 'সবটাই তো হেঁয়ালি দাদা, আমার তো গাড়ি নেই। কী বললাম তখন?

'গাড়ি নিয়েই এ যাবে। নিজের গাড়ি। ছোট্ট অস্টিন। ফোর সিটার। পেট্রল, রিপেয়ার্স— সব

তোমার, গাড়ির ভাড়া লাগবে না। গ্যারেজের ভাড়া তুমি দাবি করবে না। ও খাবে তোমাদের সংসারে, কিন্তু রান্না করবার সময় পাবে না। থাকবে তোমাদের বাড়িতে। ঐ মেজানাইন ঘরখানায়।'

সুনীল একটা ঢোঁক গিলে বলল, 'ভদ্রলোকের বয়স কত? জানেনই তো দাদা, আমার বউ সুন্দরী আর তার কাঁচা বয়স।'

'ভদ্রলোক নয়, ভদ্রমহিলা। এও সুন্দরী, কাঁচা বয়স। তবে তোমার কাঁচা বয়সের জন্য আটকাবে না। ও আত্মরক্ষা করতে জানে।'

'মহিলা! বয়স ঠিক কত?'

'বয়সের জন্য আটকাবে না। ও তোমার বাচ্চাকে পড়াবে, খেলা দেবে আর ড্রাইভারি করবে। লাইসেন্স অনেকদিনের। হাত খুব স্টেডি। বুঝতেই পারছ। সেলফ-ড্রিভেন-কার ব্যবহার করে, আসানসোল থেকে একা ড্রাইভ করে এসেছে। ওর ইন্টিগ্রিটির সম্বন্ধে আমার গ্যারান্টি রইল। বল, কত মাইনে দেবে?

'পুরুষমানুষ হলে আমি বলতাম। মহিলা এবং তাঁর বয়সটা জানি না— কুমারী, সধবা কিংবা 'ইয়ে' কি না তাও জানি না। আমি ফোনটা মল্লিকাকে দিচ্ছি। নিন কথা বলুন।'

মল্লিকা সব কথা শুনে বলল, 'আমরা কোনও দরাদরি করব না। আপনি যা আদেশ করবেন তাই মাথা পেতে মেনে নেব।'

বাসু বললেন, 'ও ভাল ছাত্রী ছিল, না হলে আজকাল কেউ ফিজিক্স-অনার্সে চান্স পায় না। বি. এসসি. পরীক্ষার ঠিক আগেই ওর বাবা মারা যান। তোমার কর্তাকে জিজ্ঞাসা কর; বি. এসসি পাশ, উইথ ফিজিক্স অনার্স, টিচার, স্কুলে সদ্য চাকরি পেলে প্রথমে সব মিলিয়ে কত টাকা মাইনে পায়। তার এক টাকা কম হলে আমরা রাজি নই। মেয়েটি জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছে। আর যেন না পায়।'

মল্লিকা বললে, 'আমরা রাজি। বিশেষ করে ওর গাড়িটাতে আমাদের অনেক অনেক প্রবলেম সলভড হয়ে যাবে। ও কবে জয়েন করবে?'

'ঘণ্টা দুই-তিনের মধ্যে। মানে নিউ আলিপুর থেকে সল্ট লেক পৌঁছতে যতক্ষণ লাগে— হ্যাঁ, ঐ নতুন রাস্তা দিয়েই ওকে যেতে বলব; ইস্টার্ন বাইপাস।... আই নো, আই নো... অতটা সময় লাগার কথা নয়। কিন্তু ও তো কলকাতার রাস্তাঘাট ভাল চেনে না। আসানসোলে মানুষ হয়েছে। তাই অতটা সময় বলেছি।'

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে রুবির দিকে ফিরে বললেন, 'ওরা লোক খুব ভাল। মল্লিকা তোমার চেয়ে বছর তিনেকের বড়। ওরা দুজনেই চাকরি করে। কর্তা সরকারি স্কুলের টিচার। গিন্নি অধ্যাপিকা। গ্যারেজের উপর একটা মেজানাইন ঘর আছে। বোধহয় সেটাই তোমাকে দেবে।'

কথা বলতে বলতেই ড্রয়ারটা টেনে উনি একটি চামড়ার ব্যাগ বার করলেন। আর ভিতর

থেকে বিশখানি একশ টাকার নোট বার করে বাড়িয়ে ধরলেন ওর দিকে। বললেন, 'নাও ধর।'

রুবির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। বললে, 'এটা কী, স্যার?'

'টাকা। দুহাজার। ধর।

'আমি তো ধার চাইনি।'

'আমি তো ধার দিইনি।'

ভ্রূকুঞ্চন হয় এবার। বলে : 'তবে কী? দান?'

'—তাই কি পারি? আমি তো তোর মামণি নই। এটা অ্যাডভান্স পেমেন্ট। ঐ যে খেসারতটা আদায় করব তার থেকে কিছু অগ্রিম দিলাম তোকে। এই আর কি। আর সেজন্যই তো ঘণ্টা দুই-তিন সময় চেয়ে নিলাম। দু-চারটে জামাকাপড়, চপ্পল, সাবান, তোয়ালেও তো কিনে নিয়ে যেতে হবে। ঐ লালপেড়ে হলুদ শাড়িটাও যে তোর মতো ক্লান্ত। দাও রানু, একটা অ্যাডভান্স পেমেন্টের ভাউচার বানিয়ে দাও দুহাজার টাকার। সুনীলের ঠিকানা আর কলকাতার একটা রোড-ম্যাপের জেরক্স কপি— ঐ বাঁদিকের ড্রয়ারে আছে; ওকে দাও। উইশ য়ু বেস্ট অব লাক।'

রানু একটু পরে এ. এ. ই. আই.-এর একটা রোডম্যাপ আর ভাউচার এনে টেবিলের ওপর রাখলেন। পেন-হোল্ডার থেকে কলমটা তুলে নিয়ে বললেন, এইখানে সই কর, রুবি। দু-হাজার টাকার অ্যাডভান্সের রসিদ।'

রুবি কোনও কথা বলল না। নির্দিষ্ট স্থানে সই দিয়ে দুজনকে প্রণাম করে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

রানু টেবিল থেকে একটা ব্লটার উঠিয়ে নিয়ে ঐ অ্যাডভান্স-ভাউচারের ওপর রুবি যেখানে সইটা করেছে সেখানে 'ব্লট' করলেন। বাসুর নজর হল।

বললেন, 'পেনটা লিক করছে না কি?'

রানু বললেন, 'না। জলটা লবণাক্ত। ও যখন নিচু হয়ে সই করছিল...'

।। সাত ।।

রুবি চলে যাবার ঘণ্টাখানেক পরে বাজল টেলিফোনটা।

রানু শুনে নিয়ে 'কথামুখে' হাত চাপা দিয়ে বললেন, 'প্রমীলা পাণ্ডে। তোমাকে খুঁজছে। কথা বলবে?'

বাসু ইতিমধ্যে খবরের কাগজটা তুলে নিয়েছিলেন। সেটা নামিয়ে রেখে বললেন, 'আমার এমন কিছু বয়স হয়নি রানু যে, প্রমীলা রাজ্য থেকে কেউ আহ্বান করলে সাড়া দেব না।'

রানু বললেন, 'একথার জবাব পরে দেব, নাও কথা বল—'

বাসু টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বললেন, 'নমস্কার প্রমীলা দেবী। বলুন, আমি পি. কে. বাসু

কথা বলছি।'

'নমস্কার, স্যার। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য মাপ চাইছি। আমি হাওড়ার উকিল মিস্টার প্রসেনজিৎ দত্তগুপ্তকে ফোন করেছিলাম, তিনিই বললেন, আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে।'

'কী ব্যাপারে?'

'রুবি রায়ের ব্যাপারে। সে কি আপনার মক্কেল?'

'হ্যাঁ। প্রসেনজিৎ আমার সঙ্গে এ বিষয়ে যুক্ত আছে। কিন্তু 'রুবি রায়ের বিষয়ে আইন-সংক্রান্ত আলোচনা আমি কোনও আইনজীবীর সঙ্গে করতে ইচ্ছুক। আপনার কোন অ্যাটর্নি আছেন, যিনি আপনার ব্যবসাসংক্রান্ত কাজকর্ম দেখেন?'

'আজ্ঞে না। আমার ব্যবসায়িক ও আইনসংক্রান্ত কাজকর্ম আমি নিজেই দেখে থাকি।'

বাসু বললেন, 'মিস রায়ের তহবিল একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। ও এই শহরে কাজ খুঁজতে এসেছিল, কিন্তু এখন ওর পক্ষে কোন কাজকর্ম পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ছে। কারণ বেকসুর খালাস পেলেও একটা বিশ্রী পুলিশ-রেকর্ড ওর বায়োডাটায় কালিমা লেপন করেছে।'

'আই অ্যাপ্রিশিয়েট। সেজন্য আমি তাকে কিছু অর্থ দান করতে চাইছিলাম, তাই মিস্টার দত্তগুপ্তকে ফোন করায়...'

'বুঝেছি, বুঝেছি, কিন্তু দান তো সে নেবে না।'

'নেবে না?'

'আজ্ঞে না। যদি আদৌ কিছু নেয়, তো নেবে 'ক্ষতিপূরণ'...।'

'সে তো ঐ একই কথা।'

'আজ্ঞে না। এইজন্যই বলছিলাম, আপনি আপনার অ্যাটর্নিকে পাঠিয়ে দিন। চ্যারিটি আর কমপেনসেশন শব্দ দুটির পার্থক্য যিনি বুঝতে পারেন।

'আপনি ভুল করছেন, মিস্টার বাসু। ঐ দুটি ইংরেজি শব্দের পার্থক্য বুঝতে গেলে ল পাস করতে হয় না। সত্যি কথা বলতে কি, মেয়েটি নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় আমি কিছুটা বিবেকের দংশন অনুভব করছি। রুবিকে দেখতে অনেকটা আমার ছোট বোনের মতো...'

'এই দেখুন! আপনি যদি আপনার অ্যাটর্নিকে কথা বলার সুযোগ দিতেন, তাহলে এসব খেজুরে প্রসঙ্গ আদৌ উঠতো না। ওকে দেখতে আপনার ছোটবোনের মতো না সতীনের মতো এটা কোনও ফ্যাক্টরই নয়।'

'সতীনের মতো! হোয়াট ডু য়্যু মীন?'

'কী মুশকিল! ও একটা কথার কথা। আপনিও জানেন, আমিও জানি যে, হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট পাস হবার পর 'সতীন' শব্দটা পেত্নী, শাঁখচুন্নির মতো অলীক অবাস্তব হয়ে গেছে।... কী হল? আপনি লাইনে আছেন?'

'হ্যাঁ আছি। 'দান'ই হোক অথবা 'ক্ষতিপূরণ', আমি আপনার মক্কেলকে কিছু টাকা দিতে চাই

আপনার অফিসে গিয়ে দিয়ে আসতে চাই। কখন আপনার সময় হবে? আজ বিকালের দিকে?'

'কলকাতায় আপনি আছেন কোথায়?'

'হোটেল হিন্দুস্থান, লোয়ার সার্কুলার রোডে।'

'ওটা এখন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। সে যাক, আর আপনার বান্ধবী? মিস পুষ্পা? এবং তার হবু বর?

'পুষ্পা আছে তাজবেঙ্গল হোটেলে, আর জনার্দন ওদের আলিপুরের রেস্টহাউসে। কিন্তু এসব কথা উঠছে কেন?'

'এমনিই। আপনি বিকাল তিনটের সময় আসতে পারবেন?'

'পারব। তখনই অন্যান্য কথা হবে। নমস্কার।'

বাসু ফোনটা নামিয়ে রাখার পর রানু বললেন, 'তুমি ইচ্ছে করে ভদ্রমহিলাকে ক্রমাগত খোঁচাচ্ছিলে কেন বল তো? লোয়ার সার্কুলার রোডকে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড না বললে মহাভারত কিছু অশুদ্ধ হয়ে যায় না।'

'যায় রানু, যায়। এ শহরে অনেক-অনেক রাস্তা আছে যেগুলি রাজনীতি-ব্যবসায়ীরা পার্টির খাতিরে নামকরণ করেছে। অল্প যে কয়টি ব্যতিক্রম আছে তার মধ্যে পড়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য জগদীশচন্দ্র, বিবেকানন্দ রোড, নেতাজী সুভাষ বা...'

'বুঝেছি। কিন্তু সতীনের প্রসঙ্গ তুলে ওঁকে খোঁচা দিলে কেন? তুমি তো জান, প্রমীলাদেবীর স্বামী অন্য একটি মহিলার সঙ্গে অন্যত্র থাকেন।'

'সো হোয়াট? এটা তো উইমেন্স লিব-এর যুগ। প্রমীলাদেবী বদলা নিতে অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে থাকলেই পারেন।'

'যার এখনো তেমন কিছু বয়স হয়নি? প্রমীলা রাজ্য থেকে ডাক এসেছে শুনলে যে এখনো চুলবুল করে ওঠে?'

* * * * * * * * *

কাঁটায় কাঁটায় তিনটের সময়েই এলেন তিনি। বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশ যে কোন অঙ্ক হতে পারে। 'বায়সকৃষ্ণ' থেকে 'দুগ্ধালক্তক' যে কোন রং— মাথায় ওটা দেহসংলগ্ন কুন্তলসম্ভার অথবা 'ফরেন মেক উইগ' বলা শক্ত। বিউটি শপ ওঁকে আদ্যন্ত রূপান্তরিতা করে দিয়েছে— যেটা পরিবর্তন করতে পারেনি— হাই হিল খুটখুট সত্ত্বেও— সেটা ওঁর উচ্চতা।

সৌজন্য বিনিময়ান্তে বাসুসাহেবের ভিজিটার্স সীটে বসে বললেন, 'আপনাকে না জিজ্ঞেস করেই আমি কিন্তু একটা কাজ করেছি। জনার্দনকে সাড়ে তিনটের সময় এখানে আসতে বলেছি।'

'কিন্তু সাড়ে তিনটে কেন? আপনার সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো ছিল তিনটেয়?'

'সেই জন্যেই। জনার্দনের রাজত্ব নেই, কিন্তু পূর্বপুরুষের রাজ-মেজাজটা আছে। ও এসে পড়ার আগে যাতে আমি আমার কথাগুলো বলতে পারি সে জন্যই এই আধঘণ্টার মার্জিন।'

'সে ক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন মিস্টার গায়কোয়াড়কে আদৌ আসতে বললেন কেন?'

'সৌজন্যবোধে। গহনা যা খোয়া গেছে তা আমার এবং পুষ্পার। জনার্দন না মনে করে আমি ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাচ্ছি।'

'তা কেন মনে করবেন উনি? বিয়েটা তো এখনো হয়নি। এনগেজমেন্ট হয়েছে মাত্র। আর গহনাগুলো কিছুটা আপনার, অধিকাংশই পুষ্পাদেবীর।

'সত্যি কথা, কিন্তু অধিকাংশই জনার্দনের দেওয়া উপহার।'

'ঠিক আছে। বলুন, প্রথমে বলুন তো চুরিটা কখন হল। কীভাবে হল?'

'মেয়েটি যখন বেকসুর খালাস পেয়ে গেছে, তখন ধরে নিতে হবে ঐ প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীটার — কী যেন নাম...?'

'সহদেব কর্মকার—'

'ইয়েস। সহদেব কর্মকারের সাক্ষ্যের কোনো মূল্য নেই। সে ক্ষেত্রে চুরিটা সন্ধে সাড়ে-সাতটার বদলে সকাল নয়টা থেকে রাত নয়টার মধ্যে যে কোন সময়ে হয়ে থাকতে পারে। কারণ কন্টেসা গাড়িটাকে ওখানে রেখে আমরা ট্যাক্সি নিয়ে দুজনে আশ্রমে যাই। সকাল নয়টা নাগাদ। দুপুরে সেখানেই 'কণিকা'-মাত্র প্রসাদ পাই। 'কণিকামাত্র' বলছি— কিছু মনে করবেন না— আমরা অন্য জাতির খাদ্যে অভ্যস্ত। তারপর পুষ্পা মায়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করল। আমি ট্যাক্সিটা নিয়ে বেলুড়-মন্দির দেখে এলাম। সন্ধ্যা ছয়টার সময় আশ্রম থেকে বের হই। পথে একটা চীনে রেস্তোরাঁয় নৈশাহার সারি। ওদের বার-লাইসেন্স ছিল না। ফলে আমরা আদৌ ড্রিংক করিনি। মোটেলে ফিরে এলাম রাত সাড়ে-আটটায়। তখনই আমার নজরে পড়ল পিছনের ডিকিটা বন্ধ নেই। আমার সন্দেহ হল। টানতেই ডালাটা খুলে গেল। দেখি সর্বনাশ হয়ে গেছে। তখন...'

'জাস্ট এ মোমেন্ট। এই পর্যায়ে কয়েকটা সন্দেহভঞ্জন করে নিই। প্রথম কথা, দুই লক্ষ টাকার গহনা গাড়ির ডিকিতে কেন রেখে গেছিলেন? কেন নয়, মোটেলের ঘরে।'

'মোটেলের ঘরে ইয়েল-লক ছিল না। অলড্রপ আর সাধারণ তালা। যার ডুপ্লিকেট চাবি নিশ্চয় আছে ঐ ম্যানেজারের কাছে। খানদানি হোটেলে সচরাচর যেমন স্ট্রংরুম থাকে এখানে তা ছিল না। অথচ লক্ষ্য করে দেখি, কন্টেসা গাড়ির পিছনে লাগেজ কেরিয়ারের গা-তালা রীতিমতো মজবুত। ফরেন-মেক হাই-গ্রেড স্টিলের চাবি। তাই সেই চাবিটা আমরা খুলে নিয়ে গিয়েছিলাম। রামলগনের কাছে ছিল শুধু দরজার আর ইগনিশনের চাবি।'

'রামলগন বলতে নিশ্চয় ঐ কন্টেসা গাড়ির ড্রাইভার? তাকে কতদিন ধরে চেনেন আপনারা?'

'না, তাকে আদৌ চিনতাম না। পুষ্পার যে পাবলিসিটি এজেন্ট আছে তার কলকাতা অফিসের একজন— মোস্তাক আহমেদ— যে হোটেল বুক করেছিল, সে লোকটাই রেন্ট আ-কার সার্ভিসে কন্টেসাও বুক করেছিল।'

'ঐ মোস্তাক আহমেদকে কতদিন ধরে চেনেন আপনারা?'

'সে বহুদিন। আগে সে বোম্বাইয়ে পুষ্পার সঙ্গে থাকত। কম্বাইন্ড-হ্যান্ড হিসাবে। লোকটার রান্নার হাত দারুণ। তখনো পুষ্পার তেমন নামডাক হয়নি। পরে পুষ্পা ওকে এখানে ওর পাবলিসিটি এজেন্টের কাছে বদলি করে দেয়।'

'ঐ রামলগন সারাদিন কোথায় ছিল?'

'আমরা দুজন ট্যাক্সি নিয়ে আশ্রমে চলে গেলাম সকালের দিকে। রামলগন সারাদিন বস্তুত ছুটিতেই ছিল। গাড়িতে বা এদিক-ওদিক। দুপুরে একটা পাঞ্জাবি ধাবায় গিয়ে খেয়েছে। ম্যাটিনিতে সিনেমা দেখেছে। সে বলছে, চুরির কথা সে কিছুই জানে না।'

'তাকে বলেননি যে, গাড়িতে অত্যন্ত দামী জিনিস আছে?'

'মুখে বলিনি। কিন্তু সে হয়তো আন্দাজ করেছিল। যখন ওর চাবির রিঙ থেকে ডিকি-লক-এর চাবিটা আমরা খুলে নিলাম।'

ডিকি-লক-এর ডুপলিকেট কোনও চাবি ছিল না?'

'না। অন্তত রামলগনের কাছে ছিল না। পুলিশে এনকোয়ারি করে দেখেছিল। ডুপ্লিকেট ছিল 'রেন্ট-আ-কার সার্ভিসের দপ্তরে। ম্যান্ডেভিলা-গার্ডেন্সে তাদের অফিস। সে অনেক অনেক দূর বেলুড় থেকে।'

'কিন্তু এত গহনা নিয়ে কলকাতা এসেছিলেন কেন আপনারা?'

'সেকথা উহ্যই থাক না, স্যার।'

'বুঝলাম। গোল্ড অ্যাক্ট বা ইনকাম ট্যাক্স। তা পরদিন মিস্টার গায়কোয়াড়ের রিঅ্যাকশন কী হল?'

'সে তো ক্ষেপে আগুন। ওর সবচেয়ে রাগ : কেন আমরা বোকার মত পুলিশে গেলাম। যদিও পুলিশে খবরটা দিয়েছিলাম আমি, ওর সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল পুষ্পার উপর। মায়ের সঙ্গে দেখাটা পর্যন্ত করল না। পরের ফ্লাইটেই গোয়ালিয়র ফিরে যেতে চেয়েছিল। আমরা অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আটকেছি। গায়কোয়াড়ের একটা গেস্ট-হাউস আছে আলিপুর রোডে। পুষ্পা সেখানে উঠতে রাজি হল না। মান অভিমান আর কি। সে উঠেছে তাজ বেঙ্গলে। দেখুন, দুলাখ টাকাটা কিছু নয়। না জনার্দনের কাছে, না পুষ্পার কাছে। কিন্তু ওর ভিতর একটা মাঙ্গলিকী ছিল : একটা 'রাণী-মুকুট'। প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের। মোঘল সম্রাটদের কাছ থেকে পাওয়া। ঐতিহাসিক মূল্য বাদ দিলেও শুধু সোনা আর পাথর মিলিয়ে সেটারই দাম একলাখ টাকা। তার মূল্য নিক্তি কষে হবার নয়। বস্তুত সে কারণেই আপনার কাছে আসা। ওয়ান অব দ্য থ্রি রিজন্স।'

'তিনটে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছুন? কী কী?

'একটা তো ঐ রুবি রায়ের ব্যাপারটা মেটানো। দু-নম্বর : শুনেছি, আপনার আন্ডারে 'সুকৌশলী' নামে একটি প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি আছে। আপনার মাধ্যমে আমরা তাঁদের প্রফেশনালি এনগেজ করতে চাই। অন্তত ঐ মুকুটটা উদ্ধারের ব্যাপারে। পুলিশের উপর আমাদের আস্থা নেই।'

'বুঝলাম। আর তিন নম্বর উদ্দেশ্য?'

'সেটা একটু ডেলিকেট, স্যার। প্রথম দুটোর দায়িত্ব আপনি নিতে রাজি হলে তারপর সে প্রসঙ্গটা তুলতে চাই।'

তখনই বেজে উঠল ইন্টারকম। রানু জানালেন, 'মিস্টার জনার্দন গায়কোয়াড় এসেছেন। তাঁকে কি অপেক্ষা করতে বলা হবে?'

প্রমীলা হাত নেড়ে ইঙ্গিত করলেন, 'না'।

বাসু ইন্টারকমে বললেন, 'না, না, ওঁকে আসতে বল। আমরা বস্তুত ওঁর জন্য অপেক্ষা করছি।'

পরমুহূর্তেই দরজাটা খুলে গেল। জনার্দন গায়কোয়াড়ের দেহাকৃতি রাজপুত্রেরই মতো। দীর্ঘদেহী, মধ্যাক্ষম, তবে মুখে বসন্তের দাগ। দাড়ি-গোঁফ কামানো। বুদ্ধিদীপ্ত ঝকঝকে পালিশ। দ্বারপ্রান্তে একটা বিচিত্র 'বাও' করলেন। তারপর অগ্রসর হয়ে এসে করমর্দনের জন্য দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করে দিলেন।

বাসু উঠে দাঁড়ালেন, করমর্দন করে বললেন, 'গুড আফটারনুন। বি সীটেড প্লীজ।'

প্রমীলাও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। জনার্দন সেদিকে ফিরে মার্কিনী ঢঙে বললেন, 'হ্যালো বিউটিফুল। য়ু লুক বিউটিফুলার দিস ইভনিং।

তিনজনেই আসন গ্রহণ করলেন। জনার্দন গায়কোয়াড়ের প্রতিটি মিনিট বোধকরি মূল্যবান। তিনি সরাসরি আলোচ্য প্রসঙ্গে এলেন। মিসেস পাণ্ডের দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি যখন ফোন করেছিলে তখন আমি ছিলাম না; কিন্তু তোমার রেকর্ডেড ফোন-মেসেজ শুনে বুঝলাম তুমি আমাকে এখানে সাড়ে-তিনটেয় আসতে বলেছ। ঐ সেই যে মেয়েটি গহনা চুরি করেছিল তার বিষয়ে কী-একটা সেটলমেন্ট করতে। তাই নয়?'

প্রমীলা তাঁর উইগ-সমেত মাথাটা নেড়ে বললেন, 'মেয়েটা আদৌ চুরি করেনি। তুমি ভুল বলছ জনার্দন।'

'করেনি? তুমি কেমন করে জানলে?'

'করলে সে বেকসুর খালাস পেত না।'

জনার্দন বিচিত্র হাসলেন। সে হাসি বাক্যের চেয়ে বাঙ্ময়। এবং ব্যঙ্গময়।

তারপর বাসুসাহেবের দিকে ফিরে বললেন, 'তা আপনি এ কেসে কীভাবে জড়িয়ে পড়লেন, মিস্টার বাসু? আমি তো শুনেছিলাম, মেয়েটি কপর্দকহীনা, তাই আদালত নিজের খরচে একজন জুনিয়র উকিলকে নিয়োগ করেছিল।'

'ঠিকই শুনেছেন।' —বললেন বাসু।

'আর নির্দোষ প্রমাণিত হবার পরে মেয়েটি হাজত থেকে বেরিয়ে এসেই আপনার মতো ক্যালকাটা বারের এ-ওয়ান ব্যারিস্টারকে এমপ্লয় করার মতো আর্থিক সঙ্গতি পেয়ে গেল?'

বাসু বললেন, 'কী জানেন মিস্টার গায়কোয়াড়— অর্থ-কৌলিন্যের দম্ভে যারা 'হ্যাভ-নটস'-

দের মাথায় চাঁদির পয়জার মারতে সদা-উদ্যত তাদের বিরুদ্ধে বিনা ফিতেই আমি কিছু কিছু কেস নিয়ে থাকি।'

জনার্দন গম্ভীর হয়ে গেলেন।

প্রমীলা একতরফা অনেকক্ষণ বকবক করে গেলেন। কীভাবে প্রসেনজিৎ দত্তগুপ্ত প্রমাণ করেছেন সহদেব কর্মকার ঘটনাস্থলে আদৌ ছিল না।

জনার্দন হাসি হাসি মুখে বললেন, 'আর ঐ মেয়েটি বোধহয় স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পেল : একটা স্টর্ক উড়তে উড়তে আসছে। তার ঠোঁট থেকে ঝুলছে একটা পুঁটুলি। তাতে একপাটি ব্রেসলেট। মায়েরা যেমন সারস পাখির কল্যাণে পেটের ভিতর খোকাখুকু পায়, ঐ বেকসুর খালাস পাওয়া মেয়েটিও তেমনি তার ভ্যানিটি ব্যাগের ভিতর...'

প্রমীলা ধমকে ওঠে : 'ও জন! ডোন্ট বি ভালগার!'

জনার্দন বাসুসাহেবের দিকে ফিরে বলেন, 'লেটস বি সিরিয়াস, স্যার। মক্কেলের তরফে আপনার বক্তব্যটা কী?'

'সেটা আপনাদের লীগাল-কাউন্সেলের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই।'

'নো! উই আর সরি। আপনার যা বলার আমাদেরই বলতে হবে। বলুন?'

'অল রাইট। বলছি : মিসেস প্রমীলা পাণ্ডে একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন যে, আমার মক্কেল দুই লক্ষ টাকার গহনা চুরি করেছে। সেই অভিযোগ মোতাবেক আমার মক্কেল দুই রাত্রি হাজত বাস করেছে। তার বায়োডাটায় একটা দাগ পড়ে গেছে। সে আনএমপ্লয়েড, ঐ কারণে চাকরি পাচ্ছে না।'

জনার্দন বাধা দিয়ে বলল, 'জাস্ট এ মিনিট, স্যার। প্রমীলা পাণ্ডে একটা কেস এফ. আই. আর. করেছিল মাত্র।'

'না। দ্যাটস নট দ্য হোল ট্রুথ। ইন্সপেক্টর যখন সহদেব কর্মকারের নির্দেশমতো মধ্যরাত্রে আমার মক্কেলকে ঘুম থেকে টেনে তুলল, তখন মিসেস পাণ্ডে নতুন করে আর একটি এফ. আই. আর. লজ করেছিলেন।'

'দ্যাটস অলসো ইজ নট দ্য হোল ট্রুথ, স্যার, আপনি উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন যে, মধ্যরাত্রে ইন্সপেক্টর মিস রুবি রায়ের ঘরটা সার্চ করার সময় ভ্যানিটি ব্যাগের ভিতর এক পাটি চোরাই গহনা উদ্ধার করেছিল...'

'দ্যাট এগেন ইজ নট দ্য হোল ট্রুথ, স্যার, মামলার রায়ে আদালত বলেছেন, 'একপাটি গহনা আসামীর ব্যাগে কেউ হয়তো উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, অপরাধটা তার ঘাড়ে চাপাতে।'

জনার্দন ব্যঙ্গের হাসি হাসে। বলে, 'সে প্রসঙ্গ তো আগেই আলোচিত হয়েছে। সম্ভবত কোন পথভ্রান্ত সারস পক্ষী। শুনুন, স্যার, প্রমীলা ঐ মেয়েটিকে চিনত না। কোনও বিদ্বেষবশে সে বলেনি : ঐ চোর। ঐ চোর। ইন্সপেক্টর নিজ হাতে নতুন করে F.I.R.-টা ড্রাফট করে দিয়েছিল।

F.I.R.-এর ভাব-ভাষা সব কিছুর জন্য ইন্সপেক্টর দায়ী। প্রমীলা শুধু স্বাক্ষর দিয়েছে। দেশে কোন আইন নেই যাতে প্রমীলাকে এজন্য দায়ী করা চলে। সে আরক্ষা-বিভাগের নির্দেশে অভিযোগে স্বাক্ষর করেছিল মাত্র। 'দান' হিসাবে প্রমীলা ঐ চোর মেয়েটিকে যদি কিছু দিতে চায় তো সে আলাদা কথা। 'খেসারত' হিসাবে আমরা এক নয়া পয়সা দিতেও বাধ্য নই। এটাই আইনের শেষ কথা।'

বাসু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আমি আপনাদের ডাকিনি। অবশ্য মিসেস পাণ্ডে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলেন। আপনারটা নিতান্তই অ্যান-অ্যাপয়েন্টেড ইনট্রুশন।'

গটগট করে এগিয়ে গেলেন তিনি। ধীরে নির্গমন দ্বারটি খুলে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

জনার্দন এবং প্রমীলা দুজনেই দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন।

জনার্দন বললেন, 'আপনি স্যার, আমাকে ভুল বুঝেছেন।'

'আজ্ঞে না! আপনিই আমাকে ভুল বুঝেছেন। আইনের শেষ কথা আমি আপনার কাছে শিখতে রাজি নই। এবার আসুন আপনারা।'

জনার্দন মনস্থির করে। প্রমীলার হাত চেপে ধরে বলে, 'অলরাইট। চলে এস প্রমীলা।'

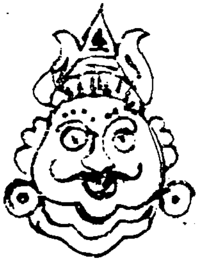

।। আট ।।

উনত্রিশে শুক্রবার।

সকালে প্রাতঃভ্রমণ ওঁর নিত্যকর্মপদ্ধতির অন্তর্গত। সাত রাজ্য সেরে সূর্যোদয়ের সময়ে ডেরায় প্রত্যাবর্তন করে দেখলেন ইতিমধ্যে সুজাতা-কৌশিক ফিরে এসেছে। ওঁরা তিনজনে লনে বসেছিলেন। বিশু এক-এক পেয়ালা চা বানিয়ে দিয়েছে।

বাসুসাহেবও এসে বসলেন। বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলে তোমরা? পাটনা? ওরে বিশে। আমাকেও এক পেয়ালা দে।'

কৌশিক বলে, 'না, মামু! পাটনা নয়, গোয়ালিয়র। আমরা বোধহয় একই চক্করে পাক খাচ্ছি অথচ মামা-ভাগ্নে সে-খবর জানি না।'

'কী-রকম? গোয়ালিয়রে কোথায়? কেন?'

'মামিমার কাছে এতক্ষণ বসে আপনার কপর্দকহীন গাড়ির মালিক মক্কেলের কাণ্ড শুনছিলাম। তাই বলছি, আপনার কেসের সঙ্গে আমাদের তদন্তের একটা নিগূঢ় যোগাযোগ রয়েছে মনে হয়, আমরা দুজনে গোয়ালিয়র গেছিলাম রাজমাতার গোপন আহ্বানে। শুনুন কাণ্ড :

'সুকৌশলী'র দপ্তরে দেখা করতে আসেন একজন সম্ভ্রান্ত মক্কেল। আত্মপরিচয় দেন গোয়ালিয়রের একজন পরাক্রমশালী প্রাক্তন জমিদারের— ছোটখাটো রাজাই ছিলেন তিনি— দেওয়ানপুত্র হিসাবে। রাজাও নেই, দেওয়ানিও নেই— কিন্তু বৈভব আছে, খানদান আছে। রাজমাতা এই দূতের মাধ্যমে সুকৌশলীর গোয়েন্দা-দম্পতিকে গোয়ালিয়রে আমন্ত্রণ করে

পাঠিয়েছেন। হেতুটা কী, তদন্তটা কী জাতীয়, তা দূত জানেন না। আন্দাজ করছেন : অত্যন্ত গোপনীয়। দু-তিনদিনের জন্য ওঁদের দুজনকে গোয়ালিয়রে গিয়ে গায়কোয়াড়-প্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে। ওঁদের ফি তিনি অগ্রিম মিটিয়ে দিতে প্রস্তুত।

বাসু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, 'গায়কোয়াড়-প্রাসাদ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন জনার্দন গায়কোয়াড়ের জননী।'

'তিনি তোমাদের পাত্তা পেলেন কী করে?'

'শুনুন সেকথা। আমরা দুজনে ক্রমে সর্বভারতীয় পরিচিতি লাভ করে বসেছি। ভি.আই.পি. কোটায় এ. সি. কোচে দুজনের টিকিট কেটে নিয়ে এলেন রাজমাতার দূত। অত্যন্ত দ্রুত কাজটা সারতে হবে। কারণ রাজমাতার ইচ্ছা— পুত্রের অনুপস্থিতির ভিতরেই যেন 'সুকৌশলী' গোয়ালিয়রে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। পুত্র জনার্দন এসেছেন কলকাতায়, তাঁর হবু-শাশুড়ির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কৌশিক ও সুজাতা রাজবাড়ির অতিথি হল। রাজকীয় আপ্যায়নের ত্রুটি নেই, তবে দেওয়ানপুত্র ছাড়া ওদের প্রকৃত পরিচয় আর কেউ জানলো না। এমনকি রাজমাতার খাস পরিচারিকা পর্যন্ত নয়।

রুদ্ধদ্বারকক্ষে রাজমাতা জানালেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্র জনার্দন একটি সিনেমা আর্টিস্টকে বিবাহ করতে চলেছে। তাতে তাঁর আপত্তি নেই, অনেক অনেক খানদানী ঘরে এখন ফিল্ম স্টার পুত্রবধূরূপে প্রবেশলাভ করেছে, করছে। কিন্তু উনি গোপনে সংবাদ পেয়েছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্র যে অভিনেত্রীটিকে বিবাহ করতে যাচ্ছে, সে অন্যপূর্বা এবং তাদের পূর্ববর্তী বিবাহের বিচ্ছেদ নাকি হয়নি। পুত্রকে তিনি সে কথা বলেছেন— জনার্দন বিশ্বাস করেননি। মাকে পাত্তা দেননি। ক্ষুব্ধ রাজমাতা তখন বোম্বাইয়ের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি বা গোয়েন্দা সংস্থাকে নিয়োগ করেন। তাঁরা সন্ধান করে জানিয়েছেন যে, আশঙ্কাটি হয়তো অমূলক নয়। কিন্তু অভিনেত্রীর পূর্বতন স্বামী— বস্তুত হয়তো বর্তমান খসম্ যদি 'তালাক' না দিয়ে থাকে...

রাজমাতাকে বাধা দিয়ে সুজাতা বলে উঠেছিল : 'তালাক' ?

'হ্যাঁ বেটি। 'তালাক'। কারণ ওই লোকটা মুসলমান। এবং শরিয়তী আইনে ওদের সাদি হয়েছিল বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।'

কৌশিক জানতে চায়, 'মা, আপনি তো বোম্বাইয়ের একটি সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করাচ্ছেন, তাহলে আমাদের আবার ডেকে পাঠালেন কেন? আর এই গোয়ালিয়রে বসে আপনি আমাদের পাত্তাই বা পেলেন কেমন করে?'

রাজমাতা ওদের বুঝিয়ে বললেন যে, ওদের নাম সেই বোম্বাইয়ের গোয়েন্দা সংস্থাই সাজেস্ট করেছেন। কারণ ওই মুসলমান লোকটি বছরখানেক ধরে কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা। জনার্দনের হবু পত্নীর সঙ্গে তার আদৌ দেখা-সাক্ষাৎ বা আলাপ হয় না। এক্ষেত্রে বাকি তদন্তটা কলকাতার কোনও সুপ্রতিষ্ঠিত গোয়েন্দা সংস্থা যদি ওদের সঙ্গে যৌথভাবে নিষ্পন্ন করে তবে সত্য উদঘাটনে সুবিধা হতে পারে।

'কালকের বিশ্রী কাণ্ড তো অতীত কথা, মিসেস পাণ্ডে। আজকে নিশ্চয় নতুন করে কিছু বলতে চান? তাই না? তাহলে বলে ফেলুন।'

'কাল জনার্দন আমাকে প্রস্তাবটা পেশ করার সুযোগই দিল না। ও বড্ড একরোখা। যা বুঝবে, তাই করবে। আপনাকে আগেই বলেছি : আমি কিছু বিবেকের দংশনে পীড়িত হচ্ছি। মনে হচ্ছে মেয়েটিকে কিছু দিতে পারলে মনটা শান্ত হবে। আমি নিঃসন্দেহ : বিচারক ঠিকই রায় দিয়েছেন। রুবি রায় ওই গহনা চুরির অংশীদার নয়। হয়তো জনার্দনের যুক্তিও অকাট্য— মানে সেজন্য আমার কোনও 'খেসারত' দেবার কথা ওঠে না। তা যে যাই বলুক, আমি বিবেকের দংশন থেকে মুক্তি পেতে চাই। আপনি কি আমাকে সে সুযোগ দেবেন?'

'আপনি প্রকারান্তরে বলতে চান যে, আমার মক্কেলকে কিছু আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে চান, এই তো? তা আদালতের বাইরে সমস্যার সমাধানে আমার আপত্তি কী?'

'আমি তাহলে কখন আপনার চেম্বারে আসব?'

'এখনই আসতে পারেন, আপনার যদি অসুবিধা না থাকে।'

'আজ্ঞে না। অসুবিধা নেই। তাহলে এখনি আসছি। বাই দা ওয়ে... আপনার বাড়ির অপরাংশে যাঁরা থাকেন— আই মীন 'সুকৌশলী' দম্পতি— ওঁরা কি কলকাতায় ফিরে এসেছেন?'

'ওঁরা কি কলকাতার বাইরে গিয়েছিলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। দিনকয়েক আগে টেলিফোন করে তাই তো শুনেছিলাম। আজ সকালে ওঁদের ফিরে আসার কথা।'

'ঠিক আছে। আমি খবর নিচ্ছি। ওরা ফিরে এসে থাকলে ওরাও আপনার জন্য অপেক্ষা করবে। কটায় আসছেন.... ও কে।'

এদিকে ফিরে বললেন, 'উনি আসছেন নয়টার সময়। তোমাদের দুজনের মধ্যে অন্তত একজন থেকো। সুজাতাই থাকুক। কৌশিক তুমি বরং আমার গাড়িটা নিয়ে বার হও। কিছু তদন্ত দরকার।'

বাসু ওকে বুঝিয়ে দিলেন—

এক নম্বর : মোস্তাক আহমেদ— টালিগঞ্জ টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে কাজ করে। কিন্তু সেখানে কাজকর্ম সচরাচর একটু বেলায় শুরু হয়। এত সকালে সব ভোঁ-ভাঁ। দু-নম্বর : প্রসেনজিতের মাধ্যমে হাওড়ার রুবি রায় কেসের সাক্ষী সহদেব কর্মকারের হদিস। পুলিশ-রেকর্ডে সেটা আছে। তার ঠিকানা... কোথায় কাজ করে, কী রোজগার; এবং ইতিপূর্বে পুলিশ কেসে সাক্ষী দিয়েছে কিনা। লোকটা যেভাবে সাক্ষী দিচ্ছিল তাতে স্বতই মনে হয় সে প্রফেশনাল সাক্ষীদেনেবালা। তিন নম্বর : রেন্ট-আ-কার এজেন্সির মাধ্যমে জানতে হবে তাদের ড্রাইভার রামলগনের অতীত ও বর্তমান কথা। হাওড়া কেসের পরে এই তিনজনের মধ্যে কারও জীবনযাত্রায় কি কোনও উল্লেখজনক পরিবর্তন হয়েছে? লটারিতে লাখ টাকা পেলে সচরাচর যেমন হয়ে থাকে।

॥ নয় ॥

বাসু পরিচয় করিয়ে দিলেন সুজাতার সঙ্গে প্রমীলার। প্রমীলা সুজাতার কাছে জানতে চান, শুনেছি আপনারা কর্তা-গিন্নি দুজনেই পার্টনারশিপে... আই মীন কৌশিকবাবু কোথায়?

'ও একটা কাজে বেরিয়েছে। আপনার বক্তব্য আপনি আমাকে বললেই চলবে। যদি এক্সক্লুসিভলি সুকৌশলীর সঙ্গে পরামর্শ করতে চান, তাহলে আমি বাড়ির ওদিকের উইং-এ আমাদের অফিসে গিয়ে বসি, আপনি মিস্টার বাসুর সঙ্গে কাজ সেরে আমার অফিসে আসবেন বরং।'

প্রমীলা হেসে বললেন, 'আমি কলকাতায় থাকি না বটে, কিন্তু আপনাদের হক-হদিস আমার জানা। আপনি এ-ঘরেই বসুন মিসেস মিত্র, আমার যা বলার আছে তা দুজনের সামনেই আমি অকপটে বলব।'

সুজাতা বলল, 'বেশ তো, শুরু করুন তাহলে?'

প্রমীলা তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটি অ্যাকাউন্ট-পেয়ী চেক বার করে বাসুসাহেবের গ্লাসটপ টেবিলে নামিয়ে দিয়ে বললেন : 'এক নম্বর কাজ : বিবেকের দংশন থেকে আমাকে আপনি মুক্তি দিন।'

বাসু চেকটা তুলে দেখলেন। পাঁচ হাজার টাকার। প্রাপক পি. কে. বাসু, অ্যাটর্নি। চেকের সঙ্গে স্টেপল করা একটি স্বীকৃতিপত্র। রীতিমতো আইনের ভাষায় বলা হয়েছে ওই চেকের প্রাপক তাঁর মক্কেলের তরফ থেকে শ্রীমতী প্রমীলা পাণ্ডেকে হাওড়া আদালতের অমুক নম্বর ফৌজদারী কেস সংক্রান্ত যাবতীয় খেসারতের দাবি থেকে অব্যাহতি দিচ্ছেন।

বাসু বললেন, 'স্বীকৃতিপত্রে ড্রাফটটা কার? আপনার?'

'না। আমার আইন-সংক্রান্ত পরামর্শদাতার।'

'এই যে কাল বললেন, আপনার ব্যবসা ও আইন সংক্রান্ত কাজকর্ম আপনি নিজেই করে থাকেন?'

'তাই তো করছি, মিস্টার বাসু। নিজেই এসেছি ফয়সালা করতে। কিন্তু আইনের ব্যাপারে আইনজ্ঞের পরামর্শ নিই না, এমন কথা তো আমি বলিনি। আপনি অনুগ্রহ করে প্রাপ্তি-স্বীকারের কাগজখানায় স্বাক্ষর করে দেবেন কি?'

'এখনই তা কেমন করে হবে? মক্কেলের সঙ্গে আগে পরামর্শ করি। টাকাটা তো সেই পাবে, আমি নই।'

'কেন? পাঁচ হাজার টাকা কি আপনি যথেষ্ট বলে মনে করছেন না?'

'আমার মনে করার প্রশ্ন তো উঠছে না। 'অ্যাগ্রীভড-পার্টি' কী মনে করছে সেটাই বড় কথা। আমি ওর কাছে জেনে আপনাকে জানাব। ও যদি রাজি হয়, তাহলে রসিদটা লোক দিয়ে হোটেল

হিন্দুস্থানে পাঠিয়ে দেব। নেক্সট পয়েন্টটা কী?'

প্রমীলা বললেন, 'আমার দ্বিতীয় প্রস্তাবটা হচ্ছে ওই গহনা চুরির তদন্ত। ইতিমধ্যে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অত্যন্ত দ্রুত-পরম্পরায় ঘটে গেছে। যদিও গহনার প্রায় আধাআধি আমার ও পুষ্পার, তবু আমি সুকৌশলীকে একাজে এককভাবে নিয়োগ করতে চাই। বস্তুত পুষ্পার অজ্ঞাতসারে। সুকৌশলী সাফল্যলাভ করলে পুষ্পা জানতে পারবে। ব্যর্থ হলে আর্থিক লোকসানটা একা আমারই।'

সুজাতা বলে, 'গহনা চুরির কেসটা আমি মোটামুটি জানি। ইতিমধ্যে দ্রুত ঘটনা-পরম্পরা কী ঘটেছে তাই শুধু বলুন।'

'তার পূর্বে বলুন, আপনারা এ বিষয়ে সক্রিয় সাহায্য করলে আমাকে কী পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে?'

সুজাতা বলে, 'দেখুন মিসেস পাণ্ডে। কেসটা আমরা আদৌ গ্রহণ করব কি করব না তা কেস না শুনে বলতে পারছি না। তবে কেস গ্রহণ না করলেও আমরা আপনাকে আমাদের মতামত ও পরামর্শ দেব, ফি নেব না। আর কাজটা যদি গ্রহণ করি, তাহলে কাজের পরিমাণের এবং সাফল্যের উপর ফি-টা নির্ভর করবে। নিশ্চয় সেটা আকাশছোঁয়া হবে না। এই শর্তে আপনি আপনার সমস্যাটা ইচ্ছে করলে জানাতে পারেন। আমরা গ্রহণ করি বা না করি এ বাড়ির বাইরে কথাটা যাবে না।'

'অল রাইট। শুনুন তাহলে...'

বাধা দিলেন বাসু, 'জাস্ট এ মিনিট। আমার মনে হয়, তোমরা তোমাদের অফিসে গিয়েই বাকি আলোচনাটুকু কর, সুজাতা, কারণ এ কেসে আমার ক্লায়েন্ট একমাত্র রুবি রায়। তার স্বার্থে আমি অন্য কোন পার্টিকে মন্ত্রগুপ্তির প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না।'

প্রমীলা উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'ফেয়ার এনাফ। আপনি চেকটা নিলেন কি নিলেন না, কতক্ষণের মধ্যে আমি জানতে পারব?'

'সোমবার ব্যাঙ্ক আওয়ার্স শেষ হবার আগে আমি টেলিফোনে জানাব। আজ শুক্রবার। কাল ইদল-ফেতরের ছুটি, ব্যাঙ্ক বন্ধ। ফলে চেকটা সোমবারের আগে জমা দেওয়া যাবেও না।'

'সুকৌশলীর অফিস বাসুসাহেবের ইংরেজি U- অক্ষরের মতো বাড়ির অপর প্রান্তে। সুজাতা সেই অফিসে নিয়ে এসে বসালো প্রমীলাকে। জানতে চাইল, তিনি চা কফি কিছু খাবেন কি না। প্রমীলা অস্বীকার করে বললেন, 'না আমাকে এখনই ফিরে যেতে হবে। কাজের কথাটা তাড়াতাড়ি সেরে নিতে চাই। প্রথমে বলুন, আপনারা আমার কেসটা আদৌ নেবেন কি না?'

সুজাতা বললে, 'একথার জবাব ওঘরেই দিয়েছি। আমার সিনিয়র পার্টনারকে জিজ্ঞেস না করে সে প্রতিশ্রুতি আপনাকে দিতে পারছি না। আপনি একটু বসুন, আমি খোঁজ নিয়ে দেখি, অফিসে সে কোনও নোট রেখে গেছে কি না, মানে কখন তার অফিসে ফিরে আসার সম্ভাবনা।'

অফিসের স্টাফ বলতে তো একমাত্র বিশে। অথবা হয়তো মামিমাও বলতে পারবেন কথাটা। সুজাতা ওঁকে বসিয়ে ভিতর-বাড়িতে ঢুকতেই দেখা হয়ে গেল কৌশিকের সঙ্গে।

'কী ব্যাপার, তুমি এখনো বের হওনি?'

'না। প্রমীলাদেবীর হাঙ্গামাটা শেষ করে বেরুব। প্রথমেই যাব টালিগঞ্জ টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে। তা ওদের ওখানে এগারোটার আগে কেউ আসে না।'

কৌশিককে সঙ্গে নিয়ে সুজাতা বাইরের ঘরে ফিরে এল। প্রমীলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'ঘটনাচক্রে ও এখানে। এখনও বের হয়নি। ফলে এখনই প্রাথমিক কথাবার্তা হতে পারে।'

নমস্কারান্তে প্রমীলা আর কৌশিক যে যার আসনে বসলেন।

কৌশিক বললে, 'আপনাদের গহনা চুরির ব্যাপারটা আমরা মোটামুটি জানি। মানে কাগজে যেটুকু বের হয়েছে আর হাওড়া কোর্ট কেসে যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে। আমার মনে যে প্রশ্নগুলি জেগেছে তার জবাবে বরং প্রথমে বলুন : এত দামী অলঙ্কার নিয়ে আপনারা দুজন কেন কলকাতায় এসেছিলেন? এখানে তো কোনও স্যোশাল ফাংশন হওয়ার কথা ছিল না। কোনও পার্টিতে যোগদানের সম্ভাবনাও ছিল না।

প্রমীলা বললেন, 'এ প্রশ্ন বাসুসাহেবও করেছিলেন। তাঁর ধারণা, এর পিছনে ইনকাম-ট্যাক্সকে ফাঁকি দেবার একটা প্রচেষ্টা ছিল। বাস্তবে তা ছিল না। শুনুন বলি :

প্রমীলা দেবী রাজমাতার আদেশে রাজবাড়ির কিছু মাঙ্গলিকী অলঙ্কার নিয়ে এসেছিলেন। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে ওই 'রানী মুকুট'। এছাড়াও ছিল একটি মঙ্গলসূত্র। রাজমাতার আদেশ ছিল. এগুলি কালীঘাটের মন্দিরে নিয়ে গিয়ে মায়ের পায়ে ছুঁইয়ে আনতে হবে। এটাই নাকি ওঁদের বংশানুক্রমিক কৌলিক আচার। পরিবারের বড় ছেলের বিবাহ স্থির হলে বিবাহরাত্রে নববধূর মাথায় ওই মাঙ্গলিকী মুকুটখানি পরিয়ে দেওয়া হয়। তার আগে সেটি কালীঘাটের মন্দিরে নিয়ে এসে মায়ের পায়ে ছুঁইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। জনার্দন একালের ছেলে। ওসব মানে না। সে বলেছিল, 'গোয়ালিয়রে যে অম্বামায়ের মন্দির আছে সেখানে ছুঁইয়ে আনলেই চলবে। রাজমাতার মন মানেনি। তাঁর নিজের বিবাহের পূর্বে এবং তাঁর শাশুড়ির বিয়ের আগে বন্দুকধারী পাইকবরকন্দাজের হেফাজতে মুকুট গোয়ালিয়র থেকে কালীঘাটে এসেছিল। এবারেও তার ব্যতিক্রম উনি হতে দেবেন না। এদিকে মুশকিল হল এই, রাজমাতা নিশ্চিত নন কোন মেয়েটি পুত্রবধূ হতে চলেছে। পুষ্পা বিবাহিতা কি না এটাই জানা নেই। রাজমাতা মনে মনে আর একটি পাত্রী নির্বাচিত করে রেখেছেন। বিবাহের দিন স্থির হলে— ওই মোস্তাক আহমেদ যদি বাগড়া দেয়— তাহলে রাজমাতা শেষ চেষ্টা করবেন, তাঁর মনোনীতা পাত্রীটিকে ঘরে আনবার। মোটকথা, পুষ্পা বিধর্মীর বিবাহিতা কি না জানা না থাকায় দায়িত্বটা দিয়েছিলেন প্রমীলা পাণ্ডেকে। ফলে প্রমীলার দৃষ্টিভঙ্গিতে চুরি যাওয়া ওই মুকুটটা তার গচ্ছিত ধন। দ্বিতীয় কথা, ওরা দুই বান্ধবী মুকুটটা নিয়ে কলকাতা আসছে জেনে জনার্দন তার ভাবী পত্নীকে একটা ছোট লোডেড রিভলভার দেয়। অত্যন্ত ছোট। মুঠির মধ্যে লুকিয়ে ফেলা যায়। প্লেনে হাতব্যাগে

রিভলভার নিয়ে উঠতে দেয় না, সিকিউরিটিতে আটকায়। সেজন্য মুকুট আর অন্যান্য গহনা রাখা হল প্রমীলার একটা সুটকেসে। তারই একটা সিক্রেট ড্রয়ারে। সিঙ্গাপুরের ফ্রি-মার্কেটে কেনা। তার অ্যালয়-স্টিল গা-চাবি 'ফুলপ্রুফ'। কিছুতেই অন্য চাবিতে খোলা যায় না। এজন্য ওরা নিশ্চিন্ত মনে গাড়ির ডিকিতে স্যুটকেসটা রেখে পুষ্পার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

কৌশিক জানতে চায়, 'আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন। এক নম্বর প্রশ্ন : দমদম-এয়ারপোর্টে বেল্ট-কেরিয়ার থেকে স্যুটকেসটা যখন ডেলিভারি নেওয়া হয়, তখন আপনারা দুজনেই কি সেখানে উপস্থিত ছিলেন? স্যুটকেসটা মুহূর্তের জন্য আপনাদের চোখের আড়ালে যায়নি? আপনাদের দুজনের সজাগ উপস্থিতিতেই সেটা দমদম এয়ারপোর্টে কন্টেসা গাড়িতে তোলা হয়।'

'হ্যাঁ তাই হয়েছিল। এবং তারপর ঐ স্যুটকেসটা আর কন্টেসা গাড়ির ডিকি থেকে নামানোই হয়নি। ওর ভিতর আমাদের জামাকাপড় বা নিত্য-ব্যবহার্য কোন কিছুই রাখা হয়নি। তাই ওটা খোলার প্রয়োজনও হয়নি, গাড়ি থেকে নামানোও হয়নি।'

'স্যুটকেসে মুকুট আর গহনাগুলো গোয়ালিয়রে কে সাজিয়ে তোলেন? কে তালাবন্ধ করেন? আপনি না পুষ্পা দেবী?'

'পুষ্পার উপস্থিতিতে আমিই সাজিয়ে রাখি। তালাবন্ধ করি। পুষ্পা শুধু ঐ স্যুটকেসের সিক্রেট-ড্রয়ারে রিভলভারটা ভরে দিয়েছিল।'

'স্যুটকেসের ডুপ্লিকেট চাবি নিশ্চয় আছে। সেটা কোথায়?'

'গোয়ালিয়রে আমার স্টিল আলমারিতে।'

'ঘটনার দিন— আই মিন, বুধবার সাতাশে, স্যুটকেসটা কন্টেসা গাড়িতে রেখে যখন আপনারা দুই বান্ধবী সকালে ট্যাক্সি নিয়ে সারদামঠে গেলেন তখন কোন চাবিটা কার কাছে ছিল? নাকি দুটোই কোন একজনের কাছে ছিল?'

প্রমীলার ঠোঁটের প্রান্তে একটা হাসির রেখা দেখা দিল। বললেন, 'স্যুটকেসের চাবিটা ছিল আমার ব্যাগে আর কন্টেসা গাড়ির ডিকির চাবি ছিল পুষ্পার কাছে। আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন, আমরা দুজনে ষড়যন্ত্র করে একত্রে কাজ না করলে...'

বাধা দিয়ে সুজাতা বলে ওঠে, 'না, না! এসব কী বলছেন? ও নিশ্চয় সেকথা মনে করে...'

এবার বাধা দিল কৌশিক তার স্ত্রীকে। বলল, 'না, তুমিই ভুল বলছ সুজাতা। প্রমীলা দেবী ঠিকই আন্দাজ করেছেন। য়ু সি— আমার কাছে এটা একটা অ্যাকাডেমিক প্রশ্ন, ব্যক্তিত্ব-নিরপেক্ষ! 'ক'-য়ের কাছে স্যুটকেসের চাবি, 'খ'-য়ের কাছে কন্টেসাডিকির। দুটোই 'ফুল প্রুফ'। ফলে একটা সল্যুশান 'ক+খ'। এক্ষেত্রে তা যখন মিলছে না তখন আমার প্রশ্ন : 'গ' কি একটা সমাধান?'

'গ! গ কে?' জানতে চাইলেন প্রমীলা।

'আমি শুনেছি, গোয়ালিয়র থেকে আপনারা প্লেনে তিনজন এসেছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি

মহিলা। আপনাদের দুজনের কারও একজনের পরিচারিকা। তার কী নাম, কার পরিচারিকা, বয়স কত, কতদিন চাকরি করছে, কতটা বিশ্বাসী?'

'হ্যাঁ। ঠিকই শুনেছেন। আমারই মেডসার্ভেন্ট। রুক্মিণী। বয়স আমার চেয়ে কম। পঁচিশ-ছাব্বিশ। বালবিধবা। তিনকূলে কেউ নেই। আমার কাছে আছে প্রায় দশবছর। ওর বিয়ে হয়েছিল দশবছর বয়সে। বিহারে, ছাপড়া জেলায়। অত্যন্ত বিশ্বাসী। তার জিম্মায় ঘরদোর ফেলে রেখে আমি দু-তিন মাসের জন্য ফরেন-ট্যুরেও গেছি। কোনদিন কোন কিছু খোয়া যায়নি।'

'আমার আর একটা জিজ্ঞাস্য আছে মিসেস পাণ্ডে। চুরি-যাওয়া মালের লিস্টটা আমি খুঁটিয়ে দেখেছি। তাতে ঐ জনার্দন গায়কোয়াড়ের শেষমুহূর্তে দেওয়া রিভলভারটার উল্লেখ নেই। সেটা বর্তমানে কার কাছে আছে? আপনার না পুষ্পাদেবীর? আর কেন সেটা চুরি গেল না?'

প্রমীলা বললেন, 'জনার্দন ওটা দিয়েছিল পুষ্পাকে। তাই ওটা পুষ্পার কাছেই আছে। আর কেন চুরি যায়নি? যেহেতু ওটা লুকানো ছিল স্যুটকেসের সিক্রেট ফলস্‌বটমে। মাত্র তিন-ইঞ্চি তার থিকনেস। নাহলে মুকুটটাও আমরা ওখানে লুকিয়ে ফেলতাম।'

'স্যুটকেসটা নিশ্চয় হোটেল হিন্দুস্থানে আছে? পুলিশে তার থেকে লেটেস্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেয়নি?'

'চেষ্টা করেছিল। পায়নি। চোর স্যুটকেসটা বন্ধ করে রুমাল দিয়ে ভাল করে মুছে দিয়েছিল। আর, ও হ্যাঁ, সেটা আমার হোটেলেই আছে। আপনি দেখতে চান?'

'হ্যাঁ, যাব দেখতে।'

'কখন?'

'বিকালের দিকে। টেলিফোন করে যাব বরং। বিকালে কি আপনি হোটেলে থাকবেন? অ্যারাউন্ড চারটে?'

'হ্যাঁ, থাকব। আচ্ছা চলি, নমস্কার। এটাই আপাতত একটা রিটেইনার হিসাবে রাখুন বরং...'

একটা হাজার টাকার চেক লিখে দিলেন উনি।

সুজাতা উঠে গেল রসিদ বইটা আনতে।

॥ দশ ॥

দুপুরবেলা। বেলা একটা। বিশে ঢং করে ঘণ্টা বাজিয়ে দিল। অর্থাৎ লাঞ্চ রেডি।

রানুদেবীর সংসারে পাকা ব্যবস্থা। দুপুরে যদি বাড়িতে লাঞ্চ খেতে চাও তবে ঠিক একটায় এসে ডাইনিং টেবিলে বসতে হবে। না যদি পার, তাহলে প্যান্ট্রিতে খাবার ঢাকা দেওয়া থাকবে। সেলফ-হেল্প পদ্ধতিতে নিজে বেড়ে নিতে হবে। বিশুকে ডাকা চলবে না। তার তখন বিশ্রাম। বিশের ভাষায় : 'অফ ডিউটি'।

চারজনে ডাইনিং টেবিলে এসে বসলেন।

বিশে পাতে-পাতে গরম ভাত বাড়তে থাকে। বাসু বলেন, 'খেতে খেতে বল, কোন কোন রাজ্য জয় করে এলে।'

কৌশিক বলে 'এক নম্বর ড্রাইভার রামলগন দোসাদ। বিহারী। ছাপড়ার অধিবাসী। সেখানে কেউ থাকে না। দশবছর কলকাতাবাসী। ক্রিমিনাল রেকর্ড কিছু নেই। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। কলকাতায় বহু জায়গায় চাকরি করেছে। ড্রাইভার হিসাবে। অতি দক্ষ ড্রাইভার। ঐ রেন্ট-আ-কার সার্ভিসের মালিক জয়কৃষ্ণবাবুর মতে দোষের মধ্যে রগচটা আর মদ্যপ। সাড়ে তিন বছর কাজ করছে ওঁর কাছে। নিদাগ সার্ভিস রেকর্ড। সাতাশে মে চুরির প্রসঙ্গে মালিকের সঙ্গে সে বচসা করে। মালিকের মতে, তার উচিত হয়নি গাড়ি ছেড়ে ম্যাটিনিতে সিনেমা দেখতে যাওয়া। রামলগন তা মানে না। তার মতে সে রীতিমতো পার্টির কাছে ছুটি নিয়ে গেছিল। তাছাড়া ডিকির চাবি যখন পার্টি ওর কাছ থেকে চেয়ে নেয়, আর তার ডুপ্লিকেট চাবি যখন স্বয়ং জয়কৃষ্ণবাবুর কী-বোর্ডে, তখন তার কোনও দায়িত্ব নেই। এই নিয়ে কথা কাটাকাটি। রামলগন এককথায় চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। এখন সে যদুবাজারে হরদয়াল সিং-এর গ্যারেজে নাম লিখিয়েছে। হরদয়ালের আট-দশটা ট্যাক্সি খাটে। তার একটা ইদানীং রামলগন চালায়। রামলগন কিছুটা মনমরা। কন্টেসা থেকে ট্যাক্সি। রীতিমতো অবনতি। তার জীবনযাত্রায় আর কোন পরিবর্তন হয়নি। সে এখন প্রমথেশ বড়ুয়া সরণিতে পাঞ্জাব ক্লাবের কাছাকাছি একটা মেসে থাকে। ড্রাইভারদের মেস।

দ্বিতীয়ত, সহদেব কর্মকার। উচ্চমানের মোটর মেকানিক। নানান জাতের গাড়ির কলকব্জা বিষয়ে ওয়াকিবহাল। দীর্ঘদিন সংযুক্ত ছিল প্রমথেশ বড়ুয়া সরণির এ. এ. ই. আই. ক্লাবের রিপেয়ার গ্যারেজের সঙ্গে। কোথাও কোন মেম্বারের গাড়ি মাঝরাস্তায় বিকল হলে টেলিফোনে দুঃসংবাদটা ক্লাবে আসে। ডাক পড়ে সহদেবের। কালিঝুলি মাখা ওভারঅলটা জড়িয়ে টুলবক্স নিয়ে সহদেব রওনা হয়ে যেত মোটর সাইকেলে। হয় গাড়ি মেরামত করিয়ে মালিককে বলত, 'এবার স্টার্ট দিয়ে দেখুন স্যার।' নাহলে ব্যবস্থা করত 'হলিং'-এর। বলত, 'হাসপাতালে না গেলে এ রোগের চিকিৎসা হবে না, স্যার।' একদিন হেড-মেকানিকের সঙ্গে তর্ক আর ঝগড়াঝাটি করে চাকরি ছেড়ে দেয়। রামলগনের সঙ্গে দোস্তি ছিল। রামলগনই তার রেন্ট-আ-কার কোম্পানির মালিক জয়কৃষ্ণবাবুকে বলে-কয়ে ওকে নতুন চাকরিতে ঢুকিয়ে দেয়। মেকানিকের চাকরি। রেন্ট-আ-কার কোম্পানির সাত-আটখানা গাড়ি। সহদেব তাদের 'ফ্যামিলি-ফিজিশিয়ান'। ঐ কন্টেসাখানা মালিকের 'পাটরানী।' তাই ওটা যখন ভাড়া খাটতে যায় তখন তাঁর দক্ষতম ড্রাইভার রামলগন সেটা চালায় আর সহদেব কর্মকার হেল্পারের পরিচয়ে সঙ্গে থাকে। ফলে ঘটনার দিন, অকুস্থলে সহদেবের উপস্থিতির মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। লোকটা বুদ্ধিমান। কথাবার্তায় চৌখস। ইতিপূর্বে কোনও আদালতে পুলিশ পক্ষে সাক্ষী দিয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সহদেব ঐ দিন দুপুরে রামলগনের সঙ্গে এক পাঞ্জাবী ধাবায় আহারাদি সারে। কিন্তু একসঙ্গে ম্যাটিনি শোতে শোলে দেখতে যায়নি। বইটা তার এগারোবার দেখা। রামলগনের সঙ্গে

সেও চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখন ট্যাক্সি চালাচ্ছে।

তৃতীয়ত, মোস্তাক আহমেদ। টালিগঞ্জ টেকনিশিয়ান স্টুডিওর হ্যান্ডিম্যান। কোনও কোম্পানিতে চাকরি করে না। ফ্রি-ল্যান্সার। সবাই ওকে চেনে। যে কোন ডাইরেক্টর বা প্রডিউসার ঐ স্টুডিওতে ফ্লোর ভাড়া নিলে, অর্থাৎ ইনডোর শুটিং করতে এলে, আহমেদের খোঁজ করেন। আহমেদ সেট সাজানো থেকে নানান সেট-রিকুইজিট যোগাড় করার বিষয়ে ওস্তাদ। রেন্ট-আ-কার এর মালিক জয়কৃষ্ণবাবুর সঙ্গেও তাই তার খাতির। ফিল্ম কোম্পানির প্রয়োজনে সে মাসে তাঁকে পাঁচ-সাত হাজার টাকার বিজনেস দেয়। ঐ সূত্রে রামলগন বা সহদেবকেও হয়তো আহমেদ চেনে, তবে কোনও অন্তরঙ্গতা বা দোস্তির প্রমাণ নেই। ঘটনার দিনে, বুধবার, মোস্তাক আহমেদ সারাদিন ছিল টালিগঞ্জ টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে। একাধিক গণ্যমান্য প্রত্যক্ষদর্শী তাকে দেখেছেন ফ্লোরে কাজ করতে, সকাল থেকে সন্ধ্যা।

এমন সময় বাজল ডোরবেল।

কে এল এমন অসময়ে?

এল রুবি রায়। এসেই বলল, 'মামিমা, আমি কিন্তু দুপুরের খাওয়া খেয়ে এসেছি। আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না।'

রুবি রায় খুব খুশি। সল্ট লেকের চাকরি তার খুব ভাল লেগেছে। মল্লিকাদি একেবারে মাটির মানুষ। কর্তাটিও তাই। আর বাচ্চাটা কাঁদতে জানে না। রুবির কোলে আসতে একটুও আপত্তি করেনি। ওদের সল্টলেকের বাড়িটা এখনো শেষ হয়নি। ছোট্ট, দোতলা হবে। ওঁরা আপাতত একতলায় আছেন। চারিদিকে ভারা বাঁধা। দোতলার গাঁথনি হচ্ছে। গাড়িটা গ্যারেজেই থাকছে। কিন্তু রুবি রায়কে ওঁরা মেজানাইনে থাকতে দেননি। অন্তত আপাতত নয়। কারণ জানলায় এখনো গ্রিল বসেনি। ও একতলার বৈঠকখানাতেই রাত্রে শুচ্ছে সোফা-কাম-বেডে। দুপুরে অবশ্য মেজানাইন-ঘরে একটা চৌকিতে বিশ্রাম নেয়। মল্লিকার ছুটি নেওয়াই ছিল। কর্তা পাঁচদিনের ছুটি নিয়েছেন। তার সঙ্গে ইদল-ফেতর আর রবিবার জুড়ে সাতদিনের ছুটিতে ওঁরা বাসে দীঘা বেড়াতে গেলেন। বাড়ির চার্জে রইল রুবি। অবশ্য দোতলার একটা অংশে তার্পলিন ঝুলিয়ে বাসোপযোগী করে কয়েকজন হিন্দুস্থানী মিস্ত্রিও থাকে। ভয়ের কিছু নেই। তারা বিশ্বাসী লোক।

রুবি ওদের এসপ্ল্যানেডে দীঘা-গামী বাসে তুলে দিয়ে ভাবল, বেলাবেলি নিউ আলিপুর ঘুরে যাবে। চাকরিটা যে ওর দারুণ পছন্দ হয়েছে একথা কৃতজ্ঞচিত্তে জানাতে।

বাসু বললেন, 'তুমি এসে গেছ ভালই হয়েছে। না হলে টেলিফোনে তোমাকে ডেকে পাঠাতে হত।'

'কেন মামু?'

কৌশিক আর সুজাতার দেখাদেখি সে ওঁকে মামু ডাকতে শুরু করছে। রানুকে মামিমা। একটা আত্মীয় সম্বোধন করতে না পারলে কেমন যেন পর পর মনে হয়।

'প্রমীলা দেবী একটা অফার দিয়েছেন— ঐ ক্ষতিপূরণবাবদ। আদালতের বাইরে উনি কেসটি

মিটিয়ে নিতে চান। আমাকে চেকটা দিয়ে গেছেন। আমি বলেছি, তোমাকে জিজ্ঞেস করে তারপর তাঁকে জানাব যে ওটা আমরা নেব কি নেব না।'

'কত টাকার চেক?'

'পাঁচ হাজার।'

'পাঁ-চ-হা-জা-র।'

বাসু বললেন, 'টেনে টেনে উচ্চারণ করলে টাকার অঙ্কটা বেড়ে যাবে না, রুবি। সোজাসুজি বল, 'এটা আমি নেব, না ফেরত দেব।'

'ফেরত দেবেন? কী বলছেন? আমার যে এখন টাকার ভয়ানক দরকার।'

'জানি। তবু আমি এটা এখনি..... অবশ্য এই মুহূর্তেই সিদ্ধান্তটা না নিলেও চলবে। সোমবার বেলা দুটো পর্যন্ত সময় আছে।'

'কেন?'

'সে তোমার বুঝে কাজ নেই।'

রানু বলেন, 'দুপুরে খেলে কোথায়?'

'একটা হোটেলে। মল্লিকাদি খরচের টাকা দিয়ে গেছেন।'

'এখানে চলে এলেই পারতে? হোটেলে খাওয়ার কী দরকার?'

টেবিলের ওপর গোছা করে রাখা ছিল কৌশিকের আনা রঙিন ফটোগ্রাফগুলো।

রুবি জানতে চায়। 'এগুলো কী? ফ্যামিলি ফটোগ্রাফ?'

সুজাতা বলল, 'না রুবি। এগুলো 'ছবি তোলার ছবি।'

'তার মানে?'

বাসুসাহেব পাইপ ধরিয়েছেন। বলেন, 'অভিপূর্বক নী ধাতু অ মানে কী জানো?'

রুবি অবাক হয়। বলে, 'অভিপূর্বক নী ধাতু অ? কোন সংস্কৃত কথার ডেরিভেটিভ?'

'একজ্যাক্টলি। যা তোমার অ্যাম্বিশন। যার কাঁটায় বিদ্ধ হয়ে তুমি ঘর ছেড়ে পথে নেমেছ রুবি : অভিপূর্বক নি-ধাতু অ = অভিনয়। এগুলো বম্বে ইনডোর স্টুডিওর ভিতর অভিনয়ের ছবি। অন্তত একজন অভিনেত্রীকে চিনবে : পুষ্পা। দেখ না।'

রুবি ছবির বান্ডিল তুলে নিল। দেখতে দেখতে সে তন্ময় হয়ে গেল। প্রত্যেকটি ছবি সে খুব খুঁটিয়ে দেখল। তারপর মুখ তুলে বলল, 'প্রত্যেকটি ছবিতে একজন সুদর্শন পুরুষের মাথায় ঢেড়া চিহ্ন দেওয়া আছে দেখছি। কেন?'

কৌশিক বললে, 'ঐ লোকটাকে আমরা খুঁজছি।'

'কী আশ্চর্য! ঐ লোকটাকে যে আমিও খুঁজছি কৌশিকদা।'

কৌশিক সোজা হয়ে বসে। বলে, 'মানে? তুমি মোস্তাক আহমেদকে খুঁজছ কেন?'

'মোস্তাক আহমেদ নয়। ওর নাম : ঝানু মল্লিক! আসানসোল সদর পুলিশ স্টেশনে ওর নামে

ডায়েরি করেছি, চার-পাঁচ বছর আগে। ও আমার সর্বস্ব : হাজার ছয়েক টাকা নিয়ে বোম্বাই পালিয়ে যায়। তারপর আর ওকে খুঁজে পাইনি।'

কৌশিক ঝুঁকে পড়ে বলে, 'তুমি নিশ্চিত? তুমি ছাড়া আর কেউ ওকে চিনবে?'

'কেন চিনবে না? অন্তত দশ-পনেরো জন ছেলেমেয়ে— আসানসোল কলেজের স্যোশালে যারা নাটকে অভিনয় করেছিল তারা সবাই চিনবে। কারণ ও ছিল আমাদের ড্রামা ডাইরেক্টর। প্রফেসর জগদীশ মিত্র চিনবেন। যতীন দত্ত চিনবে। যতীন ছিল স্টুডেন্ট ইউনিয়নের সেক্রেটারি।'

কৌশিক বললে, 'এস দিকিন আমার সঙ্গে। আমি ফোনে যোগাযোগ করে দিচ্ছি। তুমি ওকে বল ছয় হাজার টাকা চার বছরে অন্তত সাড়ে আট হাজার হয়েছে সুদে-আসলে। রবিবার বিকালের মধ্যে টাকাটা মিটিয়ে না দিলে তুমি আইনত ব্যবস্থা নেবে। বেশ কড়া মেজাজে বলবে। বুঝেছ?'

'শিওর।'

তারপর হঠাৎ কী ভেবে কৌশিক বলল, 'না। ফোনটা তুমিই কর। এই নাও নাম্বারটা। টেকনিশিয়ান স্টুডিওর।'

ওপারে সাড়া জাগতেই রুবি বলল, 'মিস্টার মোস্তাক আহমেদকে কাইন্ডলি একটু ডেকে দেবেন?'

লোকটা জবাব দিল না। অস্পষ্ট শোনা গেল তার কণ্ঠস্বর। অর্থাৎ টেলিফোনের কথামুখে হাতচাপা দিয়ে সে বললে, 'আমেদদা, তোমাকে কে খুঁজছেন। মহিলা কণ্ঠ।'

একটু পরেই বেশ ভারিক্কে গলায় কে যেন বলল, 'মোস্তাক আহমেদ। কে বলছেন?'

'আমার নাম রুবি রায়। আসানসোলের রুবি রায়। কলেজ স্যোশালে 'বিজয়া'-তে বিজয়ার রোল করেছিলাম, আপনার ডাইরেকশনে। আপনি...'

'কী আবোলতাবোল বকছেন ম্যাডাম! আমি আসানসোলে কখনো যাইইনি। সেখানকার কোন রুবি রায়কে আমি চিনি না।'

'হ্যাঁ চেনেন। তখন আপনার নাম ছিল জগৎ মল্লিক। আপনি আমার ছয় হাজার টাকা...'

'কাজের সময় অহেতুক আমাকে বিরক্ত করবেন না প্লীজ। আপনার নিশ্চয় কিছু ভুল হচ্ছে। আমার নাম মোস্তাক আহমেদ। জগৎ মল্লিক বা পূরবী রায়কে আমি চিনি না।'

'পূরবী রায় নয়, রুবি রায়।'

'অল দ্য সেম টু মি।— ও-প্রান্তে টেলিফোনটা ধারক-যন্ত্রে ফিরে গেল। কৌশিক এতক্ষণে এক্সটেনশনে দুপক্ষের কথাই শুনেছে। সেও এবার ফোনটা নামিয়ে রাখে। রুবিকে প্রশ্ন করে, তোমার আইডেন্টিফিকেশনে কোন ভুল হলো না তো, রুবি? তুমি টালিগঞ্জে গিয়ে স্বচক্ষে ওকে দেখলে চিনতে পারবে?

'কোন প্রয়োজন নেই, কৌশিকদা। আমি হাড্রেড পার্সেন্ট শিওর। লোকটা সব জেনে বুঝে ন্যাকা সাজছে। ঐ লোকটাই জগৎ মল্লিক, ঐ ঝানু মল্লিক। গলার আওয়াজেও ওকে চিনেছি।'

কৌশিক বললে, 'অল রাইট। আমি দেখছি। অন্য জাতের ওষুধ দিতে হবে।'

টেলিফোনটা তুলে নিয়ে ডায়াল করতে এবার মোস্তাক নিজেই ধরল। হয়তো সে টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে ওখানে কাছাকাছিই ছিল। মোস্তাক বলল, 'টেকনিশিয়ান স্টুডিও। কাকে খুঁজছেন?'

'মিস্টার মোস্তাক আহমেদ। এক্ষণি টেলিফোনে কথা বলছিলেন। ধারে-কাছেই আছেন নিশ্চয়।'

'আমি মোস্তাক আহমেদ। আপনি কে বলছেন?'

'আমি ভবানীভবন মিসিং-স্কোয়াড ইউনিটের ইন্সপেক্টর আব্দুল কাদের বলছি।'

'আমাকে খুঁজছেন কেন?'

'একটু আগে আপনি একটি মহিলার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছিলেন, তাই নয়? উনি এখান থেকেই ফোন করছিলেন। আমার পাশেই দাঁড়িয়ে অছেন। কী? বলছিলেন না?'

একটু দেরি হল জবাবটা দিতে। তারপর বললে, 'হ্যাঁ, সাম মিস অথবা মিসেস পূরবী দেবী...'

'একজ্যাক্টলি। ঐ মিস বা মিসেস পূরবী দেবীর ছয় হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়ে সাম মিস্টার জগৎ মল্লিক ওরফে কাপ্তেন ঝানু মল্লিক চার বছর আগে আসানসোল থেকে নিরুদ্দেশ হয়। আপনি কি ঐ মিস বা মিসেস পূরবী অথবা কাপ্তেন জগৎ বা ঝানু মল্লিককে চিনতে পারছেন? মসিয়োঁ মোস্তাক আহমেদ?

'আপনি এসব কী বলছেন, স্যার? আমি ওঁদের কাউকেই...'

'লুক হিয়ার মসিয়োঁ আহমেদ! আমি আপনাকে কাল বিকাল চারটে পর্যন্ত সময় দিচ্ছি। তার মধ্যে যদি আপনার অভিন্নহৃদয় বন্ধু মিস্টার জগৎ বা ঝানু ঐ মিস অথবা মিসেস পূরবী দেবীকে আট হাজার টাকা ফেরত না দেয় তাহলে...'

মোস্তাক আহমেদ বাধা দিয়ে বলে ওঠে, 'আপনি আমার কথাটা শুনুন, স্যার.... আমি এদের কাউকেই চিনি না... আমি...'

'আমার কথাটা শেষ হয়নি মসিয়োঁ আহমেদ। কাল বিকাল চারটের মধ্যে মিস রায়কে আট হাজার টাকা ফেরত না দিলে আমি ঝানু মল্লিকের কোমরে দড়ি বেঁধে আসানসোলে নিয়ে যাব। আইডেন্টিফিকেশন প্যারেডে। প্রফেসর জগদীশ মিত্র তাকে চিনবেন, ওদের স্টুডেন্ট ইউনিয়নের যতীন দত্ত— সে এখন আসানসোলে ডি. এস. অফিসের আপার-ডিভিশন ক্লার্ক, ঝানু মল্লিককে সনাক্ত করবে। সুতরাং আপনার অভিন্নহৃদয় বন্ধুকে বলুন যে, ঐ মিস রায়কে কাল বিকাল...

'আপনি আমার কথাটা শুনুন স্যার, রুবি রায়ের ঠিকানাটা পর্যন্ত...'

'নাউ য়ু আর টকিং মসিয়োঁ আহমেদ। কী নাম বললেন? রুবি রায়? পূরবী রায় নয়, তাহলে? একটা কাগজ পেনসিল নিন। মাদমোয়াজেল রুবি রায়ের টেলিফোন নম্বরটা লিখে নন।'

সুনীল রায়ের সল্টলেকের নম্বরটা ওকে শুনিয়ে দিল।

আহমেদ বললে, 'কিন্তু কাল কী হবে, স্যার? কাল পরবের দিন। ইদল্-ফেহতর।'

'আরে সে তো আপনার-আমার। সেই কাফেরের বাচ্চা ঝানু মল্লিকের কাছে আবার পরবের দিন কী?'

'না, না, তা বলছি না, বলছি যে, কাল তো ব্যাঙ্ক বন্ধ। পরশু রবিবার। সোমবারের আগে...'

'আরে মশাই, সে আপনার অভিন্নহৃদয় বন্ধু বুঝবে। আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনি বন্ধুকে খবরটা দিয়ে দেবেন, টেলিফোন নম্বরটা জানিয়ে দেবেন। ব্যস, আপনার ডিউটি খতম। প্রয়োজনে ঝানু মল্লিকই মিস রায়ের কাছে টেলিফোনে ক্ষমা চেয়ে নেবে, সোমবার পর্যন্ত সময় চেয়ে নেবে। কিন্তু আপনাকে... আই মীন ফিল্ম-আর্টিস্ট পুষ্পা দেবীর এক্স-কম্বাইন্ড হ্যান্ড মোস্তাক আহমেদসাহেবকে আমি আর একটা কথা বলতে চাই। আপনি শুনছেন?'

'ইয়েস, স্যার। বলুন।'

'গোয়ালিয়রের গায়কোয়াড় ফ্যামিলির মুকুটটার দাম লাখ টাকার উপর। সেটা ঐ ঝানু মল্লিকের ছিঁচকে চুরির পেটি কেস নয়। হঠাৎ গা-ঢাকা দেবার চেষ্টা করবেন না। আপনার উপর কিন্তু চব্বিশ-ঘণ্টা পুলিশে প্লেন ড্রেসে নজর রাখছে, আর আমাদের এই কথোপকথনটাও থানায় টেপরেকর্ড হয়ে থাকল কিন্তু। ফর ফিউচার এভিডেন্স।'

মোস্তাক আহমেদ কোন জবাব দেবার সুযোগ পেল না। কারণ তার আগেই কৌশিক টেলিফোনটা ধারক অঙ্গে নামিয়ে রেখেছে।

বাসু বললেন, 'গুড ওয়ার্ক।'

boiboi.net

।। এগারো ।।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা।

বাসুসাহেব গাড়ি নিয়ে কোথায় যেন বেরিয়েছেন। রানু খুলে বসেছেন টি.ভি.। সুজাতা আর কৌশিক নিজেদের দ্বিতলের ঘরে বসে আলোচনা করছে— গোয়ালিয়রের রাজমাতার কাছ থেকে যে দায়িত্বটা নিয়ে এসেছে— সে বিষয়ে এখনো পর্যন্ত কাজে হাত দেওয়াই হয়নি।

বিশে দু-কাপ চা দিয়ে গেল।

সুজাতা বললে, 'মামু বোধহয় ফিরে এলেন। নিচে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াবার আওয়াজ পেলাম মনে হচ্ছে।'

কৌশিক উঠে গিয়ে জানলা থেকে নিচের দিকে দৃষ্টি দিল। তারপর এদিকে ফিরে বললে, 'তোমার অনুমান ভুল হয়েছে, সু, মামুর 'পুষ্পক-রথ' নয়। একটা বড় 'লিমুজিন'— ক্যাডিলক বা প্লিমাউথ হবে— উপর থেকে বোঝা যাচ্ছে না।'

একটু পরে বিশে আবার উপরে উঠে এল। বললে, 'একজন দেখা করতে চাইছেন।'

'কার সঙ্গে?'— জানতে চায় কৌশিক।

বিশে একটা ভিজিটিং-কার্ড বাড়িয়ে ধরে বললে, 'আপনার সঙ্গে।'

কৌশিক ওর হাত থেকে ভিজিটিং-কার্ডটা নিয়ে দেখল : 'গায়কোয়াড় অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস্'-এর অফিশিয়াল কার্ড। নিচে রিপ্রেজেন্টেটিভের নাম : এম. কে. দস্তুর।

সুজাতা জানতে চায় : 'কে ইনি? কী মনে হয়?'

'নিঃসন্দেহে জনার্দন গায়কোয়াড়ের দূত। যাই দেখে আসি—'

সুজাতা বাধা দেয়, 'গেঞ্জি গায়ে যেও না প্লীজ। পাঞ্জাবিটা অন্তত গায়ে দিয়ে যাও।'

'কেন? অফিস-আওয়ারের বাইরে লোকটা দেখা করতে এসেছে আমার রেসিডেন্সে— মামুর ভাষায় ''আনঅ্যাপয়েন্টেড ইন্ট্রুশন।'' পাঞ্জাবি পরতে যাব কেন?'

'আমার অনুরোধে'— সুজাতা সহাস্যে বললে।

'সেটা আলাদা কথা,' জবাব দিল কৌশিক, পাঞ্জাবিটা মাথায় গলাতে গলাতে।

নিচে এসে দেখে বিশে আগন্তুককে সুকৌশলীর অফিসঘরে যত্ন করে বসিয়েছে। ফ্যানটাও খুলে দিয়েছে। কৌশিক ঘরে প্রবেশ করতেই ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে ইংরেজিতে বললেন, 'আমি দস্তুর। মিস্টার জে. গায়কোয়াড়ের পার্সোনাল সেক্রেটারি। বিশেষ জরুরি প্রয়োজনে টেলিফোন না করেই এসেছি। আপনি যে দেখা করলেন এ জন্য কৃতজ্ঞ।'

কৌশিক করমর্দন করে ইংরেজিতেই বললে, 'ঠিক আছে, বসুন। বলুন কী ব্যাপার?'

ভদ্রলোক পুনরায় আসন গ্রহণ করে পকেট থেকে একটি লম্বাটে খাম বার করে বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমার বলার কিছু নেই। স্যার এই চিঠিটা আপনাকে পাঠিয়েছেন। কাইন্ডলি পড়ে দেখুন।'

সুদৃশ্য লেফাফা। বাঁদিকে নিচে প্রেরক, অর্থাৎ জনার্দন গায়কোয়াড়ের নাম-ঠিকানা ছাপা। কৌশিক লক্ষ্য করে দেখল— খামটা শুধু আঠা দিয়েই সাঁটা হয়নি, ছোট একটি গালা-মোহর করা হয়েছে। রক্তিম বৃত্তের মাঝখানে মনোগ্রাম করা দুটি অক্ষর জড়াজড়ি করে আছে : জে/জি।

কৌশিক তার টেবিলে এসে বসেছে এতক্ষণে। কাটার দিয়ে খামটা খুলে চিঠিখানা বার করে টেবল-ল্যাম্পটা জ্বেলে দিল। জে. জি.-র লেটারহেডে হাতে-লেখা ইংরেজি চিঠি :

''ডিয়ার মিস্টার মিত্র,

আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হওয়াটা অত্যন্ত জরুরি। অবিলম্বে। আপনার-আমার দুজনের স্বার্থেই। সৌজন্যের নির্দেশে আমারই আপনার বাড়িতে হয়তো যাওয়া উচিত— যেহেতু প্রস্তাবটা আমিই তুলেছি, কিন্তু বিশেষ কারণে সাক্ষাৎকারটা আমার গরিবখানায় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। গাড়ি নিয়ে আমার একান্ত-সচিব যাচ্ছে। আপনি যদি ঐ গাড়িতে চলে আসতে পারেন— যাতায়াত বাদে আধঘণ্টা সময় নষ্ট করে— তাহলে কৃতার্থ হব। বলাবাহুল্য, আপনার প্রফেশনাল ফী মেটাব, তা আপনি আমার প্রস্তাব নিন বা না নিন। নেহাত যদি তা সম্ভবপর না হয় সেক্ষেত্রে আমিই আপনার বাসাতে যাব। আজ রাত্রেই। কটার সময় গেলে আপনার অসুবিধা হবে না তা

পত্রবাহকের মারফত জানাবেন।

"একটা অনুরোধ : ব্যাপারটা যেন গোপন থাকে, অন্তত আমাদের সাক্ষাৎ হওয়ার সময় পর্যন্ত।"

"নমস্কার ও শুভেচ্ছাসহ। প্রতীক্ষারত।"

"ভবদীয়,"

"জে/জি"

চিঠিখানা পড়া শেষ করে কৌশিক মুখ তুলে বলল, 'চিঠিতে মিস্টার জে/জি কী লিখেছেন তা কি আপনার জানা আছে?

মিস্টার দস্তুর একগাল হেসে এবার চোস্ত হিন্দুস্থানীতে যা বললেন তার বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ, "দূত শুধু অবধ্য নয়, অবোধ্য! আমার মুখ খোলা বারণ, স্যার। আমাকে আদেশ করা হয়েছে—আপনি রাজি হলে আপনাকে আলিপুরে নিয়ে যেতে। না হলে, আপনার মৌখিক জবাবটা জেনে যেতে।'

'ঠিক আছে। আপনি বসুন। আমি তৈরি হয়ে আসছি।'

'থ্যাঙ্কু য়ু স্যার!'

কৌশিক সহাস্যে প্রশ্ন করে, 'আমি আপনার সঙ্গে যেতে রাজি হলে আমাকে ধন্যবাদ জানাবার পারমিশনটা তাহলে আপনার স্যার দূতকে দিয়ে রেখেছেন?'

দস্তুর সহাস্যে নীরব রইল।

আলিপুরের 'গায়কোয়াড়-কাসল' অনেকটা জমি নিয়ে। দ্বিতল প্রাসাদ। সামনে বড় একটা সবুজ ঘাসে-ছাওয়া লন। তার একটা অংশে কিছু বেতের চেয়ার-টেবিল। সে অংশটায় সবুজ রঙের কাঠের একটা পারগোলা বা 'চন্দ্রাতপ' লতানে জুঁই আর ব্যোগনভ্যালিয়ার জড়াজড়ি করে গন্ধবর্ণের সমাহার ঘটিয়েছে। কিছু দূরে একটা কৃত্রিম ফোয়ারা। বার্ড-বাথ। মর্মর-নগ্নিকা। গেট থেকে একটা নুড়ি বিছানো পথ এসব বেষ্টন করে পোর্চের নিচে এসে থেমেছে।

প্রকাণ্ড গাড়িটা এসে তার তলায় দাঁড়াতেই ছুটে এল উর্দিধারী খিদমদগার। গাড়ির দরজা খুলে অ্যাটেনশনে দাঁড়ালো।

'আসুন স্যার!' —এবার এগিয়ে এল আর একজন। আন্দাজ করা গেল সে বাটলার।

একান্ত সচিব নমস্কারান্তে বিদায় নিল। বাটলার কৌশিককে নিয়ে এসে বসালো ড্রইংরুমে।

প্রকাণ্ড হল-কামরা পার হয়ে এই ছোট্ট ঘরটি। হল-কামরার উপরে সিলিং থেকে ঝুলছে কাট-গ্লাসের শ্যান্ডেলেয়ার। দেওয়ালে বড় বড় পোর্ট্রেট-পেন্টিং। নিঃসন্দেহে গৃহস্বামীর পূর্বপুরুষদের। কামরাটা সোফা-সেট দিয়ে সাজানো। এই বড় ঘরটি অতিক্রম করে বাটলার ওকে যে ঘরে নিয়ে এসে বসালো সেটা অনেক ছোট। একান্ত সাক্ষাৎকারের উপযোগী। খান-চারেক গদি আঁটা সোফা, মাঝে আস্বচ্ছ কাচের একটা টেবিল। টেবিল ফ্যান আছে, চলছে না। ঘরটা

বাতানুকূল করা। বাটলার ওকে নিয়ে এসে বসালো সেই ঘরে। বলল, 'আমি স্যারকে এত্তালা দিয়ে দিচ্ছি।'

সবাই দেখা যাচ্ছে, জনার্দন গায়কোয়াড়কে 'স্যার' বলে সম্বোধন করছে। হুজুর বা রাজাসাহেব জাতীয় সম্বোধন নয়।

একটু পরেই এলেন জনার্দন। পরনে পায়জামা, উর্ধ্বাঙ্গে একটি ঢিলে-ঢালা আলখাল্লাজাতীয় পোশাক— তার কোমরে রঙিন দড়ি দিয়ে বাঁধা। ড্রেসিং-গাউন নয় তা বলে। কারণ, পোশাকটি হাই-কলার এবং তা মাথা গলিয়ে পরতে হয়। হয়তো এটা ওদের খানদানী দর্জি-ঘরানার একটা আবিষ্কার।

জনার্দন করমর্দন করলেন না। যুক্ত করে নমস্কার করে বললেন, 'আপনি যে আসতে রাজি হয়েছেন এজন্য ধন্যবাদ। কি জানেন মিস্টার মিত্র, আমি চাইনি যে, কেউ আন্দাজ করুক আপনাতে-আমাতে সাক্ষাৎ হয়েছে।'

কৌশিক নির্বিকারভাবে বললে, 'সেক্ষেত্রে আপনার উচিত ছিল মিস্টার দস্তুরকে ট্যাক্সি নিয়ে যেতে বলা।'

জনার্দন মাথা নেড়ে বললেন, 'কারেক্ট। ওদিকটা আমার খেয়াল হয়নি। যা হোক, কী ফরমায়েশ করব বলুন? চা না কফি? অথবা ঠাণ্ডাই কিছু?'

কৌশিক এবারও গম্ভীরভাবে বললে, 'আমি সৌজন্যসাক্ষাতে আসিনি, মিস্টার গায়কোয়াড়। পানাহারের তো কোনও প্রয়োজন নেই।'

'তাই কি হয়? আপনি দ্বিতীয়বার এলেন অধমের গরিবখানায়। প্রথমবার তো কোনওরকম আপ্যায়ন করার সুযোগই আমি পাইনি।'

কৌশিক সবিস্ময়ে বলে, 'দ্বিতীয়বার! আমার তো যতদূর স্মরণ হয়, আপনার এই প্রাসাদে এই প্রথমবারই এলাম।'

'না, আমি আমাদের গোয়ালিয়রের গরিবখানার কথা বলছি। আপনি সস্ত্রীক সেখানে পায়ের ধুলো দিতে গেলেন, অথচ আমি তখন অনুপস্থিত। ক্যা আপসোস কি বাৎ!'

কৌশিক সামলে নেয় নিজেকে। বুঝতে পারে, সমস্ত সাবধানতা সত্ত্বেও রাজমাতা তথ্যটা পুত্রের কাছে গোপন রাখতে পারেননি। বলে, 'সে তো আপনার মায়ের আমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। আপ্যায়নের ত্রুটি তিনি হতে দেননি কোনরকম।'

'শুনে আশ্বস্ত হলাম। তাহলে তথ্যটা সঠিক। আপনারা দুজনেই গোয়ালিয়র ঘুরে এসেছেন।'

তৎক্ষণাৎ নিজের ভুলটা বুঝতে পারে কৌশিক। জনার্দন নিশ্চিতভাবে তথ্যটা জানত না। আন্দাজ করেছিল মাত্র। তার মানে, গোয়ালিয়র রাজবাড়ি থেকে ট্রাঙ্ককলে যে ব্যক্তি খবরটা ওঁকে জানিয়েছে সে ওদের চেহারার বর্ণনাই শুধু দিতে পেরেছিল। পরিচয় নয়।

কৌশিক আরও সাবধান হয়ে যায়।

'তা মায়ের দেওয়া কাজটার কতদূর কী হল? কিছু ডকুমেন্টারি এভিডেন্স যোগাড় করতে

পারলেন?'

'কিসের?'

'কিসের আবার? যে দায়িত্বটা গ্রহণ করেছেন, তার। মিস পুষ্পা বিবাহিতা কি না।'

কৌশিক বললে, 'এক মক্কেলের গোপন কথা দ্বিতীয় মক্কেলের সঙ্গে আলোচনা করায় যে সৌজন্যের নিষেধ এই প্রাথমিক শিষ্টাচারটাও কি আপনার জানা নেই?'

জনার্দন অফেন্স নিলেন না। বললেন, 'কিন্তু আমরা যে মা আর ছেলে।'

কৌশিক এবার প্রতি-আক্রমণ শুরু করল, 'তার মানে আপনি প্রকারান্তরে বলতে চান যে, আপনি যে প্রস্তাবটা জানাবার জন্য আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন সে বিষয়ে আপনার মায়ের সঙ্গে আমি খোলাখুলি আলোচনা করতে পারি? যেহেতু আপনারা মা আর ছেলে?'

জনার্দন হাসলেন। বললেন, 'দ্যাটস এ গুড রিটার্ন।'

নিচু হয়ে সেন্টার টেবিলের তলায় একটা পুশ-বাটন টিপলেন। তৎক্ষণাৎ হল-কামরার দিক থেকে এসে উপস্থিত হল উর্দিপরা একজন খিদমৎগার। জনার্দন তাকে দাক্ষিণাত্যের কোনও ভাষায়— সম্ভবত তেলুগু— কিছু নির্দেশ দিলেন। লোকটা ঝুঁকে সেলাম করল। ওপাশে সরে গিয়ে দেওয়াল-জোড়া ট্যাপেস্ট্রি-পর্দাটা সরিয়ে দিল। দেখা গেল, সেদিকে আছে মেহগনি কাঠের একটা লীকার ক্যাবিনেট আর ফ্রিজ। লোকটা নিপুণ হাতে সার্ভ করল : স্কচ-হুইস্কি, দুটি গ্লাস, এক প্লেট কাজুবাদাম এবং পোর্সেলিনের পাত্রে বরফ-কিউব আর টংস।

মাঝের টেবিলে সব কিছু সাজিয়ে দিয়ে পুনরায় সেলাম করে নিষ্ক্রান্ত হল ঘর থেকে।

জনার্দন বললেন, 'আইয়ে সাব! শওখ ফরমাইয়ে।'

কৌশিক একটা কাজু তুলে মুখে দিল। বলল, 'আমি যে গোয়ালিয়র গিয়েছিলাম এটা না হয় গোয়েন্দা মারফৎ জেনেছেন, কিন্তু আমি মদ্যপান করি কি না তা আপনি জানলেন কি করে?'

জনার্দন সহাস্যে বলেন, 'আন্দাজে!'

গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে পুনরায় বলে, 'আন্দাজটা ভুল হয়েছে বলতে চান?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আংশিক! আমি ড্রিংক করে থাকি— তবে পার্টিতে, অবসর সময়ে, স্ফূর্তি করার ইচ্ছে হলে। অথবা কারও বাড়িতে সৌজন্যসাক্ষাতে গেলে। নট ডিউরিং প্রফেশনাল ডিউটিজ। আবার বলি মিস্টার গায়কোয়াড়, আমি সৌজন্যসাক্ষাতে আসিনি।'

জনার্দন এবারও অফেন্স নিলেন না। কিন্তু গম্ভীর হয়ে গেলেন। নিজের হাতেই মদের বোতলটা পিছনের ক্যাবিনেটে রেখে ফিরে এসে বসলেন নিজের আসনে। গম্ভীরভাবেই বললেন, 'ঠিক আছে! তাহলে কাজের কথাটা শুরু করা যাক।'

তৎক্ষণাৎ বাধা দিল কৌশিক, 'জাস্ট এ মোমেন্ট, সার! কাজের কথাটা আমরা আলোচনা করব বাইরে— আপনার বাগানে, ঐ পারগোলার নিচে বেতের চেয়ারে বসে।'

জনার্দন বিস্মিত হলেন। অথবা বিস্ময়ের একটা অভিব্যক্তি— বাসুসাহেবের ভাষায়—

'অভিপূর্বক নী-ধাতু অ' করলেন।

বললেন, 'হঠাৎ এ প্রস্তাব?'

'প্রস্তাবটা যখন গোপন— আপনি চিঠিতে তাই বলেছিলেন— তখন তা চারদেওয়ালের বাইরে খোলামাঠেই হওয়া ভাল। কথায় বলে : দেওয়ালেরও কান আছে।'

এবারও মাথা নেড়ে জনার্দন বললেন, 'কারেক্ট! কথাটা আমার খেয়াল হওয়া উচিত ছিল। দেওয়ালের কান থাক-না-থাক কনসিল্ড টেপ-রেকর্ডিং-গ্যাজেট থাকতে পারে। এক্ষেত্রে তা যদিও নেই, তবু আমি আপনার প্রস্তাবে এককথায় রাজি। চলুন।'

ওঁরা দুজনে বাইরে এসে বাগানে বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। জনার্দন শুরু করলেন, 'প্রথমেই আপনার কাছে একটা প্রতিশ্রুতি চাই। আপনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করুন অথবা প্রত্যাখ্যান করুন— কথাটা শুধু আমাদের দুজনেরই মধ্যেই গোপন থাকবে। রাজি?'

কৌশিক তৎক্ষণাৎ বললে, 'আজ্ঞে না! রাজি নই! আপনি যে প্রস্তাব দেবেন তা আমার বিজনেস পার্টনারকে বাড়ি ফিরেই জানাব। এবং জানাব মিস্টার পি. কে. বাসুকে।

জনার্দন একদৃষ্টে ওর দিকে দশ সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, 'আপনার বিজনেস পার্টনারকে জানাতে চাইবেন, একথা আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু মিস্টার বাসুকে কেন? সুকৌশলী কি একটা পৃথক প্রতিষ্ঠান নয়?'

'হ্যাঁ, তাই। তবে আমরা একটা ইউনিট হিসাবে একত্রে কাজ করি। মিস্টার বাসুর কাছ থেকে আমি কিছুই গোপন করতে পারব না।'

'তাহলে তো চলবে না। সে ক্ষেত্রে এখানেই থামতে হবে আমাকে।'

'থামুন! তার মানে আমাদের আলোচনার এখানেই শেষ। আপনি কাইন্ডলি আপনার ড্রাইভারকে ডেকে পাঠান। আমি কোনও কনসালটেশন ফি দাবি করছি না।'

জনার্দন নতনেত্রে আবার দশ সেকেন্ড কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, 'অল রাইট। আই এগ্রি! কিন্তু কথা দিন, এটা আপনি প্রেসকে জানাবেন না, বাইরের কাউকেও জানাবেন না।'

'শিওর। কথা দিলাম।'

পুনরায় শুরু করলেন জনার্দন, 'গোয়ালিয়রের রাজ পরিবারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুব নিকট নয়। আমার ঠাকুর্দার জেঠামশাই প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে গোয়ালিয়রের সিংহাসনে বসতেন। আমরা রাজপরিবারের রিস্তেদারমাত্র। তবু আমার মাকে ওখানকার সবাই রাজমাতা বলে, আমাদের বাড়িটাকে বলে প্যালেস। রাজপুত্র না হলেও আমি আমার স্বর্গত পিতৃদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র। আমার নানান জাতের বিজনেস আছে। এমনকি হিন্দি ফিলম বেনামে প্রডিউস করা। ফলে মাসিক-ব্যবস্থায় আমাকে কিছু গোয়েন্দাকে নিয়োগ করতে হয়। নানান রকম তথ্য-সংগ্রহ করতে। কেমন করে জেনেছি তা জানতে চাইবেন না, কিন্তু আমি জানতে পেরেছি : আপনি আজ দুপুরে টালিগঞ্জের টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে একটা টেলিফোন করেছিলেন। বেলা একটা

চল্লিশে। ঠিক বলছি?'

'এটা আপনার প্রস্তাব নয়। আপনার গোয়েন্দা পরিবেশিত একটা তথ্য। তা সঠিক হতে পারে, ভুলও হতে পারে। এ পর্যায়ে তা আমি স্বীকার বা অস্বীকার করব কেন? বলে যান!'

'আলোচনার খাতিরে ধরে নিচ্ছি, আমার সংগৃহীত তথ্যটা সঠিক। আপনি ওখানে মোস্তাক আহমেদকে টেলিফোনে ডেকে নির্দেশ দেন যে, সে অর্থাৎ তার অভিন্নহৃদয় বন্ধু ঝানু মল্লিক যেন আগামীকাল বিকাল চারটের ভিতর নিউ আলিপুরের একটা বিশেষ ঠিকানায় মিস্টার বাসুর মক্কেল মিস রুবি রায়কে নগদে আট হাজার টাকা পৌঁছে দেয়। কারেক্ট? আয়াম সরি। আলোচনাটা একটা প্রস্তাবে পরিণত হওয়ার প্রয়োজনে ধরে নেওয়া যাক এটা কারেক্ট! ঠিক আছে?'

'বলে যান।'

জনার্দন যখন বাগানে উঠে আসেন তখন ছোট্ট একটা অ্যাটাচি কেস হাতে নিয়ে এসেছিলেন। এবার সেটা বাড়িয়ে ধরে বলেন, 'এতে দশ-বিশ আর পঞ্চাশ টাকার নোটে নগদে বিশ হাজার টাকা আছে। আমার প্রস্তাব : এটি আপনি গ্রহণ করুন। আট-দুগুনে ষোলো হাজার হচ্ছে মিস রুবি রায়ের কমপেনসেশন। বাকি চার হাজার সুকৌশলীর সার্ভিস চার্জ!'

অ্যাটাচি কেসটা খুলে ধরলেন জনার্দন। সত্যিই সেটা খুচরো নোটে বোঝাই। ডালাটা বন্ধ করে সেটা মাটিতে নামিয়ে রেখে জনার্দন বললেন, 'প্রস্তাব তো পেশ করেছি। এবার বলুন? আপনি রাজি?'

'রাজি হব কি করতে? ষোলো হাজার টাকা মিস রায়কে পৌঁছে দেওয়ার পারিশ্রমিক হিসাবে নিশ্চয় আপনি চার হাজার টাকা আমাকে দিচ্ছেন না। পরিবর্তে আপনি কী চান?'

'পরিবর্তে আর কিছুই চাইছি না আমি। ঐটুকুই আমার প্রস্তাব : মিস রায় তার ঝানুদার কাছ থেকে আট হাজার টাকা নেবে না। আমার কাছ থেকে পরিবর্তে ষোলো হাজার টাকা নেবে।'

'ব্যস?'

'ইয়েস! ব্যস! এটুকুই আমি চাইছি।'

এবারে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে কৌশিক বলে, 'অলরাইট! আমি কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। এবার আপনিও কিছু প্রতিশ্রুতি দিন। তাহলেই আমি আপনার প্রস্তাবটা গ্রহণ করতে পারি।'

'বলুন? কী প্রতিশ্রুতি চাইছেন?'

'এই আর্থিক লেনদেনের করোলারি হিসাবে আপনি ভবিষ্যতে কোনদিন চাইবেন না, রুবি রায় তার ঝানুদার বিরুদ্ধে ছয় হাজার টাকা চুরির মামলাটা দায়ের করুক। অথবা আপনি পুলিশ কেস হিসাবে আদালতে মামলাটা তুললে রুবি কোনও সাক্ষী দেবে না? আপনার উকিল তাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় তুলবে না? সমন ধরাবে না! এগ্রিড?'

জনার্দন আবার নতনেত্রে একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন মিস্টার মিত্র, সেটাই আমার পরিকল্পনা। কিন্তু কেন জানেন? ঐ লোকটা উঁচিয়ে আছে!

আমাদের বিয়ের তারিখ ঘোষিত হলেই ও আমাদের দুজনকে উকিলের চিঠি দেবে। দাবি করবে : ও হচ্ছে পুষ্পার প্রথম পক্ষের স্বামী?'

'কথাটা সত্যি?'

'না! সত্যি নয়! মিথ্যা! একটা হিমালয়াস্তিক মিথ্যা! এই দেখুন—'

অ্যাটাচি কেসের ভিতর থেকেই উনি টেনে বার করলেন একখণ্ড কাগজ ও টর্চ। আলো জ্বেলে কাগজটা মেলে ধরলেন কৌশিকের সামনে। সেটা আদ্যন্ত দুর্বোধ্য হরফে লেখা।

কৌশিক বলে, 'কী এটা? এতো উর্দু! আমি উর্দু জানি না।'

'উর্দু নয়, ফার্সি। এটা হচ্ছে মোস্তাক আহমেদের মুসলিম বিবাহের দলিলের একটা জেরক্স কপি। পুষ্পার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি আমি। এটা জাল! এই জাল দলিলে উল্লিখিত মৌলবী, যিনি ওদের বিয়ে দিয়েছেন তিনি বেহস্তে গেছেন। যে দুজন তথাকথিত সাক্ষী আছেন তাদের একজন মৃত, অপরজন আহমেদের পেটোয়া লোক! আদালতে এ দলিল দাঁড়াবে না; কিন্তু একটা স্ক্যান্ডাল তো হবে। সেটাই চাইছে মোস্তাক! পুষ্পার উপর প্রতিশোধ নিতে।'

কৌশিক বলে, 'আপনি তো বিশহাজার টাকা আমাকে দিতে চাইছেন। ওটা মোস্তাককে দিলে সে রাজি হবে না?'

'না! সে নগদ এক লাখ টাকা চায়।'

'এক লক্ষ! তাতে আপনি রাজি নন?'

'না! কারণ এক লাখ টাকা সে ব্ল্যাক মানিতে নেবে না।'

'মানে? এ তো তাজ্জব কথা বলছেন মশাই! হোয়াইট মানি চাইছে?'

'হ্যাঁ, তাজ্জবই! শুনুন তাহলে :

জনার্দন প্রযোজক হিসাবে একটা টেকনিকালার হিন্দি ছবি তুলবার আয়োজন করেছেন। কাহিনীর স্বত্ব ক্রয় করা হয়েছে, স্ক্রিপট্ প্রায় তৈরি। পরিচালক হিন্দি ছবির জগতে একজন সফল ব্যক্তিত্ব। নায়িকা পুষ্পা। মোস্তাক আহমেদের দাবি, সেই ছবিতে পুষ্পার বিপরীতে তাকে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করতে দিতে হবে। মোস্তাক সুদর্শন, ভয়েস-টেস্টিং-এ বহুদিন আগেই সে উৎরেছে। ছোটোখাটো দু-চারটে চরিত্রে অভিনয়ও করেছিল এককালে। তারপর সুযোগ না পেয়ে সিনেমা জগতের নেপথ্যে সরে গেছে। জনার্দন তাকে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করতে দিতে রাজি হতে পারেন না নানান হেতুতে। প্রথম কথা, পুষ্পা তাতে কোনোমতেই রাজি নয়। মোস্তাক এককালে তার কুক-কাম-ড্রাইভার ছিল। আজ সে খ্যাতনামা তারকা। ফলে সেই প্রাক্তন রাঁধুনীর সঙ্গে প্রেমের দৃশ্য অভিনয় করতে পুষ্পা রাজি হবে না, এটাই স্বাভাবিক। আবার নায়িকা বদল করলে মোস্তাক রাজি নয়! সে এক ঢিলে তিন পাখি মারতে উদ্যত। প্রথমত লাখ টাকা পারিশ্রমিক, দ্বিতীয়ত সিনেমার জগতে নতুন করে ফিরে আসার সম্ভাবনা। শেষ কথা : পুষ্পার সঙ্গে প্রেম করার সুযোগ, হোক না কেন তা অভিনয়!'

কৌশিক বললে, 'ঠিক আছে। আপনার প্রস্তাবটা শুনলাম। এখনি কোনও সিদ্ধান্তে আসতে

পারছি না। আমাকে রুবির সঙ্গে আলোচনা করে দেখতে হবে। অ্যাটাচি কেসটা আপনি উঠিয়ে নিন, মিস্টার গায়কোয়াড়। আমি কাল আপনাকে টেলিফোন করে জানাব।'

'কাল বিকাল চারটের আগেই নিশ্চয়। আমি চাই না, আপনার মক্কেলের সঙ্গে তার ঝানুদার সাক্ষাৎ হোক।'

'বুঝলাম। কিন্তু আপনি যা চাইছেন তাতে রুবি রাজি হবে কি না— ইয়েস, ইয়েস, বাড়তি আট হাজার পেলে— সেটাও তো আমাকে জেনে নিতে হবে।'

'অলরাইট সার! আমি প্রতীক্ষায় থাকব। আপনার অনেকটা সময় নষ্ট করেছি। কিছুটা কমপেনসেট করতে দিন। একটা ছোট্ট গিফ্‌ট দিই।'

'ছোট্ট গিফ্‌ট! কী সেটা? আগে শুনি?'

'পুষ্পার বিয়ের এই জাল দলিলের জেরক্স কপিটা। এটা আমার মাকে পাঠিয়ে দিয়ে ও তরফ থেকে আপনি মোটা ফি আদায় করতে পারবেন। গোয়ালিয়রে মা অনায়াসেই ফার্সিতে দক্ষ 'রিডার' যোগাড় করতে পারবেন। বিবাহের দলিলটা জাল না সাচ্চা তা তদন্ত করে দেখতে পারবেন। এটা কাইন্ডলি নিয়ে যান। আপনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করছেন অথবা করছেন না তার সঙ্গে এই ছোট্ট উপহারটির কোনও সম্পর্ক নেই। প্লিজ, অ্যাকসেপ্ট ইট অ্যান্ড সে : গুড-নাইট!'

'গুড-নাইট'! —কৌশিক হাত বাড়িয়ে কাগজখানা নিল।

।। বারো ।।

পরদিন সকালে হোটেল হিন্দুস্থান থেকে প্রমীলা দেবী ফোন করলেন সুকৌশলীর অফিসে। জানালেন, হঠাৎ কিছু অপ্রত্যাশিত ডেভেলপমেন্ট হয়েছে। সামনাসামনি আলোচনার দরকার। জানতে চাইলেন, কখন, কোথায় আলোচনাটা হতে পারে।

কৌশিক জানালো সে এখনই আসছে।

এলও তাই। হোটেল হিন্দুস্থানের 4/24 ঘরে প্রমীলা ওকে আপ্যায়ন করে বসালেন। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে জানালেন, গতকাল সন্ধ্যায় প্রমীলা দেবীর পরিচিত একজন অত্যন্ত নামকরা কলকাত্তাওয়ালা তাঁকে ফোন করেছিলেন। এ ভদ্রলোক রাজনীতি মহলে সুপরিচিত। বিধায়ক, পুলিশের জগতেও খাতিরের ব্যক্তি। মুকুট আর গহনাগুলি উদ্ধারের ব্যাপারে প্রমীলা ইতিপূর্বেই তাঁর সাহায্য চেয়েছিলেন, টেলিফোনে। বিশেষ কারণে প্রমীলা তাঁর নামটা জানাতে চাইলেন না। বললেন, ধরে নিন তাঁর নাম ক-বাবু। তা সেই ক-বাবু কাল জানালেন, কলকাতার এক তথাকথিত গড়ফাদারের কাছে ঐ মুকুট ও গহনা নিরাপদে পৌঁছে গেছে। চোরাই মাল পাচার করার ব্যাপারে ঐ গড়ফাদার চোর-ডাকাত মহলে 'মুশকিল আসান'। ক-বাবু খোঁজ পাওয়ার আগেই সোনার গহনাগুলি গলিয়ে ফেলা হয়েছে। তা আর উদ্ধারের কোনও আশা নেই। জড়োয়া গহনাগুলি গলানো হয়নি। গলিয়ে ফেললে পড়তা পোষায় না। ইদানীং তা পালিশ করে মধ্যপ্রাচ্যে

চালান করা হয়। ওরা ভারতীয় গহনার ডিজাইন পছন্দ করে। তবে ক-বাবুর বিশেষ অনুরোধে চোর-ডাকাতদের গডফাদার জানিয়েছেন, গহনার মালিক যদি নিজেই অর্ধ-মূল্যে জড়োয়া গহনাগুলি কিনে নিতে রাজি থাকেন এবং পুলিশ কেস উইথড্র করে নেন, তাতে তাঁর আপত্তি নেই। প্রমীলা বলেছিলেন, তিনি সব গহনাই কিনে নিতে চান, তবে নমুনা হিসাবে ঐ মুকুটটা ক্রয় করতে ইচ্ছুক। তিনি জানতে চান, শুধু মুকুটটা বাবদ তাঁকে কত দিতে হবে।

ক-বাবু তখন জবাবে বলেন, 'তুমি ভুল করছ প্রমীলা-মা। আমি তাদের চিনি না, চোখেও দেখিনি কোনদিন। এ খবর এনেছে আমার কনট্যাক্ট-ম্যান। তুমি যদি ওদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে ইচ্ছুক থাক, তাহলে আমি তাদের হোটেল হিন্দুস্থানে গিয়ে দেখা করতে বলতে পারি। দরাদরি যা করার তুমি সরাসরি করবে। আমার তাতে কোন হাত নেই। মধ্যস্থতাও নেই।'

কৌশিক জানতে চায়, 'তারপর? আপনি রাজি হয়ে গেলেন?'

'গেলাম। আমি শর্ত করলাম, ভেনুটা হবে হোটেল হিন্দুস্থানে আমার ঘর। রাত আটটায়। গডফাদারের তরফে একজন মাত্র আসবে আমার সঙ্গে দেখা করতে। ওরা রাজি হল। ঐ সঙ্গে আমাকেও প্রতিশ্রুতি দিতে হল কোন 'মাংকি-বিজনেস' করব না।'

'মাংকি-বিজনেস মানে?'

'আগেভাগে পুলিশে খবর দিয়ে ঐ লোকটিকে ধরবার চেষ্টা করব না, বা কোথাও কোন কন্সিলড টেপ রেকর্ডার লুকিয়ে রাখব না, ইত্যাদি।'

'তারপর? লোকটা এসেছিল?'

'হ্যাঁ, পাঙ্কচুয়ালি রাত আটটায়। বছর পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বয়স, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। গোঁফ-দাড়ি দুইই আছে। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। নাম বললেন, জীবনরতন ব্রহ্মচারী।'

'ছদ্মনাম নিঃসন্দেহে, কিন্তু দেখে কি মনে হল না, লোকটা ছদ্মবেশে এসেছে?'

'তা তো হলই। সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আগামীকাল, রবিবার, বেলা একটা বেজে দশ মিনিটে সে এই ঘরে এসে মুকুটখানা অক্ষত অবস্থায় ডেলিভারি দেবে, শর্তসাপেক্ষে।'

'কী কী শর্ত?'

'এক নম্বর : আজ বেলা একটা দশ মিনিটে সে আসবে। তাকে একুশ হাজার একশ টাকা নগদে দিতে হবে। দু-নম্বর : কোন মাংকি-বিজনেস হলে সে এই ঘরের ভেতর আমার লাশ ফেলে দেবে। পকেট থেকে বার করে সে একটা রিভলভার আমাকে দেখালো। তাতে সাইলেন্সার ফিট করা।'

প্রমীলা তখন জানতে চেয়েছিলেন, 'কিন্তু আপনার কথার গ্যারান্টি কী? আপনি তো অনায়াসে টাকা নিয়ে হাওয়া হয়ে যেতে পারেন। মাংকি বিজনেস হবে না, একুশ হাজার একশ টাকাই আমি নগদে দেব— কিন্তু তৎক্ষণাৎ মুকুটটাও আপনাকে হস্তান্তরিত করতে হবে।'

জীবন তখন বলেন, 'তা হয় না। আমার হাত ফিরি করার সঙ্গে সঙ্গে আমি যদি দেখি আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে স্টেনগানধারী পুলিশ? মুকুটটা যে চোরাই মাল তার রেকর্ড

আছে।'

প্রমীলা বলেন, 'কিন্তু মুকুটটা যে আপনাদের জিম্মায় আছে তার প্রমাণ কী?'

'প্রমাণ তো এই মাত্র আপনাকে হাতে-হাতে দেখালাম। চিনতে পারেননি?'

পকেট থেকে দ্বিতীয়বার রিভলভারটা সে বার করে দেখায়। বলে, 'নাম্বারটা কি আপনার লেখা আছে? নাকি আপনার সেই সিনেমা-আর্টিস্ট বান্ধবীর কাছে লেখা আছে? এটাও তো ছিল সেই স্যুটকেসে। ছিল না?'

কৌশিক বলে, 'তার মানে মিস্টার জনার্দন গায়কোয়াড়ের সেই রিভলভারটাই? কিন্তু সেটা তো চুরি যায়নি বলেছিলেন?'

'তখন তাই বলেছিলাম, কারণ জনার্দন তাই বলতে বলেছিল। ওটার ক্যারিয়ার লাইসেন্স ছিল না আমাদের দুজনের কারও। তাই পুলিশে আমরা ওটা রিপোর্ট করিনি।'

'আপনি চিনতে পারলেন?'

'না। এটুকু বুঝলাম যে, ওটা একটা কোল্ট কোবরা।'

'কোল্ট কোবরা। তার মানে?'

'অত্যন্ত দামী একটা যন্ত্র। অ্যালুমিনিয়াম-অ্যালয়। মাত্র বিশ-আউন্স ওজন। জন এক জোড়া কিনেছিল। একটা সর্বদা সে নিজের কাছে রাখে, একটা দিয়েছিল পুষ্পাকে। ও জিনিস বাজারে সহজে পাওয়া যায় না।'

'বুঝলাম। তারপর কী হল?'

'লোকটা তখন একটা বিচিত্র প্রস্তাব দিল। বলল, মুকুটটা বর্তমানে যার কাছে আছে তাকে নগদ না দিলে সে হাতছাড়া করবে না। তাকে দিতে হবে পনের হাজার...'

প্রমীলা তখন জানতে চান, 'তাহলে আপনি একুশ হাজার একশ চাইছেন কেন?'

'কী আশ্চর্য! ঘাটে-ঘাটে পেন্নামী দিয়ে যেতে হবে না? গডফাদারকে, পুলিশকে, ঐ আপনার ইলেকশন জেতা বিধায়ক দাদাকে?'

'কিন্তু আপনি যে আজ দুপুরে আমার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবেন না, তার গ্যারান্টি কী?'

'শুনুন মা, বলছি। আজ দুপুর একটা বেজে দশে আপনার কাছ থেকে টাকাটা নেবার সময় আমি একটা গ্যারান্টি জমা রেখে যাব, যার দাম আমার কাছে ত্রিশ/চল্লিশ হাজার টাকা, আপনার কাছে কিছুই না। তা হলে হবে তো?'

প্রমীলা বলেছিলেন, 'আপনার প্রস্তাবটা আমি বুঝতে পারলাম না। আপনি যদি একটা চোরাইমাল— ধরা যাক, একটা সোনার বিস্কুট গ্যারান্টি হিসাবে রেখে যান...'

জীবন বাধা দিয়ে বলেছিল, 'আপনি আমার প্রস্তাবটা ধরতে পারেননি, মা। জিনিসটা এমন যে, আপনার কাছে তার দাম নেই, আমার কাছে আছে। ধরুন চল্লিশ হাজার টাকার ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট— আমার নিজের নামে। আমি ওটা পোস্ট আফিসে জমা দিলে আজই ত্রিশ

হাজার টাকা পাব। আপনি তা পাবেন না। অথচ এন.এস.সি. একটা লিগাল ডকুমেন্ট— সরকারই তা গ্যারান্টি হিসাবে জমা রাখেন। আপনিও তা চব্বিশ ঘণ্টার জন্য জমা রাখতে পারেন। এ ক্ষেত্রে আপনার দেওয়া একুশ হাজার একশ টাকা মেরে দিয়ে আমি ওই এন. এস. সি.-গুলো খোয়াতে রাজি হতে পারি?'

কৌশিক বলল, 'মনে হচ্ছে আপনি শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মচারীর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন। তাই কী?'

'তাই হলাম, মিস্টার মিত্র। ভুল করলাম কি?'

'আমার তা মনে হয় না। আপনি খুবই বুদ্ধিমতীর মতো জিনিসটা ট্যাকল করেছেন। আমার ইন্টুইশন বলছে, আপনি মুকুটটা ফেরত পাবেন।'

প্রমীলা বলেন, পুলিশে আমি খবর দেব না, কিন্তু আপনি কি ওই সময় আমার ঘরে সশস্ত্র লুকিয়ে থাকতে পারেন?'

কৌশিক বললে, 'না। সেটা মোটেই বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে না। এইসব আন্ডার-ওয়ার্ল্ড-এর লোকগুলোর নেটওয়ার্ক কী প্রচণ্ড সুদূর-বিস্তৃত তা আপনার ধারণা নেই। হয়তো— হয়তো কেন, নিশ্চিত আপনি বর্তমানে চব্বিশ ঘণ্টা নজরবন্দি হয়ে আছেন। এই যে আপনি আমাকে ফোন করেছেন, আমি এসেছি— এসব খবর ওরা নিশ্চিত পাচ্ছে। আমার মতে, আপনি ঠিক পথেই চলেছেন। চারটি বিষয়ে সাবধান থাকলে আপনার কোন বিপদ নেই। এক নম্বর : ওরা যাকে মাংকি বিজনেস বলেছে তা করবেন না। অর্থাৎ পুলিশে খবর দিয়ে বমাল লোকটাকে হাতেনাতে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন না। দু নম্বর : ভেনুটা কোনো কারণেই পরিবর্তনে রাজি হবেন না। দু-দুটো ট্রানজাকশনই যেন এই হোটেলের এই ঘরে হয়। তিন নম্বর : ও আজ যে গ্যারান্টি-পেপার জমা রেখে যাবে সেটা জেনুইন কিনা খুঁটিয়ে দেখে নিতে হবে। চার নম্বর : আজ একটার সময় ও এলে বলবেন, 'একটা কথা বলতে ভুলে গেছি মিস্টার ব্রহ্মচারী। কাল আমার সহকারী হিসাবে একজন বৃদ্ধ জুয়েলার থাকবেন। তাঁকে ভিতরের কথা কিছুই বলা হবে না। তিনি শুধু মুকুটের সোনাটা কষ্টিপাথরে যাচাই করে জানাবেন কতটা 'পানমরা' বাদ যাবে।— আমার মনে হয় ও এককথায় মেনে নেবে। বুঝবে যে, মুকুটটা যে জেনুইন এটা আপনি যাচাই করতে চাইছেন। ও তাতে রাজি না হলে আপনি গোটা ট্রানজাকশনটা বাতিল করে দেবেন।'

'তার মানে, আপনি লুকিয়ে থেকে দেখতে চান না?'

'না। তাতে 'কোল্ট কোবরার' ছোবল খাবার আশঙ্কা। উইশ য়্যু বেস্ট অব লাক। আজ সওয়া একটায় এবং কাল সওয়া একটায় আপনাকে ফোন করে জেনে নেব।'

কৌশিক উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আপনাকে আমার অভিনন্দন মিসেস পাণ্ডে। প্রচণ্ড বিপদেও আপনি মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পেরেছিলেন।'

'য়ু আর ওয়েলকাম।'

।। তেরো ।।

রবিবার সাতসকালে চায়ের টেবিলে প্রসঙ্গটা তুলল কৌশিক। জনার্দন গায়কোয়াড়ের প্রস্তাবটা। পূর্বরাত্রে সে সবিস্তারে তথ্যটা জানিয়েছিল বাসুসহেবকে। উনি নির্বাক শুধু শুনে গিয়েছিলেন। কৌশিক জানতে চেয়েছিল, 'আপনি আমাকে কী করতে বলেন? মিস্টার গায়কোয়াড়ের প্রস্তাবে রাজি হব, না প্রত্যাখ্যান করব?'

বাসুসাহেবের জন্য কাল ডিনার-টেবিলে রানু দেবী খই-দুধের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। বাটিতে জল ঢেলে চুমুক দিয়ে সেটা খেয়ে ফেলে বাসু বললেন, 'আজ রাতটা দুজনে ভাবতে থাক! কাল সিদ্ধান্ত নিও বরং।'

তাই আজ সাতসকালেই আবার প্রসঙ্গটা তুলেছে কৌশিক।

বাসু বললেন, 'সমস্যাটা সুকৌশলীর। আমি কেন উপরপড়া হয়ে কিছু সাজেস্ট করতে যাব?'

কৌশিক কিছু বলার আগেই সুজাতা আগ বাড়িয়ে বলে, 'যেহেতু আমরা অর্থী, আমরা জিজ্ঞাসু, আমরা আপনার সাহায্য চাইছি!'

বাসু রানুর দিকে ফিরে বললেন, 'আর হাফ-কাপ কফি পাওয়া যাবে?'

রানু নির্বিকারভাবে বললেন, 'না। তাহলে তোমার ঘুম চড়ে যাবে!'

বাসু শ্রাগ করলেন।

সুজাতা হাত বাড়িয়ে কফি-পটটা টেনে নিয়ে মামুর কাপে কফি ঢেলে দিল। রানুর দিকে ফিরে বলল, 'আমার কাছে ঘুমের ওষুধ আছে মামিমা, আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

বাসুর কফিতে একটা চুমুক দিয়ে বলেন, আমার মতে জে-জি'র প্রস্তাবে তোমরা এখনই রাজি হয়ে যেও না। কৌশিক তার চাল দিয়েছে— বোড়েটাকে একঘর এগিয়ে দিয়ে আহমেদের মন্ত্রীটাকে ধরেছে। এখন আহমেদের চাল। সে কী চাল দেয় প্রথমে দেখ। আট হাজার টাকা রুবিকে দিয়ে আসে কিনা।'

কৌশিক বলে, 'কিন্তু জনার্দন চাইছেন তার আগেই আমরা কিছু একটা করি— যাতে আহমেদ ঐ সুযোগটা না পায়।'

বাসু বলেন, 'কিন্তু সেটা কি অন্যায়-অধর্ম হয়ে যাবে না?'

'কেন? অন্যায়টা কিসের? আহমেদ তো ঠগ-জোচ্চর। রুবির টাকা মেরে দিয়ে পালিয়ে গেছিল।'

'সেটা তো কেউ অস্বীকার করছে না, কৌশিক। কিন্তু সে অপরাধের জন্য তুমি তো বিচার করে ওকে একটা শাস্তির বিধান দিয়ে বসে আছ— আট হাজার টাকা আর্থিক জরিমানা। নির্দিষ্ট সময়ে আসামী যদি জরিমানার টাকাটা না মিটিয়ে দেয় তখনই "অনাদায়ে সশ্রম কারাদণ্ডের"

প্রশ্নটা উঠতে পারে।'

রানু বললেন, 'তোমার সওয়াল শুনে মনে হচ্ছে রুবি নয়, ঝানু মল্লিকই তোমার মক্কেল। আর জনার্দন গায়কোয়াড় এক্ষেত্রে আসামী।'

বাসু কফির বাকিটুকু কণ্ঠনালীতে ঢেলে দিয়ে বললেন, 'কথাটা যখন তুললেই রানু, তখন বলি : সত্যিই আমার মূল্যায়নে জে-জি হচ্ছে 'নেভ্ আর ঝানু : করুণার পাত্র।'

'কী হিসাবে?'

বাসুসাহেব তাঁর বক্তব্যটা বিশ্লেষণ করে বোঝালেন।

প্রথম কথা : 'ঝানু মল্লিক রুবির সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তা ক্ষমার অযোগ্য। সে জন্য সুকৌশলীর আদালতে তার বিচার আর শাস্তির বিধান হয়েছে। আর্থিক জরিমানা। এক অপরাধের জন্য দুবার শাস্তি দেওয়া যায় না। না আইনে, না বিবেকের নির্দেশে। কিন্তু রুবির প্রতি অন্যায় করা ছাড়া মোস্তাক আহমেদের অপরাধ কতটুকু তার প্রমাণ নেই। আমাদের সামনে দুজাতের তথ্য আছে। একেবারে প্রথম পর্যায়ে শোনা যাচ্ছে, এককালে আহমেদ পুষ্পাকে খাইয়েছে, পরিয়েছে। সত্য-মিথ্যা জানা যায় না। পুষ্পা বাল্যেই পিতৃহীন। কিন্তু সে পুনা ইনস্টিটিউটে পড়েছিল। তাহলে কে তাকে টাকা জুগিয়েছিল? মা? যে মা সন্ন্যাসিনী? তিনি কন্যাকে অভিপূর্বক নী ধাতু অ-এর জগতে পাঠিয়েছিলেন? তাহলে? ফলে, পুষ্পার অতীত জীবন রহস্যময়— পরস্পর-বিরোধী তথ্যে ঠাসা। কিন্তু কতকগুলি তথ্য অবিসংবাদিত। এক নম্বর : মোস্তাক আহমেদ এক সময় পুষ্পার ড্রাইভার-কাম-কুক ছিল। দু-নম্বর : মোস্তাক আহমেদ অত্যন্ত সুদর্শন এবং লেডি-কিলার খ্যাতি লাভ করেছিল। তিন নম্বর : পুষ্পা স্টারলেট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোস্তাক আহমেদ বোম্বাই থেকে বিতাড়িত হয়েছিল কলকাতার টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে। পুষ্পার পাবলিসিটি এজেন্টের ব্যবস্থাপনায়। এগুলি অবিসংবাদিত তথ্য!

'এখন জনার্দন জানাচ্ছেন— আহমেদ ব্ল্যাকমানিতে পুষ্পাকে অব্যাহতি দিতে অরাজি। বিশ হাজার নয়, বোধ করি, পঞ্চাশ হাজার টাকার অফার প্রত্যাখ্যান করেছে সে। পরিবর্তে শাদা টাকায় সে নায়কের পারিশ্রমিক হিসাবে এক লক্ষ টাকার দাবি করেছে। আহমেদ জানে, তা থেকে বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা স্রেফ ইনকাম ট্যাক্স বাবদ কাটা যাবে। তবু সে কালো টাকায় পুষ্পাকে অব্যাহতি দিতে রাজি নয়। কেন?'

কৌশিক বললে, 'হয়তো সে রেকর্ড রাখতে চাইছে— তার পারিশ্রমিক কত। যদি সে এ ছবিতে সাফল্যমণ্ডিত হয় তাহলে পরবর্তী ছবিতে তার ডাক আসবে, তখন তার বাজারদর আর কমানো যাবে না।'

'হতে পারে। আর মূল হেতুটা তা নাও হতে পারে।'

সুজাতা বলে, 'আমার মনে হয় মামু যা ইঙ্গিত করছেন, সেটাই মূল হেতু।'

'মামু তো কিছু ইঙ্গিত করেননি।'— কৌশিক প্রতিবাদ করে।

'করেছেন। হয়তো আহমেদ পুষ্পার প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই এভাবে দাবি করছে।

পুষ্পার সঙ্গে যদি এককালে তার প্রেম-মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে উঠে থাকে— উঠেছিল কি না আমরা জানি না— তাহলে এ প্রবণতাটা স্বাভাবিক। বাস্তব জগতে নাই হোক, অভিনয়ের জগতে পুষ্পাকে স্বীকার করতে হবে আহমেদের কাছে : ম্যায় তুমকো প্যার করতি হুঁ।'

রানু চুপ করে শুনে যাচ্ছিলেন। বললেন, 'মানলাম। হয়তো আহমেদ এক্ষেত্রে করুণার পাত্র। কিন্তু জনার্দন গায়কোয়াড় 'নেভ' হল কোন হিসাবে? সে তো কোনও অপরাধ করেনি। একমাত্র অপরাধ : পুষ্পাকে ভালবাসা ছাড়া?'

বাসু কৌশিকের দিকে ফিরে বললেন, 'কাল রাত্রে তুমি বলেছিলে, আমার মনে আছে : তবু আবার বল তো— ঐ ফার্সি-ভাষায় লেখা কাগজখানা, যার জেরক্সকপি তোমাকে উপহার দিয়েছে, সেটা জনার্দন কোথায় পেয়েছে বলেছিল?'

'পুষ্পার কাছে!'

'তাতেই প্রমাণ হচ্ছে জনার্দন গায়কোয়াড় ধোওয়া তুলসীপাতাটি নয়!'

'কেন?'

'লজিক্যালি ভেবে দেখ। ঐ কাগজখানা সাচ্চা হতে পারে, ঝুঠাও হতে পারে। ঝুঠা হলে ধরে নিতেই হবে যে, মোস্তাক আহমেদ মূল কাগজখানা কোনও মৌলবির মাধ্যমে বানিয়েছে। দু-একজন মৃত ব্যক্তির স্বাক্ষর জাল করেছে। তা যদি হয়, তাহলে তার কপি পুষ্পার কাছে থাকতে পারে না। কারণ, অমন জাল বিবাহের দলিল বানাবার প্রেরণা আহমেদ তখনই লাভ করবে যখন সে বোম্বাইয়ের সিনেমাজগৎ থেকে কলকাতায় বিতাড়িত। সে ক্ষেত্রে তার কপি পুষ্পার কাছে থাকবে কেন? অপরপক্ষে যে বিবাহের দলিলের কপি 'দুল্‌হা-দুলহ্‌ন' দুজনের কাছেই থাকে তা সচরাচর জাল হয় না। তা সাচ্চা! জনার্দন যদি পুষ্পার কাছ থেকে ঐ কাগজটা সংগ্রহ করে জেরক্স করিয়ে থাকে তবে তা সাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অর্থাৎ আহমেদ পুষ্পার প্রথমপক্ষের স্বামী। জনার্দন তাকে চুরির অপরাধে জেলের ভিতর ঢোকাতে চাইছে। সেক্ষেত্রে আহমেদ তার বিয়েতে কোনও বাধা দিতে পারবে না। আজ যদি আহমেদ বেমক্কা খুন হয়ে যায় তাহলে পুলিশ যাই বলুক, আমি তো সন্দেহ করব ঐ টাকার কুমিরটাকে!

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। কৌশিক ফোনটা তুলে শুনল। ফোন করছে রুবি। সল্টলেক থেকে। কৌশিক জানতে চাইল, 'কী খবর রুবি, এত সকালে?'

'সুখবর। কাল রাতে ঝানুদা ফোন করেছিল। কথা দিয়েছে, আজ বিকাল চারটের সময় সে আসবে এই সল্ট লেকের বাড়িতে। ডিরেকশন আর ঠিকানা জেনে নিয়েছে। পুরোপুরি আট হাজার টাকাই দেবে। নগদে।'

'বল কী! এতো দারুণ খবর! তা, কী বলল? কৈফিয়ৎ হিসাবে?'

'ও! সে এক ইন্টারেস্টিং গল্প। বোম্বাই ফিল্ম মার্কা প্লট। ছয় বছর আগে ঝানুদা বোম্বাইয়ে গিয়ে একটা মোটর অ্যাকসিডেন্টের খপ্পরে পড়ে। যথারীতি হেড ইনজুরি। যথাপ্রত্যাশিত 'অ্যামনেশিয়া'। এ কয়বছর সে শুধু ভেবেছে কে আমি? কী নাম আমার? কোন হতভাগিনী ছিল আমার প্যার-মহব্বৎ-এর দিল-কি-রানী।'

'বুঝলাম। চেনা প্লট।'

*   *   *   *   *   *

কাল দুপুরে দেড়টার সময় প্রমীলা ফোন করে জানিয়েছেন যে, ব্রহ্মচারী ঠিক সময়েই এসেছিলেন। সিকিউরিটি জমা দিয়ে একুশ হাজার একশ টাকা নিয়ে গেছেন। আজ দুপুরে মুকুটটা ফেরত দিয়ে সেই সিকিউরিটি কাগজখানা ফেরত নিয়ে যাবেন।

কৌশিক জানতে চেয়েছিল, 'এন. এস. সি.? কার নামে? ওখানে তো ছদ্মনাম চলবে না?'

প্রমীলা বলেছিলেন, 'আপনি ব্যস্ত হবেন না। সিকিউরিটি পেপারটা জেনুইন। আমার কাছে তার মূল্য থাক না থাক, যে জমা রেখে গেছে তার কাছে সেটা অমূল্য।'

অসুবিধা হয় না বুঝতে, প্রমীলা সব কথা খোলাখুলি জানাচ্ছেন না। জানাতে চাইছেন না।

কৌশিক সব কথা খুলে বলল বাসুসাহেবকে।

তিনি বললেন, 'আরে বাবা, প্রমীলা পাণ্ডে একটি বাস্তুঘুঘু। তিনি তোমার মতো টিকটিকিকে এক হাটে কিনে অন্য হাটে বেচতে পারেন। সব কিছুই তো রেখে-ঢেকে তোমার সাহায্য কিনতে চাইছেন। কোল্ট কোবরা রিভলভারটা যে চুরি গেছে এটাও তো তোমার কাছে গোপন করেছিল প্রথমে। এখনো বলতে চাইছেন না, কী সিকিউরিটি জমা দিয়ে লোকটা বিশ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়ে গেল...'

কৌশিক বাধা দিয়ে বললে, 'বিশ নয় মামু, একুশ হাজার একশ— ঘাটে ঘাটে পেন্নামী দিতে হবে বলে।'

বাসু বললেন, 'হ্যাঁ, অঙ্কের হিসাবটা আমার মনে আছে। ও তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল যে কারণে সেটাতেই যে তুমি রাজি হলে না।'

'কোনটাতে?'

'যতই বুদ্ধি ধরুক, ও স্ত্রীলোক। সম্ভবত ওর কাছে কোন ফায়ার-আর্মস নেই। ও তোমাকে অকুস্থলে বডি-গার্ড হিসাবে উপস্থিত রাখতে চেয়েছিল। আর সে জন্যই এক গাদা মিছে কথা বলে গেছে। কিন্তু তুমি আদানপ্রদানের মাহেন্দ্রক্ষণে পর্দার আড়ালে পিস্তল হাতে উপস্থিত থাকতে রাজি হলে না। এবং সেটা ঠিকই করেছ।'

রবিবার ওঁরা যখন লাঞ্চে বসেছেন তখন ফোন করলেন প্রমীলা পাণ্ডে। কৌশিক ওঁর ফোন প্রত্যাশাই করেছিল। উঠে গিয়ে ধরল, 'কী ব্যাপার? মুকুটটা ফেরত পেলেন?'

'তা পেলাম। অশেষ ধন্যবাদ।'

'আমাকে ধন্যবাদ কিসের? এ তো আপনারই কৃতিত্বে। আর রীতিমতো অর্থমূল্যে খরিদ করা। পুষ্পা দেবীকে জানিয়েছেন?'

'আমার কী গরজ? শুনুন, মিস্টার মিত্র। মঙ্গলবার, কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে গিয়ে মুকুটটা মায়ের পায়ে ছুঁইয়ে আনতে যাব। আপনাকে আমার সঙ্গে থাকতে হবে সাক্ষী হিসাবে সশস্ত্র। এবার আসতে রাজি আছেন তো?'

'আসব। ট্যাক্সিতে নয়। হোটেল হিন্দুস্থানের গাড়ি নিয়ে যাব। বড় বড় হোটেলে অর্থমূল্যে স্পেশাল সিকিউরিটির ব্যবস্থা থাকে। সে ব্যবস্থাও না হয় করা যাবে।

'এবার তাহলে বলুন, সুকৌশলীকে কী সম্মানমূল্য দিতে হবে?'

'তাড়াহুড়োর কী আছে? কাজটা সুষ্ঠুভাবে আগে মিটুক।'

'আপনাকে আরও একটা তাজ্জব জিনিস দেখাব, যেটা দিয়ে আপনার ভালরকম অর্থাগম হবে। সেটা হাতে পেলে নিশ্চয় আপনি আপনার ফি অনেক কমিয়ে দেবেন।'

'ব্যাপার কী? আপনি যে ক্রমশই রহস্যঘন হয়ে উঠছেন। জিনিসটা কী?'

'একখণ্ড কাগজ। কাল জীবন ব্রহ্মচারী যে সিকিউরিটি রেখে গিয়েছিল তারই জেরক্স কপি। আমি আপনাকে উপহার দেব বলে বানিয়ে রেখেছি। আমার কাছে তার দাম নেই। আপনার কাছে আছে।'

'রহস্য যে ক্রমশই জমাট বাঁধছে। সেটা কী, তা বলবেন না?'

'এখন নয়। যখন আপনি বিল দেবেন তখন দেখাব।'

লাইনটা কেটে দিয়ে কৌশিক বাসুসাহেবের দিকে ফিরে বলল, 'শুনলেন?'

বাসু বললেন, 'একতরফা'।

কৌশিক সমস্তটা বুঝিয়ে বলল, 'জানতে চাইল, আন্দাজ করতে পারেন জিনিসটা কী?'

বসু বললেন, 'আমার কী গরজ? সমস্যাটা যার সে সুকৌশলে সমাধানের কথা ভাবতে থাকুক। এটুকু আন্দাজ করতে পারি ঐ উপহারটা জনার্দন আগেই তোমাকে দিয়েছেন।'

আহারাদির পর বাসুসাহেব কী একখানা বই নিয়ে ইজিচেয়ারে লম্ববান হলেন। রানু জানলা বন্ধ করে ফ্যান খুলে দিবানিদ্রা দিতে গেলেন। সুজাতা কী কেনাকাটা করতে গেছে। কৌশিকের মনটা চঞ্চল ছিল। বিকাল চারটেয় ঝানু মল্লিক সল্টলেকে আসবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। এক ঘণ্টা মার্জিন দিয়ে পাঁচটা নাগাদ সে ফোন করতে উঠল। ঠিক তখনই বেজে উঠল টেলিফোন।

'হ্যালো? কে রুবি? আমি কৌশিকদা বলছি।'

'কৌশিকদা! কী বলব? এদিকে একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেছে। আমি যে কী করব বুঝতে পারছি না।'

'ঝানু মল্লিক এসেছিল? চারটের সময়?'

'না।'

'তাহলে বিশ্রী ব্যাপারটা কী হল?'

'টেলিফোনে বলাটা কি ঠিক হবে?' আমি... আমি... হঠাৎ একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়েছি আমার গাড়ির ভেতর।'

'জড়োয়া ব্রেসলেটের দ্বিতীয় পাটিটা?'

'না, কৌশিকদা, একটা ইয়ে... মানে, রিভলভার।'

'সে কী! কোথায় পেলে?'

'ঐ যে বললাম, আমার গাড়িতে। ড্রাইভারের সিটে। তোয়ালে জড়ানো।'

কৌশিক বললে, 'লাইনটা একটু ধরে থাক রুবি, আমি মামুকে ডেকে আনি।'

বাসু খবর পেয়ে এগিয়ে এলেন। কৌশিককে ইঙ্গিত করলেন, রিসেপশনের এক্সটেনশনে কথোপকথনটা শুনতে। তারপর টেলিফোনে রুবিকে বলেন, 'ইয়েস। বাসুমামু বলছি। বল, রুবি। ওটা গাড়ির ভিতর খুঁজে পেলে কী করে? গাড়িটা কোথায় ছিল?'

'গ্যারেজে নয়, ড্রাইভওয়েতে। আমার ড্রাইভার সিটের কাচটা ঠিকমতো বন্ধ হয় না। কেউ জোর করে চাপ দিয়ে নামিয়েছে।'

'লোডেড? কোনও ডিসচার্জড বুলেট কি আছে ওতে? গন্ধ শুঁকে কী মনে হল...'

'হ্যাঁ, শুঁকে দেখেছি। শুধু সিঙ্গার-মেশিন তেলের গন্ধ, পুরো লোডেড। ছটা চেম্বারে ছটা গুলি।'

'কী ধরনের রিভলভার?'

'তা জানি না। আকারে খুব ছোট। ওজনও খুব কম। নাকটা থ্যাবড়া। মনে হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম আর স্টিলের অ্যালয়...'

'বুঝেছি। কোল্ট কোবরা। তোমার ওখানে বাড়িতে কে আছে এখন?'

'রাজমিস্ত্রিরা ছাতে আছে, কেন?'

'ওদের বলে এস, তুমি বের হচ্ছ। রাত্রি বেশি হলে নাও ফিরতে পার। ওরা যেন সজাগ থাকে। দুএকজন নিচের বারান্দাতে শুয়ে থাকুক। তুমি ঐ যন্ত্রটা নিয়ে সোজা আমার বাড়িতে চলে এসে। রাত্রে এখানেই থাকবে। অত রাত্রে বাই-পাস দিয়ে তোমার একা ফেরা ঠিক নয়।'

'আমি তো সার্কুলার রোড দিয়ে শ্যামবাজার হয়েও ফিরে আসতে পারি?'

'কী দরকার? আকাশে মেঘ করেছে। না, রাত্রে তুমি এখানেই থাকবে।'

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে ঘড়িটা দেখলেন। সন্ধ্যা ছটা। বিকাল থেকেই আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। সূর্যাস্ত বোধহয় হয়নি। কিন্তু কালো মেঘের আস্তরণে অস্তগামী সূর্যটা ঢাকা পড়েছে। ঘনিয়ে এসেছে অন্ধকার।

কৌশিক টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে এগিয়ে এসে বসল ওঁর মুখোমুখি। বলল, 'নাকটা থ্যাবড়া। অ্যালুমিনিয়ম আর স্টিলের অ্যালয়! আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন, মামু। এটা কোল্ট কোবরা। কিন্তু কলকাতা বাজারে এটা দুষ্প্রাপ্য। আমি তো একটাও দেখিনি।'

বাসু বললেন, 'দেখনি। শুনেছ। জনার্দন নাকি একজোড়া কিনেছিল। একটা তার কাছে আছে। একটা চুরি গেছে। তাই নয়?'

কৌশিক বললে, 'প্রমীলা দেবী যদি সত্যি কথা বলে থাকেন তাহলে চোরাই মালটা আছে জীবনরতন ব্রহ্মচারীর কাছে।'

'হুঁ। কিন্তু জীবন ব্রহ্মচারীটি কে?'

'বাঃ! যার কাছে... ও, আপনি বলছেন... লোকটা আসলে কে? আমার আন্দাজের বাইরে। আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারছেন, মামু?'

'সম্ভবত। দুটো সূত্র থেকে। প্রথমত, রুবি রায়ের বাড়ির ঠিকানা আর সঠিক লোকেশন আমরা ছাড়া বাইরের একজনমাত্র লোকই জানে। দ্বিতীয়ত, প্রমীলা বলেছেন, জীবনলাল যে গ্যারান্টি কাগজটা দিয়ে গিয়েছিল তার মূল্য জীবনলালের কাছে অসীম। তোমার কাছেও তা অত্যন্ত মূল্যবান। তার একটা জেরক্স কপি তোমাকে উপহার দিয়ে ও সুকৌশলীর বিলটা কমাতে চায়।'

'বুঝলাম।'

'সম্ভবত। মোস্তাক আহমেদ চব্বিশ ঘণ্টার জন্য প্রমীলার কাছে জমা রেখে গেছিল তার আইনত বিবাহের যাবতীয় অরিজিনাল প্রমাণ। প্রমীলার কাছে সে কাগজের কোন মূল্য নেই, কিন্তু পুষ্পা আর জনার্দনের এনগেজমেন্ট অ্যানাউন্সড হলে ঐ কাগজটার মাধ্যমে মোস্তাক আহমেদ জনার্দনের কাছ থেকে বিশ-পঞ্চাশ হাজার আদায় করতে পারবে। চাই কি জনার্দনের ছবিতে পুষ্পার বিপরীতে হিরো সেজে লাখ টাকা কামাবে। টাকাটা পেলে তবেই সে তালাক দেবে। অথচ আহমেদ জানে, প্রমীলা ঐ ডকুমেন্টটা সযত্নে রক্ষা করবে, কারণ সে পুষ্পার প্রতিদ্বন্দ্বিনী। তার উপর প্রমীলা ঐ জেরক্স কপি দেখিয়ে গোয়ালিয়র রাজমাতার সন্দেহভঞ্জন করে ফি-টা পুরো কালেক্ট করতে পারবে।

'তার মানে, আপনি বলতে চান, রুবি রায়ের গাড়িতে ঐ ঝানু মল্লিক ওরফে আহমেদই রিভলভারটা ফেলে রেখে গেছে?'

'এ-ছাড়া বিকল্প কোন সমাধান কি তুমি দাখিল করতে পারছ?'

'কিন্তু ঝানু মল্লিক এ কাজ করবে কেন? রুবি তো বলল, রিভলভারে ছয়টাই তাজা বুলেট।'

'সেটা তার সিদ্ধান্ত। যন্ত্রটা হাতে পাই, তারপর দেখা যাবে। হয়তো ওটা ব্যবহারের পরে ভাল করে মুছে তৈলাক্ত করে আবার রিলোড করা হয়েছে।'

'তাহলে খুনটা হয়েছে কে?'

'সেটাই শুধু জানতে বাকি!'

।। চৌদ্দ ।।

রাত সাড়ে আটটা। বাসুসাহেব ক্রমাগত অশান্ত পদচারণা করে চলেছেন। সল্ট লেক থেকে নিউ আলিপুর আসতে আড়াই ঘণ্টা লাগতে পারে না। বিশেষত রবিবারে, যেদিন ট্রাফিক জ্যাম হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টি নেমেছে সাতটা নাগাদ। এখনো ঝিরঝির করে পড়ছে। সুজাতা কোথায় বুঝি বেরিয়েছিল, ছাতা নিয়ে যায়নি। কাকভেজা হয়ে ফিরে এসেছে। ইতিমধ্যে সল্ট লেকে বার দুই ফোন করা হয়েছে। প্রত্যাশিতভাবেই টেলিফোন একটানা বেজে গেছে, নো রিপ্লাই।

রানু বললেন, 'একটা ভুল হয়েছে তোমাদের। রুবিকে বলে দেওয়া উচিত ছিল, যেন ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে আসার চেষ্টা না করে। ঐ রাস্তাটা বর্তমানে আন্ডার কনস্ট্রাকশন। সন্ধ্যার পর একেবারে যানবিহীন হয়ে যায়।'

কৌশিক বলে, 'তাছাড়া দু-একটা বড়মাপের কালভার্টের কাজ শেষ হয়নি, ডাইভার্শন দিয়ে গাড়ি চালাতে হয়। এই বর্ষণে তা ভয়ানক পিছল হয়ে ওঠে। ও নিশ্চয় ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে আসছে না।'

বাসু বললেন, 'আমার কিন্তু আশঙ্কা, সেই বাইপাস দিয়েই ও আসছে। আর তাতেই কোনও অ্যাক্সিডেন্ট বাধিয়ে বসেছে। বুঝছ না? ওতো আসানসোলে মানুষ হয়েছে। কলকাতার পথঘাটের কোনটা কখন বর্জনীয় তা কি ও জানে?

কৌশিক বললেন, 'গাড়িটা বার করি, মামু? বাইপাস দিয়ে সল্ট লেকে সুনীলবাবুর বাড়ি পর্যন্ত যাই, আর সার্কুলার রোড দিয়ে ফিরে আসি।'

সার্কুলার রোড যে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুই বরেণ্য বিজ্ঞানীর নামে চিহ্নিত হয়েছে, এ কথা বাসুসাহেবের মনে পড়ল না এখন। বললেন, 'আর একটু দেখে যাও বরং...'

কথাটা তাঁর শেষ হল না। গেট দিয়ে ঢুকল রুবির অস্টিন গাড়িখানা। অক্ষত।

সকলেই এগিয়ে এলেন সামনের দিকে। বৃষ্টিটা থেমেছে।

'এত দেরি হল যে আসতে?'

দরজা খুলে রুবি নামল। মুখ তুলে ওঁদের দিকে তাকালো। তার মুখে হাসি— কিন্তু মুখটা রক্তশূন্য। মনে হল, ও বুঝি আসার পথে কোনও 'বার'-এ গাড়ি দাঁড় করিয়ে দু-তিন পেগ টেনে এসেছে। ওর দুটো পা-ই টলছে। সুজাতা এগিয়ে এসে ওর হাতটা ধরতে গেল। রুবি দুহাত বাড়িয়ে সুজাতার হাতখানা চেপে ধরল। বলল, 'একটু জল খাব, সুজাতাদি।'

'দিচ্ছি। আগে এসে এই চেয়ারে বস ঠিক করে।'

ধরে ধরে একটা বেতের চেয়ারে বসিয়ে দিল।

রানু বললেন, 'পথে কোনও বিপদে পড়েছিলে নাকি?'

রুবি মুখ তুলে বললে, 'মৃত্যুর মুখ থেকে সদ্য ফিরে এসেছি, মামিমা।'

বাসু কোনও কথা বললেন না। এগিয়ে এসে রুবির নাড়ির গতিটা দেখলেন। দ্বারের প্রান্তে কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়েছিল বিশে। তাকে বললেন, 'এক কাপ দুধ একটু গরম করে নিয়ে আয় তো।'

নিজে চলে গেলেন লাইব্রেরি ঘরের ছোট্ট সেলারে— ব্র্যান্ডির শিশিটা নিয়ে আসতে।

একটু সুস্থ হয়ে রুবি যে কাহিনী শোনাল তা রীতিমতো লোমহর্ষক। ঐ ভুলটাই করেছিল সে। ইস্টার্ন বাইপাসের অসমাপ্ত রাস্তা ধরা। দিনের বেলা শুকনো অবস্থায় সে ঐ পথে বার দুই যাতায়াত করেছে। আশঙ্কা করতে পারেনি, রাত্রে সেটা কী পরিমাণে জনশূন্য ও বিপজ্জনক। প্রায় মাঝামাঝি আসার পর ও দেখল, পিছন থেকে একটা গাড়ি ওকে ওভারটেক করতে চাইছে।

গাড়িটা বহুক্ষণ ধরেই ওর পিছন পিছন আসছিল। রুবি এর আগেও বার দুই হাত নেড়ে পশ্চাদগামী গাড়িটাকে ওভারটেক করতে ইঙ্গিত করেছে। নিজে গতি কমিয়ে বাঁদিকের প্রান্তে সরেও এসেছে। পীচের রাস্তা ছেড়ে কর্দমাক্ত 'বার্ম'-এ। কিন্তু ইতিপূর্বে দুবারই গাড়িটা ওর নির্দেশ মেনে ওভারটেক করেনি। এবার একেবারে নির্জন এলাকায় ওর হঠাৎ মনে হল, পিছনের গাড়িটা ওকে অতিক্রম করতে চাইছে না, কেন-কী বৃত্তান্ত বোঝা যায় না, কিন্তু গাড়িটা ওকে বাঁ-দিকের খাদে ঠেলে ফেলে দিতে চাইছে। রিয়ার-ভিয়ু আয়নাটা একটু সরিয়ে দেখল— গাড়িটা অ্যাম্বাসাডার, সম্ভবত ট্যাক্সি, একক চালকের মুখে ফেট্টিবাঁধা, চোখে গগল্‌স।

হঠাৎ রুবি অ্যাকসিলেটারে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে ঝড়ের বেগে এগিয়ে যেতে চাইল। কী আশ্চর্য। তৎক্ষণাৎ পিছনের গাড়িটাও গতিবৃদ্ধি করে ওর পাশাপাশি এসে ডানদিক থেকে ঠেসে ধরতে চাইল! আকারে-ওজনে ওর অস্টিনের চেয়ে অ্যাম্বাসাডারটা অনেক বড়। তাছাড়া পশ্চাদগামী গাড়িটা মাঝরাস্তায়, ও কর্দমাক্ত বাঁদিকের 'বার্ম'-এ। রুবি এখন ব্রেক কষে গাড়ি না থামালে বড় গাড়িটা ওকে বাঁদিকের খাদে ফেলে দেবে।

কিন্তু গাড়ি থামালেই লোকটা এসে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এ একেবারে নির্ঘাৎ। উদ্দেশ্য ডাকাতি, না লোকটা ম্যানিয়াক, কে জানে।

হঠাৎ বুদ্ধি খুলে গেল ওর।

ভেবেচিন্তে কিছু করেনি। প্রাণধারণের তাগিদে প্রায় প্রতিবর্তী প্রেরণায় সে তুলে নিল পাশের সীটে পড়ে থাকা রিভলভারটা। অস্টিনের এই মডেলটা রাইট-হ্যান্ড ড্রাইভ। ও বাঁ-হাতে স্টিয়ারিং ধরে পিস্তল-সমেত ডান-হাতটা বার করে দিল জানলা দিয়ে। পর-পর দুটো ফায়ার করল। এখন মনে হচ্ছে, প্রথমটা করেছিল রাস্তা বা ওর গতিপথের সমকোণে। দ্বিতীয়টায় হাতটা আরও পিছনদিকে ফিরিয়ে পশ্চাদগামী গাড়ির হেডলাইট লক্ষ্য করে। প্রথম গুলিটা কোথায় গেছে ও জানে না, কিন্তু ওর বিশ্বাস দ্বিতীয়টা পশ্চাদ্ধাবনকারীর গাড়ির সম্মুখভাগে বিদ্ধ হয়েছিল। কারণ রুবি একটা ধাতব শব্দ স্পষ্ট শুনেছিল।

মেয়েটি যে সশস্ত্র, প্রয়োজনে রিভলভার চালাবে, এটা বোধকরি ছিল পশ্চাদ্ধাবনকারীর দুঃস্বপ্নেরও অগোচর। সে এতো জোরে ব্রেক কষেছে যে রাস্তায় ওর টায়ার স্কিড করল— শব্দটা স্পষ্ট শুনতে পেল রুবি। আর তার সঙ্গে সঙ্গে পিছনগাড়ির হেডলাইট প্রচণ্ডভাবে উপর-নিচে আলোর সম্মার্জনী বুলাতে থাকে। দেড় থেকে দুমিনিট পরে আর ও গাড়িটাকে দেখা গেল না। রুবি সমান গতিবেগে ঠাণ্ডা মাথায় চলে আসে পার্ক সার্কাস অঞ্চলের জনবহুল রাস্তার উপর। এতক্ষণে ওর স্নায়ুতন্ত্রীতে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। পথে বৃষ্টিতে ছাতা মাথায় লোকজন চলেছে, ট্রাফিক পুলিশ রয়েছে, বাস-ট্রাম-গাড়ি সব কিছুই চলছে। ও কিন্তু রাস্তার একপাশে চুপ করে গাড়ি পার্ক করে বড় বড় নিঃশ্বাস নিয়েছে। বুকের ধড়ফড়ানিটা একেবারে থেমে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে। কতক্ষণ তা সে জানে না।

বাসু ওর হাত থেকে মারণাস্ত্রটা নিয়ে দেখলেন। হ্যাঁ, কোল্ট কোবরাই। চেম্বারটা খুলে দেখলেন, দুটো গুলি ছোঁড়া হয়েছে। ব্যারেলের সামনে তৃতীয়টি প্রতীক্ষারত। বাকি তিনটি বুলেট

পর-পর অপেক্ষা করছে। ছোট, অস্ত্রটা। অত্যন্ত মারাত্মক।

বাসু কৌশিকের দিকে ফিরে বললেন, 'পকেটে ডায়েরি বা নোটবই আছে? তাহলে নম্বরটা লিখে নাও : 17474 LW; এবার লোকাল থানায় একটা ফোন কর। ঘটনাটা রিপোর্ট করা দরকার।'

কৌশিক গেল ফোন করতে।

বাসু বললেন, 'একটা কথা তোমরা পরিষ্কার ভাবে বুঝে নাও। রুবি আমার নির্দেশ মোতাবেক রিভলভারটা সল্ট লেক থেকে নিয়ে আসছিল, ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে। আমার নির্দেশে রিভলভারটা আনছিল, যেহেতু ঐ রাস্তাটা সন্ধ্যার পর বিপজ্জনক। রিভলভারটা কার, কে লাইসেন্স হোল্ডার ইত্যাদি যাবতীয় প্রশ্নের জবাব দেব আমি। তোমরা কেউ নয়, বুঝলে?'

রুবি জানতে চায়, 'ওরা আমার জবানবন্দি নেবে?'

'চাইবে তো বটেই। আমি বলব, তুমি খুবই শকড্। তাই তোমার হয়ে সব কথাই আমি বলতে চাইব। পুলিশ অফিসার যদি এমন কোনও প্রশ্ন করে— তোমাকে, আমাকে নয়, এবং আমি যদি চাই তুমি জবাব দেবে না তাহলে আমি চোখ থেকে চশমাটা খুলে তার কাচটা মুছতে থাকব, আর তৎক্ষণাৎ তুমি অভিপূর্বক নী-ধাতু অ শুরু করে দেবে?'

রুবি বলে, 'কী শুরু করে দেব?'

'সেদিন কী শেখালাম? অভিপূর্বক নী-ধাতু অ, অভিনয়। অভিনব পদ্ধতিতে নিকটে নিয়ে আসা। কার নিকটে? দর্শকদের। কী নিয়ে আসা? যা বাস্তবে চোখের সামনে নেই তাকেই অভিনবরূপে উপস্থিত করা। তুমি প্রয়োজনে হিস্টেরিক হয়ে যাবে, আবোল-তাবোল বকতে শুরু করবে, বা ফেইন্ট হয়ে ধ্রাস করে পড়ে যাবে। পারবে না?'

'পারব।'

কৌশিক ফিরে এসে জানালো, থানা থেকে দুজন অফিসার আসছেন, পনের মিনিটের ভিতর।

বাসু বলেন, 'এবার একবার হোটেল হিন্দুস্থানে ফোন করে প্রনীলার কাছ থেকে জেনে নাও তো, পুষ্পা কি হোটেল তাজবেঙ্গলে আছে? থাকলে, তার ঘরের নম্বর কত?'

কৌশিক ফোন করে জেনে এল যে, পুষ্পার সঙ্গে জনার্দনের মান-অভিমানের পালা মিটেছে। পুষ্পা বর্তমানে জনার্দনের আলিপুর রোডের প্যালেসে অতিথি। কৌশিক বলে, 'আপনি এমন কেন আশঙ্কা করছেন মামু যে, রুবিকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবার অভিনয় করতে হবে?'

'হবেই— এমন কথা বলছি না, কিন্তু প্রয়োজন হতে পারে। পর-পর ভেবে দেখ। কোল্ট-কোবরা রিভলভারটা পাঁচ-ছয় ঘণ্টা আগে সম্ভবত ছিল মোস্তাক আহমেদের হেফাজতে। লোকটা ক্রিমিনাল টাইপ। তার তিন-চারটে ছদ্মনাম আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি। গহনাচুরির ব্যাপারে তার একটা বড় ভূমিকা থাকার সম্ভাবনা— না হলে ঐ কোল্ট কোবরা রিভলভারটা তার হাতে যেতে পারে না। লোকটা জানে, ঐ রিভলভারটার ব্ল্যাক-মার্কেট দাম পনের-বিশ হাজার টাকা।

সে কেন ওটা রুবির গাড়িতে বেমক্কা ফেলে রেখে যাবে? একটাই সম্ভাব্য উত্তর : নিশ্চিত সে ঐ রিভলভারে কাউকে খুন করেছে, আর এখন অপরাধটা রুবির ঘাড়ে চাপাতে চাইছে। খুনের জন্য একটা আসামীকে তো পুলিশের সামনে তুলে ধরতে হবে, না কি? যে মেয়েটা আট হাজার টাকা খেসারত চাইছে তাকে তুলে ধরাই সব চেয়ে ভাল। রুবি নিজেই স্বীকার করেছে যে, ঐ রিভলভারটা সে ফায়ার করেছে— বাইপাস রাস্তায়— কিন্তু একবার না দুবার তার প্রমাণ কী? আহমেদ যাকে হত্যা করেছে তার শব-ব্যবচ্ছেদ করে যদি প্রমাণিত হয় যে, গুলিটা, এই রিভলভার থেকে নিক্ষিপ্ত, তাহলে হত্যাপরাধ সুনির্দিষ্ট ভাবে রুবির ঘাড়ে এসে পড়ে। হয়তো আহমেদ রিভলভারটা ওর গাড়িতে ফেলে দিয়ে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছিল। সে আন্দাজ করেছিল, রুবি আমাকে ফোন করবে, আমি তাকে ঐ রিভলভারটা নিয়ে সোজা আমার বাড়িতে চলে আসতে বলব— এটাও সে সহজেই আন্দাজ করেছে। তার বাকি কাজ হল ভয় দেখিয়ে রিভলভার থেকে তাকে গুলি ছুঁড়তে বাধ্য করা। তাই নয়?'

রুবি বললে, 'মামু, আপনার চশমা-মোছার 'কিউ'-টার দরকার হবে না। আমি এখনই 'অভিপূর্বক নী-ধাতু awe'-এর অতি নিকটে পৌঁছে গেছি। বলেন তো এখনই ফেন্ট হয়ে ধ্রাস করে পড়ে যাই।'

বিশু এসে জানালো, একটা পুলিশের জিপ এসেছে।

।। পনেরো ।।

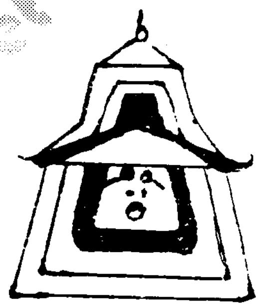

স্থানীয় পুলিশের তদন্ত আধঘণ্টার মধ্যেই শেষ হল। ও. সি. ঐ সময় থানায় ছিলেন। তিনি নিজেই এসেছিলেন। বললেন, সন্ধ্যার পর ইস্টার্ন বাইপাস রাস্তাটা বিপজ্জনক। রাস্তাটা এখনো তৈরি হচ্ছে। শেষ হয়নি। ইদানীং সন্ধ্যার পর কিছু বিপজ্জনক হয়ে পড়ে বটে। গাড়ির যাতায়াত কমে যায়। ঐ এলাকার কিছু সমাজবিরোধী দল বেঁধে কয়েকবার লুটতরাজও করেছে। এছাড়া একজন যৌন-রোগাক্রান্ত 'সেক্সুয়াল ম্যানিয়াক' গাড়িতে একা মহিলা যাত্রী দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু লোকটা ট্যাক্সিচালক নয়, ফলে রুবির পশ্চাদ্ধাবনকারী সে না হবার সম্ভাবনা। রুবি রিভলভারটা কোথায় পেল, কীভাবে পেল প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে বাসুসাহেব ঝাঁপিয়ে পড়লেন— 'ও রাস্তাটা সন্ধ্যার পর বিপজ্জনক হয়ে যায় শুনেছি, তাই আমিই ওকে বলেছিলাম, রিভলভারটা সঙ্গে নিয়ে আসতে।'

ও.সি. বলেন, 'সে তো উৎকৃষ্ট পরামর্শই দিয়েছিলেন— না, আমি জানতে চাইছি রিভলভারটা কার? লাইসেন্সটা কার নামে...?

বাধা দিয়ে বাসু বলেন, 'লুক হিয়ার, অফিসার। রুবি রায় আমার ক্লায়েন্ট। আমার নির্দেশে সে সশস্ত্র আসছিল, এ কথা আমি আগেই বলেছি। আপনি যতি তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে

আক্রমণকারীকে ছেড়ে আক্রান্ত ব্যক্তিকেই ফাঁদে ফেলায় উৎসাহী হয়ে পড়েন, তাহলে এই রিপোর্টটা বাতিল বলে ধরে নিন। আমার মক্কেলকে কেউ আক্রমণ করেনি। সে নিরাপদ ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। হল তো?'

ও. সি. বলেন, 'আপনি আমার কথাটা বুঝতে পারছেন না, স্যার।'

'না বোঝার কী আছে? আপনার পরবর্তী প্রশ্নটা তো এই : রিভালভারটার মালিক পি. কে. বাসু হতে পারেন, কিন্তু আপনার কি ক্যারিয়ার লাইসেন্স ছিল?'

ও. সি. নিজে থেকেই বলেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। রিভালভারের প্রসঙ্গ থাক। কিন্তু আপনি নিশ্চিত যে, আপনার ছোঁড়া গুলিতে পশ্চাদ্ধাবনকারী আহত হয়নি?'

এবারও বাসু আগ বাড়িয়ে বলেন, 'এ কথার জবাব ও কেন দেবে? কেমন করে দেবে? ও তো বলছে, লোকটাকে ভয় দেখাতে শূন্যে গুলি ছুঁড়েছিল। তার বেশি ও জানে না। আপনার সন্দেহ থাকে তাহলে ডি. সি. ট্রাফিককে ফোন করে বলুন ইস্টার্ন বাইপাসে তদন্ত করে দেখতে।'

'ঠিক আছে, স্যার, ঠিক আছে। তাই হবে। আমরা তাহলে উঠি।'

* * * * * * *

পুলিশের জীপটা চলে যাবার পর বাসু বললেন, 'কৌশিক, তুমি আলিপুরে জনার্দন গাইকোয়াড়ের প্যালেসে একটা ফোন কর তো। বড়লোকের ব্যাপার, হয় কোনও বাটলার অথবা হাউস-মেড ধরবে। তাকে বলবে, বোম্বাইয়ের ফিল্ম আর্টিস্ট পুষ্পাদেবীকে খুঁজছ। ন্যাচারালি ও-পক্ষ তোমার পরিচয় জানতে চাইবে। তখন বলবে, তুমি সুপারফাস্ট— ক্যুরিয়ার সার্ভিসের অফিস থেকে বলছ। তোমাদের একটা ঘোষিত রেকর্ড আছে : ভারতের চারটি প্রধান শহর— ঐ যে চারটি শহরের তাপমাত্রা প্রতিদিন টিভিতে দেখানো হয়, তার ভিতর চিঠি বিলি করতে ম্যাক্সিমাম ছত্রিশ ঘণ্টা লাগে। পুষ্পাদেবীর নামে একটা আর্জেন্ট চিঠি আছে : বোম্বাইয়ের এন. এফ. ডি. সি.-র চিঠি : কিন্তু হোটেল তাজবেঙ্গলে গিয়ে...

কৌশিক বাধা দিয়ে বলে, 'বাকিটা বুঝেছি। পুষ্পা লাইনে এলে কী বলতে হবে...?'

বাসুও বাধা দিয়ে বলেন, 'না, বোঝনি। পুষ্পা বাড়িতে না-ও থাকতে পারে। তোমাকে জেনে নিতে হবে আজ রাত বারোটার আগে পুষ্পাকে পার্সোনালি কোথায় কখন পাওয়া যাবে। বুঝলে?'

কৌশিক পাঁচ মিনিটের ভিতরেই এসে খবর দিল যে, পুষ্পা গায়কোয়াড় প্যালেসেই আছে। আজ রাত্রে আর বের হবে না। বস্তুত সে এন. এফ. ডি. সি.-র চিঠিখানার জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করছে।

বাসু বললেন, 'জানি। সেজন্যই N.F.D.C. বলেছি। সুফারফাস্ট ক্যুরিয়ারে N.F.D.C.-র চিঠি। ওর ডিনারের নিমন্ত্রণ থাকলেও ক্যানসেল করে আমাদের জন্য অপেক্ষা করত। তুমি গাড়িটা বার কর দিকিন।'

আগেই বলেছি, আলিপুর রোডে গাইকোয়াড় প্যালেস অনেকটা জমি নিয়ে। দুজনে মার্বেল-সোপান বেয়ে উঠে এসে সদর দরজায় কলিংবেল বাজালেন। দ্বার খুলে যে লোকটি অভিবাদন করল সে সম্ভবত গায়কোয়াড়ের বাটলার। অথচ কৌশিককে প্রথমবার যে আপ্যায়ন করে বসিয়েছিল সে লোকটা নয়।

বাসু মুখ খোলার আগেই লোকটি প্রশ্ন করল, 'সুপারফাস্ট ক্যুরিয়ার?'

বাসু একগাল হাসলেন। স্বীকার-অস্বীকার এড়িয়ে বললেন, 'মিস পুষ্পা আছেন?'

'শি ইজ এক্সপেক্টিং য়ু স্যার। আসুন, ওঁকে ডেকে দিচ্ছি।'

ডাকতে হল না। ডোর বেলের শব্দ পুষ্পাও নিশ্চয় শুনেছে। এন. এফ. ডি. সি. থেকে কী প্রস্তাব এসেছে জানতে সে নিশ্চয় খুবই আগ্রহী। পুষ্পা নিজে থেকেই এগিয়ে এল ওপাশের ঘর থেকে। তারপর বাসুসাহেবকে দেখে থমকে যায়। বলে, 'ও! আপনি। আমি ভেবেছিলাম...'

বাসু একটি বাও করে বললেন, 'নিতান্ত প্রয়োজনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করেই চলে আসতে বাধ্য হয়েছি, মিস পুষ্পা। তবে বেশিক্ষণ সময় আমি নেব না।'

'তাহলে এসে বসুন। ইনি?'

'আমার সহকারী, কৌশিক মিত্র।'

ওরা নমস্কার বিনিময় করল। তিনজনে বসলেন।

বাটলার নিষ্ক্রান্ত হল ঘর থেকে।

পুষ্পা বলে, 'এবার বলুন।'

বাসু বলেন, 'বেলুড়ের কাছে আপনাদের ডিকির ভিতরের স্যুটকেস থেকে যেসব জিনিস চুরি যায় তার ভিতর ঐ মিস্টার গায়কোয়াড়ের দেওয়া কোল্ট কোবরা রিভালভারটা যে ছিল না, তা আমি জানতে পেরেছিলাম মিসেস প্রমীলা পাণ্ডের কাছে। তিনি বলেছিলেন যে, যেহেতু রিভলভারটা লুকানো ছিল ঐ স্যুটকেসটার একটা ফলস্ বটমে তাই চোরের নজরে পড়েনি। কিন্তু তারপর? সেই রিভলভারটা কি বর্তমানে আপনার কাছে আছে? না কি আপনি সেটা মিস্টার গায়কোয়াড়কে ফেরত দিয়েছেন?'

পুষ্পা বেশ অবাক হয়ে গেল। একটু চিন্তা করে বলল, 'হঠাৎ একথা জানতে চাইছেন কেন?'

'আপনারই স্বার্থে, পুষ্পা দেবী। ঠিক ঐ রকম একটি কোল্ট কোবরায় আজ একটি লোক খুন হয়েছে। আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই, সেটা আপনার রিভলভারে নয়।'

এবার আর সময় নিল না। পুষ্পা বলল, 'না, আমার রিভালভারটা যথাস্থানে নিরাপদেই আছে। আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

'আপনি কাউন্ডলি একবার স্বচক্ষে দেখে এসে আমাকে নিশ্চিন্ত করবেন?'

'বাট হোয়াই? আপনিই বা এতটা উতলা হচ্ছেন কেন?'

বাসুসাহেব পকেট থেকে রুবির কাছ থেকে পাওয়া রিভলভারটা বার করে দেখালেন।

বললেন, 'আমি জানতে চাই, এই মার্ডার ওয়েপনটা আপনার সেই যন্ত্রটা নয়। প্লিজ গো অ্যান্ড চেক আপ।'

এবার পুষ্পা উঠে দাঁড়ালো। সে যে ঘাবড়ায়নি তরে প্রমাণ দিতে ধীরেসুস্থে চলে গেল পাশের ঘরে।

ফিরে এল এক মিনিটের মধ্যেই। বললে, 'না, স্যার, ওটা আমার নয়। আমারটা চুরি যায়নি। যথাস্থানেই আছে।'

বাসু বলেন, 'থ্যাঙ্কস। বুক থেকে একটা পাষাণভার নেমে গেল।'

ঠিক তখনই বাইরের দরজায় কে যেন কলিংবেল বাজালো।

যেন অন্তরীক্ষ থেকে আবির্ভূত হল বাটলার। খুলে দিল দরজা। এলেন গৃহস্বামী। কিন্তু দোরগোড়াতেই থমকে গেলেন বাসুসাহেবকে দেখে। কৌশিকের দিকেও দৃক্‌পাত করলেন; কিন্তু তাকে যে চিনতে পেরেছেন এমনভাব দেখালেন না। বাটলার তাঁর গা থেকে ভিজে ওভারকোটটা খুলে নিয়ে চলে গেল। বৃষ্টি এখনো পড়ছে। জনার্দন দু'পা এগিয়ে এসে বাসুসাহেবকে বললেন, 'শুভ সন্ধ্যা। সেদিন আপনি কী যেন একটা কথা বলেছিলেন : আহ। মনে পড়েছে : আনঅ্যাপয়েন্টেড ইনট্রুশন। তাই না?'

বাসু সহাস্যে বললেন, 'আমার মনে হল, ব্যাপারটা আপনি সেদিন ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি, তাই একটা প্র্যাকটিক্যাল ডিমন্সট্রেশন দিতে নিজেই চলে এলাম।'

জনার্দন কিছু বলার আগেই পুষ্পা বলে ওঠে, 'উনি আমারই স্বার্থে এসেছেন, জন। উনি জানতে এসেছেন যে, আমার রিভলভারটা আমার এক্তিয়ারে আছে কি না।'

'মানে? তোমার আবার রিভলভার আছে নাকি?'

পুষ্পাকে ইতস্তত করতে দেখে বাসু বললেন, 'ওঁরা দুই বান্ধবী এবার যখন গোয়ালিয়র থেকে কলকাতা আসেন, তখন আপনি যে কোল্ট কোবরাটা মিস পুষ্পাকে আত্মরক্ষার্থে দিয়েছিলেন উনি সেটার কথাই বলছেন। উনি এইমাত্র ওঘরে গিয়ে দেখে এলেন যে, সেটা যথাস্থানেই আছে।'

জনার্দন বাসুসাহেবকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে প্রশ্ন করে, 'আপনি এত কথা জানলেন কি করে?'

বাসু পকেট থেকে পুনরায় কোল্ট কোবরা রিভলভারটা বার করে বললেন, 'এই রিভলভারটার লাইসেন্সি কে জানতে ডি. সি. আর্মস অ্যাক্টের দপ্তরে যেতে হল। দেখলাম, আপনার রিভলবার : সি. সি. বিশ্বাসের দোকানে ডালহৌসি স্কোয়ারে লাস্ট ইয়ার কিনেছেন। কিন্তু একটা নয়, আপনি জোড়া কোল্ট কোবরা কিনেছিলেন। পরে শুনলাম, একটি আপনি নিজে রাখেন, একটি মিস পুষ্পার নামে লাইসেন্স করিয়ে নেন।'

জনার্দন উঠে গিয়ে ভিতর দিকের দরজায় ছিটকিনি দিয়ে ফিরে এসে বসল। বলল, 'এত লোক থাকতে মিস পুষ্পার নামে লাইসেন্স করিয়ে নিয়েছিলাম একথা আপনি কোথায় শুনলেন?'

'না, তা শুনিনি। আন্দাজ করছি। না হলে সেটা পুষ্পা দেবীর ড্রয়ারে থাকছে কী করে।'

জনার্দন পুষ্পার দিকে ফিরে জানতে চাইল, 'তোমার রিভলভারটা তোমার ড্রয়ারে আছে? আর য়ু শিওর, হানি?'

'কী আশ্চর্য! এইমাত্র তাই তো দেখে এলাম। দেখে এসে মিস্টার বাসুকে জানালাম।'

জনার্দন মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হয়ে গেল। মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে দশ সেকেন্ড কী ভেবে নিয়ে বলল, 'যন্ত্রটা দেখি, মিস্টার বাসু।'

বাসু পকেট থেকে যন্ত্রটা বার করে চেম্বারটা খুলে দেখালেন। বললেন, 'লুক, দুটো বুলেট ছোঁড়া হয়েছে। বাকি চারটে ইনট্যাক্ট। ফর য়োর ইনফরমেশন : ঘণ্টা-চারেক আগে এটা থেকে যে দুটো গুলি ছোড়া হয়েছে তার একটায় এক হতভাগ্য...'

জনার্দন যেন সাধারণ ভদ্রতার কথাও ভুলে গেল। ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে।

'দেখি, দেখি,' বলে যন্ত্রটা প্রায় কেড়ে নিল বাসুসাহেবের হাত থেকে। উঠে দাঁড়াল। সিলিংকে সম্বোধন করে বললে, 'তাহলে কি আমারটা চুরি গেছে? আই মাস্ট ভেরিফাই।'

কেউ কিছু বলার আগেই রিভলভারটা হাতে নিয়েই সে সদর দরজা খুলে ঝড়ের বেগে বাইরে বেরিয়ে গেল। অটোমেটিক ডোর-ক্লোজারে সদর আবার বন্ধ হয়ে গেল।

ওর এই অভদ্রোচিত ব্যবহারের ব্যাখ্যা হিসাবে পুষ্পা বলল, 'ও ভয়ানক ইমোশনাল। যেই মনে হয়েছে যে, এটা ওরটা হলেও হতে পারে... ও নিজেরটা গাড়ির গ্লাভ-কম্পার্টমেন্টে রাখে : যখন গাড়ি নিয়ে কোথাও যায়... দুটো গুলি ছোঁড়া হয়েছে বলছিলেন, না? কেউ কি মারা গেছে?

'আমার তাই আশঙ্কা। আজই বিকেল চারটে নাগাদ!'

'লোকটা কে?'

'তা এখনো জানা যায়নি।'

'আপনি সর্বদাই রহস্যময়।'

'সেটাই স্বাভাবিক। রহস্য নিয়েই আমার কারবার।'

ঠিক তখনই বাইরের দরজা খুলে হুড়মুড়িয়ে ফিরে এল জনার্দন, 'যা আশঙ্কা করেছিলাম। আমার গ্লাভ-কম্পার্টমেন্টটা ফাঁকা। অর্থাৎ কেউ চুরি করেছে। আমাকে এখনি থানায় একটা ফোন করতে হবে।'

'হ্যাঁ। ঐ সঙ্গে ও. সি. আর্মস অ্যাক্টকেও, লালবাজারে।'— করোলারি জুড়ে দিলেন বাসু।

জনার্দন হাত বাড়িয়ে টেলিফোনটা তুলতে তুলতে বলল, 'বাই-দ্য-ওয়ে... এটা আপনার এক্তিয়ারে এল কীভাবে?'

'খুনটা করার পর খুনী রিভলভারটা আমার এক ক্লায়েন্টের গাড়ির ভিতর ফেলে গেছে। আমি যখন দেখলাম, দু-দুটি গুলি ছোঁড়া হয়েছে তখনই তৎপর হলাম। খোঁজ নিয়ে জানলাম, আপনি নিজেই দুটি কোল্ট কোবরা কিনেছেন এবং একটি মিস পুষ্পাকে প্রেজেন্ট করেছেন। তাই

কালবিলম্ব না করে আপনাদের স্বার্থে আমাকে ছুটে আসতে হয়েছে। মিস্টার গায়কোয়াড়, আই নাউ বেগ টু অ্যাপলজাইজ ফর দ্য আনঅ্যাপয়েন্টেড ইন্ট্রুশন।'

গাইকোয়াড় টেলিফোন ছেড়ে ছুটে এসে দুহাত চেপে ধরল বাসুর।

বললে, 'প্লিজ এক্সকিউজ মি। আমি আন্তরিকভাবে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। আপনি আমাদের অশেষ উপকার করলেন।'

বাইরে বেরিয়ে এসে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসলেন বাসুসাহেব। এতক্ষণে পাইপ ধরালেন। গায়কোয়াড় প্যালেসে ঢোকার পর থেকে কৌশিক একটা কথাও বলেনি। গেটের বাইরে বেরিয়ে এসে বললে, 'মামু! এটা কী হল?'

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বাসু বললেন, 'কোনটা ভাগ্নে?'

'ওর গাড়ির গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে ওর নিজের রিভালভারটা চুরি গেছে কি না সমঝে নিতে ভদ্রলোক কী কাণ্ডটা করল। আপনার হাত থেকে আপনার রিভালভার ওভাবে ছিনিয়ে নিয়ে ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেল কেন? কী উদ্দেশ্য ছিল লোকটার?'

'একটাই সম্ভাব্য উত্তর। রিভালভারটা বদলে দিতে।'

'তার মানে আপনি জেনে বুঝে এভিডেন্স ট্যাম্পার্ড হতে দিলেন?

'কিসের এভিডেন্স ভাগ্নে?'

'খুনের। যে খুনের অপরাধে রাত-পোহালে রুবি রায় গ্রেপ্তার হতে চলেছে।'

বাসু বলেন, 'আমি তো জানি না কেউ খুন হয়েছে। আমি তো আইনত জানি না যে, জনার্দন রিভলভারটা বদলে দিয়েছে।'

'জানেন। আলবাৎ জানেন। আমি বাজি রাখতে পারি— আপনার পকেটে যে রিভলভারটা এখন আছে তার নম্বর হয় : 17473 অথবা 17475।'

বাসু একগাল হেসে বললেন, 'তোমার বুদ্ধি যে দিন দিন খুলছে ভাগ্নে! কী দারুণ ডিডাক্ট করলে!'

পরদিন সকালে প্রাতঃভ্রমণ সেরে এসে বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে বাসুসাহেব দেখেন, দোরগোড়ায় একটা পুলিশের জিপ। বারান্দায় বেতের চেয়ার পেতে কৌশিক আর সতীশ বর্মন কথা বলছে। সতীশ হোমিসাইডের ইন্সপেক্টর। বহুদিনের চেনা।

বাসু বারান্দায় উঠে এসে বললেন, 'আরে বর্মনসাহেব যে! এত সকালে কী মনে করে?'

'আপনি তো ভালই জানেন, স্যার। আপনার মক্কেলকে অ্যারেস্ট করতে। মিস্টার কৌশিক মিত্র ভিতরে খবর দিয়ে এসেছেন, তিনি তৈরি হচ্ছেন।'

বাসু বলেন, 'চার্জটা কী?'

'যেন আপনার অজানা। ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার।'

'মার্ডার? খুনটা হল কে? কখন?'

'যেন আপনার মক্কেল আপনাকে বলেনি? কাল সন্ধ্যায় যে লোকটা আপনারই মক্কেলের এফ. আই. আর. মোতাবেক : চার বছর আগে ওর ছয় হাজার টাকা নিয়ে বোম্বাই ভেগে গেছিল : জীবন মল্লিক-ওরফে-ঝানু মল্লিক-ওরফে মোস্তাক আহমেদ।'

বাসুসাহেবের মুখে ভাবের কোনও পরিবর্তন হল না। কিন্তু কৌশিক বুঝতে পারে তিনি কী পরিমাণ বিস্মিত হয়েছেন। কারণ সে নিজেই তা হয়েছে।

ওঁদের জ্ঞানমতে কোল্ট-কোবরা রিভলভারটা বেলা একটার সময়েও ছিল জীবন ব্রহ্মচারীর কাছে যে জীবনরতন প্রমীলাকে সিকিউরিটি হিসাবে জমা দিয়ে গেছিল পুষ্পা আর আহমেদের শরিয়তী সাদির অরিজিনাল ডকুমেন্ট। যার জেরক্স কপি ইতিপূর্বেই পেয়েছে কৌশিক। এতক্ষণ বাসুসাহেব আর কৌশিক এই থিয়োরি অনুসারেই অগ্রসর হচ্ছিলেন যে, খুনটা করেছে আহমেদ এবং রুবিকে আট হাজার টাকা থেকে বঞ্চিত করতে তার ঘাড়েই অপরাধটা চাপাতে চাইছে। সতীশ বর্মনের স্টেটমেন্ট মোতাবেক সেই গোটা থিয়োরিটাই ধ্বসে গেল।

কৌশিক মনে মনে ভাবছে : একথা আগে জানলে বাসুসাহেব কিছুতেই জনার্দন গায়কোয়াড়কে ঐ দুর্লভ সুযোগটা দিতেন না— রিভলভারটা বদলে ফেলার।

একটু পরে ভিতর থেকে বেরিয়ে এল রুবি। নির্বিকার। বাসুসাহেবের দিকে ফিরে বললে, 'হাজতবাসের অভিজ্ঞতা আমার আছে, মামু। ব্যস্ত হবেন না। বাড়ির চাবিটা মামিমাকে দিয়ে এসেছি। আর কৌশিকদা, আপনার একটা কাজ আছে। মল্লিকাদিরা উঠেছে দীঘার ব্লু ভিয়ু হোটেলে। ওখানে একটা ট্রাঙ্ক কল করে জানিয়ে দেবেন আমি পুনর্মূষিক হয়েছি।'

নিচু হয়ে বাসুসাহেবকে প্রণাম করে বলল, 'চলি মামু?'

তারপর ইন্সপেক্টর বর্মনের দিকে ফিরে বললে, 'আমি তৈরি। চলুন।'

বর্মন তাকে বললে, 'বসুন।'

তারপর বাসুসাহেবের দিকে ফিরে বললে, 'মিস রায় যে রিভলভারটা কাল রাত্রে আপনাকে হ্যান্ডওভার করেছিলেন সেটা কোথায়?'

'আমার পকেটে। কেন?' —জানতে চাইলেন বাসু।

'ওটা মার্ডারি-ওয়েপন জেনেও কেন আপনি সেটা থানার ও. সি.কে হ্যান্ডওভার করেননি?'

বাসু বিরক্তভাবে বলেন, 'কী পাগলের মতো বকছ, বর্মন? রাত আটটায় না ও. সি. না আমি কেউই তো জানতাম না যে, একটা লোক খুন হয়েছে। অথবা ওটা মার্ডার ওয়েপন হলেও হতে পারে।'

'কিন্তু ওটা আপনার নয়, ওর লাইসেন্স আপনার নামে নয় : তাহলে ওটা আপনার হেপাজতে সারারাত রইল কী করে?'

'দেখ বর্মন, রিভলভারটা আমার এক্তিয়ারে আসামাত্র আমি লোকাল থানায় জানিয়েছি। ও.সি. স্বয়ং এনকোয়ারি করে গেছেন। রিভলভারটা স্বচক্ষে দেখেছেন। তিনি একবারও বলেননি

যে, ওটা তিনি নিজের হেপাজতে রাখতে চান। ফলে ওটা আমার কাছে আছে। এতে হয়েছেটা কী?'

'আপনি এমনভাবে কথাবার্তা বলেছিলেন যাতে থানা অফিসার ধরে নিয়েছিল ওটা আপনারই নামে লাইসেন্স নেওয়া।'

'সে কী ধারণা করেছিল তা আমি কেমন করে জানব? আমি সে কথা বলিনি। আমাকে সে ও প্রশ্ন জিজ্ঞেসই করেনি।'

'সে জিজ্ঞেস করুক না করুক আপনি তো জানতেন ওটা এভিডেন্স...'

'এভিডেন্স! কীসের এভিডেন্স?'

'মার্ডারের।'

'আবার তুমি পাগলের মতো কথা বলছ, বর্মন। মার্ডার যে একটা হয়েছে তা তোমার কাছে আমি জেনেছি আজ সকালে, এইমাত্র। কাল তা আমি জানতামই না।'

'ডেফিনিটলি জানুন, না জানুন, আন্দাজ ঠিকই করেছিলেন। আপনার উচিত ছিল, রিভালভারটা থানা-অফিসারের কাছে সারেন্ডার করা। বিশেষ করে আপনি যখন ওটার লাইসেন্স হোল্ডার নন।'

'তুমি প্লিজ আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিও না। আমার কী করা উচিত না উচিত তা তোমার কাছে শুনতে চাই না। ক্লায়েন্টের কাছ থেকে রিভলভারটা আমার হস্তগত হওয়ামাত্র আমি থানায় ফোন করে জানিয়েছি। কোন পুলিশ অফিসার সেটা আমার কাছে চায়নি, তাই ওটা আমার কাছে সেফ-কাস্টডিতে রেখেছি।'

'তা আপনি পারেন না। আনলাইসেন্সড রিভলভার নিজ দায়িত্বে রাখতে। এটা আইনত অপরাধ।'

'তুমি তাই মনে কর? তাহলে এখানে আর সময় শান্তি নষ্ট না করে আদালতে গিয়ে আমার নামে মামলা দায়ের কর। সেখানে তার জবাব দেব।'

'তার দরকার নেই। এই তো এখন আমি জানাচ্ছি যে, কাল সন্ধ্যায় মোস্তাক আহমেদ এই রিভলভারের গুলিতে হত হয়েছে বলে পুলিশ আশঙ্কা করে। ওটা একটা মেজর এভিডেন্স! আপনি কি ওটা আমাকে হস্তান্তর করবেন?'

'নিশ্চয়ই। যদি তুমি আমাকে একটা রসিদ দাও। রিভলভারের নম্বর এই দেখ : 17475 LW, দুটো ডিসচার্জড বুলেট আছে এতে। আর চারটে লাইভ ইনট্যাক্ট। ও. কে.?'

'থ্যাঙ্ক য়ু, স্যার।'

।। ষোলো ।।

চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বিনয় বসাকের আদালতে সেদিন দর্শক সমাগম অপ্রত্যাশিত। সচরাচর আদালতে এত লোক সমাগম হয় না। এক্ষেত্রে হয়েছে একটি বিশেষ হেতুতে।

সংবাদপত্রে ঐ হত্যামামলা নিয়ে দুজাতের 'রিপোর্টাজ' হয়েছে। একজন সাংবাদিকের মতে জনশ্রুতি এই যে— আসামী ছিল মৃত ব্যক্তির 'পহেলি পেয়ার'। তখন লোকটার নাম ছিল ঝানু মল্লিক। আসামীর সর্বস্ব অপহরণ করে ঝানু আত্মগোপন করে। দীর্ঘদিন পরে বঞ্চিতা মেয়েটি এভাবে প্রতিশোধ নিতে সমর্থ হয়েছে। অপর সাংবাদিকের মতে, অপরাধের মূল হেতু আরও গভীর। মৃতব্যক্তি জনৈকা বিখ্যাত বোম্বাইমার্কা চিত্রতারকার প্রথমপক্ষের স্বামী। চিত্রতারকা এখন এক ধনকুবেরকে বিবাহ করতে চলেছেন— তাই প্রফেশনাল খুনীকে দিয়ে পথের কাঁটা সরানো হয়েছে মাত্র। নামোল্লেখ না করেও সাংবাদিক চাতুর্যের সঙ্গে বোম্বাইমার্কা চিত্রতারকাকে চিহ্নিত করেছেন।

এই কারণেই আদালতে এত লোকসমাগম।

এটাই দিনের প্রথম মামলা। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর সম্মুখে রাখা ফাইলটি দেখে পড়লেন : স্টেট ভার্সেস মিস রুবি রায়। বাদীপক্ষে আছেন পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট নিরঞ্জন মাইতি এবং তাঁর সহকারী অ্যাডভোকেট অতুল দাশ, আর প্রতিবাদীর পক্ষে পি. কে. বাসু বার-অ্যাট-ল এবং তাঁর জুনিয়র, অ্যাডভোকেট প্রসেনজিৎ দত্তগুপ্ত।

নিরঞ্জন মাইতি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'রেডি ফর দ্য প্রসিকিউশন।'

বাসুও সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'রেডি ফর দ্য ডিফেন্স।'

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, 'বাদীপক্ষ তাঁর প্রথম সাক্ষীকে ডাকতে পারেন।'

মাইতি পুনরায় গাত্রোত্থান করে বললেন : 'ইফ দ্য কোর্ট প্লিজ, প্রথম সাক্ষীকে আহ্বানের আগে আমি একটি প্রারম্ভিক ভাষণ দিতে চাই। কেসটি জটিল : অপরাধ যে সংঘটিত হয়েছে এটা হয়তো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না; কিন্তু আসামীকে কেন সেই অপরাধের সঙ্গে জড়িত করা হচ্ছে সেই যুক্তির চুম্বকসার আগেভাগে দাখিল করলে মামলাটা সহজবোধ্য হবে, য়োর অনার।'

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, 'প্রাথমিক শুনানীতে এ জাতের প্রারম্ভিক ভাষণের রেওয়াজ নেই। যা হোক, আপনি একটি অতিসংক্ষিপ্ত ভাষণ দিতে পারেন।'

'থ্যাঙ্কস, য়োর অনার। বাদীপক্ষ আশা রাখেন যে, প্রমাণ করবেন, মৃত মোস্তাক আহমেদকে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে মাত্র এক বিঘত দূরত্ব থেকে। মোস্তাক নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের লোক ছিল এ দাবি কেউই করছে না, কিন্তু তাই বলে এভাবে মর্মান্তিক মৃত্যুও তার পাওনা নয়। আমরা আশা রাখি প্রমাণ করব, পূর্বপ্রতিশ্রুতি মতো মোস্তাক আসামীর সল্ট লেকের বাসায় আসে। রবিবার, একত্রিশে মে, বিকাল চারটায়। সে এসেছিল আসামীর পাওনা মতো আট

হাজার টাকা তাকে মিটিয়ে দিতে। ঘটনাচক্রে আসামী বাড়িতে সম্পূর্ণ একা ছিল এবং তার একটা অস্টিন গাড়ি আছে। আহমেদ যখন ব্যাগ খুলে আসামীকে তার পাওনা আট হাজার টাকা গুনে দেয়, তখন আসামী দেখতে পায় ব্যাগে আরও দশ-বারো হাজার টাকা আছে। তখনি সে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। কী উদ্দেশ্যে জানা যায় না, ঠিক কোথায় যাচ্ছিল তাও না, কিন্তু আমরা আশা রাখি প্রমাণ করব, ওরা দুজন ইস্টার্ন বাইপাস ধরে দক্ষিণ দিকে আসতে থাকে। ওরা আসছিল আহমেদের মারুতি সুজুকি গাড়িতে। তখন বৃষ্টি পড়ছিল, রাস্তায় যানবাহন ছিল না। একটি বড় কালভার্টের কাছে আহমেদ গাড়ি থামাতে বাধ্য হয়, ডাইভারশনের রাস্তাটা ঠিকমতো চিনে নিতে। ঠিক তখনই আসামী রুবি রায় তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে বার করে একটি চোরাই কোল্ট-কোবরা রিভলভার। মাত্র এক বিঘৎ দূরত্ব থেকে আহমেদকে গুলি করে হত্যা করে। ওর ব্যাগ থেকে বাকি টাকা বার করে গাড়িটাকে কালভার্টের খাদের দিকে ঠেলে দেয়। ডাইভারশন-রোডের বিপরীত দিকে থাকায় তা নজরের বাইরে পড়ে থাকে। এরপর সল্ট লেকের দিকে আসা কোনও গাড়িতে চেপে— কিছুটা হেঁটে, কিছুটা হিচ-হাইক করে সে সল্ট লেকে ফিরে আসে। টাকাটা লুকিয়ে ফেলতে। তখন আন্দাজ সাড়ে পাঁচটা। আসামী এইসময় সহযোগী বিবাদীপক্ষের অ্যাটর্নি পি. কে. বাসুকে একটি টেলিফোন করে। জানায় যে, সে একটা রিভলভার কুড়িয়ে পেয়েছে। বাসুসাহেব তাকে তৎক্ষণাৎ নিউ আলিপুরে চলে আসতে বলেন, ঐ তথাকথিত কুড়িয়ে পাওয়া রিভলভারটি সহ। আসামী মিস রায় সে আদেশ যথারীতি পালন করে। কিন্তু টাকাটা গোপন করতে তার যথেষ্ট সময় লেগে যায়। সে নির্ভয়ে তার অস্টিন গাড়িতে ঐ জনমানবহীন ইস্টার্ন বাইপাস ধরেই যায়। কারণ তার হেপাজতে ছিল একটা লোডেড রিভলভার। কোনও নির্জন স্থানে সে দ্বিতীয় একটি গুলি ছোড়ে এবং টেলিফোন করার দু-তিন ঘণ্টা পরে নিউ আলিপুরে এসে পৌঁছায়। আমাদের অনুরোধ, মাননীয় বিচারপতি এই জঘন্য অপরাধের জন্য আসামীকে কঠিনতম শাস্তি প্রদান করবেন। দ্যাটস অল, য়োর অনার।'

ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব প্রতিবাদীপক্ষকে প্রশ্ন করেন, 'আপনারা কোনও প্রারম্ভিক ভাষণ দিতে চান?'

বাসু বললেন, 'নো। থ্যাঙ্ক য়ু, য়োর অনার। বাদীপক্ষ তাঁদের প্রথম সাক্ষীকে ডাকতে পারেন।'

প্রসিকিউশনের তরফে প্রথম সাক্ষী সার্জেন ডক্টর অতুলকৃষ্ণ সান্যাল। তিনি তাঁর সাক্ষ্যে জানালেন যে, মোস্তাক আহমেদের মৃত্যু হয়েছে রবিবার, একত্রিশে মে, বিকাল তিনটা থেকে সন্ধ্যা ছটার মধ্যে। মৃত্যুর হেতু একটি পয়েন্ট থ্রি এইট বুলেট। যা তার মাথার অকসিপিটাল অস্থির বাম অংশ দিয়ে করোটিতে প্রবেশ করে এবং পেরিটাল অস্থির ডানদিকে গিয়ে আঘাত করে। ডাক্তার সান্যাল একটি মনুষ্য-করোটির বড় ছবি টাঙিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। অনুমান করা শক্ত হয় না যে, মৃত ব্যক্তির অগোচরে কেউ রিভলভারটা তার মাথার পিছন দিকে এনে গুলি করে। হত্যাকারী ড্রাইভারের বাঁদিকে বসেছিল এবং সে ডান-হাতে রিভলভারটা চালকের মাথার পিছনে নিয়ে এসে ট্রিগার টেনে দেয়। যে গাড়িতে মৃতদেহ পাওয়া গেছে তা রাইট হ্যান্ড ড্রাইভ বলেই সাক্ষী এই জাতীয় অনুমান করেছেন। মৃত্যু তৎক্ষণাৎ হয়েছিল।

রিভলভারটি, সাক্ষীর মতে, মৃত ব্যক্তির মাথার মাত্র ছয় ইঞ্চি দূরে ছিল। প্রবেশ পথে পোড়া বারুদের চিহ্ন থেকে কেমিক্যাল পরীক্ষায় বিশেষজ্ঞ হিসাবে ব্যালিসটিক এক্সপার্টের সঙ্গে যৌথভাবে এই তাঁর সিদ্ধান্ত।

মাইতির প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী আরও জানালেন যে, 'ফেটাল বুলেট', অর্থাৎ সীসার গোলকটি তিনি মৃতের খুলিতে পেয়েছেন। সেটা বার করে ব্যালিসটিক এক্টপার্টকে দিয়েছেন।'

প্রত্যাশিতভাবে এরপর ব্যালিসটিক এক্সপার্টের সাক্ষ্য দেবার কথা। কিন্তু মাইতি তাঁকে না ডেকে বিভিন্ন সাক্ষীর মাধ্যমে তাঁর থিয়োরি প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন। ও. সি. সে রাত্রের অভিজ্ঞতা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। তিনি স্বীকার করলেন বাসুসাহেবের সঙ্গে কথোপকথনের সময় তাঁর ভ্রান্ত ধারণা হয়েছিল যে, অস্ত্রটা বাসুসাহেবের। তাই তার নম্বরটা টুকে রাখেননি। আরও বললেন, থানায় ফিরে গিয়ে তিনি ডি. সি. ট্রাফিকের অফিসে ফোন করে ঘটনাটা জানিয়ে দেন। ট্রাফিকের এক ইন্সপেক্টর জানালেন রাত দশটায় তিনি মারুতি গাড়ি এবং মৃতদেহটি আবিষ্কার করেন। তৎক্ষণাৎ তিনি হোমিসাইডকে সংবাদ দেন। হোমিসাইডের ইন্সপেক্টর সতীশ বর্মন মৃতদেহ দেখতে আসেন। ফোটো তোলা, মৃতদেহ এবং ভাঙা গাড়ি অপসারণ করতে করতে রাত ভোর হয়ে আসে।

কৌশিক লক্ষ্য করে দেখে এদের কাউকেই বাসুসাহেব জেরা করলেন না। প্রসেনজিৎকে বললেন জেরা করতে। কারণটাও বুঝতে পারে। বাসুসাহেবের আস্তিনের তলায় লুকানো আছে রঙের টেক্কাখানা : ব্যালিসটিক এক্সপার্টের সাক্ষ্য। তাকে জেরা করে উনি প্রমাণ করবেন যে, মৃতদেহের ভিতর যে সীসার গোলকটি পাওয়া গেছে তা 17475 L.W. পিস্তল থেকে নিক্ষিপ্ত নয়।

ফলে রুবি নির্দোষ।

মাইতির পরবর্তী সাক্ষী জনার্দন গায়কোয়াড়। মাইতি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাঁর পরিচয় প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপর পিপলস এক্সিবিট নং A অর্থাৎ 17475 L.W. নম্বরের কোল্ট-রিভলভারটি দেখিয়ে জানতে চাইলেন সেটির লাইসেন্স হোল্ডার তিনি কিনা। জনার্দন স্বীকার করলেন। জানালেন যে তাঁর গাড়ির সামনের দিকে গ্লাভ-কম্পার্টমেন্ট থেকে সেটা চুরি হয়ে যায়। ঠিক কবে তা বলতে পারছেন না। তবে মে মাসের সাতাশ তারিখের আগে নয়। প্রতিবাদী পক্ষের অ্যাটর্নি যখন তাঁর বাড়িতে গিয়ে ওই রিভলভারটি দেখান, তখন তাঁর সন্দেহ হয় যে, তাঁর গাড়ির ড্যাশ-বোর্ড থেকে তাঁর রিভলভারটি হয়তো চুরি গেছে। তিনি বাড়ির বাইরে এসে নিজের গাড়ির ড্যাশ বোর্ডে খুঁজে দেখেন। অবহিত হন যে, তাঁর রিভলভারটি চুরি গেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ থানায় সে খবর জানান।

মাইতি বাসুসাহবের দিকে ফিরে বললেন, 'য়োর উইটনেস।'

অর্থাৎ 'জেরা করুন।'

বাসু এবারও প্রসেনজিৎকে ইঙ্গিত করলেন।

প্রসেনজিতের জেরায় গায়কোয়াড় স্বীকার করলেন যে, তিনি পূর্ববৎসর এক জোড়া কোল্ট-কোবরা রিভলভার কিনেছিলেন। একটি থাকত তাঁর শয়নকক্ষে, একটি গাড়ির ওই গ্লাভস কম্পার্টমেন্টে; অপর রিভলভারটির নম্বর 17474 L.W.-। সেটা তাঁর বাড়িতেই আছে।

প্রসেনজিৎ বাসুসাহেবের কাছে থেকে ঘটনার পরম্পরা ইতিপূর্বেই শুনেছে। সে প্রশ্ন করে 'আপনি ডাইরেক্ট এভিডেন্সে বললেন যে, মিস্টার বাসু যখন আপনাকে ওই 17475 L.W. নম্বর রিভলভারটা দেখালেন তখনই আপনার সন্দেহ জাগল যে, আপনার গাড়ি থেকে অপর রিভলভারটা চুরি গেছে। তাই আপনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন গাড়িতে খুঁজে দেখতে। তাই নয়?'

'হ্যাঁ। তাই বলেছি আমি।'

'কিন্তু যাবার সময় আপনি মিস্টার বাসুর হাত থেকে রিভলভারটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তাই নয়?'

'ছিনিয়ে নিইনি। তবে হ্যাঁ, ওটা ওঁর হাত থেকে তুলে নিয়ে গেছিলাম।'

'কেন? আপনার গাড়ির ড্যাশবোর্ড থেকে অন্য একটি রিভলভার চুরি গেছে কি না দেখবার জন্য বাসুসাহেবের হাতের রিভলভারটা ওভাবে নিয়ে গেলেন কেন?'

মাইতি আপত্তি জানান; 'অবজেকশন, য়োর অনার। আর্গুমেন্টেটিভ।'

বিচারক রুলিং দেবার আগে প্রসেনজিৎকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি কেন ও প্রশ্নটা করছেন তা একটু বুঝিয়ে বলবেন?'

'ও, সার্টেনলি, যোর অনার! বাদীপক্ষ যে কোন কারণেই হোক ব্যালিসটিক এক্সপার্টকে সাক্ষী দিতে ডাকছেন না। আদালত জানেন যে, মিস্টার গায়কোয়াড়ের একজোড়া কোল্ট-কোবরা ছিল, তার একটি চুরি যায়। অথচ আদালত জানেন না, পিপলস্ একজিবিট নম্বর A অর্থাৎ ওই 17475 L.W. রিভলভারটি মার্ডার ওয়েপন কি না। আমরা জানি যে, ওই রিভলভারটা মিস্টার বাসুর জিম্বায় পুরো বারো ঘণ্টা ছিল— শুধু ওই দু-তিন মিনিট সেটা ছিল অন্যের দৃষ্টির আড়ালে বর্তমান সাক্ষীর একান্তে। প্রশ্নটা আদৌ 'আর্গুমেন্টেটিভ' নয়, য়োর অনার, আমরা সাক্ষীকে নিজ স্বীকৃতিমতে তাঁর একটি আচরণের ব্যাখ্যা দিতে বলেছি মাত্র।'

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, 'দ্য অবজেকশন ইজ ওভাররুলড। প্লিজ আনসার দ্যাট কোশ্চেন।'

জনার্দন বলেন, 'সে সময়ে আমি উত্তেজিত ছিলাম। হ্যাঁ, স্বীকার করছি, আমার গাড়ি থেকে রিভলভারটি চুরি গেছে কি না জানবার জন্য এটা হাতে করে নিয়ে যাওয়ার কোন যুক্তি ছিল না।'

প্রসেনজিৎ একটা বাও করে বললে, 'এ ক্ষেত্রে আমরা আবেদন রাখছি, আদালতের নির্দেশে মিস্টার গায়কোয়াড়ের অপর রিভলভারটি সংগ্রহ করা হোক এবং প্রতিবাদীপক্ষের একজিবিট হিসাবে চিহ্নিত হোক।'

এবারও আপত্তি জানালেন মাইতি।

বিচারক বললেন, 'বাদীপক্ষ কীভাবে তাঁদের কেস সাজাবেন, অর্থাৎ পরপর তাঁদের সাক্ষীদের আহ্বান করবেন সে বিষয়ে আদালতের কোনও বক্তব্য নেই, কিন্তু এই পর্যায়ে আমি

মিস্টার পি পি-র কাছে জানতে চাইছি যে, তাঁর সাক্ষীর তালিকায় কি সেই ব্যালিসটিক এক্সপার্টটি আছেন, যাঁর হাতে ডাক্তার সান্যাল ফেটাল বুলেটটা হস্তান্তরিত করেন?'

মাইতি উঠে দাঁড়ান, 'ইয়েস, য়োর অনার। তিনিই আমার পরবর্তী সাক্ষী।'

'সে ক্ষেত্রে বর্তমান সাক্ষীকে সাময়িকভাবে অপসারিত করে আদালত ওই ব্যালিসটিক এক্সপার্টকে দু-একটি প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক।'

তাই ব্যবস্থা করা হল। ব্যালিসটিক এক্সপার্টের নাম ইন্সপেক্টর জিতেন বসাক। বিচারকের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানালেন যে, অটপ্সি সার্জেন তাঁকে যে ফেটাল বুলেটটি দিয়েছেন তার সাহায্যে কোনক্রমেই বলা যাবে না যে, সেটি কোন রিভলভার থেকে নিক্ষিপ্ত। খুলির ভিতর দিক থেকে সীসার গোলকটি করোটি ভেদ করতে পারেনি; কিন্তু মসৃণ হয়ে গেছে এবং তার আকৃতি বদলে গেছে। কম্পারেটিভ মাইক্রোস্কোপে তার গায়ে পিস্তল-ব্যারেলের কোন দাগই এখন দেখা যাচ্ছে না। শুধু এটুকুই বলা যায় যে, সেটি 38 ক্যালিবারের রিভলভার থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

কৌশিক একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখল বাসুসাহেবের দিকে। দেখে বোঝা গেল না যে, তাঁর আস্তিনের তলা থেকে রঙের টেক্কাখানা কখন বেমালুম খোয়া গেছে। এবং তাতে তিনি কতটা বিচলিত।

বিচারক প্রসেনজিতের আবেদন নাকচ করে দিলেন।

পরবর্তী সাক্ষী : সহদেব কর্মকার।

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মাইতি তার নাম, ধাম, বয়স ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করলেন। সহদেব স্বীকার করল যে, সে দীর্ঘদিন ধরে মোস্তাক আহমেদকে চিনত। আহমেদ যখন বোম্বাইয়ে থাকত, প্রথমে পুষ্পাদেবীর কম্বাইন্ড-হ্যান্ড হিসাবে, পরে মিসেস প্রমীলা পাণ্ডের ড্রাইভার হিসাবে। সহদেব নিজেও তখন বোম্বাইয়ে থাকত। একজন ফিল্ম আর্টিস্টের গাড়ি চালাত। পুষ্পাদেবীর বাড়িতে প্রায়ই তাকে আসতে হত। এই সূত্রে মোস্তাকের সঙ্গে পরিচয়। পরে সে কলকাতায় চলে আসে। আহমেদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব কোনদিনই ক্ষুণ্ণ হয়নি। ঘটনার দিন সকালে আহমেদ ওকে জানিয়েছিল তাকে বিকালে চারটে নাগাদ সল্ট লেকে যেতে হবে। এক পাওনাদারকে কিছু টাকা মেটাতে। সহদেবকে সে অনুরোধ করেছিল তার গাড়িতে নিয়ে যেতে... কে পাওনাদার, কত টাকা তা সহদেব জানে না।

মাইতি প্রশ্ন করেন, 'তোমার গাড়ি মানে? কী গাড়ি?'

'না হুজুর। আমার আবার গাড়ি কোথায়? আমি মেকানিক। এখন ট্যাক্সি চালাই। লেকটাউনের এক সর্দারজীর ট্যাক্সি।'

মাইতি জানতে চান, 'মোস্তাক আহমেদ কি তোমার ট্যাক্সি নিয়ে সল্ট লেকে যায়?'

—আজ্ঞে না হুজুর। আমি শ্রীরামপুরের এক পার্টি পেয়ে ট্যাক্সি নিয়ে দুপুরের দিকে কলকাতার বাইরে চলে যাই। ফিরে আসি, রাত দশটা নাগাদ। যতদূর জানি, আহমেদ টেকনিশিয়ান স্টুডিওর একখানা মারুতি সুজুকি গাড়ি নিয়ে সল্ট লেকে গেছিল। তবে সে কথা

হলপ নিয়ে বলতে পারব না।'

মাইতি প্রসেনজিতের দিকে ফিরে বললেন, 'জেরা করতে পারেন।'

হঠাৎ প্রসেনজিৎকে বাধা দিয়ে বাসু জেরা করতে উঠলেন। সকাল থেকে এই প্রথম। সহদেবকে প্রশ্ন করেন, 'তুমি এখনি বললে, আহমেদকে তুমি অনেকদিন ধরে চেন, তাই না? তা কত বছর?'

সহদেব তার স্বভাবসিদ্ধ হাসিমুখে বললে, 'বছরের ঠিক হিসাব দিতে পারব না, হুজুর। ডায়েরি লেখার অভ্যাস তো নেই। তা পাঁচ-সাত বছর হবে...'

'সে যখন আসানসোলে থাকত— হিন্দু পরিচয়ে— ঝানু মল্লিক নামে, তখন তাকে চিনতে?'

'আজ্ঞে না, হুজুর। ওর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ বোম্বাইতে। ও তখন পুষ্পাদেবীর কম্বাইন্ড-হ্যান্ড ছিল। গাড়ি চালাতো। রান্নাও করত।'

'তার মানে, মিসেস পাণ্ডের গাড়ির ড্রাইভারি চাকরিটা নেবার আগে?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ হুজুর।'

'মিসেস প্রমীলা পাণ্ডের কাছে আহমেদ আন্দাজ কতদিন চাকরি করে আর কবে সে চাকরি ছেড়ে কলকাতায় আসে?'

সহদেব একটু ইতস্তত করে বললে, 'সাল-তারিখ আমার মুখস্ত নেই হুজুর। মিসেস পাণ্ডের বাড়িতে মাত্র মাস ছয়েক চাকরি করেছিল আহমেদ। তারপর চলে আসে কলকাতায়। টালিগঞ্জে ওই সিনেমার স্টুডিওতে কাজ নেয়। ঠিক কবে তা বলতে পারব না হুজুর।'

'তুমি এখন ট্যাক্সি চালাও বললে, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তোমার ট্যাক্সির নম্বরটা কত?'

সহদেব নড়ে চড়ে বসল। মাইতি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের দিকে ফিরে বললে, 'এ সব নেহাত অবান্তর খেজুরে কথা নয়, হুজুর?'

মাইতির হঠাৎ খেয়াল হয়। আপত্তি দাখিল করেন।

বিচারক সে আপত্তি মেনে নেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলেন, 'মধ্যাহ্ন বিরতির সময় হয়ে গেছে। ওবেলা অন্য একটা জরুরী কেস আছে। ফলে এই মুলতুবি মামলা পুনরায় কাল সকাল দশটায় শুরু হবে। আসামী পুলিশ প্রহরায় থাকবে।'

বিচারক উঠে তাঁর চেম্বারে চলে গেলেন। আদালত খালি হতে শুরু করল। বাসুসাহেবও খাতাপত্র গুছিয়ে তুলছিলেন, হঠাৎ নজর হল, ইন্সপেক্টর রবি বসু এগিয়ে আসছে। রবি বাসুসাহেবের ফ্যান-তথা অনুগ্রহভাজন ('ঘড়ির কাঁটা' দ্রষ্টব্য)। হোমিসাইডেই আছে, তবে বর্মনের চেয়ে জুনিয়র। রবি হাত তুলে বাসুসাহেবকে নমস্কার করে কিছু বলবার উপক্রম করতেই বাসুসাহেব বললেন, 'তোমাকেই খুঁজছিলাম রবি। বল, কোথায় বসে কথা হতে পারে?'

রবি বললে, 'ব্যাপারটা জরুরী, স্যার! এবং অত্যন্ত গোপন! আসুন, আমি ব্যবস্থা করছি।'

।। সতেরো ।।

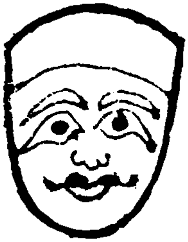

রবির মুশকিল হচ্ছে এই যে, সে তার 'বস'-এর চেয়ে বুদ্ধিমান। সে বুঝতে পেরেছে এ কেসে সতীশ বর্মন ভুল আসামীকে গ্রেপ্তার করেছে। রুবি রায়ের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ করা যাবে না। অসম্ভব। কারণ রুবি খুনটা করেনি। কিন্তু না বর্মন, না মাইতি— কেউই ওর যুক্তিতে কর্ণপাত করেনি। ফলে সে নিজের বুদ্ধিমতো কিছু তদন্ত করছে। এখন জনান্তিকে বাসুসাহেবের দ্বারস্থ হয়েছে। যদি তাঁর মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধীকে চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়া যায়।

এটা বলা বাহুল্য, তাকে— লুকিয়ে করতে হচ্ছে।

রবির ব্যবস্থাপনায় আদালতের একটি নির্জন ঘরে এসে বাসুসাহেব ওর মুখোমুখি বসে বললেন, 'তোমার উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরেছি। এ খেলা তুমি-আমি আগেও খেলেছি, রবি। একই শর্তে, একই খেলা আবার খেলতে আমি রাজি। অর্থাৎ আমার প্রাপ্তি— আসামীর বিরুদ্ধে তোমরা চার্জ তুলে নেবে, আর তোমার প্রাপ্তি, প্রকৃত আসামীর পরিচয় এবং প্রমাণ— যাতে তার কনভিকশন হয়। এই তো? বল কী বলতে চাও?'

'আপনি স্যার, জেরার মুখে সহদেবের ট্যাক্সির নম্বরটা জানতে চাইলেন, কিন্তু প্রশ্নটা নাকচ হয়ে গেল। নম্বরটা আমি জানি, আপনাকে জানালে কিছু সুরাহা হবে?'

'হবে। তার আগে বল— ট্যাক্সিটা এখন কোথায়?'

'একটা রিপেয়ার গ্যারেজে। সহদেব একটা ছোটখাটো অ্যাকসিডেন্ট করেছে। ট্যাক্সির মালিক জানে না। জানলে ওকে আর ট্যাক্সি চালাতে দেবে না, এই ভয়ে নিজের খরচেই নিজের জানা ওয়ার্কশপ থেকে নিজের তত্ত্বাবধানে সহদেব ট্যাক্সিটা সারিয়ে নিচ্ছে।'

'তুমি ট্যাক্সিটা দেখেছ? রিপেয়ার গ্যারেজটা চেন?'

'আজ্ঞে না, অ্যাকসিডেন্টের পর ট্যাক্সিটাকে আর দেখিনি। তবে শুনেছি, সেটা আছে বচন সিং-এর রিপেয়ার শপে। ইস্টার্ন বাইপাস যেখানে সল্ট লেকের দোরগোড়ায় এসে পড়ছে গ্যারেজটা সেখানে। বচন সিং টেলিফোনে আমাকে বলেছে, সামনের মাডগার্ডটা তুবড়ে গেছে। আর বাঁদিকের হেডলাইটের কাচ ভেঙে গেছে। মাইনর অ্যাকসিডেন্ট। কেন স্যার?'

'বলছি। তার আগে বলত, ঐ মারুতি সুজুকি গাড়িটা কার? মানে যেটা কালভার্টের নিচে পড়েছিল, যা থেকে ডেড বডিটা পাওয়া গেছে?'

'ও গাড়িটার মালিক দয়ারামবাবু। ফিল্ম প্রোডিউসার। টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে তাঁর একটা ছবির কাজ হচ্ছিল। ঐ মোস্তাক আহমেদ কিছুদিন ধরে গাড়িটা চালাচ্ছিল। স্টুডিওতে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, দয়ারামবাবুর নির্দেশে দুপুর দুটো নাগাদ ঐ গাড়িতে আহমেদ দুজন মহিলা ফিল্ম-আর্টিস্টকে পার্ক সার্কাসের দিকে নামিয়ে দিতে যায়। তারা নিরাপদে বাড়ি পৌঁছায়। তারপর

আহমেদ কেন হঠাৎ সল্ট লেকের দিকে যায়, তার সঙ্গে কে ছিল, কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না— সব ব্ল্যাঙ্ক! দয়ারামবাবু কিছুই ধারণা করতে পারছেন না।'

'আর সহদেব কর্মকারের ট্যাক্সিটার মালিক কে? আদালতে সাক্ষী দিতে উঠে ও বলেছিল, লেক টাউনের এক সর্দারজী ট্যাক্সিটার মালিক। তার নাম কী? জান?

'হরদয়াল সিং! লোকটা এখনো জানে না, তার গাড়ি একটা অ্যাকসিডেন্টে পড়েছে। সহদেব সে খবরটা গোপন রেখেছে।'

'তুমি সহদেবের ব্যাপারে এত খোঁজ-খবর কেন রাখছিলে রবি?'

'এই মার্ডার কেসটার জন্য নয়, স্যার। সেই বেলুড়ের গহনাচুরির কেসটার ব্যাপারে। মিস রায়ের বিরুদ্ধে সে স্পষ্টতই মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছিল। আপনি জানেন না, কিন্তু আমি তো জানি— সহদেব পুলিশের ভাড়াটে সাক্ষী ছিল না। তাহলে কার স্বার্থে সে মিথ্যা সাক্ষী দেবার জন্য পুলিশের কাছে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে আসে? 'লাল-পাড়, হলুদ শাড়ি'র বর্ণনা দেয়? আমার সিনিয়র অফিসার কথাটা মানতে চাননি, কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল, গহনা চুরির কেসের যে মূল আসামী তার সঙ্গে সহদেবের আঁতাত আছে। তারই স্বার্থে ও আদালতে উঠেছিল মিথ্যা সাক্ষী দিতে। রুবিকে ফাঁসাতে। পুলিশের দৃষ্টি বিপথগামী করতে। এজন্য আমি ট্র্যাক রেখে চলছিলাম। দেখতে চাইছিলাম, সহদেব কর্মকারের জীবনযাত্রায় হঠাৎ কোন 'ছপ্পড়ফোঁড়' পরিবর্তন এসেছে কি না— লটারিতে বেমক্কা টাকা পেলে যেমন হয়!'

বাসু খুশি হয়ে বললেন, 'ভেরি গুড! তা ওর সম্বন্ধে কী জানতে পেরেছ ইতিমধ্যে?'

'সহদেব লোকটা অবিবাহিত। কিন্তু একটি স্ত্রীলোককে নিয়ে লেকটাউনের একান্তে একটা বস্তিতে ঘর ভাড়া করে থাকে। মোস্তাক আহমেদের সঙ্গে তার জান পহচান তো আছেই, ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব থাকার সম্ভাবনা। একই কথা রামলগনের বিষয়ে। তবে বেলুড়ের গহনা চুরির কেসের পর সহদেবের জীবনযাত্রায় কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। যেমন হয়নি রামলগন বা আহমেদের জীবনে। টাকাটা ওরা পেলেও এখনো বেমক্কা খরচ করতে শুরু করেনি।'

বাসু বললেন, 'তোমাকে পর পর কতকগুলি কাজ দিচ্ছি। পর্যায়ক্রমে করতে হবে। দরকার হয়, নোট বইতে লিখে নাও।

রবি পকেট থেকে নোটবই বার করল।

'এক নম্বর : থানা থেকে একটা সার্চ ওয়ারেন্ট বানিয়ে নিয়ে চলে যাও বচন সিং-এর রিপেয়ার শপে। ট্যাক্সিটাকে খুব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করবে। দুটো পয়েন্ট বিশেষভাবে লক্ষ্য করবে। প্রথম কথা : সামনের দিকের মাডগার্ডটা কি ডেলিবারেটলি তোবড়ানো হয়েছে?

রবি বলে, 'মানে? ডেলিবারেটলি তোবড়ানো হবে কেন?'

বাসু সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে একইভাবে বলতে থাকেন, দ্বিতীয় কথা : ট্যাক্সিটার সামনের দিকে, বাঁদিকের বনেটে কোনও নিটোল গর্ত আছে কি না, যা একটা পয়েন্ট 38 ক্যালিবার রিভলভারের গুলিতে হওয়া সম্ভব। তুমি স্লাইড-ক্যালিপার্স সঙ্গে নিয়ে যেও। যদি ঐ ছিদ্রটা

দেখতে পাও তাহলে বচন সিংকে জিজ্ঞেস কর, ঐ ফুটোটা মেরামত করার নির্দেশ সহদেব দিয়ে গেছে কি না। এনি ওয়ে, আমার যা সন্দেহ তা ঠিক হলে বচন সিংকে অর্ডার দিও রিপেয়ার বন্ধ রাখতে! ট্যাক্সিটা সে ক্ষেত্রে একটা মারাত্মক এভিডেন্স।'

রবি বলে, 'বুঝলাম। আপনি আশঙ্কা করছেন, ঐ ট্যাক্সিটা করেই রুবিকে কেউ তাড়া করে এবং রুবির আন্দাজে ছোড়া গুলিটা ঐ বনেটে লাগে। কিন্তু এই ডিডাকশনের পিছনে যুক্তি কী?'

'বাঃ! রুবি তার এজাহারে বলেছিল, মনে নেই— দ্বিতীয় গুলিটা সে পিছনের গাড়ির হেডলাইট লক্ষ্য করে ছোড়ে। আর সে একটা 'মেটালিক ক্লিংক' শুনতে পায়।'

'সে তো বুঝলাম। কিন্তু সেটা যে ঐ ট্যাক্সিটাই, তা ধরে নিচ্ছেন কী করে?'

'বলছি। তার আগে তোমার কাজগুলো পরপর লিখে নাও। বচন সিং-এর গ্যারেজে তদন্ত শেষ হয়ে গেলে— তা তুমি বনেটে পয়েন্ট থ্রি এইট বোরের ছিদ্র পাও বা না পাও— সোজা চলে যাবে সহদেবের ডেরায়। সে প্রচণ্ড আপত্তি জানাবে, শুনবে না। তুমি সার্চ-ওয়ারেন্ট দেখিয়ে তার বাড়িটা সার্চ করবে।

রবি বাধা দিয়ে বলে, 'কিন্তু কী খুঁজব? মার্ডার ওয়েপন?'

'না। ক্যাশ টাকা। শোন রবি, পুলিশের ভুল হচ্ছিল কোথায় জান? গ্র্যাজুয়েট হবার আগেই পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি দাবি করা। প্রথম মামলাটা ছিল চুরির, দ্বিতীয়টা খুন। পুলিশ বুঝতে পারেনি, এ দুটো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তুমি কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিলে— তাই সহদেবের ট্র্যাক রেখেছ! আমার কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখেছ।... বেলুড়ের গহনা চুরির কেসটার একটা প্রকাণ্ড বড় ক্লু আজ আদালতে সহদেবের জবানবন্দিতে ধরা পড়েছে, সেটা কি নজরে পড়েছে তোমার?'

রবি মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে পুরো এক মিনিট চিন্তা করে বলল, 'সরি স্যার! ধরতে পারছি না। সহদেব কী এমন মারাত্মক স্টেটমেন্ট করেছে?'

'পুষ্পা তার ড্রাইভার-কাম-কুককে বোম্বাই সিনেমাজগত থেকে বিতাড়ন করতে যখন বদ্ধপরিকর, অথচ তাকে উপযুক্ত চাকরি খুঁজে দিতে পারছে না, তখন সাময়িক সমাধান হিসাবে আহমেদকে সে প্রমীলার কাছে পাঠিয়ে দেয়। সহদেব তা স্বীকার করেছে। সম্ভবত ওরা দুই বান্ধবী ড্রাইভার এক্সচেঞ্জ করে। একটু খবর নিলেই তুমি তা জানতে পারবে। সহদেব স্বীকার করেছে, পুষ্পার বাড়ি ছাড়ার পর এবং কলকাতা আসার আগে মোস্তাক আহমেদ মাস ছয়েক প্রমীলার ড্রাইভার হিসাবে চাকরি করে। তাই নয়?'

'—হ্যাঁ, তাই। কিন্তু তা থেকে কী প্রমাণ হয়?'

'লজিক্যালি স্টেপ-বাই-স্টেপ চিন্তা কর, রবি। গাড়ির ডিকির চাবি আর স্যুটকেসের চাবি দুটোই ছিল মোক্ষম। দুটোই বিদেশে বানানো— অ্যালয় স্টিলের মজবুত ফুলপ্রুফ চাবি। এমনকি দক্ষ চাবিওয়ালারও নাগালের বাইরে। গণপতি, হুডিনি বা পি. সি. সরকার অকুস্থলে ছিলেন এমন তথ্য আমরা পাইনি। তাহলে চুরিটা হল কী ভাবে? একটা চাবি ছিল পুষ্পার কাছে, একটা

প্রমীলার কাছে। যে কোন একজনের কাছে দুটোই যদি থাকত তাহলেও না হয় সন্দেহ করা যেত, এক বান্ধবী অপর বান্ধবীর গহনা চুরি করেছে। এক্ষেত্রে সেরকম ব্যতিক্রম সমাধানও মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। কারণ, দুটো চাবি ছিল দুজনের কাছে। দুজনে সংযুক্ত ভাবে চুরি করবে না— তার কোনও অর্থ হয় না। সুতরাং?

রবি কোনও কথা বলল না। অপ্রয়োজনবোধে।

বাসু আবার শুরু করেন, 'একমাত্র সমাধান : যে কোন উপায়েই হোক, চোরের হাতে দু-দুটি চাবির ডুপ্লিকেট এসে গিয়েছিল। যা বিদেশে বানানো। গাড়ি ও স্যুটকেসের ক্রেতা যা অরিজিনাল ম্যানুফ্যাকচারারের কাছ থেকে পেয়েছিল! তা যদি ধরে নিই, তাহলে জানতে হয়, ডুপ্লিকেট চাবি দুটো কোথায় ছিল, কার হেপাজতে? কন্টেসা গাড়ির ডুপ্লিকেট চাবিটা ছিল ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্সে, ঘটনাস্থল থেকে দশ-বারো মাইল দূরে— রেন্ট-আ-কার সার্ভিসের তালা-চাবি দেওয়া কী-বোর্ডে। তাই নয়? এটাই বলা হচ্ছে। কিন্তু ঐ সঙ্গে একথা বলা হচ্ছে না যে, সহদেব কর্মকার ছিল ঐ প্রতিষ্ঠানের হেড মেকানিক আর রামলগন সবচেয়ে পেয়ারের ড্রাইভার। ঘটনার অনেক আগে থেকেই ওদের মধ্যে যে কোন একজনের পক্ষে ঐ চাবিটা হস্তগত করা সম্ভব। দুজনে যৌথভাবেও করে থাকতে পারে।'

'কিন্তু ফরেন-মেক স্যুটকেসের চাবিটা?'

'ইয়েস! সেটা ছিল আরও দূরে। সুদূর গোয়ালিয়রে প্রমীলার স্টিল আলমারিতে। কিন্তু প্রমীলার জবানবন্দিতে আমরা জেনেছি, অন্তত আমি জেনেছি যে, তার অতি বিশ্বস্ত পরিচারিকা রুক্মিণীকে সে ঘরদোরের চাবি বিশ্বাস করে দিত। এমন কি প্রমীলা যখন দু-তিন মাসের জন্য ফরেন বেড়াতে যায় তখন রুক্মিণীকে আলমারির চাবি দিয়ে যায়। হয়তো ভিতরের সিক্রেট ড্রয়ারের চাবিটা দেয় না— ঠিক জানি না। তার কারণ, প্রমীলা জানে রুক্মিণীর চুরি করার উপায় নেই। তার তিন কূলে কেউ নেই। চুরি করে সে পালাবে কোথায়? বিশ্বস্ততা তার বিবেকপ্রসূত কতখানি, আর কতটা অবস্থাগতিকে তার পরিমাপ হয়নি। রুক্মিণী বালবিধবা। দশ বছর বয়সে সিঁদুর মুছে প্রমীলার সংসারে এসেছে। একান্তভাবে সে প্রমীলার উপর নির্ভরশীল। বাইরের দুনিয়াকে সে বাল্যেই ত্যাগ করে এসেছে। নিতান্ত অসহায় মেয়েটি। অন্তঃপুর থেকে দেখেছে, বোম্বাইয়ের চিত্রজগতের রঙিন খেলা! সমবয়সী যৌবনবতীদের। প্রমীলার, পুষ্পার, আরও পাঁচজনের। এখন তার বয়স পঁচিশ। যাকে বলে ভরা যৌবন! কিন্তু আদিম রিপুর তাড়না তাকে দাঁতে-দাঁত দিয়ে সহ্য করে যেতে হয়েছে। সে খিদমৎগার, পরিচারিকা, নৌকরানি।... বিবেচনা করে দেখ রবি, এই পরিবেশে ছয়মাসের জন্য প্রমীলার গৃহস্থালীতে এসে উপস্থিত হল একজন : লেডি কীলার হিসাবে যে কুখ্যাত। প্রমীলার গাড়ির ড্রাইভার— অতি সুদর্শন মোস্তাক আহমেদ! হয়তো রুক্মিণী তাকে দুবেলা একান্তে আহার্য পৌঁছে দেয়। মালকিনের আদেশে গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করতে বলতে যায়। সেই সব একান্ত মুহূর্তে কী ঘটছে আমাদের জানার উপায় নেই। তা প্রমাণ করা যাবে না। আন্দাজ করা যায়। আহমেদ রুক্মিণীকে মোহমুগ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল। হয়তো তাকে বুঝিয়েছিল, ওরা দুজনে চলে যাবে কোনও সুদূর দেশে— প্রমীলার

নাগালের বাইরে। ঘর বাঁধবে দুজনে, সন্তান মানুষ করবে, সার্থক হবে রুক্মিণীর নারী জন্ম!'

রবি চুপ করে থাকে; জবাব দেয় না।

বাসুসাহেবই আবার কথা বলে ওঠেন, 'তা যদি হয়ে থাকে তবে দেশের প্রচলিত আইনের ধারায় সেই আনপড় গ্রাম্য স্ত্রীলোকটি অপরাধী। সে বিশ্বাসহন্তা। কিন্তু কী প্রচণ্ড প্রলোভনের তাড়নায় সে আহমেদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল একবার ভেবে দেখ, রবি!'

রবি জানতে চায়, 'তাহলে আপনার থিয়োরি অনুযায়ী কে কে ছিল এই ষড়যন্ত্রে? আই মিন, চুরির কেসটায়?

'ডেফিনিট জানি না আমরা। রুক্মিণী ছিল, না হলে সুকৌশলে ডুপ্লিকেট চাবিটা অকুস্থলে উপস্থিত হতে পারে না। রুক্মিণীর সঙ্গে সহদেব বা রামলগনের পরিচয় ছিল এমন তথ্য আমরা পাইনি— যদিও রুক্মিণী আর রামলগন দুজনের আদি নিবাস ছাপড়া জিলা। আমার ধারণা, রুক্মিণী আর আহমেদ যৌথভাবে স্যুটকেসের ডুপ্লিকেট চাবিটা হাতিয়েছিল। আর ডিকির চাবিটা রামলগন অথবা সহদেবের কীর্তি।

'আরও লক্ষ্য করে দেখ রবি, বোম্বাই থেকে সদ্য আগত আহমেদ কলকাতার চোরাবাজার থেকে লক্ষ টাকা মূল্যের মুকুটটা উদ্ধার করে মাত্র একুশ হাজার টাকায় প্রমীলাকে হস্তান্তরিত করেছিল...'

রবি বাধা দিয়ে বলে, 'আপনি বলতে চান, আহমেদ নিজেই ঐ জীবন ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে...'

বাসুও ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ছদ্মবেশ যে নিয়েছিল একথা তো আমরা জেনেছি একমাত্র প্রমীলার উক্তি থেকে। সেটা কতদূর সত্য তার প্রমাণ কী? আহমেদের সঙ্গে রুবির, রুক্মিণীর এবং পুষ্পার সম্পর্কটা আমরা জানি বা আন্দাজ করেছি, কিন্তু সেই লেডি কীলারের সঙ্গে স্বামী-পরিত্যক্তা প্রমীলা পাণ্ডের সম্পর্কটা কি আমরা আন্দাজ করতে পেরেছি? হয়তো ঐ ছদ্মবেশ, ঐ ছদ্মনাম— সবই প্রমীলার উর্বর কল্পনাপ্রসূত— আহমেদকে আড়াল করতে। আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে দেখ, রবি। তুমি জান কি জান না, জানি না— রুবি আমাকে বলেছিল, ঘটনার দিন সন্ধ্যায় সে যখন হোটেলে ফিরে এসে ঘরের চাবিটা চায় তখন কাউন্টারে বসা ছেলেটি ভুল করে ওকে রুক্মিণীর চাবিটা দিয়েছিল...'

রবি বাধা দিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, সে কথাটা আমিও শুনেছি। কিন্তু তার তাৎপর্যটা কী?'

'ধর, ঘটনা যদি এইভাবে ঘটে থাকে? বেলা নয়টার সময় ট্যাক্সি নিয়ে পুষ্পা আর প্রমীলা সারদামায়ের মন্দিরের দিকে চলে গেল। রুক্মিণী মোটেলে রইল। তার হেপাজতে তখন তিনটি ঘরের চাবি। সে কী-বোর্ডে দুটো চাবি জমা দিয়ে পুষ্পার ঘরে ঢুকল। পুষ্পার একখানি দামী ছাড়া-শাড়ি— যেটা পরে সে এয়ারোড্রাম থেকে এসেছে— পরে, একগলা ঘোমটা দিয়ে নিচে নেমে গেল। কাউন্টারের ভদ্রলোক জানে, সিনেমাস্টার পুষ্পা পাবলিসিটি এড়াতে রাজস্থানী মহিলাদের মতো একগলা ঘোমটা দিয়ে রাস্তায় বের হয়। ফলে একটা হাতব্যাগ নিয়ে ঘোমটা

দিয়ে পুষ্পা সেজে রুক্মিণীর পক্ষে ঐ কন্টেসা গাড়ির দিকে যাওয়াতে কারও কিছু সন্দেহ হয়নি। মোটেলের জমাদারনী তার জবানবন্দীতে বলেছিল সে কথা। রুক্মিণীর হেপাজতে এখন ডিকির এবং স্যুটকেসের ডুপলিকেট চাবি। প্রথমটা সে পেয়েছে রামলগন, সহদেব বা আহমেদের কাছ থেকে। দ্বিতীয়টা সে আহমেদের নির্দেশ মতো বোম্বাই থেকে নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। এমনটা ঘটে থাকলে রুক্মিণীর পক্ষে গাড়ির ডিকি আর স্যুটকেসের তালা খুলে গহনা, মুকুট আর রিভলভার চুরি করা কঠিন কাজ নয়। এবার সে মোটেলে ফেরার পথে ঐ একগলা ঘোমটা দিয়েই যদি কাউন্টারে তার 'নৌকরনীর' চাবিটা চায়— 'দো-বাই-এক নম্বর কুঞ্জি' তাহলে বই পড়তে পড়তে কাউন্টার-ক্লার্ক তাকে তাই দেবে। রুক্মিণী এভাবে অনায়াসে রুবি রায়ের ঘরে চলে আসতে পারে। বাথরুমের ওয়াড্রোবে একপাটি ব্রেসলেট রেখে আবার নেমে যায়। চাবিটা কী-বোর্ডে জমা দিয়ে ফিরে আসে পুষ্পা অথবা প্রমীলার ঘরে। এজন্যই যখন রুবি রায় এসে তার ঘরের চাবিটা চায় তখন কাউন্টার-ক্লার্ক অন্যমনস্কভাবে তাকে 2/3 চাবিটা ধরিয়ে দিয়েছিল। রুবি যখন জানায় যে, তার চাবির নম্বর 2/1 তখন কাউন্টার ক্লার্ক একটু হকচকিয়ে যায়। রুবির নাম জানতে চায়। রেজিস্টারে মিলিয়ে দেখে। কী-বোর্ডে তখন দোতলায় তিনটি চাবিই ঝুলছিল। ফলে সে রুবিকে 2/1 চাবিটা দিয়ে আবার গল্পের বইয়ে ডুবে যায়।'

বাসু থামলেন। রবি বসু তথ্যটা হজম করে নিয়ে বলল, 'আপনি আমাকে বলছিলেন, সহদেবের আস্তানা সার্চ করতে...'

'হ্যাঁ। খুব সম্ভব গহনা পাবে না। তবে বেমক্কা বেশ কিছু ক্যাশ টাকা পেতে পার। যা সহদেবের মতো 'দিন-আনি-দিন-খাই' ট্যাক্সি ড্রাইভারের বাড়িতে থাকার কথা নয়। একশ টাকার নোট যতগুলি পাবে— যদি দু-পাঁচ হাজার ক্যাশও পাও, তাহলে সেগুলি সংগ্রহ করে তার পরিপূরক টাকা ওকে দিয়ে আসবে। স্থানীয় সাক্ষী রেখে, যে নোটগুলি নিলে তার নম্বর লিখে; সাক্ষীর স্বাক্ষর রেখো।'

'বুঝলাম।'

বাসু বললেন, 'সবটাই আমার এম্পিরিক্যাল হাইপথেসিস! এমনটা যে ঘটেছিল একথা আমরা আদালতে প্রমাণ করতে পারব না। এমনকি সার্কামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স থেকেও। তেমনি তুমিও পারবে না প্রমাণ করতে যে এমনটা ঘটেনি!'

রবি বলে, 'সুতরাং? সল্যুশন কী?'

'সল্যুশন তোমার কর্মক্ষমতার। তোমার তদন্তের ফলাফল। তুমি তদন্ত করে প্রমাণ কর, আমার এম্পিরিক্যাল হাইপথেসিসটা ভ্রান্ত। আমি তাহলে নতুন করে আবার ভাবতে বসব। প্রমীলা আহমেদকে যে একুশ হাজার টাকা দিয়েছিল— তার ডিনোমিনেশন যাই হোক— তার নম্বর প্রমীলা রাত জেগে টুকে রেখেছে নিশ্চয়। এটুকু সে করবেই। তুমি দেখ, সেই নম্বরী নোটের বেশ কিছু বান্ডিল সহদেবের বাড়ি সার্চ করে উদ্ধার করতে পার কি না।'

রবি জানতে চায়, 'আহমেদ হত্যার ব্যাপারে আপনার থিয়োরিটা কী?'

'আগে বল, তোমার থিয়োরিটা কী?'

'আমার ধারণা : এটা প্রফেশনাল খুনির কাজ। খুনটা যে করেছে সে মোটা টাকার বিনিময়ে তা করেছে।'

'অর্থাৎ জনার্দন গায়কোয়াড়ের টাকায়?'

'এছাড়া আর কোনো মোটিভ দেখতে পারেন? আহমেদ অনেক-অনেক মেয়েকে নিয়ে খেলা করেছে। তাদের অনেকে ওকে আজ ঘৃণা করে; যেমন পুষ্পা অথবা রুবি, কিন্তু তারা সেজন্য ওকে খুন করবে না। আই মীন, ডেলিবারেট পূর্বপরিকল্পিত খুন। রাগের মাথায় পাথরের টুকরো ছুড়ে নয়।'

'বুঝলাম। কিন্তু সেক্ষেত্রে সেই প্রফেশনাল খুনি কেন রুবির গাড়িতে রিভলভারটা ফেলে যাবে? রিভলভারটা মিস্টার গায়কোয়াড়ের। প্রফেশনাল খুনিকে নিয়োগ করলে তিনি কেন নিজের রিভলভারটা তাকে দেবেন? প্রফেশনাল খুনী— যে দশ-বিশ হাজার টাকা নিয়ে একজন ধনকুবেরের জীবনের পথের কাঁটাকে সরিয়ে দিচ্ছে সে কি একটা স্মাগলড্ রিভলভার যোগাড় করে আনতে পারবে না? হাত পেতে মালিকের কাছে তাঁরই নামে লাইসেন্সড রিভলভারটা চাইবে? আর ধনকুবের তাই তাকে দেবেন? যাতে পুলিশে সহজেই তাঁকে সন্দেহ করে?'

'তাহলে?'

'আহমেদ হত্যার ব্যাপারেও আমার একটা হাইপথেসিস আছে। আদালতে তা আমি প্রমাণ করতে পারছি না এখন। কিন্তু তুমি যদি আমার ঐ থিয়োরি অনুযায়ী অনুসন্ধান কর, আর তথ্যের যোগান দিতে পার তাহলে প্রকৃত অপরাধীর কনভিকশন না হবার কোন কারণ নেই।'

'বলুন স্যার, আপনার হাইপথেসিসটা কী?'

'আমি ধরে নিচ্ছি— বেলুড়ে গাড়ি থেকে চুরিটা করেছিল রুক্মিণী; কিন্তু তার মূল নায়ক মোস্তাক আহমেদ। রামলগন সাতে-পাঁচে ছিল না; কিন্তু সহদেব কর্মকার ছিল। সহদেবেরই পরিকল্পনা মতো রেন্ট-আ-কার সার্ভিসের কি-বোর্ড থেকে ঐ কন্টেসা গাড়ির ডিকির ডুপ্লিকেট চাবিটা এনে দেয় রুক্মিণীকে। মূল অপরাধী আহমেদ তখন ঘটনাস্থল থেকে বহুদূরে। টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে। একাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে। রুক্মিণী কীভাবে গহনা ও রিভলভারটা চুরি করেছিল তা আগেই বলেছি। পরে সম্ভবত আহমেদ আর সহদেবের মতপার্থক্য হয়েছিল গহনার বখেরা নিয়ে। চোরাই গহনা কোথায় নিরাপদে বিক্রয় করা যায় তা হয় তো ওরা জানত না, অথবা সাহস পায়নি। প্রমীলা পাণ্ডের সঙ্গে যদি আহমেদের কোনও নিবিড় সম্পর্ক থেকে থাকে তবে আহমেদই কোনও আষাড়ে গল্প শুনিয়ে একুশ হাজার টাকায় মুকুটটা প্রমীলাকে বেচে দিয়ে আসে। প্রমীলা পুলিশে যায় না, বাকি গহনা উদ্ধারের আশায়। সম্ভবত এই পর্যায়ে অন্য একটি প্রসঙ্গ নিয়ে আহমেদ আর সহদেবের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। আহমেদ চেয়েছিল, রুবিকে তার পাওনা আট হাজার টাকা নগদে মিটিয়ে দিয়ে বাকি টাকা দুভাগ করতে— অথবা তিন ভাগ, রুক্মিণীর মুখ বন্ধ করতে। আহমেদ চায়নি, আসানসোলের কেসটা নিয়ে সে ফেঁসে যায়—

ঠিক যখন পুষ্পা আর জনার্দনের বিয়ে ঘোষিত হতে চলেছে। সহদেব তাতে রাজি হয়নি। সে ডবল-ক্রস করবে বলে মনস্থ করে। নিজের ট্যাক্সিখানা সল্ট লেক বা লেক টাউনে রেখে সে টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে গিয়ে আহমেদের সঙ্গে দেখা করে। জানায় যে, সে টাকার ভাগ চায় না— কোল্ট কোবরা রিভলভারটা পেলেই সে মুকুট বেচা একুশ হাজার টাকার দাবি থেকে সরে আসবে। আহমেদ রাজি হয়ে যায়। বন্ধুকে বলে, ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে বিশ হাজার টাকা নগদে নিয়ে একা যেতে সে সাহস পাচ্ছে না। সহদেব সশস্ত্র থাকলে, সে ভরসা পায়। এটাই চাইছিল সহদেব। মারুতি-সুজুকি গাড়িতে দুই মহিলাকে পৌঁছে দিয়ে ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে দুই বন্ধু সল্ট লেকের দিকে রওনা দেয়।

তখন হয়তো বেলা আড়াইটে-তিনটে, ডাইভার্শনের কাছে আহমেদ গাড়ির গতিবেগ খুব কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়। তখন হয়তো ওখানে বৃষ্টি পড়ছিল— ডাইভার্শান রোড কর্দমাক্ত ও জনমানবহীন। সহদেব বসেছিল, পাশের সীটে। ডাক্তার সান্যাল আদালতে যেভাবে বর্ণনা করেছেন সেভাবেই সহদেব আহমেদকে হত্যা করে এক বিঘৎ দূরত্ব থেকে। একুশ হাজার খুচরো নোটে ভর্তি অ্যাটাচি কেসে রিভলভারটা ভরে নেয়। মৃতদেহ-সমেত মারুতি-সুজুকি গাড়িটা ডাইভার্শান রোডের বিপরীত দিকে কালভার্টের নিচে গড়িয়ে দেয়। বলাবাহুল্য, নিজের আঙুলের সব ছাপ মুছে নিয়ে। তারপর হিচ-হাইক করে সে সল্ট লেক বা লেক টাউনে— যেখানে তার ট্যাক্সিটা রাখা ছিল সেখানে ফিরে আসে। রুবির বাড়িতে যায়। দেখে, ছাদে মিস্ত্রিরা কাজ করছে বটে কিন্তু কেউ তাকে নজর করছে না। রুবির বাড়িতে গাড়িটা গ্যারাজ করা ছিল না, ছিল ড্রাইভ-ওয়েতে, তার ড্রাইভারের দিকের কাচটা নামানো। রুবিই বলেছে, সেটা ওঠানো যাচ্ছিল না। সহদেব ইতিমধ্যে রিভলভারের ব্যারেলটা সাফা করেছে। একটা তাজা বুলেট ভরে দিয়েছে। এবার সে সুযোগ বুঝে একটা তোয়ালে জড়িয়ে রিভলভারটা অস্টিন গাড়ির ড্রাইভারের সিটে নামিয়ে দিয়ে কিছু দূরে অপেক্ষা করে। একটু পরে রুবি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে, গাড়িটা গ্যারেজ করতে। ড্রাইভার-সিটে রিভলভারটা আবিষ্কার করে সে স্তম্ভিত হয়ে যায়। কী করবে স্থির করে উঠতে পারে না। কিন্তু সহদেব আন্দাজ করতে পেরেছিল, সে কী করবে। থানায় ফোন করবে না। করবে তার সলিসিটরকে। আমার পরামর্শটা সে সবার আগে নেবে। সহদেব আরও আন্দাজ করেছিল— আমি ওকে বলব, যন্ত্রটা নিয়ে আমার হেপাজতে দিয়ে যেতে। বাস্তবেও তাই ঘটেছিল। রুবির অস্টিন গাড়ির পিছন পিছন সহদেব তার ট্যাক্সিটা চালিয়ে নিয়ে আসে। রুবি বার দুই হাত নেড়ে ওকে ওভারটেক করতে বলে; কিন্তু সহদেব ওকে অতিক্রম করে যায় না। সে অপেক্ষা করছিল কতক্ষণে রুবির অস্টিনটা সেই অভিশপ্ত ডাইভারশানটার কাছে আসে। তার কাছাকাছি এসেই ও রুবির অস্টিনটাকে ডানদিক থেকে ঠেশে ধরে। সে যা চেয়েছিল তাই হল : রুবি ওকে ভয় দেখাতে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করলে। একটা... দুটো! তখনই সহদেব ব্রেক কষে। ফিরে যায়। সহদেব আশা করেছিল, আহমেদের দেহের ভিতর থেকে বুলেটটা উদ্ধার করা যাবে— আর ব্যালিসটিক এক্সপার্ট কম্পারেটিভ মাইক্রোস্কোপের টেস্টে প্রমাণ করবেন যে, রুবির রিভলভার থেকেই ফেটাল বুলেটটা নিক্ষিপ্ত। সে স্বপ্নেও ভাবেনি, জনার্দন ঐ মারণাস্ত্রটা বদলে দেওয়ার সুযোগ পাবেন— হ্যাঁ, তাই পেয়েছিলেন, রবি— তুমি জান কি জান

না, জানি না...?

রবি বাধা দিয়ে বলল, 'জানি। তারপর?'

'সহদেব ভেবেছিল, সে নিপুণহাতে সব কিছু করেছে। একুশ হাজার টাকা তার হেপাজতে। ভাগিদার কেউ নেই। আহমেদ মৃত। রুক্মিণীর চোরের মায়ের কান্না ছাড়া কিছু করার নেই। চোরাই কোল্ট-কোবরা রিভলভারটা গছিয়ে দিয়েছে রুবির ঘাড়ে। বেলুড়ের চুরির কেস অথবা আহমেদ হত্যা কেসে তাকে কোনভাবেই পুলিশে জড়াতে পারবে না। কিন্তু একটা ঝামেলা হয়ে গেছে। রুবির দ্বিতীয় বুলেটে ওর ট্যাক্সির বনেটের বাঁদিকে একটা ফুটো হয়েছে! এটা বিশ্রী একটা এভিডেন্স। সহদেব সেটা মেরামত করে নিতে চাইল, সে নিজেই মেকানিক। তাই হাতুড়ি দিয়ে সামনের মাডগার্ডে আর হেডলাইটে আঘাত করে একটা কৃত্রিম অ্যাকসিডেন্টের পরিবেশ তৈরি করে ট্যাক্সিটা বিশ্বস্ত রিপেয়ার গ্যারেজে মেরামত করতে দিয়ে আসে। ট্যাক্সি-মালিকের অগোচরে গাঁটের পয়সা খরচ করে সে ওটা সারাতে দেয়। বিশেষ অনুরোধ থাকে, ফুটোটা বন্ধ করে তাপ্পি লাগানো।

রবি চট করে উঠে দাঁড়ালো। নিচু হয়ে বাসুসাহেবকে প্রণাম করল একটা।

বাসু বললেন, 'যত রাতই হোক ফোন কোরো আমাকে। আমি জেগে থাকব।'

'ইয়েস স্যার।'

রাত সাড়ে দশটা।

নৈশাহার সেরে যে যার ঘরে চলে গেছেন। মন্ত্রগুপ্তি বাসুসাহেবের মজ্জায়-মজ্জায়। কাউকে কিছু বলেননি। শুধু রানুকে বললেন, 'তুমি শুয়ে পড়। আমি লাইব্রেরি ঘরে একটু পড়ব।'

রানু বললেন, 'তিন পেগের বেশি খেও না যেন।'

'কী আশ্চর্য! আমি পড়ব বলেছি। ড্রিংক করবো তো বলিনি।

'ওই হলো।'— হুইল চেয়ারে পাক মেরে তিনি শয়নকক্ষের দিকে চলে গেলেন।

টেলিফোন লাইনটা ডাইরেক্ট করাই ছিল। রাত এগারোটা নাগাদ বাজল সেটা। বুঝলেন রবি বোস। তুলে নিয়ে আত্মঘোষণা করতেই ও প্রান্ত থেকে সাড়া দিলেন প্রমীলা পাণ্ডে, 'জেগে ছিলেন তো স্যার? ডিস্টার্ব করছি না?'

'না। আমি জেগে জেগে বই পড়ছি। ইন-ফ্যাক্ট একটা ফোন এক্সপেক্ট করছি—'

'জানি। ইন্সপেক্টর রবি বোসের। উনি এতক্ষণ এখানেই ছিলেন। আজ্ঞে হ্যাঁ, এই হোটেল হিন্দুস্থানে। এইমাত্র চলে গেছেন। আপনার প্রথম অনুমান অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। মানে গহনা চুরির কেসটা। আমি ভাবতেই পারিনি চোরাই গহনাগুলি আমার পাশের ঘরেই রয়েছে— রুক্মিণীর ঐ স্যুটকেসে! রিভলভার আর মুকুট ছাড়া সে সব কিছুই নিজের কাছে রেখেছিল। আহমেদও বোধহয় মনে করেছিল, এটাই সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। তা সে যাই হোক, আহমেদের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর থেকেই রুক্মিণী কেমন যেন পাগলামি শুরু করে। আমরা তার হেতুটা ঠিক বুঝতে পারিনি। রবিবাবুর ধমকানিতে সে কাঁদতে কাঁদতে সবকিছুই স্বীকার করেছে।

ঠিক যখন পুষ্পা আর জনার্দনের বিয়ে ঘোষিত হতে চলেছে। সহদেব তাতে রাজি হয়নি। সে ডবল-ক্রস করবে বলে মনস্থ করে। নিজের ট্যাক্সিখানা সল্ট লেক বা লেক টাউনে রেখে সে টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে গিয়ে আহমেদের সঙ্গে দেখা করে। জানায় যে, সে টাকার ভাগ চায় না— কোল্ট কোবরা রিভলভারটা পেলেই সে মুকুট বেচা একুশ হাজার টাকার দাবি থেকে সরে আসবে। আহমেদ রাজি হয়ে যায়। বন্ধুকে বলে, ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে বিশ হাজার টাকা নগদে নিয়ে একা যেতে সে সাহস পাচ্ছে না। সহদেব সশস্ত্র থাকলে, সে ভরসা পায়। এটাই চাইছিল সহদেব। মারুতি-সুজুকি গাড়িতে দুই মহিলাকে পৌঁছে দিয়ে ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে দুই বন্ধু সল্ট লেকের দিকে রওনা দেয়।

তখন হয়তো বেলা আড়াইটে-তিনটে, ডাইভার্শনের কাছে আহমেদ গাড়ির গতিবেগ খুব কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়। তখন হয়তো ওখানে বৃষ্টি পড়ছিল— ডাইভার্শান রোড কর্দমাক্ত ও জনমানবহীন। সহদেব বসেছিল, পাশের সীটে। ডাক্তার সান্যাল আদালতে যেভাবে বর্ণনা করেছেন সেভাবেই সহদেব আহমেদকে হত্যা করে এক বিঘৎ দূরত্ব থেকে। একুশ হাজার খুচরো নোটে ভর্তি অ্যাটাচি কেসে রিভলভারটা ভরে নেয়। মৃতদেহ-সমেত মারুতি-সুজুকি গাড়িটা ডাইভার্শান রোডের বিপরীত দিকে কালভার্টের নিচে গড়িয়ে দেয়। বলাবাহুল্য, নিজের আঙুলের সব ছাপ মুছে নিয়ে। তারপর হিচ-হাইক করে সে সল্ট লেক বা লেক টাউনে— যেখানে তার ট্যাক্সিটা রাখা ছিল সেখানে ফিরে আসে। রুবির বাড়িতে যায়। দেখে, ছাদে মিস্ত্রিরা কাজ করছে বটে কিন্তু কেউ তাকে নজর করছে না। রুবির বাড়িতে গাড়িটা গ্যারাজ করা ছিল না, ছিল ড্রাইভ-ওয়েতে, তার ড্রাইভারের দিকের কাচটা নামানো। রুবিই বলেছে, সেটা ওঠানো যাচ্ছিল না। সহদেব ইতিমধ্যে রিভলভারের ব্যারেলটা সাফা করেছে। একটা তাজা বুলেট ভরে দিয়েছে। এবার সে সুযোগ বুঝে একটা তোয়ালে জড়িয়ে রিভলভারটা অস্টিন গাড়ির ড্রাইভারের সিটে নামিয়ে দিয়ে কিছু দূরে অপেক্ষা করে। একটু পরে রুবি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে, গাড়িটা গ্যারেজ করতে। ড্রাইভার-সিটে রিভলভারটা আবিষ্কার করে সে স্তম্ভিত হয়ে যায়। কী করবে স্থির করে উঠতে পারে না। কিন্তু সহদেব আন্দাজ করতে পেরেছিল, সে কী করবে। থানায় ফোন করবে না। করবে তার সলিসিটরকে। আমার পরামর্শটা সে সবার আগে নেবে। সহদেব আরও আন্দাজ করেছিল— আমি ওকে বলব, যন্ত্রটা নিয়ে আমার হেপাজতে দিয়ে যেতে। বাস্তবেও তাই ঘটেছিল। রুবির অস্টিন গাড়ির পিছন পিছন সহদেব তার ট্যাক্সিটা চালিয়ে নিয়ে আসে। রুবি বার দুই হাত নেড়ে ওকে ওভারটেক করতে বলে; কিন্তু সহদেব ওকে অতিক্রম করে যায় না। সে অপেক্ষা করছিল কতক্ষণে রুবির অস্টিনটা সেই অভিশপ্ত ডাইভারশানটার কাছে আসে। তার কাছাকাছি এসেই ও রুবির অস্টিনটাকে ডানদিক থেকে ঠেশে ধরে। সে যা চেয়েছিল তাই হল : রুবি ওকে ভয় দেখাতে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করলে। একটা... দুটো! তখনই সহদেব ব্রেক কষে। ফিরে যায়। সহদেব আশা করেছিল, আহমেদের দেহের ভিতর থেকে বুলেটটা উদ্ধার করা যাবে— আর ব্যালিসটিক এক্সপার্ট কম্পারেটিভ মাইক্রোস্কোপের টেস্টে প্রমাণ করবেন যে, রুবির রিভলভার থেকেই ফেটাল বুলেটটা নিক্ষিপ্ত। সে স্বপ্নেও ভাবেনি, জনার্দন ঐ মারণাস্ত্রটা বদলে দেওয়ার সুযোগ পাবেন— হ্যাঁ, তাই পেয়েছিলেন, রবি— তুমি জান কি জান

না, জানি না...?

রবি বাধা দিয়ে বলল, 'জানি। তারপর?'

'সহদেব ভেবেছিল, সে নিপুণহাতে সব কিছু করেছে। একুশ হাজার টাকা তার হেপাজতে। ভাগিদার কেউ নেই। আহমেদ মৃত। রুক্মিণীর চোরের মায়ের কান্না ছাড়া কিছু করার নেই। চোরাই কোল্ট-কোবরা রিভলভারটা গছিয়ে দিয়েছে রুবির ঘাড়ে। বেলুড়ের চুরির কেস অথবা আহমেদ হত্যা কেসে তাকে কোনভাবেই পুলিশে জড়াতে পারবে না। কিন্তু একটা ঝামেলা হয়ে গেছে। রুবির দ্বিতীয় বুলেটে ওর ট্যাক্সির বনেটের বাঁদিকে একটা ফুটো হয়েছে! এটা বিশ্রী একটা এভিডেন্স। সহদেব সেটা মেরামত করে নিতে চাইল, সে নিজেই মেকানিক। তাই হাতুড়ি দিয়ে সামনের মাডগার্ডে আর হেডলাইটে আঘাত করে একটা কৃত্রিম অ্যাকসিডেন্টের পরিবেশ তৈরি করে ট্যাক্সিটা বিশ্বস্ত রিপেয়ার গ্যারেজে মেরামত করতে দিয়ে আসে। ট্যাক্সি-মালিকের অগোচরে গাঁটের পয়সা খরচ করে সে ওটা সারাতে দেয়। বিশেষ অনুরোধ থাকে, ফুটোটা বন্ধ করে তাপ্পি লাগানো।

রবি চট করে উঠে দাঁড়ালো। নিচু হয়ে বাসুসাহেবকে প্রণাম করল একটা।

বাসু বললেন, 'যত রাতই হোক ফোন কোরো আমাকে। আমি জেগে থাকব।'

'ইয়েস স্যার।'

রাত সাড়ে দশটা।

নৈশাহার সেরে যে যার ঘরে চলে গেছেন। মন্ত্রগুপ্তি বাসুসাহেবের মজ্জায়-মজ্জায়। কাউকে কিছু বলেননি। শুধু রানুকে বললেন, 'তুমি শুয়ে পড়। আমি লাইব্রেরি ঘরে একটু পড়ব।'

রানু বললেন, 'তিন পেগের বেশি খেও না যেন।'

'কী আশ্চর্য! আমি পড়ব বলেছি! ড্রিংক করবো তো বলিনি।

'ওই হলো।'— হুইল চেয়ারে পাক মেরে তিনি শয়নকক্ষের দিকে চলে গেলেন।

টেলিফোন লাইনটা ডাইরেক্ট করাই ছিল। রাত এগারোটা নাগাদ বাজল সেটা। বুঝলেন রবি বোস। তুলে নিয়ে আত্মঘোষণা করতেই ও প্রান্ত থেকে সাড়া দিলেন প্রমীলা পাণ্ডে, 'জেগে ছিলেন তো স্যার? ডিস্টার্ব করছি না?'

'না। আমি জেগে জেগে বই পড়ছি। ইন-ফ্যাক্ট একটা ফোন এক্সপেক্ট করছি—'

'জানি। ইন্সপেক্টর রবি বোসের। উনি এতক্ষণ এখানেই ছিলেন। আজ্ঞে হ্যাঁ, এই হোটেল হিন্দুস্থানে। এইমাত্র চলে গেছেন। আপনার প্রথম অনুমান অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। মানে গহনা চুরির কেসটা। আমি ভাবতেই পারিনি চোরাই গহনাগুলি আমার পাশের ঘরেই রয়েছে— রুক্মিণীর ঐ স্যুটকেসে! রিভলভার আর মুকুট ছাড়া সে সব কিছুই নিজের কাছে রেখেছিল। আহমেদও বোধহয় মনে করেছিল, এটাই সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। তা সে যাই হোক, আহমেদের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর থেকেই রুক্মিণী কেমন যেন পাগলামি শুরু করে। আমরা তার হেতুটা ঠিক বুঝতে পারিনি। রবিবাবুর ধমকানিতে সে কাঁদতে কাঁদতে সবকিছুই স্বীকার করেছে।

চুরি যাওয়া গহনার প্রায় সবটাই উদ্ধার করা গেছে।'

বাসু জানতে চান, 'রবি কি ওকে অ্যারেস্ট করেছে?'

'করবে না? বলেন কী!'

'বুঝলাম। কিন্তু মুকুটটা উদ্ধার করতে তুমি যে একুশ হাজার টাকা আহমেদকে দিয়েছিল...?'

'আজ্ঞে না। সে তো জীবনবাবুকে। জীবন ব্রহ্মচারী।'

'ঐ হল! তার নোটের নম্বর কি টুকে রেখেছিলে?'

'নিশ্চয়। লিস্টটার কপি দিয়ে দিয়েছি রবিবাবুকে...'

'আর কিছু বলবে?'

'বলব স্যার। আপনার ক্লায়েন্টের কাছে অপরাধী হয়ে আছি। আপনি আমাকে ঋণমুক্ত করুন স্যার! আপনি অনুমতি দিলে কাল সকালে চেকটা দিয়ে আসব।'

'কত টাকার?'

'আমি তো ভেবেছি, বিশ হাজার টাকা। আপনি কি বলেন?'

'আমার মক্কেল রাজি। এসো, কাল সকালে। গুড নাইট!'

রবি ফোন করল রাত বারোটায়।

সে সহদেবকে গ্রেপ্তার করেছে। তার বাসায় তল্লাশি চালিয়ে গোপন স্থান থেকে নোটের বাণ্ডিল পাওয়া গেছে। অসংখ্য নম্বরী নোট। কাল সকালেই যাতে রুবি ছাড়া পায় এটা সে দেখবে। শুধু তাই নয়—স্বয়ং ওঁর মক্কেলকে নিউ আলিপুরে পৌঁছে দেবে।

বাসু বললেন, 'থ্যাঙ্কস! গুডনাইট। তোমার তো ডিউটি খতম হল, রবি। আমার হল না।'

'সে কী? আপনার আবার কী কাজ বাকি রইল?'

'বাঃ। ঐ আনপড় ছাপড়া জেলার বালবিধবাটিকে মক্কেল করে নতুনভাবে কেস লড়তে হবে না? লোভে পড়ে ও অন্যায় করেছে বটে, কিন্তু লোভটা তো দেখিয়েছি আমরাই, শিক্ষিত পুরুষমানুষেরাই! বেচারি ধরা পড়ল তো আমারই জন্য। বিনা ফিজ-এ লড়ে প্রায়শ্চিত্তের কিছুটা আমাকেই করতে হবে বৈকি।

ন্যায়নিষ্ঠ ন্যাসনাশীর কাঁটা

রচনাকাল : প্রাক্‌পূজা '93

[পূজাসংখ্যা ওভারল্যান্ড '94-এ প্রকাশিত]

পুস্তকাকারে প্রকাশ : বইমেলা '94

গ্রন্থক্রমিক : 96

উৎসর্গ : বিউটি মজুমদার

প্রচ্ছদ : লেখক

।। এক ।।

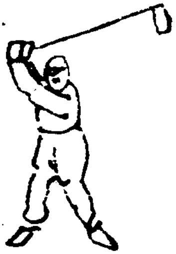

—কী চায় লোকটা?

—তা কেমন করে জানব? সবাই যা চায় ও-ও তাই চাইছে। তোমার সাক্ষাৎ। কারণটা আমাকে জানাতে রাজি নয়।

—কী নাম? কী করে?

—নাম অনির্বাণ দত্ত, বয়স আন্দাজ উনত্রিশ। সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, পোশাক-পরিচ্ছদ ভদ্র, কিছু উগ্রও। পেশা কী জানতে চাওয়ায় বলল — 'Investment Counsellor'। সেটার বাংলা কী হবে? 'বিনিয়োগ হিতৈষী?'

—বাংলায় অনুবাদ নাই করলে। অনেক সময় অনুবাদ করতে গিয়েই গোল বাধে। কিন্তু ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে। আমি তো কোথাও কোন অর্থ লগ্নি করতে চাই না, মানে বর্তমানে সক্ষম নই, এ কথাটা ওকে বলেছ?

—না, না, ও এসেছে নিজের ধান্দায়। তোমাকে শেয়ার বেচতে নয়।

—ঠিক আছে, পাঠিয়ে দাও।

রানু তাঁর ইনভ্যালিড চেয়ারে একটা পাক মেরে কক্ষান্তরে চলে গেলেন। অর্থাৎ রিসেপশন কাউন্টারে।

ধরে নেওয়া হচ্ছে : বাসুসাহেব এবং রানুদেবী আপনাদের পরিচিত। অর্থাৎ ইতিপূর্বেই কিছু কণ্টকাকীর্ণ পথে পরিভ্রমণ করার দুর্ভাগ্য আপনাদের হয়েছে। তা না হয়ে থাকলে সংক্ষেপে বলে রাখা দরকার—

পি. কে. বাসু হচ্ছেন কলকাতা বারের একজন সুপ্রসিদ্ধ ক্রিমিনাল-সাইড ব্যারিস্টার। জনশ্রুতি — তিনি নাকি ইতিপূর্বে কোনও কেসে হারেননি। এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বাসুসাহেবকে প্রশ্ন করলে উনি জবাব দেন না, হাসেন।

মিসেস রানু বাসু ওঁর সহধর্মিণী — একাধিক অর্থে। কারণ তিনি ওঁর স্ত্রী, কনফিডেন্‌শিয়াল সেক্রেটারী, স্টেনো এবং ওঁদের জীবনের এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার ভাগীদার। মিসেস বাসু চলৎশক্তিহীনা — সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায়। একটা হুইলচেয়ারে তিনি সারা বাড়ি ঘোরেন। বাড়ির বাইরে যান কদাচিৎ।

ওঁদের বাড়িটা নিউ আলিপুরে। ইংরেজি 'U' অক্ষরের আকার। দ্বিতল বাড়ি। দোতলায় থাকে কৌশিক আর সুজাতা মিত্র। তারা একটা প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থার যৌথ মালিক : 'সুকৌশলী'। নামকরণটা বাসুসাহেবই করেছিলেন : লেডিজ ফার্স্ট আইনের ধারা মোতাবেক প্রথমে সুজাতার আদ্য অক্ষর 'সু', পরে কৌশিকের 'কৌ'। আর 'শলী'টা হচ্ছে 'খলু', পাদপূরণের প্রয়োজনে।

সংসারে এছাড়া আছে বিশ্বনাথ — বিশু। ওঁদের কম্বাইন্ড হ্যান্ড। তুখোড় মেদনিপুরিয়া।

রানু তাঁর ইনভ্যালিড চেয়ারে পাক মেরে চলে যাবার একটু পরেই দরজাটা আবার খুলে গেল। দ্বারপ্রান্তে একটি সুসজ্জিত যুবকের আবির্ভাব। সিলভার গ্রে রঙের স্যুট, নীল-সাদা এড়াএড়ি স্ট্রাইপ-কাটা টাইয়ে অক্সফোর্ড-নট। দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে পড়েছে। চোখাচোখি হতে যুক্ত করে বললে, মাপ করবেন স্যার, বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে আসতে হয়েছে। নিতান্ত বিপদে পড়ে। ব্যাপারটা ভীষণ জরুরী। আপনি যে দেখা করতে রাজি হয়েছেন এতে...

বাসু বলেন, নিতান্ত বিপদে না পড়লে কেউ আমার সঙ্গে সৌজন্যসাক্ষাতে আসে না। আসুন, ভিতরে এসে বসুন।

—আমাকে তুমি-ই বলবেন, স্যার। আমার নাম...

—জানি। অনির্বাণ দত্ত। তুমি নিশ্চয় জান অনির্বাণ যে, দেওয়ানী মামলার পরামর্শ আমি দিই না। তোমার প্রফেশনের সঙ্গে আমার কর্মপদ্ধতির যোগাযোগ হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। আশঙ্কা হচ্ছে, আমারা দুজনেই নিজের-নিজের সময় নষ্ট করছি।

অনির্বাণ গুছিয়ে বসেছে। বললে, ফৌজদারী মামলার আসামীকে আপনি পরামর্শ দেন নিশ্চয়! তাহলেই হল...

—ফৌজদারী মামলা? আসামীটি কে?

অনির্বাণ জবাব দিল না। বামহস্তের তর্জনী দিয়ে নিজের বক্ষস্থল চিহ্নিত করল।

বাসু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সাক্ষাৎপ্রার্থীকে আপাদমস্তক আর একবার দেখে নিয়ে বললেন, তোমাকে

অ্যারেস্ট করেছিল কবে? জামিনই বা কবে পেলে?

—আজ্ঞে না। আমাকে পুলিশে অ্যারেস্ট করেনি এখনো। যাতে না করতে পারে তাই তো আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি।

—বুঝলাম। কিন্তু কীর্তিটা কী জাতের? এম্বেজ্‌ল্‌মেন্ট? তহবিল তছরুপ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠিকই ধরেছেন।

—কোন হতভাগ্যের তহবিল?

—হতভাগ্য নয় স্যার, হতভাগিনীর। একটি তরুণীর : করবী সেন।

—টাকার অঙ্কটা কত?

—একদিক থেকে হিসেব করলে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা।

বাসু ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে পাইপ ধরালেন। বললেন, লুক হিয়ার, ইয়ং ম্যান, প্রতিটি মানুষের অধিকার আছে আদালত থেকে সুবিচার পাওয়ার। সেজন্য সে যে কোনও আইনজীবীর দ্বারস্থ হতে পারে। তার আশঙ্কা, কৃতকর্ম অথবা অপরাধের কথা সবিস্তারে জানাতে পারে। আইনজীবী কেসটা নিতে পারেন। নিন বা না নিন প্রফেশনাল এথিক্সে তিনি মক্কেলকে সেজন্য পুলিসে ধরিয়ে দিতে পারেন না। অপরপক্ষে প্রতিটি আইনজীবী প্রতিটি অপরাধীকে রক্ষা করতে বাধ্য নয়। তুমি এ পর্যন্ত যেটুকু বলেছ তাতেই আমি বুঝতে পেরেছি তোমার কেসটা আমি নিতে পারব না। এক্ষেত্রে তুমি ঐ করবী সেন নাম্নী হতভাগিনীর অর্থ কীভাবে আত্মসাৎ করেছ তা বিস্তারিত শুনবার আগ্রহ আমার নেই। তোমার এ স্বীকৃতি গোপন থাকবে। তুমি আর কোনও আইনজীবীর দ্বারস্থ হও। আর তুমি যদি ও ঘরে কিছু রিটেইনার দিয়ে এসে থাক তাহলে তা ফেরত নিয়ে যাও। আমি ইন্টারকমে বলে দিচ্ছি...

—কিন্তু আপনি তো, স্যার, আমার সমস্যার কথাটা এখনো শোনেনইনি...

—আর শোনার কী দরকার? তুমি তো নিজেই স্বীকার করছ যে, একটি তরুণীর তহবিল তছরুপ করে তুমি অপরাধী।

—আজ্ঞে না। তা তো আমি বলিনি। তহবিল তছরুপ করেছি আইন মোতাবেক। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধী। আইনের কাছে কি না জানি না, বিবেকের কাছে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

বাসুসাহেব ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, পাঁচ মিনিট সময় আমি দেব তোমাকে। তার ভিতর তোমার গল্পটা বলতে হবে। যদি আমি ইন্টারেস্টেড হই তাহলে তোমার কেসটা নেব; যদি না হই তাহলে ঐ রিটেইনারটা গচ্চা যাবে— কনসালটেশন ফী বাবদ— আমার পাঁচ মিনিট সময়ের দাম। নাউ স্টার্ট...

অনির্বাণ তৎক্ষণাৎ শুরু করল তার কাহিনী :

করবী সেনের পিতা স্বর্গত রঘুবীর সেন পিতৃমাতৃহীন অনির্বাণকে মানুষ করেন। তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন মিলিটারির ঠিকাদার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আসাম আর বর্মা অঞ্চলে ঠিকাদারী করে বেশ কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন। যুদ্ধান্তে তিনি কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে একটি দ্বিতল গৃহ

নির্মাণ করে সেখানেই বসবাস শুরু করেন। ঐ সময় তিনি বিবাহ করেন কিন্তু প্রথম সন্তান প্রসব করতে গিয়েই তাঁর স্ত্রী মারা যান। প্রায় কিশোর বয়স থেকে অনির্বাণ রঘুবীরের সংসারে আছে। অনির্বাণের বাবা ছিলেন রঘুবীরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বাবার মৃত্যুর পর অনির্বাণ তাঁর সংসারে মানুষ হতে থাকে। রঘুবীরকে সে কাকাবাবু ডাকত। পিতৃপ্রতিম শ্রদ্ধাও করত। বিপত্নীক রঘুবীরের সংসার দেখত ঠাকুর-চাকর আর বিধবা পিসিমা। পিসিমা কিছুতেই রঘুবীরকে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে সম্মত করাতে পারেননি। স্ত্রীবিয়োগের পর রঘুবীর সংসারে বেশ উদাসীন হয়ে পড়েন। উপার্জন বন্ধ। সঞ্চিত অর্থের সুদেই সংসার চলত। গৃহিণীহীন সংসারে মানুষ হতে থাকে রঘুবীরের একমাত্র সন্তান : মাতৃহীনা খুকু। পোশাকী নাম : মিস করবী সেন। ঐ সংসারে থেকেই অনির্বাণ হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে। কলেজে ভর্তি হয়। ক্রমে বি. কম. পাস করে। তারপর আর পড়াশুনা করতে চায় না। রঘুবীরের ইচ্ছা ছিল ও এম. কম.-এ ভর্তি হোক। অনির্বাণ রাজি হয় না। সে বুঝতে পারে রঘুবীরের সঞ্চয় তিলতিল করে নিঃশেষ হয়ে আসছে। বসে খেলে স্বয়ং কুবেরও ভিখারি হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে রঘুবীর তাঁর বসত বাড়িটি বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছেন। শেষ জীবনে সে বাড়িতেই ভাড়াটে হিসাবে বাস করছেন। অনির্বাণ 'রিয়্যাল এস্টেট'-এর ব্যবসা শুরু করল। ইতিমধ্যে সে হয়ে উঠেছে অপুত্রক রঘুবীর সেনের দক্ষিণ হস্ত। সবচেয়ে বিশ্বস্ত।

একই বাড়িতে থাকে। ফলে ভাইবোনের মতো বড় হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। খুকু অনির্বাণের চেয়ে আট বছরের ছোট। মাতৃহীন আদুরে মেয়েটির অনেক-অনেক হোমটাস্কের অঙ্ক কষে দিতে হয়েছে অনির্বাণদাকে। তবে খুকু সেজন্য কোনও কৃতজ্ঞতা বোধ করত না। বাল্যে আর কৈশোরে তার ধারণা ছিল আশেপাশে যারা আছে তাদের একমাত্র কাজ ওকে খুশি রাখা।

বছর চারেক আগে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হলেন রঘুবীর। পিসিমা তার আগেই সাধনোচিত ধামে পাড়ি দিয়েছেন। খুকুর তখন সবে ষোলোকলা পূর্ণ হয়েছে : সে ষোড়শী। অনির্বাণের বয়স চব্বিশ।

রঘুবীরের মৃত্যুর পর উদ্ধারপ্রাপ্ত হল একটি বিচিত্র উইল। ফিয়াট গাড়িটি বাদে সমস্ত সম্পত্তি তিনি দিয়ে গেছেন একটি ট্রাস্টকে। অনির্বাণ এককভাবে সেই ট্রাস্টি : সম্পত্তির অছি। সে ইচ্ছা মতো সম্পত্তির কেনাবেচা করতে পারবে। বাকী ছয় বছরের জন্য অনির্বাণ খুকুর প্রয়োজন মতো তাকে মাসোহারা জোগাবে। সংসারের যাবতীয় খরচ-খরচা মেটাবে। করবীর বয়স যখন বাইশ বছর হবে তখন সম্পত্তির অধিকার বর্তাবে তার উপর। তার পূর্বে করবীকে ঐ 'উটকো অছি' অনির্বাণের কাছে মাসে-মাসে হাত পাততে হবে। শুধু তাঁর গাড়িখানা দিয়ে গেছেন পুত্রপ্রতিম অনির্বাণকে। কেন এমন ব্যবস্থা করে গেলেন সেকথা উইলে সবিস্তারে জানিয়ে গেছেন প্রয়াত রঘুবীর সেন। তার চুম্বকসার দুটি পংক্তিতে বিবৃত করা যায়। এক : তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, মাতৃহীন করবী বয়সের তুলনায় পরিণতবুদ্ধির তরুণী হয়ে ওঠেনি, সে বিশ্বাসপ্রবণ, তাকে সহজেই লোকে ঠকিয়ে নেবে। দুই : অনির্বাণ দত্ত রঘুবীরের মূল্যায়নে খাঁটি মানুষ। তাই তাকেই এককভাবে করে গেলেন ন্যায়নিষ্ঠ ন্যাসরক্ষী।

বাসু বলেন, বুঝলাম। মৃত্যুসময়ে কত টাকা উনি রেখে গেছেন?

—ভাড়াটে বাড়ি, ভূসম্পত্তি নেই, গাড়িটা তো দিয়েছেন আমাকে। তাছাড়া— পেপার ভ্যালু প্রায় এক লক্ষ টাকা— মানে ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স, শেয়ার, ইউনিট ট্রাস্ট, এন.এস. সি. ইত্যাদি।

বাসু বললেন, কিন্তু তুমি যে তখন বললে, 'তহবিলের তছরুপের পরিমাণটা আড়াই লাখ টাকা?' —এবার সেই দিকদর্শন যন্ত্রটা তোমার আস্তিনের তলা থেকে বার কর। হিসাবটা কোন দিক থেকে করলে...

অনির্বাণ বাধা দিয়ে বললে, খুকুর বাবা আমাকে শুধু 'ন্যাসরক্ষক' বা ট্রাস্টিই করে যাননি, শেয়ার কেনাবেচার নিরঙ্কুশ অধিকারও দিয়ে গিয়েছিলেন। আমি নিজের বুদ্ধিমতো বেচেছি এবং কিনেছি। এখন সেটা বাড়তে বাড়তে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা হয়ে গেছে।

—এ তো আনন্দের কথা। করবী সেনের বাইশ বছর বয়স হতে আর কত দেরি?

—মাসখানেক। ইন ফ্যাক্ট, জুলাইয়ের দশ তারিখ।

—তাহলে সেই সময় টাকাটা ওকে বুঝিয়ে দিও। এক লক্ষ বৃদ্ধি পেয়ে ছয় বছরে আড়াই লক্ষ হওয়াতে সে নিশ্চয় আপত্তি করবে না।

অনির্বাণ সোজা হয়ে বসল। বলল, মুশকিল কি জানেন, স্যার? হিসাব দেখলে খুকু খেপে যাবে। বলবে, কেন আড়াই লক্ষ? কেন নয় দশ লক্ষ?

—আই সী! তাহলে আরও একটু বুঝিয়ে বল। তুমি 'অছি' হিসাবে কোন্ 'ফিনান্সিয়াল ইয়ার' পর্যন্ত হিসাব ঐ মেয়েটিকে বুঝিয়ে দিয়েছ?

—আমি আজ পর্যন্ত কোনও হিসাবই দিইনি। দেওয়ার উপায় ছিল না। ও প্রথম থেকেই আমাকে শত্রুপক্ষ হিসাবে দেখে এসেছে। ওকে খুব দোষও দেওয়া যায় না। বাপের সম্পত্তিতে তার কোনও অধিকার নেই। প্রতিটি ব্যাপারে আমার কাছে তাকে হাত পাততে হয়। কার ভাল লাগে বলুন?

—তা ঠিক। কিন্তু এমন অদ্ভুত উইল উনি কেন করেছিলেন বলতো, অনির্বাণ?

—নিঃসন্দেহে কন্যাকে রক্ষা করতে!

—কার কাছ থেকে?

—তাঁর কন্যার অপরিণত বুদ্ধির হাত থেকে।

—আর তোমার হাত থেকে তাকে বাঁচাতে কী ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন সেই ধুরন্ধর ব্যবসায়ী?

—কিছুই নয়। আমাকে তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন। মুশকিল কী হল জানেন, স্যার, খুকুর বয়স যখন আঠারো, অর্থাৎ আইনত সে যখন সাবালিকা হল, তখন সে আমার বিরুদ্ধে একটা কেস ফাইল করে বসে। যেহেতু সে আইনত সাবালিকা, তাই আমি ঐ উইলের বলে তার উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্য টাকা আটকে রাখতে পারি না। এ মামলা সে স্ব-ইচ্ছায় করেনি আমি জানি, কিন্তু যার পরামর্শেই করে থাকুক, আইনের চোখে সে ছিল বাদী। আমি প্রতিবাদী।

মামলায় খুকুর নিরঙ্কুশ হার হল। কাকাবাবু, মানে স্বর্গত রঘুবীর সেন যে উইল করে গিয়েছিলেন তাতে কোনও ফাঁক ছিল না। বিচারক তাঁর রায়ে বললেন, বাইশ বছর বয়স হবার আগে করবী ঐ সম্পত্তিতে হাত দিতে পারবে না। তবে 'রায়'-এ প্রতিবাদীকেও 'অ্যাডমনিশ' করলেন, হিসাব দাখিল না করার জন্য। অবিলম্বে বার্ষিক হিসাব দাখিল করতে বললেন। আমি খুকুকে ডেকে পাঠালাম হিসাব বুঝে নিতে। সে এল না। রাগ করে বসে থাকল।

—আমি কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না, তোমার সমস্যাটা ঠিক কী?

—শুনুন স্যার, বুঝিয়ে বলি। কাকাবাবুর মৃত্যুর পর আমি ভবানীপুরের বাড়ি ছেড়ে কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে একটা মেসে এসে আশ্রয় নিই। খুকু আমাকে বরদাস্ত করতে পারত না। ও সে বছর মাধ্যমিক দেবে। আমি আড়ালে থেকে ছয় বছর ধরে ওর যাবতীয় খরচ জুগিয়ে গেছি। ও যখন আমার বিরুদ্ধে মামলা করল তখন ও হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেছে। শুনতে অদ্ভুত লাগবে, কিন্তু ওর সেই মামলা করার যাবতীয় খরচও আমিই দিয়েছি। মামলায় হেরে যাবার পর ও পড়াশোনা ছেড়ে দিল। একদল ছেলের সঙ্গে তখন ওর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। তাদের কেউ গ্রুপ থিয়েটার করে। কেউ লিটল ম্যাগাজিন। কেউ বোহিমিয়ান আর্টিস্ট, কেউ কট্টর রাজনৈতিক পার্টির মস্তান। ও তাদের মধ্যে 'টম-বয়'। বয়েজ-কাট চুল কেটে, প্যান্ট-শার্ট পবে ও সেই দলের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে। সবাই ওর প্রেমিক। সবাই ওকে বিয়ে করতে চায়। কারণ বেকারের দল জানে, দু-চার বছরের ভিতরেই খুকুর হাতে আসবে অন্তত এক লক্ষ টাকা। আমি তাই খুকুকে জানাতে পারলাম না যে, ওর পৈত্রিক উত্তরাধিকারের অর্থমূল্য এক লাখ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে আড়াই লাখ হয়ে গেছে। বরং ওকে মিথ্যা করে এমন ভাব দেখাতাম যে, মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে ওর ভাগে দেড়-দু হাজার টাকা হয়-কি-না হয়! তাছাড়া খুকুর বাবার নামে যত শেয়ার ছিল সব আমি আমার নিজের নামে ট্রান্সফার করিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। নাহলে শেয়ার মার্কেটে সকাল-বিকাল কেনাবেচা করা মুশকিল হয়ে পড়ে। খাতা-কলমে খুকুর প্রাপ্য সত্যিই দেড়-দু হাজার টাকা। কারণ বাকি অংশটা আমার নামে রয়েছে। এটা তহবিল তছরুপ নয়?

—আলবাৎ তহবিল তছরুপ। 'ট্রাস্টি' বা অছি হিসাবে তুমি এভাবে ন্যাসবদ্ধ অর্থ নিজের নামে পরিবর্তন করতে পার না। তা আইনত যাই হোক, টাকাটা যখন তুমি ওকে ফিরিয়ে দিতে রাজি...

—মুশকিল কি জানেন, স্যার, টাকাটা আমি ওকে ওর বাইশতম জন্মদিনে ফিরিয়ে দিতে রাজি নই!

—সে কি! কেন? তুমি সত্যই তহবিলটা তছরুপ করতে চাও? আর সে বিষয়ে আমার পরামর্শ চাইছ!

—কী মুশকিল! আপনি সমস্যাটা বুঝতে পারছেন না। খুকুর চারপাশে এক ঝাঁক হাঙর! তারা প্রতীক্ষা করে আছে ওর বাইশতম জন্মদিনের জন্য! দেখুন স্যার, কাকাবাবু যা চেয়েছিলেন তা আমি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছি। ওকে অমিতব্যয়ী হতে দিইনি। হাতে যথেষ্ট টাকা থাকলে ও যে শুধু মদে থামতো, না হেরোইন, এল. এস. ডি.-তে তা খোদায় মালুম। আমি

নিশ্চিতভাবে জানি, ওর দু-একটা বন্ধু ড্রাগ-অ্যাডিক্ট! তাই ওকে না জানিয়ে আমি ওর বাবার আশীর্বাদটাকে আড়াই গুণ বৃদ্ধি করেছি। ওকে বাঁচিয়েছি ওর নিজের কাছ থেকে। এখন আমি কীভাবে দু-কূল রক্ষা করতে পারি আপনি একটা বুদ্ধি বাৎলান।

—ঠিক কার আক্রমণ থেকে ওকে রক্ষা করতে চাও?

—শুধু ওর তথাকথিত প্রেমিক বন্ধুদের আক্রমণ থেকে নয়, ওর নিজের অপরিণত বুদ্ধির হাত থেকে।

—একবার মামলা করে হেরেছে। সে নিশ্চয় খেপে আগুন হয়ে আছে। এবার মামলা করলে সে তোমাকে জেল খাটাতে পারে। তা জান?

—কী মুশকিল! তাই জানি বলেই তো কলকাতা-বারের সবসেরা ব্যারিস্টারের শরণ নিয়েছি। আপনি স্যার, এমন একটা বুদ্ধি বাৎলান যাতে লাঠিটাও না ভাঙে আর সাপগুলো না মরলেও যেন ভেগে যায়।

—তোমার নামে যে আড়াই লক্ষ টাকার শেয়ার আছে, তা বাস্তবে করবী সেনের প্রাপ্য, এ-কথা কেউ জানে না?

—এই তো আপনি জানলেন।

—ধর যদি তোমার মৃত্যু হত? গত বছর, গত মাসে?

—আমার বয়স ত্রিশ, স্বাস্থ্য ভাল। কলেজে ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ন ছিলাম। মরবার কোনও লক্ষণ তো ছিল না স্যার?

—কলকাতা শহরে মোটর অ্যাকসিডেন্টে ত্রিশ বছরের যুবক কোনদিন মরেনি? সেক্ষেত্রে টাকাটা তোমার ওয়ারিশ পেত! করবী সেন জানতেও পারত না যে, তুমি তাকে কীভাবে বঞ্চিত করেছ।

—না, স্যার, তা হত না। প্রথমত, আমার তিনকুলে কেউ নেই। আপনি বলবেন, 'আড়াই লাখ টাকার সম্পত্তি রেখে যদি কেউ মারা যায় তাহলে লতায়-পাতায় সম্পর্ক ধরে ওয়ারিশ ঠিকই হাজির হয়।' তা হয়, অস্বীকার করব না। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সে কিছু পেত না। কারণ আমি একটি উইল করে রেখেছি। তার কপি আমার সলিসিটারের কাছে আছে। যে ব্যাঙ্কভল্টে অরিজিনাল শেয়ারগুলো আছে, সেই ভল্টেও এক কপি রাখা আছে। আমার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আমি ওকেই দিয়ে গেছি সেই উইলে।

বাসুসাহেবের পাইপে আর তামাক ছিল না। পোড়া ছাইটা অ্যাশট্রেতে ঝেড়ে ফেলে উনি বললেন, লুক হিয়ার ইয়ং ম্যান, তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিজনেস ভাল বোঝ, এক্ষেত্রে তুমি এতবড় রিস্ক নিতে পার একটিমাত্র হেতুতে। সেটা এবার নিজমুখে স্বীকার কর। আমি মনস্থির করি কেসটা নেব, না নেব না।

অনির্বাণ পুরো দশ সেকেন্ড নির্বাক তাকিয়ে রইল বাসু-সাহেবের দিকে। তারপর বললে, অল রাইট স্যার, আই কনফেস। আপনি যা আন্দাজ করেছেন তাই!

—কথাটা ওকে জানিয়েছ কখনো?

—জানিয়েছিলাম। কাকাবাবু বেঁচে থাকতে। কিন্তু তখন ও প্রায় কিশোরী! আমার সঙ্গে বয়সের ফারাকটা তখন খুবই প্রকট। ও বলেছিল, 'তা হয় না অনিদা! তোমাকে চিরকাল নিজের দাদার মতো দেখে এসেছি। ওকথা যদি আর কোনদিন বল, তাহলে এই বন্ধুত্বের সম্পর্কটাও থাকবে না। আমি কথাই বলব না তোমার সঙ্গে।'... তারপর ওর বাবার মৃত্যুর পর সম্পর্কটা তিক্ত হয়ে পড়ে। ও বুনো ঘোড়ার মতো সর্বদা আমাকে চাট মারবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত। যে কারণে আমি ওদের বাড়ি ছেড়ে মেসবাড়িতে উঠে আসি। আর মামলায় হেরে যাবার পর তো সে আমার সঙ্গে সরাসরি কথাই বলে না। যেটুকু কথাবার্তা হয়— টাকাপয়সা নিয়ে— তা টেলিফোনে।

—তোমার মেসে টেলিফোন আছে?

—না নেই, অফিসে আছে।

বাসু বললেন, অলরাইট! আমি তোমার কেসটা নিলাম। তুমি কি ওঘরে কোনও 'রিটেইনার' দিয়ে এসেছ?

—আজ্ঞে না। উনি বললেন, আপনি যদি কেসটা নেন তাহলেই অগ্রিম দেওয়ার প্রশ্ন উঠবে।

বাসুসাহেব মনে মনে হাসলেন। নেড়া তাহলে একবারের বেশি বেলতলায় যায় না। বাসুসাহেব সাক্ষাৎপ্রার্থীকে ক্লায়েন্ট হিসাবে মেনে নেওয়ার আগে রানু আর কিছুতেই রিটেইনার গ্রহণ করেননি।* বললেন, শোন অনির্বাণ, তোমাকে তিনটি কাজ করতে হবে। এক নম্বর : আমাকে একটা অ্যাকাউন্ট-পেয়ী চেকে 'রিটেইনার' মানি দিয়ে যাও,— এক হাজার— যাতে আমি তোমাকে আইনত মক্কেল বলে স্বীকার করতে পারি। দু'নম্বর : তোমার লেটারহেডে একটা ঘোষণাপত্র লিখে ফেল 'টু হুম ইট মে কনসার্ন'— জাতীয় স্বীকারোক্তি। তাতে লিস্ট করে সাজিয়ে দাও যেসব শেয়ার তোমার নামে বর্তমানে আছে, যা তুমি বিশেষ কারণে নিজের নামে রেখেছ এবং যার মালিক করবী সেন, তুমি যার ন্যাসপাল বা ট্রাস্টি! ওটা আমাকে কাল বিকালের মধ্যে পৌঁছে দিয়ে যেও।

—আপনি, স্যার, তিনটি কাজের কথা বলেছিলেন। তৃতীয়টা?

—তিন নম্বর কাজটা হচ্ছে করবীকে কাল টেলিফোন করে বল যে, সে যেন আমার সেক্রেটারিকে একটা ফোন করে। আমি তার সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলতে চাই।

—কেন স্যার?

—বাইশতম জন্মদিনে সে কী পরিমাণ উত্তরাধিকার লাভ করবে তার ইঙ্গিত তাকে আগেভাগে জানাতে হবে। তুমি যদি তা বলতে যাও তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। আমি হয়তো ওকে বুঝিয়ে দিতে পারব ব্যাপারটা। ও তখন তোমার উপর রাগ করতে পারবে না।

—কিন্তু একটা কথা। আপনি যেন কোনক্রমেই ওকে বুঝতে দেবেন না যে, আমি..... মানে...

—পাগলামি কর না। এটা কোন 'প্রজাপতি' মার্কা অফিস নয়। তুমি কাকে ভালবাস, কাকে

* ব্যাখ্যা : কৌতূহলী কনেব কাঁটায়

বিয়ে করবে, তা নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। সেসব প্রসঙ্গ আদৌ উঠবে না। আমার একটিমাত্র লক্ষ্য : তুমি যে 'ন্যাসনাশী' নও, 'ন্যায়নিষ্ঠ ন্যাসপাল' এটা প্রমাণ করা। যাতে করবী তার বাপের সম্পত্তিটা সুদে-আসলে পায়। যাতে তোমার হাতে হাতকড়া না পড়ে। তারপর সে কাকে বিয়ে করল তা জানতে আমার কোনও গরজ নেই।

অনির্বাণ স্থির হয়ে বসে রইল দশ সেকেন্ড। তারপর বললে, অলরাইট! এছাড়া আর কোন পথ নেই যখন...

পকেট থেকে চেকবুকটা বার করল সে।

বাসুও বললেন, অলরাইট! এছাড়া যখন তুমি খুশি মনে বিদায় নেবে না, তখন আরও বলি : সে যাতে হাঙরের পেটে না যায় সে-চেষ্টাও করব আমি।

একগাল হেসে অনির্বাণ চেকটা লিখতে থাকে।

।। দুই ।।

পরদিন সকালেই দেখা করতে এল করবী সেন।

রানু ইন্টারকমে না জানিয়ে তাঁর ইনভ্যালিড চেয়ারে পাক মেরে এঘরে এসে সংবাদটা পরিবেশন করলেন। বললেন, নিজেই উঠে আসতে হল জানাতে যে, করবী সেন একা আসেনি। তার সঙ্গে এসেছেন দুজন। দেখলেই বোঝা যায় মা আর ছেলে। মিসেস জয়ন্তী হালদার আর কিংশুক হালদার। ভদ্রমহিলা সম্ভবত বিপত্নীক...

—ভদ্রমহিলা বিপত্নীক! মানে?

—'চিকিৎসা-সঙ্কটের' জিগীষাকে মনে আছে? স্বামীকে যিনি 'সুষ-সুষ' বলে শিস দিয়ে ডাকতেন? স্বামীর মৃত্যু হলে সেই জিগীষা দেবী কী হতেন? বিধবা না বিপত্নীক?

—বুঝলাম। আর তাঁর পুত্রটি কি 'লালিমা পাল (পুং)?'

—আদৌ নয়। সে বোহিমিয়ান আর্টিস্ট : পল গোগাঁর আধুনিক সংস্করণ!

—ঠিক আছে। পাঠিয়ে দাও এ ঘরে।

একটু পরে এ ঘরে এলেন আগন্তুক তিনজন। বাসুসাহেবের নির্দেশে রানু স্থানত্যাগ করলেন না। একটা শর্টহ্যান্ড নোটবুক আর ডটপেন হাতে বসে রইলেন তাঁর হুইলচেয়ারে।

কিংশুক দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ যুবক। মাথার চুল দেখলে মনে হয় সে বুঝি আর্জেন্টিনা ফুটবল টিমের স্টপার। চাপ দাড়িটা অবশ্য সে হিসাবে বেমানান। হাতের নখগুলো বড় বড়, আর নোংরা। গায়ে একটা বুক-খোলা হাফশার্ট। লোমশ বুক এবং তাতে কালো সুতোয় বাঁধা কী-একটা টোটেম-জাতীয় কিছু দোদুল্যমান। পরিধানে তাপ্পিমারা সযত্নজীর্ণ জীনস-এর প্যান্ট। পায়ে অজন্তার মুগুর-মার্কা রবার চপ্পল।

পিছন পিছন ওর মা। তিনিও বাঙালি মহিলার পক্ষে রীতিমতো দীর্ঘাঙ্গী : পাঁচ ফুট ছয় তো হবেই। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। পাকানো চেহারা। কাঁচাপাকা ববকাট চুল, চোখে রোল্ডগোল্ডের সৌখিন চশমা। মধুবনী-ছাপ একটি রঙিন শাড়ি তাঁর পরিধানে। হাতে চামড়ার হাত-ব্যাগ। ঠোঁটে কফি-কালার লিপস্টিক!

সবার পিছনে করবী। বয়েজকাট চুল, শার্ট-প্যান্ট সত্ত্বেও তার নারীত্ব গোপন করা যায়নি। শুধু দেহ গঠনের তরঙ্গিত ভঙ্গিমাতেই নয়, মুখের পেলবতায়। সে কিন্তু প্রসাধনের ধার-কাছ দিয়েও যায়নি।

বাসুর অনুরোধে ওঁরা তিনজনই দর্শনার্থীর চেয়ারগুলো দখল করে বসলেন। যুবকটি— বয়সে সে করবীর সমানই হবে হয়তো— আগবাড়িয়ে বললে : আমার নাম কিংশুক হালদার, ইনি আমার মম, মিসেস জয়ন্তী হালদার, আর এ আমার 'ফিয়ার্সি'। মিস করবী সেন।

বাসু বললেন, বলুন?

মিসেস জয়ন্তী হালদার রানুর দিকে তর্জনী সঙ্কেত করে বললেন, উনি কে? এ ঘরে কেন?

—ও ঘরে দেখেননি? উনি আমার কনফিডেনশিয়াল সেক্রেটারি। উনি থাকবেন। নোট নেবেন, আমাকে সাহায্য করবেন।

জয়ন্তী বললেন, অ। তা বেশ। থাকুন। শুনুন! খুকুকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল আপনার সঙ্গে অবিলম্বে সাক্ষাৎ করতে। ঐ ট্রাস্টের বিষয়েই আলোচনা হবে নিশ্চয়। তাই আমরা এসেছি, ব্যাপারটা কী তাই জানতে।

বাসু বললেন, অ। তা ঠিক কী জানতে চান আপনারা?

—সে তো আপনিই ভাল জানেন, বাসুসাহেব। খুকুকে কেন নির্দেশ দেওয়া হল আপনার সঙ্গে দেখা করতে?

—খুকু কে?

—ঐ তো আপনার সামনেই বসে আছে, করবী সেন, খুকু।

—কে তাকে নির্দেশটা দিয়েছে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে?

—কে আবার? ওর বাবার সেই বিচিত্র উইলের ট্রাস্টি, অনির্বাণ দত্ত।

বাসু কিংশুকের দিকে ফিরে বললেন, তাকে চেনেন?

জয়ন্তী ধমকে ওঠেন, খোকাকে আবার 'আপনি' কেন?

বাসু নির্বিকার ভাবে কিংশুককে পুনরায় প্রশ্ন করেন, তাকে চেন?

কিংশুক বিরক্তি দেখিয়ে বললে, চিনি। মানে দেখেছি দূর থেকে। আলাপ নেই। আলাপ করার ইচ্ছেও নেই। একটা প্রাচীনপন্থী গোঁড়া, অর্থগৃধ্নু! সামাজিক প্যারাসাইট! ইনভার্টিব্রেট জোঁক।

করবী বাসুর দিকে ফিরে বলে, বাপি ওকে খুব স্নেহ করতেন। খুব বিশ্বাসও করতেন।

জয়ন্তী যোগ দেন আলোচনায়, তাঁর সেই বোকামির ফল ভোগ করছ আজ তোমরা।

করবী নড়েচড়ে বসল। প্রতিবাদ করল না কিন্তু।

বাসু থামতে রাজি নন। করবীর কাছে জানতে চাইলেন, ওকথা বললে কেন?

করবী এবার রুখে ওঠে, কেন তা আপনি জানেন না? বাপি উইলে ওকে তাঁর সম্পত্তির 'সোল ট্রাস্টি' করে গেছিলেন। আপনার মক্কেল সেকথা বলেনি?

বাসু বললেন, হ্যাঁ, সেকথা শুনেছি। তবে উইলটা আমি স্বচক্ষে দেখিনি। তিনি কি তাঁর উইলে হেতুটা জানিয়ে যাননি? নাকি তুমিও মিসেস হালদারের মতো বিশ্বাস কর এটা তোমার বাপির নির্বুদ্ধিতা?

করবী সোজা হয়ে বসল। হাসল। বলল, আজ্ঞে না, তা মনে করি না। বাপি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ। আমাকে ভালও বাসতেন খুব। আমাকে রক্ষা করার জনই এ-ব্যবস্থা করেছিলেন।

—রক্ষা করা! কার কাছ থেকে রক্ষা করা?

—য়ু সী, স্যার, বাপি যখন মারা যান তখন আমার বয়স মাত্র ষোল। ফলে আমার অপরিণত বুদ্ধির হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে তিনি ও ব্যবস্থা করেছিলেন। তখন আমি নাবালিকা ছিলাম।

—সেক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন : তিনি ছয় বছরের জন্য এ ব্যবস্থা করলেন কেন? আঠারো বছরে তুমি যখন সাবালিকা হলে...

প্রশ্নটা শেষ করার অবকাশ ওঁকে দিলেন না মিসেস হালদার। মাঝখানেই বলে ওঠেন, লুক হিয়ার ব্যারিস্টার-সাহেব! আমাদের না-থাক, অন্তত আপনার সময়ের দাম আছে। এসব খেজুরে আলাপ বন্ধ করে আপনার কী বক্তব্য আছে সেটা সরাসরি জানিয়ে দিলেই আমরা বিদায় নিতে পারি। আপনি আমাদের কেন ডেকেছেন?

বাসু বললেন, আজ্ঞে না। আমি তো আপনাদের ডাকিনি। আপনারাই অযাচিত আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। কিছু বলার থাকলে আপনারাই তো বলবেন আমাকে।

মিসেস হালদার জবাবে বলেন, আপনার নির্দেশেই সেই অনির্বাণ ছোকরা খুকুকে আপনার কাছে আসতে বলে। অন্তত সে তাই বলেছিল টেলিফোনে। আপনি বলতে চান, অনির্বাণ মিছে কথা বলেছে?

বাসু করবীকে প্রশ্ন করেন, অনির্বাণ তোমাকে বলেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে?

—হ্যাঁ। কাল সন্ধ্যাবেলায়।

—ও বলেছিল, মিসেস হালদার আর মাস্টার হালদারকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করতে আসতে?

—না। তা বলেনি। সেটা আমার নিজের বুদ্ধি-বিবেচনায়।

বাসু আবার বাংলা স্বরবর্ণের প্রথম অক্ষরটা উচ্চারণ করলেন।

জয়ন্তী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলেন, তার মানে, আমাদের সাক্ষাতে আপনি খুকুর সঙ্গে ঐ ট্রাস্টের

ব্যাপারে কোন আলোচনা করতে চান না? সেটা সরাসরি বললেই হয়?

বাসু জবাব দিলেন না। পকেট থেকে পাউচ বার করে পাইপে নীরবে তামাক ভরতে থাকেন। মিসেস হালদার বোধকরি অপমানিত বোধ করেন। তড়াক করে উঠে দাঁড়ান। বলেন, চলে আয় খোকা!

কিংশুক কিন্তু রাজি হয় না। বলে, তুমি এগোও। আমরা দুজন অন্যদিকে যাব।

—অল রাইট! অ্যাজ য়ু প্লিজ!

গটগট করে প্রস্থান করলেন মিসেস হালদার।

কিংশুক নড়েচড়ে বসল। বললে, উড য়ু মাইন্ড, স্যার, ইফ আই স্মোক?

—পাইপ? সিগার? সিগারেট? না স্ম্যাক?

কিংশুক পকেট থেকে চারমিনারের প্যাকেটটা বার করে দেখালো।

বাসু বললেন, প্যাকেটটা চারমিনারের, কিন্তু স্টিকগুলোয় কী আছে? গাঁজার গন্ধ আমার সহ্য হয় না, বাপু! তাছাড়া আমি তো তোমাকে ডাকিনি। তুমি অনায়াসে বাইরে গিয়ে স্মোক করতে পার।

কিংশুক অগত্যা চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া চারমিনারের প্যাকেটটা পুনরায় পকেটস্থ করল।

করবী হঠাৎ বলে ওঠে, পার্ডন মি স্যার, কিঙ-এর মায়ের সামনে আপনি আলোচনা করতে চাননি তার মানে বুঝি : কিন্তু কিঙ-এর সামনে আলোচনায় কোন বাধা নেই।

—'কিঙ' কে?

—কিংশুক হালদার। ও একজন 'জিনিয়াস'! অর্থাভাবে ও শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত জগতে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে না। আমাদের পরিকল্পনা ছিল বাপির ঐ ট্রাস্ট-ফান্ডটা হাতে এলে আমরা একটা আশ্রম গড়ে তুলব। সেখানে প্রতিভাবান চিত্রশিল্পী-সাহিত্যিক-কবি-সঙ্গীতশিল্পী — যারা সমাজে ঠাঁই করতে পারছে না, তাদের আমরা বিকশিত হবার সুযোগ দেব। জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় উপকরণ যোগান দেব — মাথার উপর ছাদ, আহার আর পানীয়। এটা ছিল আমাদের যৌথ পরিকল্পনা। আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। অনিদা আপনার মক্কেল। ফলে আলোচনাটা ট্রাস্ট সম্বন্ধে। মাসখানেক পরে অনিদা আমাকে ট্রাস্ট-ফান্ডের ব্যালান্স যে দু-চার হাজার টাকা হবে...

কিংশুক বাধা দিয়ে বলে ওঠে, দু-চার হাজার নয়, খুকু! সাড়ে সতেরো হাজার টাকা। আমাদের 'শিল্পীর-স্বর্গের' পক্ষে অবশ্য তা অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু 'কল-আ-স্পেড-আ-স্পেড'!

বাসু বলেন, আলোচনার আগে আমাকে একটা ফাউন্ডেশন গড়তে হবে। কিছু প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে। প্রথম প্রশ্ন : মিস্টার কিংশুক হালদার কী হিসাবে জিনিয়াস? সে চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা, সাহিত্যিক না কবি?

করবী জবাব দেওয়ার সুযোগ পেল না। তার আগে কিংশুক প্রতিপ্রশ্ন করে ওঠে : কিছু মনে করবেন না স্যার, সে আলোচনার আগে আমাকেও একটা ফাউন্ডেশন গড়তে দিন। লেঅনার্দো-

দ্য-ভিঞ্চি একজন জিনিয়াস ছিলেন নিঃসন্দেহে। আপনার মতে কী হিসাবে? চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, বিজ্ঞানী, আবিষ্কারক, টাউন-প্ল্যানার না যুদ্ধাস্ত্র-আবিষ্কারে?

বাসু জবাব দিলেন না। করবীর দিকে ফিরে বললেন, তুমি তোমার পৈত্রিক সম্পত্তিটার অধিকার পেলে তোমার ঐ রাজ্যহীন 'কিং লেঅনার্দোর' 'কিংডম' বানাতে তা বিনিয়োগ করতে চাও?

করবী বললে, দু-চার হাজার টাকায় তার ভিত্তিপ্রস্তরটাও স্থাপন করা যাবে না।

—কিন্তু কিং-এর হিসাবে তো অঙ্কটা সাড়ে সতেরো হাজার টাকা।

—সে হিসাব ভুল। অনিদা হিসাব দেয়নি। কিন্তু টেলিফোনে আমাকে প্রতিবার জানিয়েছে কবে কোন শেয়ার কিনেছে, কোন শেয়ার বেচেছে। এখন ওর হাতে আছে একগাদা চা-এর শেয়ার। 'কুতুব টী'-এর শেয়ার। তার কোনও বাজার দরই নেই। অবশ্য দোষটা অনিদার নয়। বাবাই ওকে বলে গেছিলেন, ঐ শেয়ারগুলো শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে। অনিদা সেই ক্যাসাবিয়াংকার আধুনিক সংস্করণ : 'দ্য বয় স্টুড অন দ্য বার্নিং ডেক'। রাশিয়া ভারতীয় চা কেনা বন্ধ করে দিল, যাবতীয় চায়ের শেয়ারের দর হু-হু করে পড়তে শুরু করল। তবু অনিদা বেচল না। আমার হিসাবে আগামী মাসে আমার হাতে আসবে দেড় থেকে দু-হাজার টাকা।

—আই সি! তুমি অনির্বাণের কাছ থেকে মাসে-মাসে হাত খরচ বাবদ কী পরিমাণ অর্থ নিয়েছ, রাফলি স্পিকিং?

—ঐ দেড় থেকে দু-হাজারই!

—তাহলে জুলাই মাস থেকে তুমি কী করবে? আই মীন, গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা?

—মাস-চারেক হল আমি টাইপিং শিখছি। টাইপিস্টের চাকরি করব।

—তুমি গ্র্যাজুয়েশনটাও করনি। আশা করছ, আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট হিসাবে চাকরি পাবে?

—তাই করছি স্যার। একজন আমাকে কথা দিয়ে রেখেছেন।

—তিনি কে, নামটা জানতে পারি?

—আপত্তি কী? তাঁর নাম শ্রীকালিপদ কুণ্ডু। বাপির ফার্মের এক্স-এমপ্লয়ি। দিন পনেরো আগে তিনি আমার সঙ্গে এসে দেখা করেছিলেন। একটা ফেবার চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমি যদি সেটা ওঁকে দিই, তাহলে উনিও আমাকে একটা চাকরি দেবেন। কেরানির। আই মীন টাইপিস্ট-কাম-ক্লার্কের।

—কী ফেবার চেয়েছিলেন কালিপদ কুণ্ডু?

—মাফ করবেন। সেটা বলতে পারব না। মিস্টার কুণ্ডুই আমাকে অনুরোধ করে গিয়েছিলেন সেটা গোপন রাখতে।

—বুঝলাম। কী করেন ঐ কালিপদ কুণ্ডু? তোমাকে একটি কেরানির চাকরি দেবার ক্ষমতা তাঁর আছে?

—এবারও আমাকে মাফ করতে হবে। ও বিষয়েও আমি কোন আলোচনা করব না। মানে, করতে পারি না।

এবার বাসু বললেন, আই সী!

আধ মিনিটটাক কেউ কথা বলল না। তারপর করবী আবার শুরু করে, অনিদা আমাকে কাল বলেছিল আপনার সঙ্গে দেখা করতে। এটা ফ্যাক্ট! আপনিও অস্বীকার করেননি যে, আপনি তাকে অমন নির্দেশ দেননি। তাহলে...

এবারও বাসু কোন কথা বললেন না।

কিংশুক উশখুশ করছিল। তার বোধকরি নেশার তাগাদা। করবী আবার বলে, দেড়-দু'হাজার থাক আর সাড়ে সতেরো হাজারই থাক, যা আছে তা আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে রসিদ নেবে— এই তো ব্যাপার। আমি কোনদিন হিসাব চাইনি, চাইবও না। তাহলে অনিদা কেন আপনার মতো একজন প্রখ্যাত ব্যারিস্টারের দ্বারস্থ হয়েছে এটাই আমার মাথায় ঢুকছে না।

বাসু বললেন, লুক হিয়ার করবী। অনির্বাণ দত্ত আমার ক্লায়েন্ট। তার স্বার্থটাই আমাকে প্রথমে দেখতে হবে। হ্যাঁ, সে আমার নির্দেশেই তোমাকে এখানে আসতে বলেছিল। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গেই শুধু ও বিষয়ে আলোচনা করতে পারি। কোন 'কিং' বা কিং-মাদারের উপস্থিতিতে নয়। যখন তোমার সুবিধা হবে, এস। আলোচনা করব।

কিংশুক দাঁড়িয়ে ওঠে। বলে, কী দরকার? আমি বরং বাইরে গিয়ে দাঁড়াই!

—না! এখন হবে না। কারণ আমি করবীর সঙ্গে জনান্তিকে আলাপ করতে চাই। এ কথা বলিনি।

—তাই তো প্রকারান্তরে বললেন আপনি। — কিংশুক রুখে ওঠে।

—না। তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ।

বাসুসাহেব করবীর দিকে ফিরে বলেন, আলোচনাটা ত্রিমুখী হতে হবে। যখন তোমার আর অনির্বাণের দুজনেরই সময় হবে সেসময় আমার সময় হলে সেই ত্রহস্পর্শযোগেই তা সম্ভব। আজ সেই ট্রাস্টি অনুপস্থিত।

।। তিন ।।

পরদিন রাত্রে সবাই যখন ডিনার টেবিলে আহারে বসেছেন তখন টেলিফোনটা বেজে উঠল।

বিশু ছুটে গিয়ে ধরল। বাসুসাহেবের দিকে ফিরে বললে, আপনাকে খুঁজছেন।

বাসু মাংসের টুকরোটাকে সবে ফর্ক দিয়ে চেপে ধরেছেন। বললেন, কে ফোন করছেন জেনে নে। কী শেখালাম সেদিন?

বিশুর মনে পড়ে গেল। টেলিফোনের 'কথা-মুখে' বলল, ওঁকে কী বলব? কে ফোন করছেন বলব?

তারপর শুনে নিয়ে টেলিফোনের কথামুখে হাতচাপা দিয়ে বললে, কিংশুক হালদার। মানে ইয়ে... মিস্টার কিংশুক হালদার!

বাসু বললেন, পাসড উইথ ডিসটিংশন। দে, যন্ত্রটা এগিয়ে দে। তারপর টেলিফোনে বলেন,

বল কিংশুকবাবু?

—শেয়ার বাজারের লেটেস্ট খবরটা শুনেছেন, স্যার? জাপানের সঙ্গে ইন্ডিয়ার ট্রেড-এগ্রিমেন্ট হয়ে গেছে। জাপান কয়েক কোটি পেটি ভারতীয় চা কিনবে। টী-এক্সপোর্ট আবার শুরু হবে। তাই, 'কুতুব টী'-এর শেয়ার থ্রি হান্ড্রেড পারসেন্ট বেড়ে গেছে! হয়তো আরও বাড়বে!

—তাতে তোমারই বা কী, আমারই বা কী?

—আপনার কাছে হয়তো কিছুই না। কিন্তু আমার কাছে ছপ্পড়-ফোঁড় আকাশের চাঁদ। খুকুর বাবা রঘুবীর সেন ছিলেন কুতুব টী কোম্পানির প্রথম ব্যাচের ফাউন্ডার মেম্বার ক্লাসের শেয়ার-হোল্ডার। তাঁর হেপাজতে একটা মোটা চাংক ছিল ঐ কোম্পানির শেয়ারের। তার মানে, ট্রাস্ট-মানিটা রাতারাতি লাখ-বেলাখ হয়ে গেছে!

বাসু বলেন, অনির্বাণ হয়তো এতদিন সে শেয়ার বেচে দিয়ে বসে আছে!

—ইমপসিবল, স্যার! কুতুব টী এস্টেটের প্রেসিডেন্ট ছিলেন রঘুবীর সেনের ক্লাস ফ্রেন্ড! তাই ঐ অনির্বাণ দত্তকে উনি ইন্সট্রাকশন দিয়ে গেছিলেন ঐ শেয়ার কিছুতেই না বেচতে!

—তুমি কেমন করে জানলে?

—খুকুই বলেছিল।

—তা হতে পারে; কিন্তু এ চার বছরে দুনিয়ার অনেক কিছুই তো বদলে গেছে। রাশিয়ার কম্যুনিস্ট সরকারের পতনের পর রাশিয়ায় চা পাঠানো বন্ধ হয়ে গেছে। শুনেছি, 'কুতুব টী'-এর শেয়ারের দাম হু হু করে পড়ে যাচ্ছিল। তাই হয়তো অনির্বাণ সে শেয়ার বেচে দিয়েছে।

—লেট ল্যামেন্টেড রঘুবীর সেনের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে?

—আরে বাপু, ইতিমধ্যে পরিস্থিতিটা যে বদলে গেছে। অনির্বাণ দত্ত তো আর 'ক্যাসাবিয়াঙ্কা' নয় যে, জ্বলন্ত জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে থাকবে লেট ল্যামেন্টেড রঘুবীর সেনের আদেশ শিরোধার্য করে।

—আপনি স্যার, আপনার মক্কেলকে একবার ট্যাপ করে দেখবেন কাইন্ডলি?

বাসু বিরক্ত হয়ে বলেন, দেখ ছোকরা! এভাবে আমাকে বিরক্ত কর না। আমার মক্কেলকে আমি ফোন করব কি করব না সেটা আমার বিবেচ্য।

টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন।

রানু জানতে চান, কী ব্যাপার?

উনি বুঝিয়ে দিলেন পরিস্থিতিটা। বললেন, রাত্রে অনির্বাণের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা যাবে না। তার মেসে ফোন নেই। দেখতো রানু, সলিল মৈত্রকে ফোনে ধরতে পার কি না। নম্বরটা আমার অ্যাড্রেস বইয়ে পাবে। M-এ, মৈত্র সলিল, শেয়ার কনসালটেন্ট।

পাওয়া গেল মৈত্রকে। বাসু তাঁকে অনুরোধ করলেন কাল সকালে বাজার খুললেই যেন পাঁচশ কুতুব টী-এর শেয়ার ওঁর নামে ধরা হয়।

সলিল মৈত্র বললেন, বড় দেরি হয়ে গেছে, স্যার। গত বাহাত্তর ঘণ্টায় কুতুব টী-এর শেয়ারের দর থ্রি-হান্ড্রেড পার্সেন্ট বেড়ে গেছে। পরশু সন্ধ্যায় টিভিতে ট্রেড এগ্রিমেন্ট ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই।

—জানি। ওটা আরও বাড়বে। বাই-দ্য-ওয়ে, কুতুব টী-এর প্রেসিডেন্ট এখন কে, জান?

—জানি। জনার্দন সিঙ্ঘানিয়া। কেন বলুন তো?

—না, সিঙ্ঘানিয়া নয়, কী-সাম পাল— বাঙালি— তিনি বোর্ড প্রেসিডেন্ট। তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন আমার ক্লায়েন্ট : রঘুবীর সেন। কুতুব টী-এর প্রথম যুগের শেয়ার হোল্ডার। রঘুর কাছে একটা বড় চাংক ছিল। আমাকেও বলেছিল...

বাধা দিয়ে মৈত্র বলেন, জানি স্যার। রঘুবীর গত হয়েছেন বছর ছয়েক। আর তাছাড়া কুতুব টী-এর ঐ বড় চাংকটা বর্তমানে তাঁর ওয়ারিশের এক্তিয়ারে নেই...

—তুমি কেমন করে জানলে?

—নিতান্ত ঘটনাচক্রে ব্যারিস্টার সাহেব। ঐ রঘুবীর সেন ছিলেন আমার পিতৃবন্ধু। তাঁর ছিল এক নাবালিকা কন্যা। তাই তিনি মৃত্যুর আগে তাঁর সম্পত্তির অছি নিযুক্ত করে যান কী-সাম দত্তকে। সে ছোকরা ঐ রঘুকাকার বাড়িতেই থাকত। রাশিয়ায় কম্যুনিস্ট সরকারের পতনের পর ইন্ডিয়ান টী-এর এক্সপোর্ট প্রচুর পরিমাণে কমে যায়। কুতুব টী-র দামও হু হু করে পড়ে যাচ্ছিল। তখন ঐ ছোকরা এক লপ্তে সব শেয়ার বেচে দেয় আমারই মাধ্যমে।

—আই সী। সে ছোকরার নাম বোধহয় 'অনির্বাণ দত্ত'। তাই নয়?

—একজ্যাক্টলি! তুখোড় ছোকরা। ঐ অনির্বাণ দত্ত গত সপ্তাহে, মানে কুতুব টী-র বাজার চড়বার আগেই, আবার শ-পাঁচেক শেয়ার আমার মাধ্যমে কিনেছে। বেশ কম দামে।

—নিজের নামে?

—আবার কী? যা হোক, কাল বাজার খোলার সময় কী দাম থাকবে তা তো জানি না। ম্যাক্সিমাম কত দর পর্যন্ত কিনব?

—এনি প্রাইস। দর আরও চড়বে। আসল কথা, আমি ঐ কোম্পানির একজন শেয়ার-হোল্ডার হতে চাই।

—ঠিক আছে, স্যার। তাই হবে।

—তুমি বললে, রঘুবীর তোমার বাবার বন্ধু ছিলেন, তাই নয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, দুজনে কাক-ডাকা ভোরে টালিগঞ্জ গলফ ক্লাবে যেতেন, বছরে নয় মাস। বর্ষার তিন মাস বাদে। ক্লাবেই ব্রেকফাস্ট সারতেন, দুজনে। না, দুজনে নয়, ওঁরা ছিলেন তিন বন্ধু। তৃতীয় জন হচ্ছেন মহেন্দ্রনাথ পাল : কুতুব টী-র বোর্ড অব ডাইরেক্টরসে ছিলেন, প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত হয়েছিলেন।

—বেঁচে আছেন?

—আছেন। বর্ধমানের দিকে বাড়ি করেছেন। কিছুদিন আগে তাঁর সঙ্গে ট্রেনে দেখা হয়েছিল।

উনি তো আশাবাদী। ওঁর বিশ্বাস, সিংঘানিয়াকে হটিয়ে উনি আবার গদি দখল করবেন।

বাসু ধন্যবাদ জানিয়ে লাইনটা কেটে দিয়ে এদিকে ফিরলেন। বললেন, কৌশিক, অনির্বাণ দত্তের মেসের ঠিকানা লেখা আছে তোমার মামিমার খাতায়। কাল সকাল সাতটার মধ্যে ওর মেসে হানা দাও। আমি জানতে চাই, কুতুব টী-র সেই অরিজিনাল শেয়ার অনির্বাণ বেচেছে কি না। আর গত সপ্তাহে নিজের নামে সলিলের কাছ থেকে পাঁচশ শেয়ার কিনেছে কি না। তাকে বল, অফিসে যাবার আগে যেন কোনও দোকান থেকে আমাকে একটা ফোন করে। মহেন্দ্র পালের বর্ধমানের অ্যাড্রেসটাও সংগ্রহ কর। ব্যাপারটা ক্রমশ ঘোরালো হয়ে উঠছে।

কৌশিক বলল, বর্ধমানের অ্যাড্রেস তো মিস্টার সলিল মৈত্রের কাছ থেকেই জোগাড় করতে পারতেন?

—তা পারতাম। কিন্তু তাতে সলিল অহেতুক সন্দিগ্ধ হয়ে উঠত। তোমাকে যা বলছি, তাই কর না বাপু!

কলেজ স্ট্রিট আর মহাত্মা গান্ধী রোডের মোড়ের কাছাকাছি একটা ত্যাড়চা গলি বেরিয়েছে : টেমার লেন। অনির্বাণ দত্তের মেসটা সেই গলির ভিতর। সকাল তখন পৌনে আটটা। কলেজ স্ট্রিটের বই-বাজার তখনও সরগরম হয়নি, দোকানপাট খোলেনি। একটা বন্ধ দোকানের সামনে গাড়িটা পার্ক করে কৌশিক সুজাতাকে বললে, আমি গাড়িতেই বসে থাকছি, তুমি যাও — ঐটা মেস বাড়ি। ওখানে গিয়ে অনির্বাণ দত্তর খোঁজ কর দিকিন।

সুজাতা বললে, সবসময় আমাকে বাঘের মুখে এগিয়ে দিয়ে তুমি ব্যাকগ্রাউন্ডে বসে থাকতে চাও কেন, বল দিকিন?

কৌশিক বলে, সহজবোধ্য হেতুতে। এখানে থেকেই ম্যানেজারকে দেখা যাচ্ছে। ফতুয়া গায়ে বসে আছেন। পঞ্চাশোর্দ্ধ প্রৌঢ়। মাথায় 'দর্পণসদৃশ ইন্দ্রলুপ্ত'। আমাকে হয় তো তিনি পাত্তাই দেবেন না। অথচ তোমাকে আদর করে বসাবেন, চা অফার করবেন। যাও, লক্ষ্মীটি।

সুজাতা হেসে ফেলে। এগিয়ে যায় মেসবাড়ির দিকে।

গাড়িতে বসে বসেই কৌশিক দেখতে পায়, ম্যানেজার ভদ্রলোক সুজাতাকে আপ্যায়ন করে বসালেন। প্রশ্নটা শুনে একটু অবাক হয়ে ম্যানেজার বলেন, কী ব্যাপার বলুন তো দিদি? হঠাৎ অনির্বাণের বাজার দর এভাবে বেড়ে গেল কেন?

—মানে?

—দত্তজা থাকে তিনতলার চিলেকোটার সিঙ্গল- বেড ঘরে। যদ্দুর জানি, তার তিন কুলে কেউ নেই। তার কোনও চিঠিপত্রও আসে না। কেউ কোনদিন খোঁজ করতেও আসেনি। অথচ কাল এক ভদ্রলোক তিন-তিনবার এসেছিলেন অনির্বাণের সন্ধানে। আবার আজ ভোরেই আপনি এসেছেন... কী দরকার?

সুজাতা তৎক্ষণাৎ এক আষাঢ়ে গল্প শোনাল—

অনির্বাণ ওর গ্রাম-সম্পর্কে দাদা। সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার ফার্মে একটা টাইপিস্টের চাকরি সে করিয়ে দিতে পারে। সেই খোঁজ নিতেই ও এসেছে। শিয়ালদহ থেকে ট্রামে, নম্বর দেখতে দেখতে।

ম্যানেজার বললেন, তার মানে সকাল থেকে চা-টাও খাওয়া হয়নি।

সুজাতা বললে, না না। ট্রেনে ভেন্ডারের কাছে কিনে চা খেয়েছি। মুড়ি-মশলাও। আপনি ব্যস্ত হবেন না। অনিদা কি আছে?

ম্যানেজার কর্ণপাত করলেন না। ভৃত্য নকুলকে ডেকে আদেশ করলেন দিদিমণির জন্য একটা ডবল-অমলেট আর স্পেশাল চা। তাঁর নিজের জন্যও একটা সেকেন্ড-কাপ চিনি-ছাড়া অর্ডার করলেন। তারপর সুজাতার দিকে ফিরে বললেন, কাল অনির্বাণ অফিস-ফেরত মেসে আদৌ ফেরেনি। তার চিলেকোটার সিঙ্গলবেড ঘরটা তালা-মারা। সে যে কোথায় গেছে, কেন গেছে, ওঁরা কেউ জানেন না।

সুজাতা জানতে চায়, কাল যিনি তিন-তিনবার এসেছিলেন ওঁর খোঁজে, তাঁর নাম কি সনাতন হাজরা? কালো-মোটা-বেঁটে, দাড়ি আছে? আন্দাজ বছর ত্রিশ বয়স? —বলাবাহুল্য, এটা আন্দাজি-বর্ণনা। কারণ, সুজাতা জানে, মনুষ্যচরিত্রের নিয়মই হচ্ছে প্রতিবাদ করে আনন্দ পাওয়া।

ঠিক তাই।

ম্যানেজার বললেন, না মা লক্ষ্মী! এ তোমার সনাতন হাজরা নয়। এ ভদ্রলোক ছয় ফুটের কাছাকাছি লম্বা, দাড়ি-গোঁফ কামানো, বয়স পঞ্চাশের ওপরে। ফর্সা নয়, গায়ের রঙ তামাটে, গালে একটা বড় আঁচিল। চেন তাকে, মানে, চেনেন তাকে?

সুজাতা বললে, আমাকে তুমিই বলবেন। না, চিনতে পারছি না। আমাদের গাঁয়ের কেউ নয়, বোধহয়। কিন্তু অনিদা বলেছিল, ওর এক্স-এমপ্লয়ার ওকে একটা গাড়ি দিয়েছিলেন। অনিদা কি সেটা বেচে দিয়েছে?

ইতিমধ্যে দু-কাপ চা আর ডবল-ডিমের অমলেট এসে গেল।

কৌশিক গাড়ির ড্রাইভারের সীটে নিশ্চল বসে ছিল। এবার একটা সিগ্রেট ধরালো।

সুজাতা তারিয়ে তারিয়ে অমলেট আর চা সেবন করতে করতে বাইরে তাকিয়ে দেখছিল। সামনে একটা গাড়িতে ড্রাইভারের সীটে বসে একজন ভদ্রলোক যে দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তাতে ওর অমলেটটা হজম হলে হয়।

ম্যানেজার বললেন, না, মা বেচে দেয়নি। এ গলিতে তো জায়গা হয় না। গ্যারেজ নেই কাছে-পিঠে। দত্তজা তার গাড়িটা গ্যারেজ করে কিষেনলালের গ্যারেজে : কলেজ স্ট্রিট বাজারের ওপারে, মেছুয়াবাজারের মুখটায়। কেন বল দিকি?

—না, মানে ভাবছিলাম ওর গাড়িটা গ্যারেজে আছে কি না। অনিদা যদি গাড়ি নিয়ে কলকাতার বাইরে গিয়ে থাকে তাহলে এ-যাত্রা আর দেখা হবে না। আমাকে গাঁয়েই ফিরে যেতে হবে।

—অ। তা দেখ কিষেনলালের গ্যারেজে খোঁজ নিয়ে।

অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে সুজাতা উঠে দাঁড়ায়।

ম্যানেজার বলেন, তোমার নামটা জানা হল না। দত্তবাবু ফিরে এলে কী বলব, মা?

—বলবে, 'কনি' এসেছিল, মদনপুর থেকে।

—বলব। 'কনি'! বাঃ! বেশ নাম!

মেস থেকে বেরিয়ে সুজাতা গাড়ির দিকে গেল না। ট্রামরাস্তার দিকে হাঁটা ধরল। কারণ ও লক্ষ্য করেছিল, ম্যানেজার ভদ্রলোক একটা বিড়ি ধরিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। বোধকরি হাওয়া খেতে। পিছন থেকে ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে আছেন। একদৃষ্টে।

কান টানলে মাথাকে আসতে হয়। কৌশিক গলির মধ্যে গাড়ি ঘোরাবার মতো যথেষ্ট জায়গা পেল না। ব্যাকগিয়ারে পিছিয়ে এল ট্রামরাস্তার দিকে। ততক্ষণে ম্যানেজার মেসের ভিতরে ঢুকে গেছেন।

কৌশিক নেমে এসে বললে, কী ব্যাপার? হাঁটতে হাঁটতে কোথায় চলেছ?

—ম্যানেজার-ভদ্রলোকের দৃষ্টিপথের বাইরে। ওঁকে বলেছি, আমি শেয়ালদা থেকে ট্রামে এসেছি। সে যা হোক, অনির্বাণ কাল অফিস-ফেরত মেসে আসেনি। রাত্রে মেসে ছিল না। আরও একটা খবর। অনির্বাণকে কে একজন খুঁজছে। কাল নাকি বার-তিনেক লোকটা মেসে খোঁজ নিতে এসেছিল। দেখা পায়নি।

সেই লোকটার বর্ণনা শুনে কৌশিক বললে, জাস্ট এ মিনিট। এই গলির প্রায় শেষপ্রান্তে 'করুণা প্রকাশনী'-র একটা কাউন্টার আছে। এখন দোকান বন্ধ; কিন্তু ঐ রোয়াকে একটা বুড়ো বসে আছে — তুমি দেখে এস তো।

—কেন? আমি একা একা যাব কেন? চল না, দুজনেই যাই।

—না। আমি যখন গাড়িতে বসেছিলাম তখন সে লোকটার সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে। সে তোমাকে এ-গাড়ি থেকে নামতে দেখেছে। কিন্তু মুখখানা বোধহয় দেখেনি। আমি এখানেই থাকছি। তুমি বাড়ির নম্বর দেখতে দেখতে সমস্ত গলিটাই ঘুরে এস। ভাবখানা : যাকে খুঁজছ, সে ঐ মেসবাড়িতে থাকে না। যে-নম্বর খুঁজছ সেটা পাচ্ছ না বলেই...

—কিন্তু ঐ বুড়োটাকে বিশেষভাবে দেখবার কী দরকার?

—এক নজরে আমার মনে হয়েছিল, ও খুব লম্বা, লোকটার বয়স পঞ্চাশের ওপরে, দাড়ি-গোঁফ কামানো, গালে বড় আঁচিল। গায়ে টুইলের হাফশার্ট, পরনে পায়জামা, আমাকে দ্বিতীয়বার দেখলে লোকটা সন্দিগ্ধ হয়ে ভেগে যাবে। তুমি দেখ তো, ম্যানেজারের বর্ণনা মোতাবেক এই লোকটাই কি অনির্বাণকে খুঁজছে?

।। চার।।

টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বাসুসাহেব বললেন, বল সুজাতা। কোথা থেকে ফোন করছ?

—কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের একটা পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে। আপনার মক্কেল না-পাত্তা। কাল রাতে মেসে ফেরেনি। আর আজ সকালে সে তার গাড়ি নিয়ে দূরপাল্লার সফরে বেরিয়েছে।

বাসু জানতে চাইলেন, রাতে মেসে ফেরেনি এ তথ্য সংগ্রহ করা সহজ; কিন্তু আজ যে সে দূরপাল্লার সফরে গেছে তার তথ্যসূত্র কী?

সুজাতা কিষেনলালজীর রিপেয়ার শপ থেকে সংগৃহীত তথ্য সরবরাহ করে। অনির্বাণের নির্দেশে গাড়ির গ্রিজ-মবিল বদল করা হয়েছে।

বাসু বলেন, তোমার কর্তাটি কোথায়? তোমার পাশে?

—আজ্ঞে না। ও আমাকে নামিয়ে দিয়ে ভবানীপুর গেল করবীর বাড়ি। সেখান থেকে অনির্বাণের অফিসে যাবে। আমাকে বললে, ট্যাক্সি নিয়ে সময়মতো বাড়ি ফিরতে।

—কেন? তুমি কলেজ স্ট্রিটের বাজারে কী করছ? হাপু গাইছ?

—আজ্ঞে না। হাপু গাইছি না। একটা বুড়োর উপর নজর রাখছি। সে এখনো ঐ মেসবাড়ির উল্টোদিকের রোয়াকে বসে বসে বিড়ি টানছে। ঐ লোকটা নাকি কাল থেকে অনির্বাণ দত্তের খোঁজ করছে। মেস-ম্যানেজার বলেছেন, ওকে আগে কখনো দেখেননি। কৌশিকের ধারণা ও আদালতের প্রসেস-সার্ভার।

—আদালতের প্রসেস-সার্ভার? সেটা কেমন করে বুঝলে?

—না মানে, লোকটা মরিয়া হয়ে অপেক্ষা করছে মেসবাড়ির সামনে।

—লোকটার বগলে ছাতা আছে? পায়ে ক্যানভাসের জুতো? কাঁধে ঝোলাব্যাগ?

—না, তিনটের একটাও নেই।

—তাহলে ও আদালতের প্রসেস-সার্ভার নয়। স্টেথো না নিয়ে ডাক্তার রোগী দেখতে যায় না। ছাতা না নিয়ে প্রসেস-সার্ভারও কাউকে সমন ধরাতে যায় না। তুমি বাড়ি ফিরে এস দিকি। কৌশিকের যেমন কাণ্ড! ঘরের বউকে পথে বসিয়ে সারা কলকাতা চষে বেড়াচ্ছে।

সুজাতা নিউ আলিপুরের বাড়িতে ফিরে এল বেলা এগারোটায়। কৌশিক বেলা একটায়। বেচারি কৌশিক! সে নানান সম্ভাব্যস্থানে অনির্বাণের সন্ধান করেছে। অনির্বাণের একটা ছোট্ট দপ্তর আছে। শেয়ার-মার্কেটের কাছাকাছি। শেয়ার কেনাবেচার খুপরি। অফিসে ও একাই বসে। কর্মচারী বলতে, এক মেদনিপুরিয়া কম্বাইন্ড-হ্যান্ড। গৌতম জানা। চিঠিপত্র নিয়ে ছোটাছুটি করা, টেলিফোন ধরা এবং মেসেজ লিখে রাখা, ইলেকট্রিক হিটারে চা বানানো, সব কাজেই দক্ষ। সে যথারীতি সকালে দোকানের ঝাঁপ খুলে বসেছে তার টুলে। সাহেব যে কেন বেলা বারোটা পর্যন্ত

অফিসে এলেন না, তা সে জানে না। তাঁর যে কলকাতার বাইরে যাবার সম্ভাবনা ছিল সে-কথা গৌতম আদৌ জানে না।... অথচ কিয়েনলালজীর খবর : বাবুজী লম্বা পাড়ি জমাবার জন্য তৈয়ারী হয়েছেন। কোথায় গেছেন তা সে'ও জানে না।

করবীর সঙ্গেও কৌশিক দেখা করেছে। হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে। করবী জানে না, অনির্বাণ কোথায়। তবে সে বলল, টেলিফোন করে আজ সন্ধ্যায় অনির্বাণ ওর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল, সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ। করবী রাজি হতে পারেনি, তার অন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকায়। সে তার অনিদাকে কাল সকাল আটটায় আসতে বলেছে। অনির্বাণ নাকি জবাবে টেলিফোনে বলেছিল, ব্যাপারটা জরুরী। আজ রাতে মিটিয়ে ফেললেই ভাল হয়। করবী তবু রাজি হয়নি। করবীর যে আজ সন্ধ্যায় কী জরুরী কাজ আছে, তা কৌশিক সৌজন্যবোধে জানতে চায়নি। করবীও বলেনি।

কৌশিকের মতে, অনির্বাণ কলকাতার বাইরে যায়নি। কোন বিশেষ কারণে সে গা-ঢাকা দিয়ে আছে মাত্র। সম্ভবত সে কোনও উকিলের সমন এড়াবার জন্যই মেসে ফিরছে না। ঐ বৃদ্ধ প্রসেস-সার্ভারকে দেখেই এমন অনুমান করছে কৌশিক।

বাসু বললেন, কুতুব টী-র শেয়ার বেচে দেওয়া এবং নিজের নামে আবার কেনা নৈতিক দিক থেকে আপাতদৃষ্টিতে সমর্থনযোগ্য না হলেও অনির্বাণ বেআইনি কাজ কিছু করেনি। সে এভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন? আমার মনে হয়, কিছু জটিলতার বিষয়ে অনির্বাণ আমাকে আদৌ জানায়নি।

কৌশিক জানতে চায়, আপনি কি বিকালে কোথাও বেরুবেন, মামু?

—কেন বল তো?

—না হলে সন্ধ্যা-নাগাদ করবীর বাড়ির কাছে-পিঠে একবার হানা দিতাম। অনির্বাণের সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করল কেন করবী? আমার আন্দাজ : করবী সন্ধ্যায় তার কোনও প্রেমিকের বাড়ি অভিসারে যাবে। কার সঙ্গে ডেটিং করেছে? কোথায় যাচ্ছে? তা জানার দরকার। ব্যাপারটা ক্রমশ ঘোরালো হয়ে উঠছে।

রানু বললেন, না, তোমার মামুর একটু সর্দির মতো হয়েছে। সন্ধ্যার পর আজ আর উনি বার হবেন না। তা সুজাতাকেও নিয়ে যাচ্ছ তো?

কৌশিক বললে, চলুক। বাড়ি বসে থেকেই বা করবেটা কী? তা হলে মামি, আপনারা আহারাদি সেরে নেবেন। আমাদের জন্য অপেক্ষা করে রাত করবেন না। আমাদের ফিরতে কত দেরি হবে, তার তো ঠিক নেই।

বাসু বললেন, এসব ওয়াইল্ড গুজ চেজ-এর কোনও মানে হয়? শুনছ, করবী মেয়েটির একাধিক পুরুষ বন্ধু! সে কার সঙ্গে সিনেমা যাচ্ছে, কার সঙ্গে থিয়েটার বা রেস্টুরেন্টে খাচ্ছে তা জেনে কি আমাদের আর দুটো হাত গজাবে? তাছাড়া...

রানু ধমকে ওঠেন, তুমি থাম তো দেখি। হ্যাঁ, কৌশিক, তোমরা গাড়িটা নিয়েই যাও। এক কাজ

কর বরং : রাতে বাইরেই কোথাও খেয়ে নিও। তাহলে বাড়ি ফিরে ঠাণ্ডা খাবার খেতে হবে না।

বাসু ঢোক গিললেন।

ওরা দুজনে স্থানত্যাগ করার পর রানু বললেন, কোর্ট-কাছারি করে করে তোমার শুধু বুদ্ধিসুদ্ধি নয়, রসকষও সব লোপ পেয়ে গেছে। দেখছ, ওরা এই ছুতো করে গাড়িটা নিয়ে বিকেলে একটু বেরুতে চায়। চাইনিজ রেস্তোরাঁয় রাতে খাবে বলে আমাদের তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়তে বলল। আর তুমি...

বাসু সামলে নেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমার জন্য রাত্রে কী বানাতে বলেছ? খই-দুধ?

—না, সাবু!

—আই সী!

।। পাঁচ।।

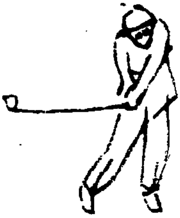

সন্ধ্যাবেলা রানু বসেছেন টিভি খুলে। বাসুসাহেব লাইব্রেরি ঘরে একটা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক দুরূহ বইয়ের মধ্যে বুঁদ হয়ে গেছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত পপুলার সায়েন্সের বই : 'দ্য ক্রিয়েটিভ কম্প্যুটার', ডক্টর D. Dichie-এর লেখা।

ড্রইং-কাম-ডাইনিংয়ে টেলিফোন বেজে উঠল। বিশু আজকাল বেশ চালু হয়ে গেছে। কে ফোন করছে, কাকে চাইছে জেনে নিয়ে লাইব্রেরি এক্সটেনশনে বোতাম টিপে দিল। 'জীবন্ত কম্প্যুটার'-কে 'শিভাস রিগ্যাল'-এর পাদদেশে নামিয়ে রেখে বাসুসাহেব টেলিফোনটা তুলে নিলেন : বাসু!

—সুজাতা বলছি মামু, খবর আছে।

—বুঝেছি। টেলিফোনের মাউথপীসে চাও-চাও আর ফ্রায়েড-প্রনের গন্ধেই বুঝেছি। বল?

—এটা একটা ওষুধের দোকান। আপনার মক্কেলের টিকির সন্ধান পাওয়া গেছে।

—গুড। কৌশিক কোথায়?

—তাকে শ্যাডো করছে।

—আর তুমি?

—সেই ওবেলার মতো রাস্তার ধারে বসে হাপু গাইছি। ও বলে গেছে, ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরে আসতে।

—তাহলে তা আসছ না কেন?

—এখনি আসছি। শুধু মামিমাকে বলে দেবেন, রাতে আমি খাব। ওঁকে জিজ্ঞেস করুন, কিছু তৈরি-খাবার কিনে নিয়ে যাব কি?

জিজ্ঞাসা করতে হল না। রানু ইতিমধ্যেই ডাইনিং-হলের রিসিভারটা তুলে ওদের কথোপকথন শুনছিলেন। বললেন, না। সুজাতা, কিছু আনতে হবে না। তোমাদের দুজনের

খাবার তো তৈরিই রাখা আছে, ফ্রিজে। শুধু গরম করে নিতে হবে।

সুজাতা ফিরে এল সাড়ে-সাতটার মধ্যে। একাই ট্যাক্সি নিয়ে। শোনালো তাদের গোধূলিলগ্নের অভিজ্ঞতা :

সুজাতা আর কৌশিক সন্ধ্যা নাগাদ করবীর বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে দেখতে পায় কিছু দূরে অনির্বাণের গাড়িটা পার্ক করা আছে। অনির্বাণ গাড়িতে একা। ড্রাইভারের সীটে বসে বসে সিগ্রেট খাচ্ছে। গাড়িটা এমন জায়গায় পার্ক করেছে যাতে তার মুখখানা আছে ছায়ায়।

কিষেনলালজীর কাছ থেকে গাড়ির মেক আর নম্বর সংগ্রহ করা না থাকলে ওদের পক্ষে অনির্বাণকে শনাক্ত করা হয় তো সম্ভবপর হত না।

একটা ছেলে উইন্ডস্ক্রিনে স্টিকার লাগাবার উপক্রম করতেই একটি দু-টাকার নোট বার করে তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে কৌশিক বললে, বিনা নোটিসে হঠাৎ হয়তো চলে যাব ব্রাদার। এটা আগাম পকেটস্থ কর, টিকিট দিতে হবে না।

ছেলেটা একগাল হাসল।

অনির্বাণ ওদের দুজনকে চেনে না। ফলে ঘাবড়াবার কিছু নেই। সুজাতা বলে, অনির্বাণ তাহলে কলকাতার বাইরে যায়নি। কিন্তু এলই যদি এ পাড়ায় তাহলে, দোরের বাইরে কেন?

কৌশিক বলে, 'উই আর ইন দ্য সেম বোট, নন-সিস্টার!' অনির্বাণও দেখতে চায়, তার প্রেয়সী কার জন্য বাসকসজ্জায় প্রহর গুনছে!

প্রায় আধঘণ্টা বাদে করবী তার ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে বার হয়ে এল। পরনে 'ক্রিমসন লেক' রঙের সিল্ক। সঙ্গে একটি দীর্ঘদেহী যুবক। তার মাথায় কাঁধ-ছাপানো কুণ্ডলিত চুল। পরনে জীনস-এর তাপ্পি দেওয়া প্যান্ট। পায়ে চপ্পল।

মামুর কাছে বর্ণনা শোনা ছিল। দুজনের কারও চিনতে অসুবিধা হল না। কথা বলতে বলতে করবী আর কিংশুক বাসস্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে এল। দক্ষিণমুখো বাসস্ট্যান্ডে ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়ালো। কৌশিক সুজাতার কানে কানে বলে, 'রক্ত করবী' যদি একই বাসে ওঠে তাহলে তুমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে ওদের ফলো করবে। বাসের নম্বরটা দেখে রাখলে ট্যাক্সি ধরতে যেটুকু দেরি হবে তাতে অসুবিধা হবে না। ওরা কোথায় গেল জেনেই ফিরে আসবে।

—আর তুমি?

—আমার টার্গেট অনির্বাণ শিখায় জ্বলছে। হয়তো সেও ঐ বাসের পিছু পিছু ধাওয়া করবে। সেক্ষেত্রে তোমাকে কিছুই করতে হবে না। চুপটি করে বসে থাকবে আমার পাশে।

সুজাতা জবাব দেওয়ার অবকাশ পেল না। স্ট্যান্ডে একটা মিনি এসে দাঁড়ালো। কিংশুক লাফ দিয়ে তাতে উঠে পড়ল। টা-টা করল। বাসটা ছেড়ে গেল। করবী বাড়ির দিকে ফিরে চলল।

বোঝা গেল, সে বন্ধুকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছিল মাত্র।

সুজাতা জানতে চায়, আমি কি নেমে গিয়ে একটা ট্যাক্সি...

—না! চুপচাপ বসে থাক। আমার আন্দাজ অনির্বাণ জানত, করবীর ঘরে কিংশুক হালদার আছে। তাই ও বাইরে অপেক্ষা করছিল। ইয়েস, আয়াম রাইট। ঐ দেখ, অনির্বাণ গাড়ি থেকে নেমে করবীর বাড়ির দিকে যাচ্ছে।

—তাহলে আমরা এখন কী করব?

—"দে অলসো সার্ভ হু ওনলি স্ট্যান্ড অ্যান্ড ওয়েট!"

কিন্তু ঈশ্বরভক্ত মিল্টনের মতো নীরব প্রতীক্ষার সুযোগও ওদের মিলল না। একটু পরেই দেখা গেল, দক্ষিণ দিক থেকে বড় বড় পা ফেলে কিংশুক হালদার ফিরে আসছে। হয়তো সে কোন জরুরী কথা বলে আসতে ভুলেছে, অথবা বাড়ির চাবি কিংবা মানিব্যাগটা করবীর ঘরে ফেলে এসেছে। তাই এক স্টপ গিয়েই বাস থেকে নেমে পড়েছে। উত্তরমুখো ফিরে আসছে।

কৌশিক সুজাতার হাতটা চেপে ধরল : গাড়ি থেকে নেমো না। এখানে বসেই দেখ, নাটকটা কীভাবে জমে যায়।

দু'চার মিনিট পরেই করবীর বাড়ির ভিতর থেকে একটা চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ শোনা গেল। তারপরই হিন্দি সিনেমার নিরন্তর ঢিসম-ঢিসম! কলকাতাবাসী ক্রমশ এতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। পথচারীরা ভ্রূক্ষেপও করল না। কেউ ও বাড়িটার দিকে নজর তুলে তাকিয়েও দেখছে না। মতপার্থক্যটা ইস্ট বেঙ্গল-মোহন বাগান, সি পি এম-কংগ্রেস, ভোটের রিগিং সমর্থন ও রিগিং-বিরোধী— কী জাতীয়, তা জানতে কেউ আগ্রহী নয়। এমন সময় এক ভদ্রমহিলা— বোধকরি করবীর প্রতিবেশিনী, দ্বিতলের ক্যান্টিলিভার বারান্দায় ছুটে বেরিয়ে এসে হঠাৎ চিৎকার জুড়ে দিলেন, বাঁচাও, বাঁচাও। মেরে ফেললে গো... পুলিশ! পুলিশ!

কৌশিক এবার গাড়ি থেকে নামল। সুজাতাকে বললে, তুমি চুপচাপ বসে থাক। আমি দেখছি। শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ বেধে গেছে বোধহয়। অনির্বাণ এতক্ষণে নিশ্চয় ঐ ছয়ফুট দৈত্যটার ঢিসম্-ঢিসমে ফ্ল্যাট!

আরও কয়েকজন সচেতন হল। তার ভিতর একজন হচ্ছে মোড়ের ট্রাফিক-পুলিশ। নিতান্ত ঘটনাচক্রে মোটরবাইকে চড়ে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর তখন ওখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। ট্রাফিক পুলিশের কর্তব্য শুধুমাত্র সেলাম জানানো। পরিবর্তে এ লোকটা হুইসিল বাজিয়ে ইন্সপেক্টরকে রুখে দিল। আঙুল তুলে দ্বিতলের ঐ ঝোলা-বারান্দাটা দেখিয়ে দিল। ইন্সপেক্টর বাইক থামালেন, ফুটপাথের কিনার-ঘেঁষে চক্রযানটা পার্ক করে গটগট ভঙ্গিতে এগিয়ে গেলেন বাড়িটার দিকে। ইতিমধ্যে আশপাশের মানুষজনও ভিড় করেছে।

কৌশিক আর ইন্সপেক্টর প্রায়ই একই সময়ে সদর-দরজার সামনে এসে পৌঁছালো। সেটা খোলাই ছিল। ভিতরদিক থেকে এগিয়ে এল বছর-ত্রিশের একটি যুবক। সিলভার গ্রে রঙের থ্রি-পীস স্যুট তার পরিধানে। চুল সুবিন্যস্ত, টাই যথাস্থানে। ইন্সপেক্টর তাকেই প্রশ্ন করল, কী ব্যাপার? ভিতরে কে এসেছেন? অমিতাভ বচ্চন? না মিঠুন চক্রবর্তী?

কথাটা তার শেষ হল না। যুবকটি আঙুল তুলে দ্বিতলের একটা অংশ দেখিয়ে দিল।

অন্যমনস্কের মতো বললে, ফার্স্ট ফ্লোর। রঘুবীর সেনের ফ্ল্যাট মনে হল। রোজই হয়। তবে আজ একটু বাড়াবাড়ি রকম। এই যা।

ঘড়ি দেখে সে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। ইন্সপেক্টর ওকে নজর করল না। জোড়া জোড়া সিঁড়ির ধাপ ডিঙিয়ে সে দোতলায় উঠতে থাকে। তার পিছু পিছু উৎসাহী জনতার একাংশ। কৌশিক কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঘড়ি দেখল। পৌনে সাতটা। ব্যাক-গিয়ারে পেছিয়ে এল নিজের গাড়ির কাছে। সুজাতাকে বললে, নেমে পড়। কুইক! এখানে যেটুকু খবর সংগ্রহ করতে পার করে মামুকে ফোন কর। ঐ মেডিকেল স্টোরে টেলিফোন আছে।

—আর তুমি?

—আমার টার্গেট তো অনির্বাণ! তাকেই শ্যাডো করব।

—অনির্বাণ! সে তো বাড়ির ভিতরে। কিংশুকের সঙ্গে শুম্ভ-নিশুম্ভের...

—না! ঐ দেখ, সে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিচ্ছে। ওর গায়ে একটি আঁচড়ও লাগেনি। মারামারিতে ও আদৌ অংশ নেয়নি।

রানু বিস্মিত হয়ে সুজাতার কাছে জানতে চান, আসলে ব্যাপারটা কী হল বুঝলাম না। অনির্বাণ মারামারি করেনি? তাহলে দৈত্যটা ঢিসম্-ঢিসম্ করছিল কার সঙ্গে?

সুজাতা বলে অবিশ্বাস্য ব্যাপার, মামিমা। নিজে চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাসই করতাম না। অনির্বাণের পিছু পিছু 'ও' যখন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল তখন দ্বিতলে উঠে এলাম। করবীর ফ্ল্যাটে তখন কৌতূহলী জনতার ভিড়। পুলিশ ইন্সপেক্টর ধমক দিচ্ছে, এখানে কী দেখতে এসেছেন আপনারা? রথ না দোল? যে-যার কাজে যান। না হলে জবানবন্দি নেবার জন্য থানায় ধরে নিয়ে যাব কিন্তু। আদালতে সাক্ষী দিতে দিতে জান নিকলে যাবে।

কথাটায় কাজ হল। ঊর্ধ্বগামী জনস্রোত নিম্নমুখী হল। সুজাতা দেয়াল ঘেঁষে নিশ্চুপ দাঁড়িয়েই রইল। ঐ বাড়িরই অন্যান্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের ভিড়ে। করবীর বৈঠকখানায় সোফা-সেট স্থানচ্যুত। একটা ফুলের টব ভেঙে গেছে। 'বুক-কেস'-এর একটা স্লাইডিং পাল্লাও চুরমার। কেন্দ্রস্থলে পম্পাতীরে ভগ্নঊরু দুর্যোধনের মতো অর্ধশয়ান অবস্থায় পড়ে আছে কিংশুক হালদার। তার দাড়িতে রক্ত, শার্টের সামনের অংশটা ফাৎলা-ফাই। বাঁ চোখটা ফুলে ঢেকে গেছে। ঠোঁটটাও মারাত্মকভাবে কেটে গেছে। করবী একটা পোর্সেলিনের বৌলে ডেটল জল নিয়ে এসে ধুইয়ে দিচ্ছে।

সুজাতা এগিয়ে এসে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যান্ড-এড' বাড়িতে আছে? না ঐ সামনের মেডিকেল স্টোর থেকে নিয়ে আসব?

করবী চোখ তুলে দেখল। ওকে চিনতে পারল না। বলল, না, ব্যান্ড-এইড বাড়িতে নেই। নিয়ে আসুন, প্লীজ। খুচরো দেব?

—টাকা-পয়সার কথা পরে। ডেটল তো রয়েছে। তুলো ব্যান্ডেজ কি আর লাগবে?

এতক্ষণে ঘর খালি হয়ে গেছে। উটকো মানুষ আর বিশেষ নেই। প্রতিবেশীরা রয়েছেন

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। ইন্সপেক্টর করবীকেই গৃহের মালকিন হিসাবে চিহ্নিত করেছে। তার কাছেই জানতে চায়, ইনি কি এই ফ্ল্যাটের বাসিন্দা?

করবী চোখ তুলে তাকায়। বলে, না ও থাকে আনোয়ার শাহ্ রোডে।

—কে হয় আপনার? কী নাম?

—ইয়ে, সম্পর্কে দাদা। কাজিন। এর নাম কিংশুক হালদার।

ইন্সপেক্টর ওর নাড়ি দেখে বলল, অ্যাম্বুলেন্স আনাব? কী কাজিন কিংশুক? না, একটু পরে সুস্থ হয়ে ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি যেতে পারবে? না কি, রাতটা এখানেই...

বাক্যটা অসমাপ্ত রেখে সে করবীর দিকে তাকায়। বলে, এ ফ্ল্যাটে আর কে থাকেন?

করবী জবাব দেবার আগেই ভগ্নউরু দুর্যোধন গর্জে ওঠে, আপনি... আপনি... ঐ শুয়োরের বাচ্চাটাকে পালিয়ে যেতে দিলেন? ...ওকে, ওকে... অ্যারেস্ট করলেন না?

ইন্সপেক্টর পুনরায় করবীকে প্রশ্ন করে, কে ওঁকে এভাবে ঠেঙিয়েছে? কেন ঠেঙিয়েছে?

করবী জবাব দিল না। নিঃশব্দে শুশ্রূষা করতে থাকে।

ইন্সপেক্টর পুনরায় করবীকে প্রশ্ন করে, ভদ্রলোকের গায়ে কি একটা সিলভার গ্রে রঙের স্যুট ছিল? বয়স ত্রিশ বছর? পাঁচ-সাত বা আট-হাইট?

এবারও করবী নীরব। কিংশুক আবার গর্জে ওঠে : ভদ্রলোক! ওকে আপনি ভদ্রলোক বলেন? হারামজাদা! শুয়োর কি বাচ্চা!

ইন্সপেক্টর উঠে দাঁড়ায়। করবীকে বলে, কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে লোকাল থানায় এফ. আই. আর. লজ করে আসবেন। তবে আপনি যেভাবে নির্বাক সেবাব্রতীর মতো আপনার কাজিনের শুশ্রূষা করে চলেছেন তাতে মনে হয়, আপনি ব্যাপারটা চেপে যেতেই চান। অল রাইট।

কিংশুক আবার গর্জে ওঠে : আই উইশ দ্যট দ্য হুলিগান বি অ্যারেস্টেড!

ইন্সপেক্টর দ্বারের কাছ পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। সেখানে সে ঘুরে দাঁড়ায়।

বলে, বললাম তো! থানায় গিয়ে অভিযোগটা লিপিবদ্ধ করবেন। বিস্তারিতভাবে। কিন্তু তাতে মুশকিল কি জানেন, কাজিন কিংশুকবাবু? আপনার এফ. আই. আর.-টা বিশ্বাসযোগ্য হওয়া চাই। আপনাকে ব্যাখ্যা দিতে হবে : কীভাবে বয়সে আপনার চেয়ে দশ বছরের বড়, হাইটে চার ইঞ্চি ছোট, ঐ থ্রি-পীস স্যুট পরা মানুষটা আপনাকে এমন মর্মান্তিকভাবে একতরফা ঠেঙিয়ে গেল। মামলাটা আদালত পর্যন্ত গেলে আমি কিন্তু সাক্ষী দেব যে, ওর গলার টাইটা পর্যন্ত স্থানচ্যুত হয়নি! গুড নাইট!

।। ছয়।।

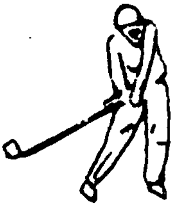

কৌশিক ফিরে এল রাত আটটা নাগাদ। এসেই বললে, এবার আপনার ঐ মান্ধাতা-আমলের গাড়িটা বাতিল করুন, মামু!

—কেন, উঠানটা কি খুবই বেঁকে গেছে?

—আজ্ঞে না। সব্‌সে-জবর নাচনেওয়ালিও একই কমপ্লেন করবে। যাকে ফলো করছি সে ঝড়াকসে একবারে স্টার্ট নিয়ে নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে গেল, আর আপনার পুষ্পক-রথ ঝকড়-ঝকড় করে স্টার্ট নিতেই চায় না। যখন নিল, তখন সামনের গাড়িটা হাওয়া। আমি কী করতে পারি?

বাসু বললেন, ঠিক আছে। ঠিক আছে। সব দোষ আমার গাড়ির। কিন্তু তুমি কতদূর কী জেনে এসেছ, শুনি। সুজাতার কিস্‌সা শেষ হয়েছে, 'কিং' ধরাশায়ী আর 'কিংকং' পুলিশ-ইন্সপেক্টরের নাকের ডগা দিয়ে হাওয়া। আর তুমি ঐ কিংকং-এর পিছু নিলে। তারপর?

কৌশিকের রিপোর্ট অনুসারে জানা গেল যে, অনির্বাণ হরীশ মুখার্জি রোড ধরে হাজরা রোডে এসে পড়ে। বাঁয়ে বাঁক নেয়। হাজরা পার্কের কাছে গাড়িটা পার্ক করে নেমে যায়। ওখানে যে একটা পাবলিক টেলিফোন বুথ আছে সেটাই জানা ছিল না কৌশিকের। সে কিছু দূরে গাড়িটা পার্ক করল। অনির্বাণ গাড়ি লক করে এগিয়ে গেল টেলিফোন বুথটায়। অনির্বাণকে খুবই চিন্তাগ্রস্ত মনে হচ্ছিল। ডাইনে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে না। কেউ যে তাকে অনুসরণ করতে পারে, বা করছে, এ বোধই নেই। ফলে তার নজর এড়িয়ে অনায়াসে পিছন পিছন কৌশিকও এগিয়ে আসে।

টেলিফোন বুথটা খালি। একটা মাত্র খুপরি। নিচের দিকটা কাঠের প্যানেল, উপরে কাচ। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পিছনের কাচখানা ভাঙা। হাজরা-মোড়ে পুলিশ আর 'ইনকেলাবি-দলে' খণ্ডযুদ্ধ লেগেই আছে। তাতেই হয়তো কাচখানা ভেঙে গেছে। কৌশিক সেই ভাঙা কাচের কাছাকাছি কানটা রেখে একটা সিগ্রেট ধরাবার চেষ্টা করছে। ও তাকে ভ্রূক্ষেপই করে না।

অনির্বাণ একটা নম্বর ডায়াল করে। কিছু পরে পয়সা ফেলে। কৌশিক আড়ালে দাঁড়িয়ে শুধু একতরফা আলাপচারী শুনতে পায় :

—হ্যালো!... কী? হ্যাঁ, কুতুব টী!... সে আবার কী? দাঁড়ান, কাগজ-কলম বার করি।

অনির্বাণ পকেট থেকে কাগজ-কলম বার করে বলে, এবার বলুন?

খানিকক্ষণ শুনে বলে, শুনুন, নম্বরটা আমি রিপিট করছি।

একটা টেলিফোন নাম্বার সে রিপিট করে। কৌশিক সেটা লিখে নিতে সাহস পায় না। কারণ সে যে টেলিফোন বুথের ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে, কথোপকথন শুনতে পাচ্ছে, এটা পথচারীদের নজরে পড়ছে। যে কেউ এসে ওর কলার চেপে ধরে বলতে পারে, এভাবে আড়ি পাতছেন কেন, মশাই? বিশেষত পানের দোকানের পানওয়ালা দুলে দুলে পান সাজতে সাজতে ওকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নজর করছে মনে হল।

লোকটা সন্দেহ করেছে ইতিমধ্যেই।

অনির্বাণ টেলিফোনটা হুক থেকে নামিয়ে রাখল। এদিকে ফিরল। কৌশিকের সঙ্গে ওর চোখাচোখি হয়ে গেল। উপায় নেই। কৌশিক বললে, আপনার শেষ হয়েছে? কাইন্ডলি বাইরে আসুন। আমাকে একটা জরুরি ফোন করতে হবে।

অনির্বাণ বললে, সরি! আমাকে আরও দু-একটা ফোন করতে হবে। আপনি বরং ঐ রেলওয়ে টিকিট-কাউন্টারে গিয়ে দেখুন। ওখানেও একটা পাবলিক ফোন আছে।

কৌশিক বিনা-বাক্যব্যয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল। দেখল, অনির্বাণ আবার নতুন করে ফোন করছে কোথাও। কৌশিক ওর দৃষ্টি এড়িয়ে আবার ফিরে এসে দাঁড়ালো। আগের জায়গায়।

অনির্বাণ উল্টোদিকে মুখ করে বলছে, ...ঠিক আছে। কটার সময়? ...দশটা? আজ রাত দশটা?... অল রাইট। কোথায়? ...হ্যাঁ, হ্যাঁ, টাকাটা আমার সঙ্গেই আছে... আরে হ্যাঁ, বাপু পাঁচ হাজারই। দশ-বিশ টাকার নোটে। ভেনুটা বলুন। কোথায়? ...কী? ও, হ্যাঁ বুঝেছি। চিনি, আর. সি. জি. সি. চিনি। কিন্তু সে তো বিরাট এলাকা ...কী? ট্রাস্টি? হ্যাঁ, চিনি। অল রাইট ...রাত দশটা, অ্যাট TRUSTEE! কিন্তু অমন অদ্ভুত জায়গায় কেন? ... অল রাইট।

ফোনটা নামিয়ে রাখল অনির্বাণ। বেরিয়ে গেল বুথ থেকে। কৌশিকের নজর হল, পানওয়ালা এখনো একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই বললে, বাবুজি, শুনিয়ে।

অগত্যা এগিয়ে আসতে হল তার দিকে। পানওয়ালা বললে, আপ ছুপকর উনকি বাত চোরী চোরী সুন রহেথে! কিঁউ?

অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স! আক্রমণই হচ্ছে আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ পন্থা! কৌশিক খিঁচিয়ে ওঠে, তোমার কোনও ছোটি বহিন আছে? বদমেজাজী জিজাজী আছে? বিনাদোষে যদি তোমার জিজাজী ঐ নন্নি-মুন্নি বহিনটাকে তালাক দিতে চায়, তাহলে তুমি তখন কী করবে? আড়ি পাতবে? না দুলে দুলে পান সাজবে?

—ঐ স্যুট পিহ্‌নেবালা আপকো জিজাজী আছেন?

—না তো কি আপকো জিজাজী আছেন?

—ঠিক হ্যায়, বাবুজি; যাইয়ে!

এ ঝামেলা মিটিয়েই কি রেহাই পাওয়া গেল? মামুর পুষ্পক রথ বেগড়বাই শুরু করলেন!

বাসু বললেন, অল রাইট, অল রাইট! দোষটা নন্দ ঘোষের, মেনে নিলাম। এবার বল, টেলিফোনের নম্বরটা কী ছিল?

—বললাম তো। সেটা লিখে নেবার সুযোগ পাইনি।

—তা তো শুনলাম। বুঝতে পারছি, মনে রাখতেও পারিনি। অন্তত এক্সচেঞ্জ নম্বরটা?

—ভাল শোনা যাচ্ছিল না। ট্রামের ঘড়ঘড়ানিতে।

—বটেই তো! হাজরার মোড়ে ট্রামে বড় শব্দ হয়। ওখানে ট্রামরাস্তার উঠোনটা বড়ই বাঁকা!

রানু কৌশিকের তরফে সওয়াল করেন, তুমি বাপু অহেতুক রাগ করছ। কৌশিক তোমার পুষ্পক রথকে ছ্যাকড়া গাড়ি বলায়।

বাসু সেকথায় কর্ণপাত করলেন না। কৌশিককে বলেন, ঠিক আছে! যেটুকু শুনতে পেয়েছ তার অর্থগ্রহণ হয়েছে? TRUSTEE ব্যাপারটা কী? রাত দশটায় TRUSTEE-তে দেখা করার অর্থ?

কৌশিক বললেন, আমি বুঝতে পারিনি।

—ন্যাচারালি। আর ঐ R.C.G.C.?

—তাও জানি না।

—ধর, আমি যদি বুঝিয়ে বলি ঐ R.C.G.C. হচ্ছে রয়্যাল ক্যালকাটা গলফ ক্লাব? তাহলে বলতে পারবে TRUSTEE-তে দেখা করার অর্থ?

কৌশিক অধোবদনে ভাবছে। বাসু জিজ্ঞেস করেন, নেক্সট? সুজাতা?

সুজাতা এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। এখনও নীরব। রানু আগ বাড়িয়ে বলেন, আমাকে জিজ্ঞেস করা নিরর্থক। আমি বুঝিনি।

—ধর, আমি যদি বুঝিয়ে বলি : কৌশিক ট্রামের ঘড়ঘড়ানিতে ঠিক মতো শুনতে পায়নি। কথাটা 'ট্রাস্টী' নয়, 'ফার্স্ট টী'?

—'প্রথম পেয়ালা চা?' তার মানে?

—না। টী বানান এখানে TEA নয়, TEE; তাহলে? কোন অর্থ হয়?

এবারও সবাই নীরব।

বাসুই ব্যাখ্যা দেন, গলফ খেলায় TEE একটা পারিভাষিক শব্দ। ফুটবলে যেমন 'ফ্রি-কিক' বা 'সাডেন-ডেথ'; ক্রিকেটে যেমন 'গুগলি' বা 'চায়নাম্যান'। গলফ খেলার সময় যেখানে বলটাকে তৃণাচ্ছাদিত টিলায় বসিয়ে স্ট্রাইক করা হয় তাকে বলে 'টী'। পরপর তাদের নাম 'ফার্স্ট টী', 'সেকেন্ড টী', 'থার্ড টী' ইত্যাদি। আমরা জানি, অনির্বাণের কাকাবাবু প্রয়াত রঘুবীর সেন প্রত্যহ গলফ খেলতে আসতেন। হয়তো অনির্বাণই ড্রাইভ করে নিয়ে আসত R.C.G.C.-তে। তাই ঐ গলফ কোর্সের 'ফার্স্ট টী'-র অবস্থান সম্বন্ধে সে প্রত্যাশিতভাবেই ওয়াকিবহাল।

কৌশিক বলে, কিন্তু যে ফোন করছিল সে'ও কি গলফ খেলে? আমি, সুজাতা, মামিমা, আমরা কেউই তো জানতাম না 'TEE' কথাটার মানে। ও কেমন করে জানল?

—আমার অনুমান যদি সত্য হয় অর্থাৎ TRUSTEE-টা যদি First Tee হয় তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে সেও ঐ গলফ-কোর্ট সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। প্রশ্ন সেটা নয়, প্রশ্ন হচ্ছে সাক্ষাৎকারটা হচ্ছে কেন?

সুজাতা এবার বলে, অনির্বাণকে কেউ ব্ল্যাকমেলিং করছে। ও তাকে নগদে পাঁচ হাজার টাকা খুচরো নোটে দিতে যাচ্ছে...

—সেটা সহজবোধ্য। প্রশ্ন সেটাও নয়। প্রশ্ন : পাঁচ হাজার ব্ল্যাকমেলিং-এর টাকা মেটাতে অমন একটা অন্ধকার নির্জন স্থান বেছে নেওয়া হল কেন?

কৌশিক উঠে দাঁড়ায়। ঘড়ি দেখে বলে, এখনো সওয়া ঘণ্টা সময় আছে।

বাসু বলেন, তা আছে। কিন্তু তোমার হিপ-পকেটে কি 'ওটা' আছে? নাহলে ভরে আত্মরক্ষার্থে প্রয়োজন হতে পারে। দ্বিতীয় কথা, আমার গাড়িটা থাক। ট্যাক্সি নিয়ে জায়গাটা চেন তো? আনওয়ার শাহ রোডে টিভি স্টেশনের...

—হ্যাঁ, চিনি। রয়্যাল ক্যালকাটা গলফ ক্লাবের গেটটা দেখেছি। কিন্তু মেম্বারশিপ কার্ড আমাকে তো ঢুকতে দেবে না।

—সম্ভবত নয়। তবে বহু জায়গায় পাঁচিলটা ভেঙে দিয়েছে বস্তির লোকেরা। ইট খুলে গেছে। তা হোক, সে পথে বেআইনি ভিতরে ঢুকতে যেও না। গেটে গিয়ে পৌনে দশটা গাড়িটা পার্ক কর। বাইরে থেকে যেটুকু দেখা যায় তাই দেখবে। অনির্বাণ কখন ভিতরে কখন বেরিয়ে এল। টাইমটা নোট কর। আরও একটা কথা। এখন অনির্বাণ তোমার মুখ একটু মেক আপ নিয়ে যেও।

রানু বলেন, কিন্তু সাক্ষাতের জায়গাটা তো অনির্বাণ স্থির করেনি, করেছে ঐ লো শয়তানি পরিকল্পনাটা যদি তার হয়?

বাসু বললেন, অনির্বাণ কচি খোকা নয়, অত্যন্ত বিচক্ষণ, তুখোড় ছেলে। সে আত্মরক্ষা জানে। না জানলে সে মরবে। তুমি শুধু নিজেকে কোনভাবেই জড়িয়ে ফেল না কৌশিক।

সুজাতা উঠে দাঁড়ায়। বলে, দাঁড়াও। আমি যাব তোমার সঙ্গে।

—না! —বাসু আপত্তি করেন। তুমি গেলে ওর দায়িত্ব বাড়বে অহেতুক। সুবিধা কিছুই না। ও একাই যাক। যে কোনভাবেই অহেতুক বাড়তি রিস্ক নিতে যেও না, কৌশিক। তুমি বডিগার্ড হিসাবে যাচ্ছ না। ইনভেস্টিগেটার হিসাবে যাচ্ছ।

—অল রাইট। চলি।

কৌশিক এবার সুজাতার দিকে ফিরে বলল, স্টিল-আলমারির চাবিটা দেখি?

সুজাতা উঠে দাঁড়ায়। বলে, চল। আমি বার করে দিচ্ছি। ওরা দুজনে দোতলায় উঠে য পর রানু বাসুসাহেবের দিকে ফিরে বললেন, কী দরকার ছিল ঐ গোলাগুলির মধ্যে কৌশি এত রাত করে পাঠাবার?

বাসু বলেন, আমার উপর রাগ করছ কেন? প্রফেশনটা কৌশিক তো নিজেই বেছে নিয়ে প্রাইভেট গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে মাঝে মাঝে হিপ-পকেটে আত্মরক্ষার অস্ত্রটা থাকা প্রয়ো হয়ে পড়ে। শুধু এই কথাই তো ওকে মনে করিয়ে দিয়েছি।

—না। তুমিই ওকে পাঠালে অমন একটা বিপদজনক জায়গায়।

বাসু মাথা নেড়ে বললেন, সরি ম্যাডাম। আপনার স্মৃতিভ্রম হচ্ছে। আমি শুধু জা চেয়েছিলুম, "পাঁচ হাজার ব্ল্যাকমেলিং-এর টাকা মেটাতে অমন একটা অন্ধকার নির্জন স্থান নেওয়া হল কেন?" তোমরা দুজনে জবাব দিলে না। কৌশিক ত্রিং করে উঠে দাঁড়ালো। দেখে বলল, 'এখনো সময় আছে।'

—তখন তোমার বলা উচিত ছিল, ওসব ধাষ্টামোর মধ্যে তোমাকে নাক গলাতে হবে না।

—আমি সে কথা বললেই ওর 'বোঁতাম-আঁটা জামার নিচে শান্তিতে শয়ান' প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়ে যেত? ও রাজি হয়ে যেত, সুজাতাকে নিয়ে দোতলায় উঠে খেত?

রানু প্রত্যুত্তর করার সময় পেলেন না। ইতিমধ্যে ওরা দুজনে দ্বিতল থেকে নেমে এসেছে। কৌশিকের হিপ-পকেটটা উঁচু হয়ে আছে। তার হাতে একটা টর্চ। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ। বাসু জানেন, তাতে আছে ফ্ল্যাশগান-ওয়ালা ক্যামেরা, বাইনোকুলার ইত্যাদি।

ওরা দুজনে বৈঠকখানার সামনে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো।

কৌশিক এদিকে ফিরে বললে, আপনারা তিনজনে খেয়ে নেবেন। ফিরতে আমার অনেক রাত হতে পারে। সদরের ডুপলিকেট চাবি তো আমার কাছেই আছে। শুয়ে পড়বেন আপনারা। গুডনাইট!

কৌশিক সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। রাস্তায়।

সুজাতা কোনও কথা বলল না। না কৌশিকের সঙ্গে, না মামু-মামিমার সঙ্গে। দুম্-দুম্ করে উঠে গেল দ্বিতলে। তারপর হঠাৎ ফিরে এসে বললে, মামিমা, আপনারা খেয়ে নেবেন। আমার শরীরটা ভাল নেই। রাতে খাব না।

রানু জবাব দেবার সুযোগ এবারও পেলেন না।

কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়েই সুজাতা দ্বিতলমুখো রওনা হয়েছে।

বাসু পাইপ ধরালেন। বললেন, সুজাতা মর্মান্তিক চটেছে।

রানু বললেন, সেটাই স্বাভাবিক। তোমার উচিত ছিল, কৌশিককে বাধা দেওয়া।

বাসু বলেন, ভুল করছ রানু! কৌশিককে যেতে দিলাম বলে সুজাতা চটেনি।

—তবে কী জন্য সে রাগ করেছে?

—তাকে কৌশিকের সঙ্গে নৈশ-অভিযানে যেতে দিলাম না বলে।

।। সাত ।।

রাত বাড়তে থাকে।

ডিনার-টাইম হতেই বিশু এসে জানতে চায়, টেবিল সাজাবো?

রানু বাসুসাহেবের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালেন।

উনি বলেন, না রে! কৌশিক বেরিয়ে গেল। ওর ফিরতে দেরি হবে। ও ফিরে এলে আমরা একসঙ্গেই খাব। তুই খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।

—দাদাবাবু কই গেল?

—সে আর তোর শুনে কাজ নেই।

বিশে বিজ্ঞের মতো বললে, বুঝলাম। শোনেন, বড্ড ঘুম পাচ্ছে। জেগে থাকতে পারবনি। শুয়ে

পড়ছি। দাদাবাবু এলে আমারে ডেকে দেবেন। তখন টেবিল সাজাব। নিজেও খেয়ে নেব নে।

বলেই ছুট।

রানু পিছন থেকে ডাকেন, না, না, এই বিশে, শুনে যা...

কে কার কথা শোনে। বিশু ততক্ষণে হাওয়া।

রানু এদিকে ফিরে বাসুসাহেবকে বললেন, তুমিই যত নষ্টের গোড়া। তোমার মক্কেল মাঝরাতে কাকে ব্ল্যাকমেলিং-এর টাকা মেটাতে যাচ্ছে, তাতে তোমার কী? কলকাতা শহরে তুমিই তো একা ক্রিমিনাল-সাইড ব্যারিস্টার নও! কই আর কেউ তো এভাবে বাড়ির শান্তি নষ্ট করে না।

বাসু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আই প্লীড গিল্‌টি, মিলেডী! অনুমতি দেন তো সেজন্য প্রায়শ্চিত্ত করতেও প্রস্তুত।

—প্রায়শ্চিত্ত! মানে? কীভাবে?

—এখনো সময় আছে। রাত দশটার আগেই ঐ R.C.G.C.-র গেটে সশস্ত্র উপস্থিত হতে পারি।

রানুর ছুটে পালানোর উপায় নেই। সবেগে চাকায় পাক দিয়ে তিনি রওনা হয়ে গেলেন অন্দর-মুখো। যাবার আগে বলেও গেলেন : তাহলেই ষোলোকলা পূর্ণ হয়! বয়স কত হল সে খেয়াল আছে?

বাসু জানতে চান, চললে কোথায়?

—শুতে। আমারও শরীরটা ভাল নেই, রাতে খাব না।

—অলরাইট! অলরাইট! কিন্তু আমি তো তোমাদের মতো বুড়ো হয়ে যাইনি। খিদেও আছে। আমার জন্য রাতে কী বানানো হয়েছে? খই দুধ? না সাবু? কে দেবে?

রানুর ইনভ্যালিড চেয়ার ততক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে। কেউ এ প্রশ্নের জবাব দিল না।

বাসু ধীরপদে উঠে গেলেন ড্রিংক-কাবার্ডর দিকে।

শিভ্যাস-রিগাল এর বোতলটা বার করলেন। কেউ আজ নেই সাহায্য করতে। নিজেই কিচেনে গিয়ে ফ্রিজ খুলে আইস কিউবের ট্রে-টা নিয়ে এলেন। আর কাজুবাদাম ভর্তি হরলিকসের শিশিটা।

হুইস্কি-অন-রকসই এসব মুহূর্তে ওঁর মন-পসন্দ। এ রোগের দাওয়াই।

কৌশিক যখন ফিরে এল পাড়া তখন নিশুতি। নিউ আলিপুর পাড়ায় দু-একটি ঘরে ছেলে-মেয়েদের ঘুম পাড়িয়ে হয়তো কর্তা-গিন্নি অ্যাডাল্ট মার্কা মিডনাইট শো দেখছেন টিভিতে। কৌশিক আশা করেছিল, ওদের বাড়িও ঘুমে অচেতন থাকবে। দূর থেকে তাই মনেও হয়েছিল। কিন্তু গাড়ি গ্যারাজে তুলবার মুখে বাঁক নেবার সময় যখন হেডলাইটের ধূমকেতুর পুচ্ছ পোর্চের উপর সম্মার্জনী-প্রলেপন বুলিয়ে দিল, তখন দেখা গেল তিন-তিনটি বেতের সোফা দখল করে

বসে আছেন তিন উদ্বিগ্ন পরমাত্মীয়।

ও এগিয়ে আসতেই বাসু বললেন, মামুর দু-দুটো পরামর্শের একটাও গ্রহণ করনি দেখছি। ট্যাক্সিতেও যাওনি। খানদানি বদনখানা আড়াল করার চেষ্টাও করনি।

কৌশিক একটা চেয়ার দখল করে বসল। বলল, কী জানেন মামু? আপনি তো ইদানীং ট্যাক্সি বিশেষ চড়েন না। তাই জানেন না। রাত নয়টার পর ট্যাক্সিওয়ালা তাদের গ্যারেজ-মুখো ছাড়া যেতে চায় না। নেহাত যদি বলেন এয়ারপোর্ট যাবেন আর ফাঁকা গাড়ি ফেরার জন্য ডবল ফেয়ার কবুল করেন...

—বুঝেছি, বুঝেছি। আর মেকআপটা নিলে না কেন?

—একটু আত্মপ্রশংসার মতো শোনাবে, সেটা সুজাতার সামনে বলতে চাই না— কিন্তু আপনি ব্যঙ্গ করে যে কথা বললেন, হেতুটা তাই। এই 'খানদানি বদনখানি'র জন্য। এটাকে লুকোতে হলে বাবা মুস্তাফার মেক-আপ নিতে হয়। অতটা সময় হাতে ছিল না। আর তাছাড়া অনির্বাণের সঙ্গে আচমকা মুখোমুখি হয়ে পড়লে বলতুম : 'ওয়াল্ট ডিজনে ঠিকই বলেছেন : It's a small world! আজ সন্ধ্যারাতেই আপনাকে হাজরা মোড়ে দেখেছি মনে হচ্ছে?' ছদ্মবেশে ধরা পড়ে যাওয়ার চেয়ে সেটা অনেক নিরাপদ! কী জানেন, মামু— আপনি আজও পড়ে আছেন কনান ডয়েলের যুগে। ক্রিস্টির প্যাঁয়রো কখনো ছদ্মবেশ পরেছেন বলে তো মনে পড়ে না; আর পেরী মেসন...

—হয়েছে। থাক। পণ্ডিত্যেমি অনেক দেখিয়েছ। এবার তোমার অভিজ্ঞতাটা শোনাও।

রানু বাধা দিয়ে বলেন, থাম তো তুমি! বেচারি এই রাত বারোটা পর্যন্ত না খেয়ে আছে। যাও কৌশিক মুখ-হাত ধুয়ে প্যান্ট-শার্ট ছেড়ে ডাইনিং হলে এসে বস। আমি খাবরটা দিতে বলি।

বাসু ধমকে ওঠেন, আজ তোমার কী হয়েছে রানু? বারে বারে সব গুলিয়ে ফেলছ, রাত বারোটা পর্যন্ত কৌশিক একাই অভুক্ত পড়ে নেই। আমরা সবাই পেটে কিল মেরে পড়ে আছি। সুজাতা, তুমি, বিশে আর— হ্যাঁ, আমারও সাবু অথবা খই-দুধ অভুক্ত।

রানু হেসে ফেলেন। বলেন, না। তুমি বাদ! তুমি ইতিমধ্যে তিন পেগ খেয়েছ। আর খাবে না। বোতলটা দাও দিকিনি।

ডাইনিং টেবিলে চিলি-চিকেন আর পরোটা চিবাতে চিবাতে কৌশিক বললে, মামু আপনি কিন্তু গভীর গাড্ডায় পড়ে গেছেন। আপনার মক্কেল ধোয়া তুলসীপাতাটি নয়।

বাসু বলেন, তোমার কনক্লুশনটা আমি শুনতে চাইনি, কৌশিক। আমি চাই 'ফ্যাক্টস'; বাস্তবে যা ঘটেছে একের পর এক। ওর দেখা পেলে?

—পেলাম। রাত নয়টা সাতচল্লিশে। আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার অনুমানটা ঠিকই। রাঁদেভুটা ঐ গলফ-ক্লাবের একনম্বর টী-তেই। ঐ R.C.G.C.-র গেটের সামনে আমি পৌঁছাই নয়টা একত্রিশে।

ছায়া-ছায়া মতো জায়গায় গাড়িটা পার্ক করে অন্ধকারে অপেক্ষা করতে থাকি। ও এল নয়টা সাতচল্লিশে। ডাইনে-বাঁয়ে তাকালো না। কার্ড দেখিয়ে সোজা ভিতরে চলে গলে। পরিধানে সেই সাবেক সিলভার-গ্রে স্যুট। সেই সাদা-নীল স্ট্রাইপড্ টাই। দূর থেকে ওর সাইড-পকেট বা হিপ-পকেট দুটোই ভাল করে লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমার মনে হয়নি যে, তার ভিতর মারাত্মক কিছু আছে। কোন পকেটই উঁচু হয়ে নেই...

—তোমার কী মনে হল তা আমি জানতে চাইছি না; বাস্তবে কী কী ঘটল...

রানু ধমকে ওঠেন, কেন? কৌশিক কি কাঠগড়ায় উঠেছে?

সুজাতা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলে, তাছাড়া সাক্ষী একজন বিশেষজ্ঞ, মি-লর্ড! একজন এক্সপিরিয়েন্সড 'জাসুসী'-র অনুমান-নির্ভর এভিডেন্স হুজুরের আদালতে গ্রাহ্য হওয়া উচিত।

বাসুও হেসে ফেলেন, অল রাইট। ধরে নেওয়া গেল— অনির্বাণ কোন রিভলভার নিয়ে ক্লাবের ভিতর ঢোকেনি। তারপর কী হল?

—ঠিক তেইশ মিনিট পরে— দশটা বেজে দশ মিনিটে ও ক্লাবঘর থেকে বার হয়ে এল। এবারেও ডাইনে-বাঁয়ে তাকালো না। দ্রুত পায়ে সোজা এসে উঠে বসল ওর ফিয়াট গাড়িতে। স্টার্ট দিল। দ্রুত গিয়ার বদলে...

—আর তোমার ছ্যাকড়া গাড়ি ঝকড়-ঝকড় শুরু করে দিল, এই তো?

—না মামু। ইতিমধ্যে কার্বুরেটারের ট্রাবলটা আমি মেরামত করিয়ে নিয়েছি। আপনার ওল্ড-গোল্ড পুষ্পকরথ একবারেই স্টার্ট নিল। প্রায় চল্লিশ মিটার ব্যবধান রেখে আমরা চলতে থাকি। রাত তখন এমন কিছু বেশি নয়। আনোয়ার শাহ রোডে ট্রাফিক ভালোই আছে। তারপর ও হঠাৎ একটা আট-দশ মিটার চওড়া গলি-মুখ পার হয়েই ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল। ব্যাক করে এল চার-পাঁচ মিটার। ঐ গলিতে ঢুকে গেল। ততক্ষণে আমি ঐ গলির মুখটার কাছাকাছি এসে গাড়ি পার্ক করেছি। গাড়ি থেকে নেমে লুকিয়ে লক্ষ্য করতে থাকি। গলির ভিতর তাকিয়ে দেখি ঘোর অন্ধকার। ঐ অঞ্চলে লোডশেডিং হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ মিটার এগিয়ে অনির্বাণ গাড়ি থামালো। নেমে এল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল। জনমানবের চিহ্ন দেখতে না পেয়ে সে পকেট থেকে কী-একটা জিনিস বের করল। অতদূর থেকে আমার মনে হল, অ্যালুমিনিয়ামের টিফিন-বক্স : বাচ্চারা যা নিয়ে স্কুলে যায়। চট করে ডাস্টবিনের ভিতর সেটা ফেলে দিল। শুধু তাই নয়, কোট খুলে, আস্তিন গুটিয়ে, ডাস্টবিনের ভিতর হাত চালিয়ে বস্তুটাকে নিচে ঠেলে দিল। গলির একটা বাড়িতে দ্বিতলে আলো জ্বলছিল। তাতেই গলিপথটা আলো-আঁধারি। তারপর অনির্বাণ ফিরে এল গাড়িতে। কোটটা গায়ে দিল না। গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেল।

বাসু বলেন, বুঝলাম। অতঃপর নীরন্ধ্র অন্ধকার মঞ্চে শ্রীমান সুকৌশলীর প্রবেশ এবং পরিত্যক্ত বস্তুটি উদ্ধার। সেটা কোথায়?

—খেয়ে উঠে দেখাচ্ছি।

আহারান্তে কৌশিক উদ্ধারপ্রাপ্ত বস্তুটি দেখালো। রুমালে জড়ানো একটি জার্মান-মেড

রিভলভার। শর্ট-নজল। ছোট্ট। রুমালটায় নোংরা লেগেছে। অস্ত্রটায় লাগেনি। বাসু সেটা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন। নম্বরটা পড়ে শোনালেন : KB 173498।

রানু তৎক্ষণাৎ নম্বরটা টুকে নিলেন খাতায়।

বাসু সামনে ধরে চেম্বারটা খুলে দেখলেন। পাঁচটা চেম্বারে টাটকা বুলেট। শুধু ব্যারেলের সামনের অবস্থানে কোনও বুলেট নেই। সেটা ফাঁকা। গন্ধ শুঁকেও দেখলেন।

রানু জানতে চান, বারুদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে?

—যাচ্ছে! বারুদের নয়! পচা-চিংড়ির! ডাস্টবিনটা বোধহয় বহুদিন সাফা করা হয়নি।

কৌশিক বলে, আমার বোধহয় এখনই পুলিশে রিপোর্ট করা উচিত! এটা একটা এভিডেন্স। আমি গোপন করতে পারি না। সুকৌশলী লাইসেন্সড ডিটেকটিভ এজেন্সি!

বাসু বলেন, এভিডেন্স? মানে? কিসের এভিডেন্স?

—মার্ডারের। ঐ গুলিটায় যে লোকটা খুন হয়েছে।

—আগে খবর পাই, কেউ আদৌ খুন হয়েছে! এখন পর্যন্ত ঘটনাটা এই : তোমার এক্তিয়ারে একটা রিভলভার বেমক্কা এসে গেছে, এজন্য তুমি আমার কাছে আইনত পরামর্শ চাইতে এসেছ। তুমি আমার ক্লায়েন্ট। তোমার আশঙ্কা কেউ তোমাকে হত্যা মামলায় জড়াতে চায়। অথচ কে হত হয়েছে, আদৌ কেউ হত হয়েছে কি না, তা তুমি জান না। তুমি একটা একশ টাকার নোট রানুকে রিটেনার হিসাবে জমা দিয়ে রসিদ নাও। আর এই রিভলভারটার প্রাপ্তিস্বীকারের রসিদ। এবার চল সবাই, শুয়ে পড়ি। কাল সকালে খবরের কাগজে যদি দেখা যায়, যে গলফ ক্লাবে রাত দশটায় কেউ খুন হয়েছে তখন পুলিসে খবর দেবার প্রশ্ন উঠবে। এখন পর্যন্ত আমরা কেন ধরে নেব যে, আদৌ কেউ খুন হয়েছে?

।। আট ।।

পরদিন সকালে প্রাতঃভ্রমণ সেরে বাড়ি ফিরে বাসুসাহেব দেখেন বাইরের বারান্দায় ওঁরা তিনজনে দু-তিনখানা খবরের কাগজে বিশেষ একটি সংবাদ খুঁজছেন। সাধারণ মানুষের মৃতদেহ পথের ধারে পড়ে থাকাকে ইদানীং আর 'নিউজ' বলে ধরা হচ্ছে না। তবে এ-খবরটা বেরিয়েছে একাধিক পত্রিকায়। বোধকরি স্থান-মাহাত্ম্যে। রয়্যাল ক্যালকাটা গলফ ক্লাবের সে রমরমার যুগ আর নেই। তবু মরা হাতি লাখ টাকা। সংবাদে প্রকাশ : ঐ ক্লাবের মাঠে গতকাল রাত একটার সময় টহলদারী দারোয়ানের নজরে পড়ে এক নম্বর টীর কাছাকাছি একটি মৃতদেহ। পুরুষ। বয়স পঞ্চাশের ওপরে। পরনে শার্ট-প্যান্ট। ক্লাবের সভ্য নয়। তার পকেট ফাঁকা— কোন কাগজ, রুমাল, মানিব্যাগ, বাসের টিকিট কিচ্ছুটি নেই। দারোয়ান কেয়ারটেকারকে ডেকে আনে। পুলিশ এসে পৌঁছায় রাত পৌনে দুটোয়। বিস্তারিত খবর স্টপ-প্রেসে দেওয়া যায়নি। শুধু বলা হয়েছে, মৃতব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি। না, স্টোনম্যানের কীর্তি নয়। রগের পাশে বুলেটের আঘাত চিহ্ন।

কৌশিক বললে, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি। আমার মনে হয়, লাইসেন্সড প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসাবে আগবাড়িয়ে আমাকে খবরটা জানাতে হয়।

—কী খবর? কে খুন হয়েছে?

—তা জানি না। কিন্তু কে খুনটা করেছে তা জানি!

বাসু ধমকে ওঠেন, বোকার মতো কথা বল না কৌশিক। তুমি শুধু এটুকু জান যে, তুমি একটা বেওয়ারিশ রিভলভার উদ্ধার করেছ, যার একটি গুলি ব্যয়িত। তুমি আমাকে জানিয়েছ। ব্যস। এখন তুমি আমার মক্কেল। আমার নির্দেশ মতো চলবে।

হঠাৎ পোর্টিকোর সামনে এসে দাঁড়ালো একটা পুলিশ-জীপ। ধড়াচূড়ো-পরা ইন্সপেক্টর নিখিল দাশ নেমে এল গাড়ি থেকে। হোমিসাইড সেকশানে এই নিখিল দাশ নতুন জয়েন করেছে। বরাবরই সে বাসুসাহেবের ফ্যান, এখন ঘটনাচক্রে বিপক্ষশিবিরে এসে পড়াতেও তার মুগ্ধভাব কাটেনি। সম্প্রতি বাসুসাহেব একটি হত্যা মামলার কিনারা করে নিখিলের সঙ্গে পুরস্কারটা ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। বাসুর ভাগে পড়েছে মক্কেলের মুক্তি আর ইন্সপেক্টর দাশের প্রাপ্তি : সমস্যা সমাধানের কৃতিত্ব। তথা, একটি 'বউ!'

রানু বললেন, এসো, এসো নিখিল। কাকলিকে সঙ্গে নিয়ে এলে না কেন?

কাকলি নিখিলের সদ্যপরিণীতা বধূ।

—আমি কি এই কাকডাকা ভোরে সৌজন্য সাক্ষাতে এসেছি মামিমা?

তা সত্যি। বেচারি অফ-ডিউটিতে ছিল। কিন্তু পঞ্চায়েতি ইলেকশনের হাঙ্গামায় এমনিতেই লোকের টানাটানি। তাই মাঝরাত্রে ওর ঘাড়ে চেপেছে বাড়তি কাজের বোঝা। রাত দেড়টার সময় লালবাজার হোমিসাইড থেকে ওর বাড়িতে ফোন করে জানানো হয় যে, গলফ ক্লাবের মাঠে একটা মৃতদেহ পাওয়া গেছে। মার্ডার। গুলিবিদ্ধ বৃদ্ধ। লালবাজার থেকে পুলিশ ফটোগ্রাফারকে ওরা রওনা করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সিনিয়র ইন্সপেক্টর আর কেউ ডিউটিতে না থাকায় ওকেই সরেজমিনে কেসটা দেখতে বলা হচ্ছে। নিখিল রাত চারটের সময় লাসকে মরাকাটা-ঘরে রওনা করে দিয়ে ফিরে আসে। আর তখনই স্ত্রীর কাছে শোনে, লালবাজার হোমিসাইড থেকে দ্বিতীয়বার ফোন এসেছিল।

নিখিল রিং-ব্যাক করে। লালবাজার থেকে জানতে পারে যে, রাত চারটের সময় ওরা একটা 'অ্যাননিমাস টিপস্' পায় টেলিফোনে। অজানা লোকটা বিকৃতকণ্ঠে কথা বলছিল। আত্মপরিচয় দিতে চায়নি। তার বক্তব্য : মৃত ব্যক্তির নাম কালিপদ কুণ্ডু। ব্ল্যাকমেলিং ছিল তার ব্যবসা। সংবাদদাতা জানে যে, ঐ কুণ্ডুর সঙ্গে একজন যুবকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল গলফ ক্লাবে, রাত দশটায়। যুবকের নামটা সংবাদদাতা জানে না; কিন্তু সে থাকে টেমার লেনের একটা মেসবাড়িতে; আর দ্বিতীয়ত সে কী একটা মামলায় জড়িত। স্বনামধন্য ব্যারিস্টার বাসুসাহেবের মক্কেল।

নিখিল বলে, খবরটা শুনে আমি সরাসরি আপনার কাছে চলে এসেছি। এবার বলুন স্যার,

টেমার লেনের মেসে আপনার কোনও মক্কেল থাকে?

বাসু বললেন, থাকে। অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট, কাল আমাদেরও শুতে অনেক রাত হয়েছিল। কৌশিক আমারই নির্দেশে একটা তদন্তে গিয়েছিল। ফিরে এল রাত বারোটা বাজিয়ে। খবরের কাগজে নিউজটা দেখে আমি হোমিসাইডে ফোন করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় তুমি নিজেই এসে হাজির। আমি কৌশিককে ডেকে দিচ্ছি। সে একটা এজাহার দেবে। শুধু এজাহার নয়, একটা বেওয়ারিশ রিভলভার তোমার হাতে তুলে দেবে।

—বেওয়ারিশ রিভলভার! মানে?

—হ্যাঁ, জার্মান মেড। 'সড-অফ নজল'। এমন রিভলভার বাজারে কমই আছে। ও একটা ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে।

—কোথায়?

—সেটা ওর কাছেই শোন। ওকে ডেকে দিচ্ছি।

উপায় নেই। শুধু আইন-সচেতন নাগরিক হিসাবেই নয়, হাইকোর্টের একজন প্র্যাকটিসিং ব্যারিস্টার হিসাবে সব কথাই ওঁকে জানাতে হবে। অনির্বাণ হাজার টাকার রিটেইনার দিয়েছে কিন্তু সেটা তার 'তহবিল-তছরুপ' কেসে। ট্রাস্টি হিসাবে সে যেন বিশ্বাসঘাতক রূপে চিহ্নিত হয়ে শাস্তি না পায়, তাই। সেই অজুহাতে সে মানুষ খুন করে নিরুদ্দেশ হতে পারে না। অনির্বাণ যদি রিভলভারটা ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে না দিয়ে বাসুসাহেবের চেম্বারে এসে আত্মসমর্পণ করত, তাহলে হয়তো ব্যাপারটা দাঁড়াতো অন্যরকম। কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছেলেটি সে পথে যায়নি। কেন? সে কলকাতাবাসী হিসাবে কি জানে না যে, 'ময়লা ছুঁইলে শাস্তি পাইবে' নির্দেশ অগ্রাহ্য করে একদল ভিখারি প্রতিদিন কাঠি দিয়ে ডাস্টবিনের ময়লা ঘাঁটে? সে কি জানে না, জমাদার ডাস্টবিনের ময়লা লরিতে লাদ করার সময় আচমকা রিভলভারটা আবিষ্কার করতে পারে? সে কি জানে না, যন্ত্রটার কালোবাজারী দাম পাঁচ-সাত হাজার? নিঃসন্দেহে ওটা আনলাইসেন্সড। অনির্বাণ ব্ল্যাকমানিতে কিনেছে। কিন্তু ঐ কালিপদ কুণ্ডুর মতো বৃদ্ধকে সে কেন এভাবে খুন করল? আরও আশ্চর্যের কথা— কৌশিকের জবানবন্দি অনুসারে : অনির্বাণ স্থান-নির্বাচন তথা সময়-নির্বাচন করেনি। করেছিল কালিপদ কুণ্ডু। কেন? অমন নির্জন স্থানে, অমন অন্ধকার রাত্রে কোন বৃদ্ধ কোন একটি জোয়ান মানুষের কাছে ব্ল্যাকমেলিং-এর টাকা আদায় করতে যায়? মৃত্যু কি তাকে টানছিল?

তৃতীয়ত, লালবাজার হোমিসাইডকে যে ভদ্রলোক বিকৃত কণ্ঠস্বরে টিপস্ দিয়েছেন তিনি কে? তাঁর স্বার্থই বা কী? অনির্বাণকে সে চেনে না, চিনলে নামটা বলে দিত। ফলে শত্রুতাবশত অনির্বাণকে ফাঁসাতে সে টেলিফোন করেনি। তাহলে তার উদ্দেশ্য কী?

বাসুসাহেবের অনুমতি পেয়ে কৌশিক আর সুজাতা পৃথকপৃথকভাবে তাদের এজাহার দিয়েছে। কৌশিক সেই থ্যাবড়া-নাক রিভলভারটা বাসুসাহেবের হেপাজত থেকে নিয়ে নিখিল দাশের হাতে তুলে দিয়েছে।

যন্ত্রটা নেড়ে-চেড়ে দেখে নিখিল বললে, আমার ইন্টুইশান বলছে, এটা আনলাইসেন্সড! বিদেশ থেকে কোনভাবে স্মাগলড্ হয়ে ভারতে এসেছে।

বাসু বললেন, আমারও তাই মনে হয়।

নিখিল কৌশিকের কাছে জানতে চায়, এই রিভালভারে দেখছি ছয়টা চেম্বার। পাঁচটায় রয়েছে তাজা বুলেট, শুধু ফায়ারিং-ব্যারেলটা ফাঁকা। আপনি যখন ডাস্টবিন থেকে অস্ত্রটা উদ্ধার করেন, তখনও এই অবস্থা ছিল?

কৌশিক বললে, হ্যাঁ। তাই। আমি চেম্বার খুলে দেখেছিলাম। তারপর সেটা রি-সেট করে দিয়েছিলাম।

—গন্ধ শুঁকে দেখেছিলেন?

—হ্যাঁ, দেখেছিলাম। তখনও ওতে বারুদের গন্ধ ছিল।

নিখিল বাসুসাহেবের দিকে ফিরে বলে, আর আপনি? আপনি যখন মিস্টার মিত্রের হাত থেকে রিভলভারটা পান তখনও ঐ বারুদের গন্ধ ছিল?

—না। ছিল না। আমি রাত সাড়ে বারোটার সময় যখন ওটা হাতে পাই আর শুঁকে দেখি, তখন তাতে ছিল পচা চিংড়িমাছের গন্ধ।

—এনি ফিঙ্গার প্রিন্ট?

—আমাদের নজরে পড়েনি। মানে সাদা চোখে, আর ম্যাগনিফাইং গ্লাসে। যন্ত্রটা একটা রুমালে জড়ানো ছিল। সম্ভবত যার রুমাল সে ফিঙ্গার প্রিন্ট মুছে নিয়ে ওটা জড়িয়েছে— যাতে তার নিজের আঙুলের ছাপ না থাকে।

—সে রুমালটা কোথায়?

বাসু ইঙ্গিত করলেন। সুজাতা নোংরা রুমালটা এনে দিল। বাসু বললেন, ওতে কোন লন্ড্রি-মার্কও নেই, কারও নামের আদ্যক্ষরও সেলাই করা নেই। তবু ওটা এভিডেন্স। নিয়ে যাও।

নিখিল রুমালটা কাগজে জড়িয়ে সংগ্রহ করল। বলল, এবার মিস্টার মিত্র আর মিসেস মিত্রকে একবার আমার সঙ্গে আসতে হবে। পুলিশ হসপিটালের মর্গে। কালিপদ কুণ্ডুর মৃতদেহটা শনাক্ত করতে।

কৌশিক বললে, আপনি চাইলে আমার দু'জন নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে আসব। কিন্তু ভেবে দেখুন, ইন্সপেক্টর দাশ, আমাদের দুজনের কেউই মৃতদেহটা দেখে তাকে কালিপদ কুণ্ডু বলে শনাক্ত করতে পারব না। হ্যাঁ, এই লোকটিই কাল সকালে টেমার লেনে 'করুণা প্রকাশনী'র দোকানের সামনে বসেছিল কি না তা হয়তো বলতে পারব।

নিখিল বললে, জানি, এ জন্য আমি আমার একজন সহকারীকে পাঠিয়েছি টেমার লেনের মেস-ম্যানেজারের জবানবন্দি নিতে। তিনিও পৃথকভাবে মর্গে এসে মৃতদেহ শনাক্ত করবেন। যা থেকে প্রমাণ হবে, কালিপদ কুণ্ডুই কাল সকালে টেমার লেনের মেসে অনির্বাণবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আসুন আপনারা দুজন।

বাসু বললেন, তাতেও প্রমাণ হবে না মৃতদেহটা কালিপদ কুণ্ডুর। যাহোক, তোমরা দেখে এসো তো।

নিখিল দাশের জীপে ওরা দু'জন এসে পৌঁছালো পুলিশ হসপিটালের মর্গে। ঘরটা বাতানুকূল করা। অত্যন্ত ঠাণ্ডা। সুজাতার সে কথা খেয়াল হয়নি। না হলে একটা শাল নিয়ে আসত।

মরা-কাটা ঘরের ইনচার্জ নিখিলকে দেখে সেলাম করল।

নিখিল বলল, ইসমাইল, কাল রাত চারটের সময় যে লাস টালিগঞ্জ থেকে এসেছে সেটা এঁদের দেখাও।

ইসমাইল ওদের আহ্বান করল : আসুন স্যার।

বিরাট বড় একটা ওয়াড্রোব মতো। ইসমাইল তার একটা ড্রয়ারের রিং দুহাতে ধরে টানলো। বল-বিয়ারিং-এর আবর্তনে ড্রয়ারটা এগিয়ে এল সামনের দিকে। তার গর্ভে মৃতদেহটা।

বছর পঞ্চাশ বয়স। দীর্ঘদেহী। গায়ে টুইলের শার্ট। পরিধানে নস্যি রঙের একটা প্যান্ট। লোকটার চোখ দুটি বোজা। গালে আঁচিল।

কৌশিক একবার দেখেই বললে, হ্যাঁ, এই লোকটিই কাল সকালে টেমার লেনে করুণা প্রকাশনীর বারান্দায় বসেছিল।

নিখিল এবার সুজাতার দিকে ফিরল।

সুজাতার গা গুলোচ্ছে। সে কোনও কথা বলল না। সজোরে মাথা নেড়ে সমর্থন করল কৌশিকের শনাক্তিকরণ।

মরাকাটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিখিল সুজাতাকে বললে, আয়াম সরি, মিসেস মিত্র। কিন্তু দোষটা একা আমার নয়। আপনি নিজেই এই প্রফেশন বেছে নিয়েছেন।

সুজাতা দৃঢ়স্বরে বললে, আমি তো কোন অভিযোগ করিনি আপনার বিরুদ্ধে। শুধু বলুন, আপনার প্রয়োজন কি ফুরিয়েছে? আমরা বাড়ি যেতে পারি?

—একটু চা বা কফি খাবেন না?

—থ্যাঙ্কস! না!

—বেশ। এই জীপই আপনাদের নিউ আলিপুরে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

নিখিলের ব্যবস্থাপনায় টেমার লেনের ম্যানেজার এসে মরাকাটা ঘরে মৃতদেহ শনাক্ত করে গেল। তাতেও প্রমাণিত হল না যে, মৃতের নাম কালিপদ কুণ্ডু। শুধু জানা গেল যে, সে গত পর্শু বার-তিনেক টেমার লেন মেস-এ অনির্বাণের খোঁজ করতে এসেছিল। সাক্ষাৎ পায়নি। নিখিল আন্দাজ করল অনির্বাণ পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। কেন, কী বৃত্তান্ত বোঝা যাচ্ছে না; কিন্তু ঐ লোকটাও মরিয়া হয়ে পড়েছিল। তাই গতকাল সকাল সাতটা বাজার আগে এসে মেসের দরজায় হাজিরা দিয়েছে।

মৃতদেহের একটি ছবি নিখিল ছাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা করল বাংলা-ইংরেজি-হিন্দি কাগজে।

তার সম্ভাব্য নামটা জানালো না। দৈহিক বর্ণনা থাকল বিস্তারিত। দৈর্ঘ্য, ওজন, গালে আঁচিলের কথা এবং পোশাক-পরিচ্ছদের বিবরণ। আরক্ষা বিভাগ প্রার্থনা করছেন, এই বেওয়ারিশ মৃতদেহ, যাকে মঙ্গলবার মধ্যরাত্রে টালিগঞ্জ গলফ ক্লাবের মাঠে উদ্ধার করা গেছে, তার পরিচয় কারও জানা থাকলে হোমিসাইড বিভাগে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে।

নিখিলের আশা ছিল বিকৃতকণ্ঠে কেউ টেলিফোনে জানাবে যে, ছবিটা দেখে সে মৃতদেহটি শনাক্ত করতে পারছে— ওর নাম ছিল কালিপদ কুণ্ডু।

বাস্তবে তা হল না কিন্তু। সে লোকটা আত্মগোপন করেই রইল, যদি ধরে নেওয়া যায় কাগজে ছাপা ছবিটা সে দেখেছে।

পরিবর্তে বর্ধমান থেকে এস. টি. ডি. করে এক ভদ্রলোক জানালেন যে, মৃতদেহটি তিনি ছবি দেখে শনাক্ত করতে পারছেন। দিন-তিনেক আগেই ওঁর এই কর্মচারীটি নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। ভদ্রলোক থাকেন বর্ধমানের কানাইনাটশাল অঞ্চলে; নাম মহেন্দ্রনাথ পাল। তিনি স্বয়ং কলকাতায় আসছেন মৃতদেহটি শনাক্ত করতে। তার পূর্বে যেন দাহ করা না হয়। মহেন্দ্রনাথের বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তি কালিপদ কুণ্ডু।

।। নয় ।।

boiRboi.net

তারের জালতির দু'ধারে দু'জন।

বাসুসাহেব জানতে চান, ওদের কতটা বলেছ?

অনির্বাণ বলে, রামগঙ্গা কিছুই নয়। পুলিশকে বলেছি, আমি আমার সলিসিটারের অনুপস্থিতিতে কোনও কথা বলব না। তাতেই ওরা আপনাকে খবর দিয়ে আনিয়েছে।

—ঠিক আছে। তোমার বিরুদ্ধে পুলিসের হাতে বেশ কিছু এভিডেন্স আছে। কী কী, তা আমি জানি। কিন্তু সেসব কথা তোমাকে বলার আগে আমি শুনতে চাই, তোমার এজাহারটা। পর পর কী ঘটনা ঘটেছিল, কেন তুমি তাতে অংশগ্রহণ করেছিলে, বলে যাও প্রথমে।

—বলার কিছু নেই স্যার। বলুন, কী জানতে চাইছেন?

—গলফ ক্লাবে যে লোকটা খুন হয়েছে তাকে তুমি চিনতে?

—লোকটা যদি কালিপদ কুণ্ডু হয় তবে হ্যাঁ, তার পরিচয় জানতাম, চিনতামই, যদিও কখনো সাক্ষাৎ হয়নি। —বার কয়েক তাঁর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছি। এই মাত্র। আর হ্যাঁ, ওর নাম কাকাবাবুর কাছে শুনেছিলাম। প্রথমে সে কাকুর গাড়ির ড্রাইভার ছিল। পরে নাকি 'কুতুব-টী' কোম্পানির ক্যাশিয়ার পর্যন্ত হয়েছিল। তহবিল তছরুপের অপরাধে চাকরি যায়; অথচ টাকাটা আদায় হয় না। কাকুর ধারণা ছিল, কালিপদবাবু সম্পূর্ণ নির্দোষ। অন্য কেউ টাকাটা সরিয়ে ওকে ফাঁসিয়েছে। তখন আমার বিশ্বাস হয়নি; কিন্তু এখন মনে হয়, কাকু ঠিক কথাই বলেছিলেন। বিশ হাজার টাকা তহবিল তছরুপ করলে লোকটা বাকি জীবন এমন ভিখারির মতো কাটাতো না।

—ও ঠিক কী করত? মানে গ্রাসাচ্ছাদনের কী ব্যবস্থা ছিল? চাকরি যাবার পর?

—এতদিন কী করেছে জানি না। তবে ইদানীং সে মহেন্দ্রবাবুর এমপ্লয়মেন্টে ছিল। মাস-

মাহিনা অথবা কমিশন-বেসিস ঠিক জানি না। মহেন্দ্রনাথ পাল কুতুব টীর ম্যানেজমেন্ট কব্জা করতে উঠেপড়ে লেগেছেন। মাসতিনেক পরে ওঁদের জেনারেল ইলেকশান। মহেন্দ্রবাবু অনেকগুলি এজেন্টকে কমিশন-বেসিসে কাজে লাগিয়েছেন। কালিপদ তাদেরই একজন। কুতুব টীর শেয়ার হোল্ডারদের নাম-ঠিকানার একটি বিরাট লিস্ট তার কাছে ছিল। সে জনে জনে সাক্ষাত করে প্রক্সি ফর্ম যোগাড় করত। কালিবাবু জানত যে, রঘুবীর সেনের কাছে কুতুব টী-র একটা বড় চাংক শেয়ার ছিল। তাই রঘুবীরের একমাত্র কন্যা খুকুর কাছে ও যায়। খুকু বলে, শেয়ার তার কাছে নেই; আছে আমার কাছে ট্রাস্টি হিসাবে প্রক্সিতে আমারই সই নিতে হবে। কালিপদবাবু তারপর আমাকে ফোন করে। সেই প্রথমবার।

—তুমি বোধহয় তার আগেই কুতুব টী-র সব শেয়ার বেচে দিয়েছ? যখন ওর দাম হু হু করে পড়ে যাচ্ছিল? তাই নয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু সেকথা তো কালিবাবুর কাছে স্বীকার করতে পারি না। কারণ খুকু তা জানে না। আমি ক্রমাগত কালিবাবুকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছিলাম।

—তারপর?

—লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত। ইতিমধ্যে সে আমার নাড়ি-নক্ষত্রের সন্ধান নেয়। রঘুবীরের উইল, ট্রাস্ট, আমার সঙ্গে খুকুর সম্পর্ক এবং খুকুর সঙ্গে কিংশুকের ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধেও সে কী-জানি কোন সূত্রে সংবাদ সংগ্রহ করে। ও শুধু টের পায়নি যে, কুতুব-টী'র সব শেয়ার আমি বেচে দিয়েছি। দিনসাতেক আগে ও আমাকে টেলিফোনে জানায়, আমি যদি কুতুব টী-র শেয়ার প্রক্সি ফর্মে ব্ল্যাঙ্ক স্বাক্ষর করে ওকে দিই তাহলে ও এমন ব্যবস্থা করবে যাতে কিংশুক আর ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে পারবে না। আমি এ কথার ব্যাখ্যা চাই। তখন ও বলে যে, কিংশুক হালদার একটা মারাত্মক অপরাধ করেছে, যেকথা পুলিস জানে না; কিন্তু যার অকাট্য প্রমাণ ওর হাতে আছে। আমি জানতে চাই, অপরাধটা কী জাতের এবং প্রমাণটাই বা কী? ও বলে, অপরাধটা কী তা ও এখন বলবে না, তবে প্রমাণটা হচ্ছে 'একটা ডেড-ম্যানস ডায়েরি'! আমার বিশ্বাস হয় ওর কথায়। ও আরও জানায় যে, অর্থাভাবে ওকে প্রায় অনাহারে থাকতে হচ্ছে। প্রক্সি ফর্ম মহেন্দ্র পালকে পৌঁছে দিলে ও পেমেন্ট পাবে। তাই 'ডেড-ম্যানস' ডায়েরিটার বদলে প্রক্সি ফর্ম ছাড়া ও পাঁচ হাজার নগদও দাবি করে। আমি রাজি হয়ে যাই। কিন্তু আমি কয়েকদিন সময় চাই...

বাসুসাহেব জানতে চান, কেন? সময় চাইলে কেন?

—আমি মরিয়া হয়ে পড়েছিলাম ঐ খুকু-কিংশুকের ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারটায়। কয়েকদিনের সময় চেয়ে নিয়ে নিজের নামে বিশ হাজার কুতুব টীর শেয়ার কিনে ফেলি। তখন দর খুব পড়ে গেছে। যেদিন আমি আপনার সঙ্গে দেখা করি তার পরের দিন কালিবাবু ফোন করে। বলে, ও অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সর্দি-কাশিতে। বস্তুত ওর গলার স্বর শুনে আমি বুঝতেই পারিনি যে, কালিবাবু ফোন করছে। কথার মধ্যে ও বারে বারে কাশছিল। ও আমাকে একটা টেলিফোন নম্বর দেয়। বলে, পরদিন সন্ধ্যা সাতটায় ঐ নম্বরে ফোন করতে। তখন ও বলবে, কবে-কখন দেখা হবে।

বাসু বলেন, তুমি সন্ধ্যা সাতটায় ফোন করেছিলে?

—হ্যাঁ।

—কোথা থেকে?

—হাজরা মোড়ে একটা টেলিফোন বুথ থেকে।

—তারপর কী হল, বলে যাও?

—টেলিফোন যে ধরল, আমার ধারণা সে কালিবাবুর বাড়ির ঝি। সে আমার নাম জানতে চাইল। আমি বললাম, 'আমার নামের কী দরকার? আমি তো ঠিক সাতটার সময়েই ফোন করেছি। তাই তো কথা ছিল?' ও তখন জানতে চাইল, কুতুব টীর ব্যাপারে? আমি 'হ্যাঁ' বলায় ও একটা নতুন টেলিফোন নাম্বারে ফোন করতে বলল। যা হোক, আমি দ্বিতীয় নম্বরে ফোন করা মাত্র কালিবাবু ধরল। আমি পাঁচ হাজার নগদে নিয়ে যাচ্ছি কি না জেনে নিয়ে বলল, 'রয়্যাল ক্যালকাটা গলফ ক্লাব চেনেন নিশ্চয়? তারই 'ফার্স্ট-টী'-তে। রাত দশটার সময়।'

—তোমার সন্দেহ হল না? রয়্যাল ক্যালকাটা গলফ ক্লাবের এক নম্বর টীর অবস্থান ও লোকটা কেমন করে চিনল?

—আজ্ঞে না, সে বিষয়ে সন্দেহ হয়নি। আমি বিস্মিত হয়েছিলাম স্থান নির্বাচনে নয়, সময় নির্বাচনে। আমি ঐ ক্লাব-মাঠের প্রতিটি গাছ, প্রতি 'হোল' চিনি। এককালে রঘুবীর কাকার পিছন পিছন স্টিক ঘাড়ে করে আমাকে ঘুরতে হয়েছে : 'ফার্স্ট-টী' থেকে 'এইটিন্থ-হোল' পর্যন্ত। ইদানীং সময় পেলে আমি নিজে গিয়েও খেলি। আমি আরও জানতাম, ঐ কালিপদ কুণ্ডু এককালে রঘুকাকার গাড়ি চালাতেন। ফলে, তাঁকেও একই ভাবে ক্লাব-মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে হাঁটতে হয়েছে। বস্তুত স্থান নির্বাচনে আমি মনে মনে নিশ্চিন্তই হলাম। লোকটার কণ্ঠস্বর বিকৃত শোনালেও সেটা সর্দি লাগায়। ও লোকটা নির্ঘাৎ কালিপদ কুণ্ডু। আমার সন্দেহ ছিল, সময়টা নিয়ে। অত গভীর রাত্রে কেন? কিন্তু কালিপদ কুণ্ডু আমার শত্রু নয়, যে বেমক্কা অমন নির্জন স্থানে আমাকে হত্যা করে বসবে...

বাসুসাহেব বাধা দিয়ে বলেন, কিন্তু তোমার সঙ্গে নগদ পাঁচ হাজার টাকা ছিল। লোকটা সেই টাকার লোভেও তোমাকে হত্যা করতে পারত। তাই কি তুমি তোমার রিভলভারটা পকেটে নিয়ে গেলে?

—রিভলভার! না স্যার, কোন রিভলভার তো আমি নিয়ে যাইনি।

—কিন্তু কালিপদ যদি হঠাৎ পকেট থেকে একটা রিভলভার বার করত, তখন তুমি কী করতে?

—আমি ক্যারাটে "ব্ল্যাক বেল্ট"। মানে ক্যারাটে বিদ্যায় পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিধারী। একাধিক ক্লাবে আমি ক্যারাটে শেখাই। কালিবাবুর মতো একজন বৃদ্ধ যদি পকেট থেকে একটা রিভলভার বার করে আমার দিকে তাক করবার সুযোগ পেত, আর তার আগে ওকে আমি মাটিতে শুইয়ে দিতে না পারতাম — তাহলে বাড়ি ফিরে এসে আমি গলায় দড়ি দিতাম।

—ও আচ্ছা। তারপর কী হল বলে যাও।

—যে কথা বলছিলাম স্যার, আমার সন্দেহ হয়নি। তবু জানতে চাইলাম, 'কিন্তু অমন অদ্ভুত জায়গায় কেন?' ও প্রান্তের লোকটা বললে, "দত্তবাবু, আর. সি. জি. সি.'র ফার্স্ট টী এক কথায় চিনে নেবে এমন মানুষ গোটা কলকাতা শহরে হাতের পাঁচটা আঙুলে গোনা যায়। এতে প্রমাণ হল : টেলিফোনের এ প্রান্তেই বা কে, ও প্রান্তেই বা কে।' আমি জবাবে বললাম, 'অলরাইট'। বলে, টেলিফোন রেখে দিলাম।

—তারপর?

—রাত পৌনে দশটায় আমি ক্লাবে পৌঁছাই। গাড়ি পার্ক করে ভিতরে যাই। ক্লাব ঘরে তখন দশ-পনের জন ছিলেন। আমার পরিচিত কেউ ছিলেন না।

—তুমি ঐ গলফ ক্লাবের মেম্বার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কাকাবাবু আমাকে হাতে ধরে খেলাটা শিখিয়েছিলেন। স্টিক নিয়ে ওঁর পিছন-পিছন হাঁটতে হাঁটতে খেলাটা আমি অবশ্য নিজে থেকেই শিখে গেছিলাম। কাকু আমাকে স্ট্রোক মারা শেখান, গ্রিপ, স্টান্স, ড্রাইভ, ডাউনওয়ার্ড স্যুইং, বাঙ্কার টপকানো ইত্যাদি সবকিছুই শেখান। সে যাই হোক, সেদিন রাত দশটায় যাঁরা ক্লাবে ছিলেন তাঁদের কাউকে আমি চিনতে পারিনি। ঐ রাতের মেম্বাররা খেলতে আসেন না বোধহয়, মদ্যপান করতে আসেন। আমি পিছনের দিকের দরজা দিয়ে মাঠে নেমে যাই। ফার্স্ট টীতে পৌঁছাই। ক্লাবঘর থেকে একশ গজও হবে না। সেখানে মিনিট পাঁচেক বোকার মতো অপেক্ষা করি। জায়গাটা আলো-আঁধারি। এতটা অন্ধকার নয় যে, একজন মানুষ এগিয়ে এলে দেখতে পাব না। আমার ঘড়িতে রেডিয়াম-ডায়াল। দশটা পাঁচ হবার পর আমি অস্থির হয়ে উঠি। পায়চারি শুরু করি। আর তখনই কিসে যেন ঠোক্কর খাই!

—কিসে যেন ঠোক্কর খাও! কী সে?

—একটা নিথর মৃতদেহে! ...বোধহয় মিনিট দুই আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। তারপর নিচু হয়ে লোকটিকে 'ফীল' করি। পুরুষ মানুষ। বৃদ্ধ। রক্ত! আন্দাজ করি : কালিপদ কুণ্ডু! ...আমি ঘাসে হাতটা মুছে নিয়ে উঠে দাঁড়াই। নিঃশব্দে ক্লাবের বাইরে বেরিয়ে আসি। আমার আশঙ্কা হয়, কেউ একটা মার্ডার করেছে। কালিপদকেই— কেন জানি না, কিন্তু আমাকে ফ্রেম-আপ করতে চায়!

—তারপর?

—তারপর আমি ওখান থেকে সোজা বাই-রোড আসানসোলের দিকে রওনা দিই। প্রায় সারারাত ড্রাইভ করে...

—জাস্ট এ মিনিট। ড্রাইভ করার সময় তুমি গায়ের কোটটা খুলে রেখেছিলে, নয়? কেন?

—কোটটা খুলে রেখেছিলাম! মানে?

—বাঃ! ডাস্টবিনের ভিতর হাত ঢোকানোতে হাতে তো প্রচুর ময়লা লেগে যাবার কথা। নয়? হাতটা ধুলে কোথায়?

অনির্বাণ এবার প্রশ্ন করতেও ভুলে যায়।

বাসু বলেন, একটা শর্ট-ব্যারেল জার্মান রিভলভার, যার নম্বর KB 173498 : তুমি কলকাতা ত্যাগ করার আগে একটা অন্ধকার গলিতে ডাস্টবিনের ভিতর ফেলে দিয়ে যাওনি?

অনির্বাণ বজ্রাহতের মতো মিনিটখানেক তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, আপনাকে কে বলল?

—রিভলভারটা আনলাইসেন্সড তা বোঝা যায়। তোমার হেপাজতে এল কখন? কীভাবে?

অনির্বাণ কোনক্রমে বললে, জানি না আপনি কোন সূত্রে জেনেছেন। হ্যাঁ, স্বীকার করছি—ওটা আমি একটা ডাস্টবিনের ভিতর ফেলে যাই। তবে আপনার ঐ আন্দাজটা ভুল। ওটা আনলাইসেন্সড নয়, আমারই নামে লাইসেন্স। আমার রিভলভার।

—তুমি রিভলভারের লাইসেন্স নিয়েছিলে? কেন? কবে?

—না। ওটা ছিল কাকুর। ফিয়াট গাড়ির সঙ্গে ঐ রিভলভারটাও আমাকে উনি দান করে যান। আমি নিজের নামে লাইসেন্স করিয়ে নিই। খুকু বাড়িতে একলা থাকে বলে তার আঠারো বছর বয়সে ওটা তাকে দিতে চাই, কিন্তু পুলিশ কমিশনার রাজি হন না। বলেন, নিজের বাবাই যাকে বাইশ বছরের আগে সাবালিকা ভাবতে পারেননি তাকে আমি কোন আক্কেলে ওটার লাইসেন্স দিই? আমাকে বলেন, বছর চার-পাঁচ পরে নতুন করে আবেদন করতে।

—রিভলভারটা থাকত কোথায়? মেসে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মেসের তিনতলায় আমার ঘরে একটা মজবুত কাঠের গা-আলমারি আছে। তার একটা সিক্রেট ড্রয়ার আমি নিজ-ব্যয়ে বানিয়ে নিয়েছিলাম।

—তাহলে ঘটনার রাত্রে ওটা তুমি পকেটে করে নিয়ে যাও!

—না, স্যার। আমি খালি হাতেই গিয়েছিলাম। গলফ্ ক্লাব মাঠের প্রতিটি বর্গইঞ্চি আমার পরিচিত। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি ওখানে খুনোখুনি হতে পারে।

—তাহলে রিভলভারটা তোমার হাতে এল কেমন করে?

—নিচু হয়ে যখন মৃতদেহ পরীক্ষা করছি তখনই আমার হাতে ওটা ঠেকে যায়। হাত বুলিয়ে বুঝতে পারি ওটা আমারই। কারণ ওরকম শর্ট-ব্যারেল জার্মান রিভলভার বাজারে সহজে পাওয়া যায় না। আমার আশঙ্কা হয়, কেউ আমাকে 'ফ্রেম-আপ' করতে চাইছে। আমি তৎক্ষণাৎ ওটা রুমালে জড়িয়ে তুলে নিই। পকেটে ফেলি।

—শুঁকে দেখনি?

—দেখেছিলাম। ব্যারেলে বারুদের গন্ধ ছিল।

—তোমার কাছে পকেট-টর্চ ছিল না?

—না! আমি জানতাম, কম্পাউন্ড-ওয়াল ভেঙে রিফিউজিরা ইট চুরি শুরু করার পর রাতে ওখানে টহলদারি দারোয়ানের ব্যবস্থা হয়েছে। মাঠে কোথাও টর্চের আলো জ্বললে দারোয়ান ছুটে আসত।

—মেসের ঐ দেওয়াল-আলমারি থেকে কীভাবে বা কতদিন আগে রিভলভারটা চুরি গেছে তা তোমার আন্দাজ নেই?

—বিন্দুমাত্র না।

—রিভলভারটা নিয়ে তুমি আমার কাছে এলে না কেন?

—আমার আশঙ্কা হল, আপনি আমার এজাহারটা বিশ্বাস করবেন না।

—সে তো এখনো করছি না। কিন্তু রাতারাতি কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াটা খুবই বিশ্রী দেখাচ্ছে না? তার চেয়ে অনেক ভাল হত— মৃতদেহ আবিষ্কারের কথা তৎক্ষণাৎ পুলিশে রিপোর্ট করে নিজে থেকেই রিভলভারটা সারেন্ডার করা।

—এখন আপনি আমাকে কী করতে বলেন? 'গিলটি প্লীড' করে আদালতের মার্জনা ভিক্ষা করব?

—তুমিই কালিপদবাবুকে হত্যা করেছ?

—সার্টেনলি নট!

—তাহলে তুমি অহেতুক 'গিলটি প্লীড' করতে যাবে কেন?

—আপনি নিজেই যে আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

—না পারছি না, অনির্বাণ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি কাউকে আড়াল করবার চেষ্টা করছ। মিছে কথা বলে দোষটা নিজের ঘাড়ে টেনে নিচ্ছ।... তুমি আদ্যন্ত সত্যি কথাটা এবার বলবে?

—এটাই আদ্যন্ত সত্যি কথা!

—অল রাইট! কেউ নিজেই নিজের পায়ে কুড়ুল মারে। কেউ কুড়ুলটা খাড়া করে পেতে তাতে সবলে পদাঘাত করে। এক্ষেত্রে তোমার যেটা অভিরুচি। তবে ফল একই।

—আপনি আমাকে কী করতে বলেন?

—তোমার ঐ আষাঢ়ে গল্পটা বদলে তোমার কাউন্সেলের কাছে আদ্যন্ত সত্যি কথা বলা।

অনির্বাণ কাঁধ ঝাঁকালো নিরুপায় ভঙ্গিতে। বলল, আপনি স্যার একটা উদ্দেশ্য দেখাতে পারেন? একটা ক্ষীণতম মোটিভ, যাতে আমার মতো মানুষ ঐ কালিপদ কুণ্ডুর মতো অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণ একটা মানুষকে খুন করতে চাইবে?

—আমি পারি কি পারি না সেকথা থাক। পুলিশ অসংখ্য মোটিভ খাড়া করতে পারে। করবেও। তার একটা এখনি শোন। তোমার এজাহার শেষ হলে পাবলিক প্রসিকিউটার মাইতি-সাহেব আদালতে দাঁড়িয়ে উঠে বলবেন, "ধর্মাবতার! ঐ কালিপদ কুণ্ডু ছিল স্বর্গত রঘুবীর সেনের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী। তাকে ডেকে রঘুবীর শেষাবস্থায় বলেছিলেন : এখন আমি উত্থানশক্তিরহিত। আমার মেয়ে নাবালিকা। আমি উইলটা বদলাতে চাই। কিন্তু অনির্বাণ আমাকে সে সুযোগ দিচ্ছে না। তুমি এককালে আমার গাড়ি চলাতে। তুমি আমাকে সাহায্য করবে?' তাতে হুজুর ঐ মৃত কালিপদ কুণ্ডু জানতে চায়, 'কেন স্যার? অনির্বাণকে আপনি ট্রাস্টি রাখতে চান না কেন?' রঘুবীর তখন ওকে একটা ডায়েরি দিয়ে বলেছিলেন, 'এইটা পড়ে দেখ। তাহলেই বুঝতে

পারবে। দু'দিন পরে ডায়েরিটা ফেরত দিয়ে যেও।' হুজুর, কালিপদ কুণ্ডু সেই ডায়েরিটা ফেরত দিয়ে যেতে পারেনি। তার আগেই রঘুবীরের বাক্‌রোধ হয়ে যায়। পরদিন তিনি মারা যান। এ সব কথাই আমরা সার্কামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স থেকে প্রমাণ করব। সেই মারাত্মক 'ডেড ম্যানস ডায়েরি'র জোরে কালিপদবাবু বিগত কয়েক বছর ধরে ব্ল্যাকমেলিং করে আসছিলেন। ঘটনার রাত্রেও আসামীর কাছে খুচরো নোটে পাঁচ হাজার টাকা ছিল এটা আমরা প্রমাণ করব বলে আশা রাখি। ঐ রকম একটা অন্ধকার নির্জন স্থানে আসামী কালিপদকে টাকার লোভ দেখিয়ে টেনে আনে।'' ...এর পর স্বচক্ষে দেখতে পাবে, প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীরা হলফ নিয়ে কী দারুণ আজগুবি গল্প শুনিয়ে যাবে। সব শেষে অটোপ্সি-সার্জেন যদি প্রমাণ করতে পারেন যে, ফেটাল বুলেটটা KB 173498 থেকে নিক্ষিপ্ত, এবং প্রমাণ হয় সেটা তোমার, তুমি সেটা ডাস্টবিনের ভিতর ফেলে রাতারাতি কলকাতা ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করেছিলে, তাহলে আমি তো ছাড়, আমার গুরু এ. কে. রে. বার-অ্যাট-ল'ও তোমাকে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচাতে পারবেন না।''

অনির্বাণ দুই হাতে নিজের মুখ ঢাকল।

—তুমি কি তোমার আষাঢ়ে গল্পটা এবার বদল করবে, অনির্বাণ?

মুখ থেকে হাত সরল না। অনির্বাণ দু'দিকে মাথা নাড়ল।

—অল রাইট! অ্যাজ য়ু প্লীজ!

হঠাৎ মুখ তুলে তাকালো অনির্বাণ, আপনি কি আমাকে ত্যাগ করে যাচ্ছেন স্যার?

—সার্টেনলি নট! না হয় একটা কেসে হারব। তাতে কী?

—আমাকে গিলটি প্লীড করতেও বলছেন না?

—নিশ্চয় না। যদি তুমি স্বহস্তে খুনটা না করে থাক।

—থ্যাঙ্কু, স্যার।

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর বাসুসাহেব হঠাৎ বলে ওঠেন, কাম অন! লেটস স্টার্ট অ্যাফ্রেশ! এস, নতুন করে খেলাটা শুরু করা যাক। তুমি এ পর্যন্ত একটাও অনার্স-কার্ড আমার হাতে দাওনি। সবই দুরি-তিরি, পাঞ্জা-ছক্কা। তা বলে তো খেলার টেবিল ছেড়ে উঠে যাওয়া যায় না। এবং দু-একটা প্রশ্নের জবাব দাও। প্রথম প্রশ্ন : 'ডেড ম্যানস ডায়েরি'টা কার, তা ও বলেনি? সেটা তুমি ওর পকেট থেকে উদ্ধার করতে পারনি?

—আজ্ঞে না। আপনার দুটো প্রশ্নের জবাবই : না।

—কিংশুকের বিষয়ে ওর সঙ্গে তোমার যেসব কথাবার্তা হয়েছিল, সে বিষয়ে কালিপদ কুণ্ডুর কোনও হাতচিঠি, বা কোনও এভিডেন্স কি তোমার কাছে নেই?

—আজ্ঞে না।

—থার্ডলি : হাজরা রোডের মোড়ের পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে তুমি দু-দু'বার ফোন করেছিলে। প্রথমবার একটা কাগজ দেখে-দেখে; দ্বিতীয়বার ও'পক্ষের কথা শুনে একটা কাগজে

লিখে নিয়েছিলে। সেই কাগজের টুকরো দুটো কোথায়?

—আমি নষ্ট করে ফেলেছি, যাতে পুলিশ আমার সঙ্গে কালিপদ কুণ্ডুকে 'কানেক্ট' করতে না পারে।

—বুঝলাম! নম্বর দুটোর একটাও মনে নেই? অন্তত এক্সচেঞ্জ নাম্বারগুলো?

অনির্বাণ নতনেত্রে একটু ভেবে নিয়ে বলল, দ্বিতীয় নম্বরটার কথা কিছুই মনে নেই। তবে প্রথমটার কিছুটা মনে আছে। এক্সচেঞ্জ নাম্বারটা দুই-সংখ্যা না তিন-সংখ্যার, তা মনে নেই, কিন্তু শেষ চারটে অঙ্ক ছিল ওয়ান-এইট-থ্রি-সিক্স!

—আশ্চর্য! অ্যাদ্দিন পরেও তা তোমার মনে আছে?

—হ্যাঁ, স্যার। আছে। চেষ্টা করে মনে রাখিনি। তবু ভুলতেও পারিনি।

—চেষ্টা করে মনে রাখনি? তাহলে? তুমি কি হাফ-শ্রুতিধর?

অনির্বাণ ম্লান হাসল। বলল, আসলে কী জানেন? কালিবাবুর মুখে শুনে তখনই আমার মনে পড়ে গিয়েছিল, ওটা ঠাকুরের জন্মসাল! 1836 সালটা তো ভোলা যায় না!

মুখফোঁড় বাসুসাহেব মূক হয়ে গেলেন!

অনির্বাণের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। বলে, আপনি কি কোনই আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন না, স্যার?

বাসু ম্লান হেসে বললেন, এক মিনিট আগেও পাচ্ছিলাম না। আমার হাতে যে শুধুই দুরি-তিরি! কিন্তু শেষ পাতে যে আমার পার্টনার রঙের টেক্কাখানা নামিয়ে দিল, অনির্বাণ! ঠাকুরের নাম নিয়েছ তুমি! একটা পিঠ তো নির্ঘাৎ আমাদের!

॥ দশ ॥

কলবেলের আওয়াজ শুনে করবী এসে দরজা খুলে দিয়েই একেবারে অবাক : আপনি! আপনি নিজেই চলে এসেছেন? আমাকে টেলিফোনে ডেকে পাঠালে আমিই চলে যেতাম। আসুন স্যার, বসুন।

বাসু একাই এসেছিলেন। ভিতরে এসে বসলেন। হেসে বললেন, টেলিফোনে ডাকতে সাহস হল না। কী জানি, তুমি যদি ধরে নাও সপরিবারে নিমন্ত্রণ করছি।

করবীও হাসল। বলল, প্রথমে বলুন, কী খাবেন, গরম না ঠাণ্ডা?

—গরম-ঠাণ্ডা কিছুই নয়। আমার সঙ্গে কথা বলার সময় আছে তো? কোন কাজে ব্যস্ত নেই? বা বেরুচ্ছ না?

—কী যে বলেন! আমি তো ধন্য বোধ করছি। আপনি নিজে থেকে... ইয়ে, অনিদার কেসটা কি সত্যই খারাপ? শুনলাম জামিন পায়নি?

—হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ, জামিন সে পায়নি। তবে তার কেস নিয়ে আমি শুধু শুনতেই রাজি,

কিছু বলতে নয়। জান বোধহয়, আমি অনির্বাণের তরফে অ্যাটর্নি। অনির্বাণ তোমার ন্যাসরক্ষক, সেই হিসাবে আমার প্রয়োজন হয়েছে তোমার সঙ্গে কিছু আলোচনা করার। তবে আমার পক্ষে জানিয়ে রাখা শোভন যে, আমি তোমার স্বার্থ দেখছি না। দেখছি, শুধু অনির্বাণের স্বার্থ। সে জন্য যদি তুমি আলোচনা করতে না চাও...

—না, না, বলুন না, কী বলবেন?

—তোমার ঐ বুককেসটা সেই মারামারির দিন ভেঙেছে বুঝি?

—মারামারি! না, মারামারি তো হয়নি সেদিন...

বাসুসাহেবের ভ্রূকুঞ্চন হল। এতবড় ঘটনাটা কেন করবী অস্বীকার করতে চাইছে? বললেন, অনির্বাণ আর কিংশুক...

—আজ্ঞে না। তাকে মারামারি বলে না। বলে, 'একতরফা ঠ্যাঙানো।'

ঘটনাটা খুকু বিস্তারিত জানায়। কিংশুককে বাসস্ট্যান্ডে তুলে দিয়ে ফিরে এসে সবে ও দরজা বন্ধ করেছে, এমন সময় আবার ডোরবেল বাজল। খুকু এসে খুলে দিয়ে দেখল, দরজার ও প্রান্তে স্যুট-বুট পরা অনির্বাণ দত্ত দাঁড়িয়ে। সে জিজ্ঞেস করল, ভিতরে আসব, খুকু?

করবী একটু বিরক্ত হয়ে বলেছিল, তোমাকে তো টেলিফোনেই বলেছিলাম অনিদা, বিকেলে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আমি ব্যস্ত থাকব।

—ও, আয়াম সরি। আমি ভেবেছি যে, সে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা শেষ হয়ে গেছে।

—তার মানে তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে আড়ি পাতছিলে?

—না, না, আড়ি পাতব কেন? স্বচক্ষে দেখলাম, মিস্টার হালদারকে তুমি মিনিবাসে তুলে দিয়ে একা বাড়ি ফিরে এলে। তাই ভাবলাম, ...মানে, আমার কথাটা সত্যিই জরুরি।

—কার কাছে জরুরি? তোমার, না আমার?

—দুজনের কাছেই।

করবী তখন ওকে ভিতরে এসে বসতে বলে। দরজাটা খোলাই থাকে। করবী জানতে চায়, তুমি কি চা বা কফি খাবে অনিদা?

অনির্বাণ বলে, না। আমার হাতে সময় কম। একটা টেলিফোন করতে হবে, তারপর আখড়ায় যেতে হবে...

—আখড়া! আখড়া মানে?

—আমি বিকালবেলা একটা ক্লাবে ছেলেদের ক্যারাটে শেখাই।

করবী বলে, টেলিফোনটা তুমি এখান থেকেই করতে পার। আমি তো কিচেনে চা বানাবো। তুমি তোমার বান্ধবীকে ফোনে কী বললে তা আমি শুনতে পাব না।

অনির্বাণ গম্ভীর হয়ে বলে, বান্ধবীকে নয়। আমার কোনও বান্ধবী নেই। এটা বিজনেস টক।

করবী কটাক্ষপাত করে বলে, কেন, আমি কি তোমার বান্ধবী নই?

অনির্বাণ দৃঢ়স্বরে বলে, না! তুমি আমার 'ছোটবোন' হয়ে থাকতে চেয়েছিলে, বান্ধবী নও।

ঠোঁট উলটিয়ে করবী বলেছিল, তাতে আবার তুমি যে রাজি নও!

—ও প্রসঙ্গ থাক, খুকু। যা বলতে এসেছি, সেটা বলি। কিন্তু তুমি কথা দাও, এ কথা তুমি কিংশুকবাবু বা তার মাকে বলবে না?

—কেন?

—কেন, সেটা নিজে থেকে বুঝতে না পারলে, আমি কেমন করে বোঝাব? ওরা তোমার টাকাটার দিকে শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আর কোন উদ্দেশ্য নেই ওদের। ওরা কুচক্রী, অর্থলোভী...

—আর তুই? খুকুর বাপের সম্পত্তিটা কব্জা করে যক্ষের ধন আগলে রেখেছিস! তুই অর্থপিশাচ নস?

ওরা দুজনেই চমকে উঠে তাকিয়ে দেখে খোলা দ্বারপ্রান্তে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে কিংশুক হালদার, তার দীর্ঘ ছয়ফুট দেহখানা নিয়ে। অনির্বাণ উঠে আসে ওর কাছে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, মিস্টার হালদার! আমরা দুজনে কিছু প্রাইভেট কথা বলছি, আপনি পরে আসবেন।

কিংশুক গর্জে ওঠে, হিম্মৎ থাকে তো বাইরে বেরিয়ে আয়, হারামজাদা! না হলে তোকে ঐ সিঁড়ি দিয়ে নিচে ছুঁড়ে ফেলে দেব।

আশ্চর্য স্থিরতার সঙ্গে অনির্বাণ বললে, আজ নয়। আজ আমি ব্যস্ত আছি মিস্টার হালদার! তবে তোমার বাসনা আর একদিন পূর্ণ করে দেব আমি... কথা দিচ্ছি...

—অল রাইট! শুয়ারকা বাচ্চা! টেক দিস পাঞ্চ।

কথা নেই, বার্তা নেই বুনো মোষের মতো সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল কিংশুক। কিন্তু অনির্বাণের দেহ স্পর্শ করতে পারল না। হুমড়ি খেয়ে পড়ল টেবিলটার উপর।

অনির্বাণ 'ডাক' করেছে!

তারপর কী ঘটেছে, করবী জানে না।

'এন্টার দ্য ড্র্যাগন' ছবির একটা সিকোয়েন্স অভিনীত হয়ে গেল ওর চোখের সামনে। রক্তাপ্লুত কিংশুক যখন শয্যা নিল কার্পেটের ওপর, তখন একটা পকেট-চিরুনি বার করে চুলটা মেরামত করতে করতে অনির্বাণ বলল, আয়াম এক্সট্রিমলি সরি, খুকু, কথাটা আজ আর বলা হল না। তোমার প্রতিবেশিনী যেভাবে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিক্কুড় পাড়ছেন তাতে এখনি হয়তো পুলিশ এসে পড়বে...

বাসু বললেন, বাকিটা আমি জানি। তুমি এবার বরং রিভলভারটার কথা বল...

—রিভলভার! কোন রিভলভার?

—তোমার বাবার একটা থ্যাবড়া-নাক রিভলভার ছিল না? যেটা অনির্বাণ তোমার কাছে রাখতে দিয়েছিল— তুমি একলা বাড়িতে থাক বলে?

—হ্যাঁ, দিয়েছিল, সেটা সম্বন্ধে কী জানতে চান?

—সেটা কোথায়?

—আমার ড্রয়ারে। কেন?

—ড্রয়ারটা কি সব সময় তালাবন্ধ থাকে?

—না তো! কিন্তু এসব কথা কেন?

—তুমি আমাকে নিয়ে চল তো করবী, সেই ড্রয়ারটার কাছে; আমি দেখতে চাই, ড্রয়ারে রিভলভারটা আছে কি না।

—কী আশ্চর্য! থাকবে না কেন? নিশ্চয় আছে।

—লেটস সী! চল।

করবীর ভ্রূকুটি হয়। সে আর আপত্তি করে না। দুজনে চলে আসেন ওর শয়নকক্ষে। মাঝারি ঘর। সিঙ্গলবেড খাট। একটা চেস্ট-অব-ড্রয়ার্স। চাবিবন্ধ নয়। করবী দ্বিতীয় ড্রয়ারটা টেনে খোলে। অবাক হয়। তারপর একে একে সবগুলি পাল্লাই তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখে। অবশেষে বাসুসাহেবের দিকে ফিরে বলে, স্ট্রেঞ্জ! এর মানে কী?

বাসু বললেন, তোমার ঘরে গোদরেজের লোহার আলমারি আছে। রিভলভারটা ওতে রাখতে না কেন? ওটা কি তালাবন্ধ থাকে না?

এগিয়ে এসে হাতল ঘোরাতেই লোহার আলমারিটা খুলে গেল। বাসু বললেন, আয়াম সরি!

—'আয়াম সরি' মানে?

—তোমার সংসারে লোহার আলমারি আর কাঠের পাল্লায় কোনও প্রভেদ নেই। সবই খোলা পড়ে থাকে। এটা আমার আন্দাজের বাইরে ছিল। ফলে, এজন্য একজনকে তো 'সরি' হতেই হবে। না-হয় আমিই হলাম! তোমার মনে আছে, রিভলভারটাকে শেষ কবে ঐ ড্রয়ারে দেখেছ?

—না... মানে, দিনসাতেক আগে ওটাকে দেখেছি বোধহয়।

—অনির্বাণ ওটা তোমার কাছ থেকে ফেরত নিয়ে যায়নি?

—সার্টেনলি নট!

—কথাটাকে অন্যভাবে নিও না করবী। গত সাতদিনের মধ্যে তোমার বেডরুমের ভিতর কে কে এসেছিল? ...ওটা যে চুরি গেছে তা নিশ্চয় বুঝতে পারছ। আমি জানতে চাই, সুযোগ ছিল কার কার?

হঠাৎ বাসুসাহেবের চোখে-চোখে তাকিয়ে খুকু জানতে চায়, ঐ রিভলভারের গুলিতেই কি কালিপদবাবু খুন হয়েছেন?

বাসু বললেন, আগেই বলেছি, আমি শুধু শুনতে এসেছি, দেখতে এসেছি, কিছু বলতে নয়। তুমি কাউকে সন্দেহ করতে পারছ? এর আগে তোমাকে আর একটা প্রশ্ন করেছিলাম— আই অ্যাডমিট, কুমারী মেয়ের পক্ষে অত্যন্ত এম্ব্যারাসিং প্রশ্ন। তবু উত্তরটা আমার জানা দরকার।

—আয়াম সরি, স্যার। আপনার প্রশ্নটা কী ছিল তা আমার ঠিক মনে নেই।

—আমি জানতে চেয়েছিলাম : গত সাতদিনের ভিতর তোমার বেডরুমের ভিতর কে কে এসেছিল?

—এটা এম্ব্যারাসিং প্রশ্ন কেন হতে যাবে?

—নয়?

—আমি তো মনে করি না। ডাক্তার আর উকিলের কাছে কিছু গোপন করতে নেই। তাতে ঠকতে হয়।

—ভেরি গুড। তাহলে বল।

—না, স্যার। আমি কাউকে সন্দেহ করতে পারছি না। আমার একজন মেড-সার্ভেন্ট আছে—বাবার আমল থেকে : মোক্ষদামাসী। বিশ্বাসী। সে এ কাজ করবে না। মানে রিভলভার চুরি।

—তোমার বন্ধুবান্ধব বা তাদের আত্মীয়স্বজনেরা নিশ্চয় বেডরুমে আসে না; কিন্তু এ ঘর তো সব সময় খোলাই থাকে?

করবী এ কথার জবাব দিল না। বললে, লাইসেন্সটা অনিদার নামে। আমার কেরিয়ার-লাইসেন্সও ছিল না। আপনি কী পরামর্শ দেন? পুলিশে ফোন করে জানাব যে, ওটা আমার ঘর থেকে চুরি গেছে?

বাসু বলেন, না। ব্যস্ত হয়ো না। রিভলভারটা বর্তমানে পুলিস-কাস্টডিতেই আছে। চল, আমরা বাইরের ঘরে গিয়ে বসি।

বাইরের ঘরে ফিরে এসে বসলেন, দুজনে অনেকক্ষণ গল্প করলেন। করবী শুনল না, দুকাপ কফি বানিয়ে আনল। বাসুসাহেব তাঁর তথ্যানুসন্ধান চালিয়ে যান।

না, খুকু ডায়েরি লেখে না। বাপি? হ্যাঁ, লিখতেন। তবে বিস্তারিত কিছু নয়। কাজের কথা, অ্যাপয়েন্টমেন্ট। খুকুর বন্ধুবান্ধবদের কথা বিস্তারিত জানতে চাইলেন। সুখেন চৌধুরী একটা লিটল ম্যাগাজিন বার করে : ত্রৈমাসিক। ও কবি। সম্পাদকীয়ও লেখে। ওরা দলে চারপাঁচজন আছে। যতীন কর, মীনাক্ষী, শিখা, রবি দাস ইত্যাদি গ্রুপ থিয়েটারে অভিনয় করে। ওরা মাঝে মাঝে সবাই দল বেঁধে এখানে রিহার্সাল দিতে আসে। না, না বেডরুমে নয়, বাইরের ঘরে। কিং? হ্যাঁ, সেও আসে। ওর প্রতিভা বহুমুখী। গানের গলা নেই; কিন্তু ক্লাসিকাল গানের সমঝদার। ছবি আঁকে। তেলরঙে। আর স্কেচ। পোর্ট্রেটেই ওর বৈশিষ্ট্য। বিশেষ ধরনের পোর্ট্রেট।

—বিশেষ ধরনের পোর্ট্রেট মানে? কী ধরনের?

করবী মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, সে আপনাকে বোঝাতে পারব না। তাহলে মডার্ন আর্ট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে হয়।

—কর না। আমিও কিছু কিছু বুঝি। গত শতাব্দীর 'ইম্প্রেশানিজম্', 'ডাডাইজম', সুররিয়ালিজম... পোস্ট-ইম্প্রেশানিজম, পয়েন্টিলিজম, কিউবিজম...

খুকু ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললে, ও প্রসঙ্গ থাক। ওসব ব্যাকডেটেড চিন্তাধারা।

—আই সী। কিংশুক তোমার পোর্ট্রেট এঁকেছে?

—হ্যাঁ, একাধিক।

—একটা দেখাও দেখি।

—সরি! আমার কাছে একটাও নেই।

বাসু হঠাৎ প্রশ্ন করে বসেন, আচ্ছা, কালিপদ কুণ্ডু যখন তোমার কাছে শেয়ারের প্রক্সি সংগ্রহ করতে আসে তখন তোমার বাবার একটা মিসিং ডায়েরির কথা বলেছিল কি?

—বাবার মিসিং ডায়েরি? নাতো! হঠাৎ এ কথা কেন?

বাসু হেসে বলেন, এক কথা কতবার বলব করবী? আমি শুধু শুনতে এসেছি; কিছু বলতে নয়। আচ্ছা আজ চলি। কফির জন্য ধন্যবাদ। আর তোমার সহযোগিতার জন্যও।

—অন্তত একটা কথা বলে যান, স্যার?

—কী কথা?

—অনিদাই কি কালিপদবাবুকে...

কথাটা শেষ হল না। বাসু বলেন, আই রিপীট : হি ইজ মাই ক্লায়েন্ট।

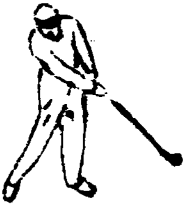

॥ এগার ॥

বাসুসাহেব টেলিফোন করছিলেন। ওপ্রান্তে 'হ্যালো' শুনেই বলেন, অশোক মুখুজ্জে কি অফিস থেকে ফিরেছে?

যে টেলিফোন ধরেছিল সে বিরক্ত হল। হবারই কথা, মিস্টার অশোক মুখোপাধ্যায়, বি ই, টেলিকম্যুনিকেশন সিভিল সেন্টারের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। তাঁর সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে হয় সম্ভ্রমের সঙ্গে। 'অশোক মুখুজ্যে কি ফিরেছে'— এ আবার কী জাতের প্রশ্ন! ভৃত্যশ্রেণীর লোকটি বিরক্ত হয়ে বললে, হ্যাঁ, সাহেব ফিরেছেন। তাঁকে কী বলব? কে ফোন করছেন?

—বল, বাসুমামা ফোন করছেন। পি. কে. বাসু।

একটু পরেই অশোক ছুটে এল। সোৎসাহে বলল, বলুন মামু, কীভাবে আপনার মিস্ট্রি-সলভিং-এ সাহায্য করতে পারি? এবার অনেকদিন পরে ফোন করছেন।

অশোক ওঁর গুণগ্রাহী।

বাসু বলেন, একটা বিচিত্র রিকোয়েস্ট রাখতে হবে।

—ফরমাইয়ে।

—টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে যেমন সাবস্ক্রাইবারদের নাম অ্যালফাবেটিক্যালি সাজানো থাকে, তেমনি টেলিফোন ভবনে আর একটি রেজিস্টারে নিশ্চয় নিউমেরিক্যালি লিস্ট করা আছে, তাই নয়?

—ঠিক কী জানতে চাইছেন?

—আমি যদি জানতে চাই 475-8464 নম্বরে সাবস্ক্রাইবারের নাম-ঠিকানা কী, তা তোমরা সেই রেজিস্টার দেখে অনায়াসে বলে দিতে পারবে, তাই নয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ডাইরেক্টরিতেই দেখুন, এজন্য একটা বিশেষ নম্বর লেখা আছে। সেখানে ডায়াল করলে তা জানিয়ে দেওয়া হয়।

—আই নো। আমার প্রবলেমটা একটু অন্যরকম। না হলে তোমাকে বিরক্ত করব কেন?

—বলুন, মামু?

—পুরো নম্বরটা জানি না। শেষের চারটে অঙ্ক শুধু জানি। তুমি সাবস্ক্রাইবারকে ট্রেস করে দিতে পারবে?

—না, মামু, তা হয় না। পুরো নম্বরটা চাই।

—আরে ভাগ্নে, কথাটা তো শোন। ধর, শেষ চারটে সংখ্যা 1234 এমন কতগুলি টেলিফোন আছে শহর কলকাতায়? অসংখ্য নয়, যতগুলি এক্সচেঞ্জ আছে ততগুলিই। তাই নয়?

—হ্যাঁ, তাই। কিন্তু তা ধরে নাম পেলে 'ঠিকানা', অথবা ঠিকানা পেলে 'নাম' খুঁজে বার করতে একটা লোকের সারাটা দিন লাগবে।

—আই নো, আই নো! তোমার একজন কর্মীর নাম কর যে দক্ষ, পরিশ্রমী, আর জেদী— 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'-টাইপ।

—অপর্ণা দেব। কেন?

—ম্যারেড?

—হ্যাঁ, সম্প্রতি।

—অল রাইট। তাকে একদিন ক্যাজুয়াল লীভ নিতে বল, আর বল : কলকাতায় যতগুলি এক্সচেঞ্জ আছে— আশা করি শতখানেকের কম— তার ভিতর সে খুঁজে দেখুক প্রত্যেকটি এক্সচেঞ্জে কোন কোন সাবস্ক্রাইবারের শেষ চারটে নম্বর হচ্ছে 1836। আমি তথ্যটা তালিকাকারে চাই। এক্সচেঞ্জ-বেসিসে সাবস্ক্রাইবারের নাম ও ঠিকানা সহ। অপর্ণাকে বল : তার এ পরিশ্রমের বিনিময়ে হয়তো একজন নিরাপরাধী ফাঁসির দড়ি থেকে রেহাই পাবে। এজন্য অপর্ণাকে কত অনারেরিয়াম দিতে হবে?

অশোক হেসে বলল, আমি তার হয়ে বলছি, মামু। অপর্ণাও আপনার 'ফ্যান'। ও একটি পয়সাও নেবে না। কিন্তু এ কেস যদি জেতেন তাহলে আপনাদের চারজনকে আমাদের বাড়ি ডিনারে নিমন্ত্রণ রাখতে আসতে হবে। সকর্তা অপর্ণাও আসবে। গল্পটা ছাপার আগে শোনাতে হবে। রাজি?

—রাজি। শর্তসাপেক্ষে।

—কী শর্ত?

—আমি ডিভিশন-অব-লেবারে বিশ্বাসী। তারিখটা ঠিক করবে তুমি আর তোমার বেটার-

হাফ। ভেনুটা 'তাজবেঙ্গল'। মেনুটা ঠিক করবে একটা কমিটি : অপর্ণা, মিস্টার দেব, সুজাতা, ভারতী আর কৌশিক। গল্পটা শোনাব আমি। আর তোমার মামিমা, মানে আমার বেটার-হাফ, শুধু হোটেলের বিলটা মেটাবে। এগ্রীড?

—এগ্রীড!

পরদিন বাসুসাহেবের চেম্বারে দেখা করতে এলেন মহেন্দ্রনাথ পাল। বর্ধমানের কানাইনাটশাল থেকে। বেঁটেখাটো মানুষ। বয়স সত্তরের ওপারে। তবে শরীর শক্ত। উনি ছিলেন রঘুবীর সেনের বাল্যবন্ধু। বস্তুত ওঁরা দুজন আর সলিল মৈত্রের পিতৃদেব স্বাধীনতার পর সাহেবদের কাছ থেকে কুতুব টীর স্বত্বাধিকার ক্রয় করে নেন। তখন ওটা ছিল নেহাতই ছোট কোম্পানি। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। ক্রমে স্বাধীনতা-উত্তর ওর শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। 'প্রাইভেট' শব্দটা উড়িয়ে দিয়ে ওঁরা পুরোপুরি কোম্পানিই ফ্লোট করেন। ভারতীয় চায়ের বাজার বিশ্বে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কোম্পানিও বড় হতে থাকে। নতুন নতুন চা-বাগান খরিদ করা হয়। কিন্তু মুশকিল হল অন্য ব্যাপারে। স্ত্রী বিয়োগের পর রঘুবীর হয়ে পড়েন উদাসীন। মহেন্দ্রবাবুর ছিল বর্ধমান অঞ্চলে নামে-বেনামে প্রচুর ধানজমি, কোল্ড-স্টোরেজ এবং সিনেমা হল। আর সলিল মৈত্রের পিতৃদেবের ছিল হাইকোর্টে ওকালতি। ফলে তিন কর্তার কেউই সরেজমিনে তত্ত্বতালাশ নিতে যেতে পারতেন না। তাঁরা নির্ভর করতেন ম্যানেজারের রিপোর্টের ওপর। এই সুযোগটাই গ্রহণ করলেন ধূর্ত ব্যবসায়ী জনার্দন সিংঘানিয়া। একবার জেনারেল মিটিং-এ হঠাৎ তিন বন্ধু প্রণিধান করলেন পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। সিংঘানিয়া ভোটের জোরে কুতুব টীর প্রেসিডেন্ট হয়ে বসলেন। ওঁদের সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল। নানান ছুতোয় পুরাতন কর্মীদের বিদায় করলেন সিংঘানিয়া, সিংহবিক্রমে! এই সময়েই তহবিল তছরুপের মিথ্যা অজুহাতে চাকরি খোয়ালেন কালিপদ কুণ্ডু। রঘুবীর মারা গেলেন। মৈত্রমশাই তাঁর শেয়ার বেচে দিলেন, রাশিয়ায় প্রতিবিপ্লব সফল হবার মুখে। অর্থাৎ ভারতীয় চা যেদিন রাশিয়ার বাজারটা খোয়ালো।

অতি সম্প্রতি মহেন্দ্রনাথ তাঁর হৃত সাম্রাজ্য উদ্ধার করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এ কাজে তাঁর দক্ষিণহস্ত ছিলেন কালিপদ কুণ্ডু। মহেন্দ্রনাথের বিশ্বাস, কালিপদ কুণ্ডু খুন হয়েছেন কোন ভাড়াটে খুনীর হাতে। খুনীকে কাজে লাগিয়েছিলেন ঐ সিংহবিক্রম সিংঘানিয়া। তার কারণ ঐ কালিপদ কুণ্ডু ঘুরে ঘুরে গত ছয় মাসে প্রচুর প্রক্সি ফর্ম জোগাড় করেছিলেন। সিংঘানিয়ার লোক যেখানেই প্রক্সি ভোট সংগ্রহ করতে গেছে সেখানেই শুনেছে, সাম মিস্টার কুণ্ডু ইতিপূর্বেই প্রক্সি ফর্ম সংগ্রহ করে গেছেন। মজা হচ্ছে এই যে, সচরাচর শেয়ারহোল্ডাররা উপরোধে পড়ে ব্ল্যাঙ্ক ফর্মে স্বাক্ষর করে দেয়। এজেন্ট নামটা বসিয়ে দেয়। ফলে মৃত্যুকালে কালিপদ কুণ্ডুর হেপাজতে সম্ভবত প্রচুর পরিমাণে স্বাক্ষরিত প্রক্সি ফর্ম ছিল, যাতে প্রার্থীর 'কলমটা' ছিল ফাঁকা। মহেন্দ্রনাথের মতে, সেটাই কুণ্ডুমশায়ের মৃত্যুর কারণ। মহেন্দ্রনাথ বললেন, কালিপদর তিনকুলে কেউ নেই; কিন্তু সে আমার কাজ করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। ফলে তার আত্মা অতৃপ্ত থাকবে যদি

না আমি তার বদলা নিই।

ওঁর মতে অনির্বাণ বেমক্কা ফাঁদে পড়ে গেছে মাত্র।

বাসু বললেন, সবই বুঝলাম। কিন্তু পুলিশ অনির্বাণকেই আসামী সাজিয়ে কেস খাড়া করতে উদ্যোগী হয়েছে। আর আমি ঐ অনির্বাণকেই আমার ক্লায়েন্ট বলে স্বীকার করে নিয়েছি। ফলে, প্রথম কাজ হচ্ছে অনির্বাণকে এ মামলা থেকে মুক্ত করা। তবে আমার কর্মপদ্ধতি আপনি জানেন কি না জানি না। প্রকৃত হত্যাকারীকে চিহ্নিত না করা পর্যন্ত আমি থামতে পারি না। আপনার কথাটা আমার স্মরণ থাকবে। এ কেস মিটলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আপাতত আপনি আমাকে রঘুবীর, সিংঘানিয়া আর কালিপদ কুণ্ডুর ব্যাকগ্রাউন্ড যতটা জানেন, বলুন।

মহেন্দ্রনাথ তিনজনের বিষয়েই অনেক কিছু অতীত কথা শুনিয়ে গেলেন। ওঁর বিশ্বাস, রঘুবীর কোন গোপন ডায়েরি রেখে যাননি। মৃত্যুর তিনচারদিন পূর্বেও মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে রঘুবীরের সাক্ষাৎ হয়েছিল। অনির্বাণের বিরুদ্ধে তাঁর কোনও অভিযোগ ছিল না। উনি যে অনির্বাণকেই ওঁর সম্পত্তির একক 'ন্যাসপাল' করে গেছেন তা বাল্যবন্ধু মহেন্দ্রনাথকে পর্যন্ত রঘুবীর বলে যাননি। এতটাই তিনি বিশ্বাস করতেন অনির্বাণকে। তাছাড়া মহেন্দ্রনাথের বিশ্বাস, ঐ ছেলেটিকে উনি হয়তো জামাতা হিসাবে নির্বাচন করতেন আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে।

দ্বিতীয়ত, সিংঘানিয়া। অতি ধূর্ত ব্যবসায়ী। মোস্ট আনস্ক্রুপুলাস। 'পাঁপ হমার কেন হোবে? পাঁপ তো হোবে শালা কাসেম আলির হোবে'— এই দার্শনিক তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাছাড়া প্রতি পূর্ণিমাতে পূজা চড়ান। সারা মাসের পাপ তাতে ধুয়ে-মুছে যায়।

কালিপদ কুণ্ডু গুণী লোক। প্রথমে রঘুবীরের গাড়ির ড্রাইভার হিসাবে চাকরি করতে আসে। ক্রমে কুতুব টীর ক্যাশিয়ার পর্যন্ত হয়। ভাল তবলা, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ বাজাতে জানে। মার্গসঙ্গীত বোঝে। চাকরি যাবার পর অনেকদিন হাজতবাস করে, তহবিল তছরুপের মামলায়। তারপর বেকসুর মুক্তি পেয়ে বার হয়ে এসে সে কিন্তু পরিচিত দুনিয়ায় কারও কাছে যায় না। বস্তুত নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। সম্ভবত মনের দুঃখে, তীব্র অভিমানে। বেশ কয়েক বছর পর মহেন্দ্রনাথ তার সাক্ষাত পান একজন ধনাঢ্য-ব্যক্তির পুত্রের অন্নপ্রাশনে, গানের জলসায়। একটি সুন্দরী মধ্যবয়সী বাঈজী গান গাইছিল আর কালিপদ কুণ্ডু তার সঙ্গে তবলায় সঙ্গত করছিলেন। আসর ভাঙলে, মহেন্দ্রনাথ কালিপদকে ডেকে আলাপ করলেন। শুনলেন, তার কোনও আয় নেই, সে ঐ বাঈজীর বাড়িতেই থাকে। বাঈজী তাকে 'বাবা' বলে ডাকে। বছর-খানেক আগে সংবাদপত্রে দেখতে পান, ঐ বাঈজী বেমক্কা খুন হয়ে গেছে, বাঈজীর সব গহনা চুরি হয়ে গেছে। আর পুলিশ সন্দেহ করে কালিপদকেই গ্রেপ্তার করেছে। তার 'ক্রিমিনাল-রেকর্ড' ছিলই— যদিও প্রমাণের অভাবে, মহামান্য আদালত তাকে ইতিপূর্বে বেকসুর খালাস দিয়েছিলেন। এবারও প্রমাণাভাবে কালিপদ মুক্তি পান। সোনার গহনার একটি টুকরোও উদ্ধার করা যায়নি। মহেন্দ্রনাথ তারপর কালিপদকে নিজের কাজে নিযুক্ত করেন। প্রথমে সিনেমাহাউসে 'আশারার'-এর চাকরিতে। পরে কুতুব টীর প্রক্সি সংগ্রহের কাজে।

বাসু জানতে চান, কলকাতায় কালিপদবাবু থাকত কোথায়?

—খুব একটা ভদ্র পল্লীতে নয়। হাড়কাটা লেন যেখানে প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটে এসে পড়েছে তার কাছাকাছি একটা ভাঙা ভাড়াবাড়িতে। বাঈজী মারা যাবার পর, অন্য একটি রূপোপজীবিনী বাড়িটার দখল নিয়েছে। সে আগে থেকেই ঐ বাড়িতেই থাকত, কালিপদকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনত। কালিপদকে থাকতে দিতে তার আপত্তি হয়নি। এ মেয়েটি গান জানে না, নিহতা বাঈজীর সঙ্গিনী ছিল। এর দেহসৌষ্ঠব খুব আকর্ষণীয়। দেহব্যবসা ব্যতিরেকে তাই 'মডেল' হিসাবে বিভিন্ন অ্যাড-এজেন্সিতে কাজ করে। ফটো তোলায়, আর্টিস্টের মডেল হিসাবেও সিটিং দেয়। এও কালিপদকে 'বাবা' বলে ডাকত।

বাসু জানতে চান, বাড়িটা চেনেন?

মহেন্দ্র বললেন, আজ্ঞে না। ও পাড়ায় পদার্পণের সাহস হয়নি, রুচিও হয়নি। তাই বাড়িটা চিনি না। তবে ঠিকানাটা আমার নোটবইয়ে লেখা আছে। প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের ঠিকানা। হাড়কাটা গলির নয়। এই নিন।

বাসু বললেন, থ্যাঙ্কু।

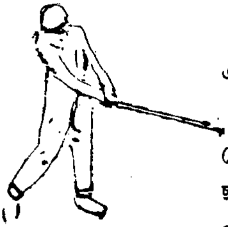

।। বারো ।।

একাই এসেছেন বাসুসাহেব।

গাড়িটা পার্ক করে লক করলেন। সন্ধ্যা-সঙ্গীতের আসর শুরু হয়ে গেছে। প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটের এ অঞ্চল দিয়ে বিশেষ জাতের মানুষ ছাড়া লোকজনের যাতায়াত কমে গেছে। ঠুন্‌ঠান্‌ করে রিকশা চলছে—পর্দা ফেলা। বেলফুলের মালা ফিরি করতে করতে একটা লোক রাস্তার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে চলে গেল। ফুলুরি-পিঁয়াজিওয়ালা উনুনে সবে আগুন দিয়েছে। কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া যেন প্রেমচক্রের পাকে-পাকে প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটকে অজগর সাপের মতো জড়িয়ে ফেলেছে।

বাসুসাহেব যথারীতির স্যুটেড-বুটেড। দেওয়ালে নম্বর-প্লেট খুঁজে দেখছেন। একটা নম্বরও পড়া যায় না। সামনের একটি দরজার আধখানা ফাঁক করে দু-তিনটি যুবতী ও প্রৌঢ়া মুখ বার করে দেখছে। তাদের প্রসাধন উগ্র, খোঁপায় যুঁইয়ের মালা। বাসু সেদিকে যেতেই একজন প্রৌঢ়া এগিয়ে এল মহড়া নিতে। বলল, এ বাড়িতে সব ঘর ভর্তি বাবু, লোক বসাবোনি। এগুয়ে দেখুন।

'লোক-বসানো'— এ পাড়ার একটি বাঁধা লবজ্‌; যোগরূঢ় অর্থে প্রয়োগ হয়। বাসুসাহেব প্রস্টিট্যুট-কোয়ার্টার্সে খুনের মামলা একাধিক করেছেন। অর্থগ্রহণে বাধা হল না তাঁর। বললেন, না, মা! আমি একটা নম্বর খুঁজছি। 'একশ সাতের তিনের সি' নম্বরটা কোন দিকে হবে বলতে পারেন, মা?'

'মা' এবং 'আপনি' সম্বোধনে প্রৌঢ়া বুঝতে পারে এ অন্য জাতের মানুষ। বললে, নম্বর বললি তো চিন্তে পারবনি বাবা, যাঁরে খুঁজছেন, তেঁনার নামটা বলেন?

বাসু বলেন, নামটা তো জানি না মা, তবে মেয়েটি মডেলিং-এর কাজ করে...

—কিসের কাজ করে?

—ঐ ফটোগ্রাফারের সামনে... বিজ্ঞাপনের জন্য.. মানে...

পাশের মেয়েটা আগবাড়িয়ে বলে, বুইচি দাদু, ঐ গা-দেখানো পোজ দিতে হয় আর কি!

বাসু বলেন, সে বাড়িতে একজন বাঈজী গত বছর খুন হয়ে যায়। আর সে বাড়িতে যে তবলচি ছিল তাকেই পুলিসে...

—বুইচি, বুইচি, কালিখুড়ো তবলচির কতা বুলছেন। ঐ হলুদ রঙের ঝুল-বারান্দাবালা ভাঙা বাড়িটে... বাড়িউলি মাসি ঐ ডাঁড়িয়ে আছে। অরে গিয়ে বলুন। গা-দ্যাখানো মাগিটার নাম সৈরভী।

অসতর্কভাবে বাসু অভ্যাসবশে বলে বসেন : থ্যাঙ্কু।

শুনে ওরা হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না। এ-ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ে।

বাড়িউলি মাসি কিন্তু এককথায় ভিতরে ঢুকতে দিল না। বললে, কতক্ষণ বসবে, বাছা?

বাড়িউলি ওঁর মেয়ের বয়সী।

'বাছা' সম্বোধন বহু দশক শোনেননি। বললেন, তা আধঘণ্টা-খানেক লাগবে। সৌরভী আছে?

—আছে। এট্টু ডেরী হবে। ওর গা-ধোওয়া হয়নি একনো। আর আধঘণ্টার জন্যি পঞ্চাশ ট্যাকা লাগবে।

বাসু একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে বাড়িউলি মাসির হাতে ধরিয়ে দিয়ে প্রায় ওর কানে-কানে বলেন, সৌরভীকে বলুন, ওকে আমি ছোঁব না। গা ধুয়ে আসার দরকার নেই। মোটামুটি ভদ্র পোশাকে এসে বসুক। আমি একজন উকিল। এসেছি কালি কুণ্ডুর হত্যা মামলার তদন্ত করতে।

মাসি পঞ্চাশ টাকার নোটখানা ফেরত দেবার জন্য বাড়িয়ে ধরে। বলে, এ্যাই লাও গো লাগর, তোমার লোট। সৈরোভী কোর্ট-কাছারির মধ্যি যাতি পারবে না! বাস রে! বাঘে ছুলে আঠারো ঘা।

বাসু জবাব দেবার আগেই ওপাশ থেকে একটি শ্যামবর্ণা সুতনুকা বলে ওঠে : কালিখুড়োর খুনের ব্যাপারে কী জানতি চান আপনি? আমিই সৈরভী। আসেন, ভিতরে আস্যে বসেন।

মাসি চিক্কুড় পাড়তে থাকে, মরবি তুই, সৈরভী! বাঘে ছুলি আঠারো ঘা, কিন্তুক পুলিশে ছুলি ছত্তিশ!

অভ্যাশবসে সৌরভী তার খদ্দেরকে নিয়ে এসে ঘরে বসিয়ে দোরে আগড় দিল। একটি মাত্র জানলা আছে ঘরে। রাস্তা দেখা যায়। সেটাও বন্ধ করে টাওয়ার-বোল্ট লাগালো। চৌকিতে বসবে-কি-বসবে না ইতস্তত করছিল। বাসু বললেন, বসো মেয়ে। তুমি আমার নাতনির বয়সী। আমাকে সঙ্কোচ কর না। তোমার মাসিকে বলেছি, সেটা তুমি শুনতে পেয়েছ কি না জানি না,

আবার বলছি : তোমাকে আমি ছোঁব না। না, না, ঘৃণায় নয়। সে অর্থে 'ছোঁব না' বলিনি, তুমি প্রণাম করলে আমি তোমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করব।

তৎক্ষণাৎ মেয়েটি নত হয়ে বৃদ্ধের পাদস্পর্শ করে প্রণাম করে। বাসু তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। বললেন, তুই এ-বাড়িতে কতদিন আছিস রে, সৌরভী?

—তা পাঁচ-সাত বছর হবে দাদু। কেন বল তো?

—কালিপদবাবু লোক কেমন ছ্যাল রে?

বাসুসাহেবের খানদানি পোশাকে মেয়েটা এতক্ষণ সিঁটিয়ে ছিল। এবার ওঁর 'উরুশ্চারণ' শুনে মেয়েটি আশ্বস্ত হল। বলল— খুব ভাল লোক। কারও সাত-পাঁচে থাকতনি। কারও ঘরে রাত কাটাতে যেতনি। আমারে 'মা' ডাকত।

—ও ফৌত হবার পর ওর জিনিসপত্র নিয়ে যেতে কোনও সুম্বুদ্ধির পো আসেনি?

—কালিখুড়োর তিনকুলে কেউ ছ্যাল নাকি যে, নিতি আসবে?

—ওর ট্যাকাপয়সা, জামাকাপড় সব কোথায় থাকত রে?

—ট্যাকাপয়সা তো ঘোড়ার ডিম, জামাকাপড়ও ছ্যাল না। থাকার মধ্যে ছ্যাল এক বাণ্ডিল দস্তাবেজ। ঐ তো দেখ না কেনে, পড়ি আছে ঐ শুটকেসে।

চৌকির নিচে থেকে সৌরভী টেনে বার করল স্যুটকেসটা। তাতে কালিপদর কিছু গেঞ্জি, শার্ট, পায়জামা আর এক বাণ্ডিল স্বাক্ষরিত ব্র্যাঙ্ক প্রক্সি-ফর্ম।

বাসু জানতে চান, এ কাগজগুলো কী করবি?

—পুরানো কাগজের দরে বেচে দেবে নে। তা দু-ট্যাকা হবেই।

বাসু ওর হাতে একটা একশ টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে বললেন, কাগজগুলো আমি নিয়ে গেলাম রে সৌরভী। তোদের কাছে এর কোন দাম নেই; কিন্তু অন্যলোকের কাছে আছে।

সৌরভী খুশিতে ডগমগ। বলল, বাড়িউলি মাসিরে যেন বলনি। তাইলে এ ট্যাকা কেড়ে নেবে। আর তুমি আমারে যখন এত ট্যাকা দিলে তাইলে তোমারে আর একটা দামী জিনিস দেখাই দাদু। দেখবা?

—কী জিনিস?

এবার আঁচলের চাবি দিয়ে সৌরভী একটা টিনের তোরঙ্গ খুলল। তা থেকে বার করে দিল একটা খাতা।

—কী এটা?

—তা জানিনে, দাদু। কালিখুড়ো বলিছিল, খুব যত্ন করি রাখি দে, সৈরভী। কারেও দেখতে দিস না।

বাসু পাতা উল্টে দেখলেন। একটা দিনপঞ্জিকা! হ্যাঁ, মৃত ব্যক্তির দিনপঞ্জিকাই বটে! যা কালিপদ কুণ্ডু হস্তান্তর করতে চেয়েছিল অনির্বাণকে। পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে। বাসু

বললেন, তুই জানিস না এটা কী?

—তোমার মাতা খারাপ, দাদু! আমি কি নেকাপড়া জানি?

—তাহলে এটাও আমি নিয়ে যাই?

—তা নাও না। একশ টাকা বকসিস দেবার হিম্মৎ কয়জনের হয়? নাও। কালিকাকা তো আর ফিরে আসবেনি। তুমিই নাও।

বাসু বলেন, তাহলে এ পাঁচখানাও রাখ। ভয় নেই রে, বাড়িউলি মাসিকে কিছু বলব না আমি।

পাঁচখানা একশ টাকার নোট হাতে নিয়ে বজ্রাহত হয়ে গেল সৌরভী। আধঘণ্টায় ছয়শো টাকা! বাসুসাহেব উঠে দাঁড়াতে আবার টিপ করে প্রণাম করল।

কাগজপত্র দুই পকেটে বোঝাই করে ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু যখন পথে নামলেন ততক্ষণে জনপদবধূদের পল্লীটি জমজমাট।

এক মাতাল অপর মাতালকে কনুইয়ের গোঁত্তা মেরে বললে, দ্যাখ রে শালা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ! সাহেব সেজে বেশ্যাপাড়ায় এসেছে! শাল্লাহ্!

রানু বললেন, গাড়ি নিয়ে একাএকা কোথায় গিয়েছিলে? কৌশিক রাগারাগি করছিল।

বাসু বললেন, যে পাড়ায় গেছিলাম সেটা বে-পাড়া। সেখানে কৌশিককে নিয়ে যাওয়া যায় না।

—তার মানে?

—হাড়কাটা গলি।

রানু আর কিছু বলার সুযোগ পেলেন না।

বাসু ঢুকে গেলেন স্টাডিতে। ফ্যানটা খুলে দিয়ে এসে বসলেন, তাঁর ঘূর্ণ্যমান চেয়ারে। টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বেলে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন সেই 'মৃতব্যক্তির দিনলিপির' ওপর।

আদালত অঞ্চলে 'ডেড-পার্সন্স ডায়েরি'-র দারুণ কদর। একটা লোক দু-এক বছর বা দু-পাঁচ মাস আগে তার দিনপঞ্জিকায় কিছু লিখে গেছে। বিশেষত হস্তরেখাবিদ 'সার্টিফাই' করছেন যে, সেই দিনলিপিতে প্রক্ষিপ্ত কিছু ঢোকেনি। তা কোন ভাবেই 'ট্যাম্পার' করা হয়নি, তা হলে আদালত মহলে তার মূল্য অসীম। কারণ যে লোকটা দিনলিপি লিখে ফৌত হয়েছে সে তো জানতো না ভবিষ্যতে কোনও অপরাধ হবে কি না, কে খুন হবে। কে খুনের অপরাধে ধরা পড়বে।

ডায়েরি পড়তে পড়তে একেবারে তন্ময় হয়ে গেলেন বাসুসাহেব। তাঁর ঠোঁটে থেকে ঝুলছে তামাকঠাশা পাইপ। বাঁ হাতে দেশলাই আর ডানহাতে দেশলাই কাঠি। জ্বালাবার সুযোগ হয়নি। এতই তন্ময়। তিল তিল করে রহস্যজাল ভেদ হয়ে আসছে।

কেন অমন নির্বিরোধী অজাতশত্রু মানুষটা এমন বেমক্কা খুন হল।

আর কেনই বা সে ওটা থানায় গিয়ে জমা দেয়নি। ঘণ্টাখানেক পরে স্টাডি রুম থেকে বার হয়ে এলেন উনি। রানু বসেছিলেন লিভিং রুমে। উলের একটা সোয়েটার বুনছিলেন। বললেন, তন্ময় হয়ে কী পড়ছিলে এতক্ষণ?

—তন্ময় হয়ে? কেমন করে জানলে 'তন্ময় হয়ে'।

—সহজেই। এর মধ্যে দুবার ও ঘরে গিয়েছি। তোমার খেয়াল হয়নি। তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, চা-কফি কিছু খাবে কি না। তুমি আমার কথা শুনতেই পাওনি।

উনি হাসলেন। পাইপটা এতক্ষণে ধরালেন। বললেন, হ্যাঁ, রানু, আমি ঘণ্টাখানেক খুবই থ্রিলিং একটা কিছু পড়ছিলাম।

—কোন বই?

—না। 'আ ডেড পার্সনস্ ডায়েরি!'

—যেটা কালিপদ কুণ্ডু পাঁচ হাজার টাকায় অনির্বাণকে বিক্রি করতে চেয়েছিলেন?

—নাইন্টি-নাইন পার্সেন্ট চান্স, সেটাই।

—নাইন্টি-নাইন? তাহলে বাকি এক পার্সেন্ট ঠিক কি না কে বলবে?

—অপর্ণা দেব।

—সে আবার কে?

—তুমি টেলিকমিউনিকেশনের অশোক মুখুজ্জেকে একবার ধরতো। রেসিডেন্স নাম্বারে।

একটু পরেই টেলিফোনে যোগাযোগ করা গেল।

অশোক বললে, না মামু, অপর্ণা এখনো লিস্টটা শেষ করতে পারেনি। মুশকিল হয়েছে কি, অনেক নাম্বার প্রতি সপ্তাহেই বদলে যাচ্ছে তো। এক্সচেঞ্জগুলো ইলেকট্রনিক সিস্টেমের আওতায় এসে যাচ্ছে বলে। ও প্রায় আধাআধি শেষ করেছে। গোটা পঞ্চাশ নাম-ঠিকানা এ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করতে পেরেছে, যাদের শেষ চারটে ডিজিট হচ্ছে 1836।

—অলরাইট, অলরাইট। সেই ইনকমপ্লিট তালিকাটা কার কাছে আছে?

—অপর্ণারি কাছে এক কপি আছে। আমার কাছেও একটা জেরক্স কপি আছে।

—তোমার অফিসে?

—আজ্ঞে না, আমার অ্যাটাচি কেসে।

—থ্যাংক গড! লেটস ট্রাই আওয়ার লাক। কে জানে হয়তো ঐ প্রথম পঞ্চাশটা নামের ভিতরেই আমার 'ছুপে-রুস্তম' ঘাপটি মেরে লুকিয়ে বসে আছেন। তুমি ঐ পঞ্চাশটা নাম ঠিকানা পড়ে শোনাও দেখি।

—এক মিনিট, স্যার। আমি ওঘর থেকে ব্যাগটা নিয়ে আসি।

বাসু টেলিফোনটা ধরে অপেক্ষা করলেন। একটু পরেই অশোক ফিরে এল টেলিফোনে।

—হ্যালো?

—হ্যাঁ, বলো?

—আপনি কাগজ পেন্‌সিল নিয়েছেন?

—না। তার প্রয়োজন নেই। আমি একজনকে সন্দেহ করছি যার টেলিফোনের নম্বরের শেষ চারটি সংখ্যা হচ্ছে 1836; তুমি সেই নামটা উচ্চারণ করলেই আমার উদ্দেশ্য সফল, না করলে আমি বলব, অপর্ণাকে বল তার বাকি গবেষণা চালিয়ে যেতে।

অশোক ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘ নামের তালিকা, যে ভাগ্যবান অথবা হতভাগ্যের রেসিডেন্সিয়াল টেলিফোনের শেষ চারটি সংখ্যা 1836— পড়ে যেতে থাকে।

নামটা পড়া হতেই বাসু বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, থ্যাঙ্কস, মুখার্জি। যা খুঁজছি তা পেয়ে গেছি। অপর্ণাকে বল, আর পরিশ্রম করতে হবে না। কবে 'তাজ-বেঙ্গলে' আসবে তা পরামর্শ করে স্থির কর। ছুটির দিন হলেই সবার সুবিধা।

অশোক অবাক হয়ে বলে, যাকে খুঁজছেন তাকে পেয়ে গেছেন?

—ইয়েস!

—আমি লাস্ট নেম যা বলেছি— যখন আপনি আমাকে থামতে বললেন, সেই নামটা জে. এম. ঠক্কর। 'ঠক্কর' বোধহয় গুজরাতি টাইটল না মামু?

—বোধহয় তাই। ঠিক জানি না। কিন্তু তোমার ও ধারণাটা ভুল। আমি যে নামটা খুঁজছি, প্রত্যাশা করছি, সেটা উচ্চারণ মাত্রেই আমি তোমাকে থামতে বলিনি।

—কেন? সেটাই তো স্বাভাবিক।

—সব সময় স্বাভাবিক কাজটা করতে নেই। তা করলে তুমি অপরাধীকে তৎক্ষণাৎ চিহ্নিত করতে। সেটা আমি চাই না। আমার গোপন কথা আমি আপাতত আস্তিনের তলায় লুকিয়ে রাখতে চাই। এনি ওয়ে, থ্যাংস অ্য লট।

টেলিফোনটা ক্র্যাডেলে নামিয়ে রাখলেন।

রানু জানতে চান, তোমার সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে?

—ইয়েস। নাইন্টি নাইন পার্সেন্ট সংগ্রহ করেছি হাড়কাটা গলিতে; বাকি এক পার্সেন্ট সরবরাহ করল অপর্ণা দেব।

—কালিপদকে গুলিটা কে করেছিল তা জানতে পেরেছ?

—নিঃসন্দেহে। কিন্তু আমি জানলেই তো হবে না। আমাকে কনভিন্সিং এভিডেন্স যোগাড় করতে হবে। দাঁড়াও একটা ফাঁদ পাতি। দেখি পাখি ধরা পড়ে কি না। তুমি 'স্যার'কে একবার র তো। কানাই সচরাচর টেলিফোন ধরে। তার কাছে আগে জেনে নিও যে, স্যার...

—জানি, বাপু জানি।

বৃদ্ধ পি. কে. বাসু বার-আট-ল'র কাছে কলকাতা শহরে প্রণম্য একজনই এখনো জীবিত— তিনি ওঁর 'স্যার', ব্যারিস্টার এ. কে. রে। নব্বই ছুঁই ছুঁই। এঁরই অধীনে কর্মজীবন শুরু

করেছিলেন বাসুসাহেব, জুনিয়র হিসাবে।

রে-সাহেব জেগেই ছিলেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা গেল। বাসু বললেন, একটা ব্যাপারে আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হলাম, স্যার!

—'স্টেট-ভার্সেস-অনির্বাণ দত্ত' কেস সংক্রান্ত?

—আপনি ট্র্যাক রাখছেন?

—বাঃ! কেসটা যে তোমার!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ ব্যাপারেই। মনে হচ্ছে আসল ঘুঘুকে চিহ্নিত করতে পেরেছি; কিন্তু কনভিক্‌শন পেতে হলে তাকে লোভ দেখিয়ে ফাঁদে ফেলতে হবে। তাই...

—মাই সার্ভিস ইজ অ্যাট্‌ য়োর ডিস্‌পোজাল। বল, কী চাও?

—R.C.G.C. ক্লাবের আপনি প্রেসিডেন্ট, আমি খবর নিয়েছি। ঐখানেই কালিপদবাবু খুন হয়েছিল। ঐখানেই ফাঁদটা পাততে হবে আমাকে। পরশু দিন, মানে আগামী বৃহস্পতিবারে। আমার কিছু কর্মী সকালে যাবে, কিছু গ্যাজেট পেতে আসবে। আপনি শুধু কেয়ারটেকারকে টেলিফোনে জানিয়ে রাখুন।

—এ তো সহজেই করা যাবে; কিন্তু বৃহস্পতিবার ক্লাব বন্ধ থাকে তা জান তো? ওটা ড্রাই-ডে।

—সেই জন্যই বৃহস্পতিবারটাকে বেছে নিয়েছি। ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়া সহজ।

—আমিও সেটা আন্দাজ করেছি। বেস্ট অফ লাক্‌!

মামীর কাছে খবর পেয়ে দুই লেজুড়ই এসে হাজির : কৌশিক আর সুজাতা। ওদের প্রশ্ন করতে হল না। বাসু বললেন, হ্যাঁ, সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। নিতান্ত ঘটনাচক্রে। অনির্বাণ যে 'ডেড-ম্যানস্‌ ডায়েরি'র কথা বলেছিল, সেটা পেয়ে গেছি।

—কোথায় পেলেন?

—কালিপদ কুণ্ডুর ডেরায়। শোন কৌশিক, কাল সকালে ঐ ডায়েরির খানকতক পৃষ্ঠা আমি নিজে জেরক্স করে আনব। না, সরি! তোমাদের কাউকে দিয়ে হবে না। আমি নিজেই যাব জেরক্স করাতে। তারপর সাড়ে নটা নাগাদ আমি বাড়ি ফিরে আসব। ঐ জেরক্সকরা কখানা পৃষ্ঠা সমেত একটা চিঠি একজনকে লিখব। পোস্টাল ডিপার্টমেন্টকে বিশ্বাস নেই। তুমি ক্যুরিয়ার সার্ভিসের পিয়ন সেজে নিজে হাতে চিঠিখানা ডেলিভারি দিয়ে আসবে। খাম যার নামে তার হাতে দেওয়া চাই। ঝি-চাকর বা বাড়ির আর কাউকে নয়। ফলো? পার্টি যদি বাড়িতে না থাকে তাহলে অপেক্ষা করবে।

কৌশিক ঘাড় নেড়ে জানালো সে বুঝেছে।

বাসু বললেন, রানু, নিখিলকে ফোনে ধর তো। প্রথমে বাড়িতে। না পেলে লালবাজার হোমিসাইডে। নিখিলের বউ বলতে পারবে ও কোথায় আছে।

নিখিলকেও পাওয়া গেল। বাসু বললেন, নিখিল, তুমি প্রথম সুযোগেই আমার সঙ্গে এসে দেখা কর। কখন আসছ?

—আমি এখনই আসছি, স্যার। আমি এখন অফ ডিউটি। কী ব্যাপার?

—এলে বলব।

নিখিল এবার এল সস্ত্রীক। নিখিলের স্ত্রী কাকলিও একসময়ে খুনের মামলায় ফেঁসেছিল। 'যাদু এ-তো বড় রঙ্গ'র কাঁটায়। এবাড়ির সবাইকে চেনে। সে সোজা ভিতরে চলে গেল। বাসু নিখিলকে নিয়ে স্টাডিতে গিয়ে বসলেন। বললেন, ঘটনাচক্রে একটা দারুণ এভিডেন্স পেয়ে গেছি। সেটা কী, আমি বলতে পারব না; কিন্তু...

—বাই এনি চান্স, স্যার : সেটা কোন 'ডেড ম্যানস ডায়েরি' নয় তো?

বাসু পকেট হাতড়ে পাইপ-পাউচ বার করলেন। বললেন, প্রশ্নটা নেহাত বোকার মতো করে বসলে, ইন্সপেক্টর দাশ!

—কেন স্যার?

—লজিক্যালি ভেবে দেখ। তোমার অনুমান সত্য হলে আমি স্বীকার করতে পারি, অস্বীকারও করতে পারি। স্বীকার করলে, তোমাকে তৎক্ষণাৎ খবরটা উপর মহলে জানাতে হবে। অস্বীকার করলে আমি বে-আইনি কাজ করব। তোমার অনুমান ভ্রান্তও হতে পারে; সেক্ষেত্রে...

—আয়াম সরি! আই উইথড্র। প্রশ্নটা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি আমি।

বাসু এতক্ষণে পাইপ ধরিয়েছেন। বললেন, যে কথা বলছিলাম! আমার অনুমান : কালিপদ কুণ্ডুকে কে খুন করেছে, কখন খুন করেছে...

—কখন খুন করেছে?

—ইয়েস! ফর য়োর ইনফরমেশন : কালিপদ কুণ্ডু খুন হয়েছে পৌনে দশটার আগে—তখনো অনির্বাণ গলফ ক্লাবে পৌঁছায়নি।

নিখিল বলে, আয়াম সরি এগেন। বলে যান, স্যার?

—কে খুন করেছে, কখন খুন করেছে, কেন খুন করেছে, তা আমি জেনে গেছি। তোমাকে জানাতে পারছি না দুটো হেতুতে। প্রথম কথা, আমার মক্কেল অনির্বাণ দত্ত যতক্ষণ না বেকসুর খালাস হচ্ছে ততক্ষণ তুমি-আমি ফর্মালি বিপক্ষ শিবিরে। দ্বিতীয় হেতু : অপরাধীকে কনভিক্ট করবার মতো এভিডেন্স আমার হাতে নেই।

—সো?

—আমি একটি ফাঁদ পাতছি। বৃহস্পতিবার রাত নয়টায়। দেড়-দিনের মতো খবরটা তোমাকে 'ভবম-হাজাম'-এর মতো পেট কোঁচড়ে চেপে রাখতে হবে। আর ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে অপরাধীকে ধরতে হবে।

—আমি রাজি।

বুধবার বেলা সাড়ে এগারোটার মধ্যেই কৌশিক এসে রিপোর্ট করল : ক্যুরিয়র সার্ভিসের চিঠি ডেলিভারি দিয়ে এলাম মামু।

—তোমাকে সন্দেহ করেনি? আমার বাড়ির লোক বলে?

—আমি নিজে থোড়াই গেছিলাম।

—তাহলে?

—সুকৌশলীরও তো কিছু চ্যালা-চামুণ্ডা আছে।

বাসু কৌশিকের হাতে একটা টেলিফোন নম্বর ধরিয়ে দিয়ে বললেন, যার হাতে চিঠিখানা দিয়ে এলে এটা তারই ফোন নম্বর। তার কণ্ঠস্বর তুমি চেন। তুমি কনফার্ম করে নিয়ে আমাকে রিসিভারটা দিও। পার্টি যদি বাড়িতে না থাকে তাহলে লাইন কেটে দিও। ওপক্ষ যেন কোনক্রমেই না বুঝতে পারে ফোনটা কোথায় অরিজিনেট করেছে।

কাগজটা হাতে নিয়ে কৌশিক ডায়াল করল। ওপ্রান্তে রিং টোন। তারপরে ওপ্রান্তের লোকটি আত্মঘোষণা করতেই কৌশিক বললে, প্লিজ স্পিক হিয়ার!

বাসু যন্ত্রটা বাগিয়ে ধরে তার কথামুখে বিচিত্র দেহাতি গ্রাম্যকণ্ঠে বললেন : হ্যালৌ! যেন : 'কাক্কাজীনে কহিন'!

ওপ্রান্ত থেকে প্রশ্ন হল : আপনি কে? কী চান?

—অ্যাই দ্যাহেন! আমারে চিন্তি ফার্লেন না? আমি খালিচরণ! খালিফদ কুণ্ডুর ছুট ভাই আজ্ঞে! আমার হাতচিটি ফোঁছায়নি এখনো?

—আপনি... আপনি কী চান?

—ওমা, আমি কনে যাব! সে খথা তো চিটিতেই বলিচি! দাদারে যা দিবেন বলিচিলেন... তাই দেবান্নে... মানে রুজনামচাখান হাতে ফেলি!

—অত টাকা এখন আমার হাতে নেই।

—বেশ তো, বেশ তো! ফরে দিবেন! মাস্-মাস্ দিবেন অখন! জেবনভর দিবেন। তাড়া কী? কাল নখকীবারে বৌনিটা হয়ি যাক! হাজার-ফাঁচেক দ্যান! দাদার ছেরাদ্দটা তো করি।

ও-প্রান্তে নীরবতা।

—কী হল? অ্যাঁ? কাল ফাঁচ-হাজার দিতি ফার্বেন? না, ফার্বেন না?

—কালিপদ কুণ্ডুর কোন ছোট ভাই ছিল না। বাজে কথা!

—ওমা আমি কনে যাব! রুজনামচার খাতাখান যে দাদা আমারে দে-গেল! বলি গেল, চরণ, এখন থিকা তুই নিজিই আদায়-ফত্তর করিস! আমি যে তেনার ন্যায্য ওয়ারিশ গো! রুজনামচা-কাতার ফাতার জেরক্স ফাননি?

—টাকাটা তুমি কোথায় নেবে?

—বলচি; কিন্তুক লম্বরী লোট নয়! দশ-বিশ ট্যাহার লোটে!

—তাই দেব। কোথায় তোমার দেখা পাব?

—আপনের দয়ায় দাদা যেহানে ফরলোকে গ্যালেন, ঠিক সেই ঠাঁইয়ে!

—তুমি সেখানে ঢুকতে পারবে তো?

—অ্যাই দ্যাহেন! কেন ফার্বনি? ফাঁচিল যে বেবাক ভাঙা গো! কাল নখকীবার আছেন। কেলাবে জনমনিষ্যি আসফেনি। রাত নিয্যস নয়টায়!

—তুমি ডায়েরিটা সঙ্গে নিয়ে আসছ তো?

—ওমা আমি কনে যাব! তাই কি ফারি? মাত্তর ফাঁচ হাজারে? এতো দাদার ছেরাদ্দ বাবদ! রুজনামচার দর-দাম কাল হবেনে! আজ অ্যাই পয্যন্তই থাক। ফেন্নাম হই! ঠিক রাত নয়টায় কিন্তুক!

টেলিফোনটা ক্র্যাডেলে নামিয়ে রাখলেন।

কৌশিক বলল, আশ্চর্য! ও রাজি হয়ে গেল টাকাটা দিতে! বুঝতে পারল না যে, আপনি কালিপদর ছোট ভাই নন?

বাসুসাহেব একগাল হেসে বললেন, ওমা আমি কনে যাব! বুঝতি কেন ফার্বেন না? কিন্তুক ও এটুকুনও বুঝিছেন যে, খালিফদর ব্রেমহাস্তরটা অখন খালিচরণের ফকেটে!

॥ তেরো ॥

বুধবার সন্ধ্যারাত্রেই টিভিতে আবহাওয়া-খবরে ঘোষণা করা হল যে, বঙ্গোপসাগরের কোথায় বুঝি নিম্নচাপ না ঊর্ধ্বচাপ কী যেন হয়েছে; ফলে এক পাগলা ঘূর্ণী ঝড় প্রবল বেগে ধেয়ে আসছে। অন্ধ্র, উড়িষ্যা না পশ্চিমবঙ্গ, কোনটাকে গিলে খাবে তা এখনো মনস্থির করতে পারেনি, সেই 'মেহরালি'-মার্কা পাগলা ঝড়!

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই এলোমেলো হাওয়া আর ঝিরঝিরে বৃষ্টি। আকাশের বদনখানি যেন পাগলাগারদের উদাসী বাসিন্দার ঘোলাটে চোখের তারা। আকাশের এমন হাল দেখেই বড়-সারেঙ বোধ করি শ্রীকান্তকে বলেছিল, 'বাবু, আজ ছাইকোলন্ হতি পারে।'

বাসুসাহেবের সর্দির ধাত। রানু সকাল থেকেই ওঁর গলায় একটা কম্ফার্টার জড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু তাঁকে রোখা গেল না। বর্ষাতি চড়িয়ে ছাতা মাথায় তিনি গেলেন সরেজমিনে তদারকি করতে। তার ঘণ্টাকয়েক আগেই কৌশিকের ব্যবস্থাপনায় ইলেকট্রিক মিস্ত্রির দল ভ্যানটা নিয়ে গলফ ক্লাবে চলে গেছে। নিখিল পৌঁছেছে তার আগেই।

বেলা এগারোটার মধ্যেই সব কাজ সারা হয়ে গেল। নিখিল কেয়ারটেকারকে বলল, আজ রাতে প্লেন-ড্রেস পুলিশ সারা মাঠে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকবে। আপনি আপনার দরোয়ান আর

ওয়াচম্যানদের ছুটি দিয়ে দিন।

—আর আমি নিজে? আমি থাকব না?

—লুকিয়ে বসে দেখতে চান তো থাকুন। কিন্তু গোলাগুলির ব্যাপার। আপনি ছাপোষা মানুষ! কী দরকার?

কেয়ারটেকারের ধারণা এখানে কিছু সমাজবিরোধী উগ্রপন্থীকে কব্জা করার ব্যবস্থা হচ্ছে। সে রাজি হয়ে গেল স্থানত্যাগে। আপনি বাঁচলে পিতাঠাকুরের নাম!

রাত সাড়ে আটটা।

সাইক্লোনটা দিকভ্রষ্ট হয়ে কুমিল্লার দিকে চলে গেছে; কিন্তু তার লেজুড়ের দাপটও বড় কম নয়। গলফ ক্লাব রোডের যাবতীয় বড় বড় গাছ পাগলা হাতির মতো মাথা দোলাচ্ছে। প্রভঞ্জনের বিরুদ্ধে তাদের সম্মিলিত প্রতিবাদ। পথে যান চলাচল সন্ধ্যার আগে থেকেই কমে গেছে। দু-একটি পাবলিক বাস গ্যারেজ-মুখো হবার আগে শেষ খেপ মারছে। তাদের পাদানি ঘরেফেরা মানুষে উপচীয়মান। কখনো বা রেডক্রস ছাপ মারা কোন ডাক্তারবাবু চলেছেন অপ্রতিরোধ্য অন্তিম 'কল' পেয়ে। ত্রিসীমানায় জনমানব নেই।

রাত আটটা পঁয়ত্রিশ—

গলফ ক্লাবের গেটে এসে থামল একটা মোপেড। তার কেরিয়ারে একটি প্লাস্টিকে জড়ানো ব্যাগ। আরোহীর মাথায় হেলমেট, চোখে গগলস। পরনে ওয়াটারপ্রুফ। পায়ে গামবুট। গাড়িটা গাছতলায় পার্ক করে দীর্ঘদেহী আরোহী এগিয়ে এল ক্লাবের প্রবেশদ্বারের কাছে। মজবুত নবতাল তালা ঝুলছে অলড্রপ থেকে। লোকটি এদিক-ওদিক দেখে দিয়ে হাঁকাড় পাড়ল : 'বেয়ারা! ...দারোয়ান'!

যেন ওয়ালটার ডি লা মেয়ারের সেই বিখ্যাত কবিতা : 'দ্য লিস্‌নার্স'!

প্রতিধ্বনিটাই ফিরে এল শুধু। কান পাতলে শোনা যেত রাতচর একটা প্যাঁচা তার চ্যাঁচানি থামিয়েছে। গলফ ক্লাবের অসংখ্য মেম্বারদের অনুপস্থিতিটা যেন সোচ্চার হয়ে উঠল সেই প্রতিধ্বনিতে।

আগন্তুক নিশ্চিন্ত হল : তাহলে ত্রিসীমানায় কেউ নেই।

ফিরে এল সে মোপেডের কাছে। গা দিয়ে তার জল ঝরছে। বৃষ্টিটা থেমেছে; কিন্তু ইলশেগুঁড়ির বিরাম নেই। দীর্ঘদেহী আরোহী মোপেডে উঠে আবার চলল গলফ্ ক্লাব রোড ধরে। প্রায় তিনশ মিটার এগিয়ে এসে সে আবার তার দ্বিচক্রযানকে থামালো। নেমে এল গাড়ি থেকে। পিছনের প্লাস্টিকে জড়ানো ব্যাগ থেকে কী একটা জিনিস ভরে নিল ওয়াটারপ্রুফের পকেটে। গাড়িটা লক করে এগিয়ে গেল গলফ ক্লাবের প্রাচীরের দিকে। এখানে পাঁচিল অনেকটা ভাঙা। চাপ-চাপ ইটের পিণ্ড আর অন্ধকার।

আগন্তুক ইটের ভগ্নস্তূপ ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকল। এ জায়গাটা আলো-আঁধারি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ— সি. ই. এস. সি.-কেও — এই দুর্যোগের রাত্রে এ পাড়ায় লোডশেডিং হয়নি। রাস্তায়

নিয়ন আলোর স্তিমিত উপস্থিতি। ক্লাবের গলফ কোর্স তাই নিরন্ধ্র অন্ধকার নয়। কিছু দূরে দূরে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে গাছের দল। তারা ওকে দেখছে। ক্লাবঘরের পিছন দিকে টিমটিমে বাতিটার তহবিলে কত ক্যান্ডেল-পাওয়ার মজুত তার হিসাব জানা নেই। কিন্তু মাঠের এপ্রান্তে তার অবদান যৎকিঞ্চিত। কোনক্রমে ইটের ভগ্নস্তূপ ডিঙিয়ে আগন্তুক পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল ক্লাবঘরের পিছনদিকে। মনে হচ্ছে না যে, কলকাতা শহরের চৌহদ্দির ভিতরেই আছে। ও যেন কোন্ শ্রাবস্তী-নালন্দার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এসে পড়েছে। কিছু ঝিঁঝিপোকা আর অকালবর্ষণে উৎফুল্ল দর্দুরোচ্ছ্বাস ব্যতীত প্রাণের কোন স্পন্দন নেই। লালটালির বারান্দাটা ওখান থেকে তিনশ মিটার দূরে, আর ফার্স্ট টী— সেই যেখানে অন্তিমশয়ানে লুটিয়ে পড়েছিল হতভাগ্য কালিপদ কুণ্ডু— সেটা একশ মিটার হয়-কি-না হয়।

আগন্তুকের বর্ষাতির পকেটে আছে তিন ব্যাটারির টর্চ। কিন্তু সেটা জ্বালতে ভরসা হল না। এমন বর্ষণমুখর রাতেই ফুটপাতের বাসিন্দার দল আসে ইট তুলে নিয়ে যেতে। টর্চের আলো দেখলে ওয়াচম্যান হয়তো ছুটে আসবে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ওটা কী?

হ্যাঁ, ঠিকই দেখেছে! ফার্স্ট টী-র তৃণাচ্ছাদিত প্রত্যাশিত স্থানে কে একজন বসে আছে। একটা টিনের ফোল্ডিং চেয়ার পেতে। তার পরনে বর্ষাতি, মাথায় টুপি। তার উপরে কাঁধে ছাতা। ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টিতে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। আশ্চর্য! লোকটা একেবারে নড়াচড়া করছে না। ধ্যানস্থ। নাকি ঘুমাচ্ছে? ক্লাবঘরের দিকে পিছন ফিরে। অর্থাৎ ওর মুখোমুখি। কিন্তু ছাতার আড়ালে মুখখানা দেখা যাচ্ছে না।

প্রায় পঞ্চাশ মিটার দূরত্বে পৌঁছতেই লোকটা সরব হয়ে উঠল :

—আয়েন, আয়েন। ফের্থম্ কিস্তির ট্যাহাটা আন্ছেন? বেবাক খুচরা নোটে তো? ফাঁচ হাজার তো?

আগন্তুক জবাব দিল না।

তিল তিল করে পায়ে-পায়ে এগিয়ে চলল।

দূরত্বটা ক্রমশ কমে আসছে।

—ব্যস, ব্যস! খাড়ান! আর এগুবেন না কিন্তুক!

বলল বটে, কিন্তু নিজে তিলমাত্র বিচলিত হল না। নড়লও না!

আগন্তুক বললে, সে কি খালিচরণ? তুমি না দরদামের আলোচনা করতে চেয়েছিলে? এই নির্জন মাঠে? খাতাখানা কত টাকা পেলে দেবে? ঠিক বল তো সোনা!

চেয়ারে বসা লোকটা গর্জন করে উঠল : আই সে, ডোন্ট প্রসীড ফার্দার, অর এলস্...

কথাটা তার শেষ হল না। তার আগেই গর্জে উঠল আগন্তুক : বিফোর দ্যাট টেক দিস, অ্যান্ড দিস, অ্যান্ড দিস...

কথাগুলো ভালো শোনা গেল না। কারণ প্রতিটি 'দিস'-এর সঙ্গে গর্জে উঠল ওর ডানহাতের মুঠিতে ধরা মারণাস্ত্রটা।

খণ্ডমুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল একাধিক ঘটনা।

প্রথম গুলিটা খেয়েই চেয়ারে বসা লোকটা উল্টে পড়ল চেয়ার সমেত। দ্বিতীয় আর তৃতীয় গুলিটা তার গায়ে লাগল কি না বোঝা গেল না; কিন্তু সামনের অর্জুন গাছটার ডালে ঝোলানো একটা জোরালা সার্চ-লাইট জ্বলে উঠল। আলোর বন্যায় ভেসে গেল গোটা এলাকাটা।

উল্টে-পড়া লোকটা চিৎকার করে বলল, ড্রপ দ্যাট রিভলভার অ্যান্ড পুট য়োর হ্যান্ডস আপ, মিসেস হালদার!

আশ্চর্য! উল্টে-পড়া লোকটা মরেনি!

আগন্তুক জোরালো আলোর ঝলকানিতে দুহাতে চোখ ঢেকেছিল। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল। জনমানবশূন্য গলফ কোর্সে কাউকে দেখতে পেল না।

ভূলুণ্ঠিত ঐ লোকটাই আবার বলল, মিসেস হালদার! আপনাকে চারদিক থেকে সশস্ত্র পুলিশে ঘিরে ফেলেছে। রিভালভার মাটিতে ফেলে দিয়ে দুহাত মাথার ওপর তুলুন। না হলে ফায়ারিং-এর অর্ডার দিতে বাধ্য হব কিন্তু। ওরা আপনার দুটো হাঁটুতে গুলি করবে। আপনার দুটো পা-ই অ্যাম্পুট করতে হবে!

ধীরে ধীরে পরিস্থিতিটা হৃদয়ঙ্গম করল জয়ন্তী হালদার। তিন-তিনটে বুলেট সমেত আগ্নেয়াস্ত্রটা মাটিতে ফেলে দিয়ে মাথার ওপর হাত তুলল সে। চতুর্দিক থেকে ছায়ামূর্তির দল এগিয়ে এল তৎক্ষণাৎ।

মিসেস হালদারের কৌতূহল তখনো মেটেনি। ঝুঁকে পড়ে ভূলুণ্ঠিত কালিচরণকে দেখতে গেল। ততক্ষণে ইন্সপেক্টর নিখিল দাশ পৌঁছে গেছে অকুস্থলে। সে বললে, ওটা ডামি! ওর তলপেটে লাগানো ছিল একটা লাউড-স্পীকার। লাউড অবশ্য নয়, নর্মাল ভয়েসের জন্য রিয়স্ট্যাটটা অ্যাডজাস্ট করা ছিল। সেটা ওর বুকে লাগাইনি, কারণ আশঙ্কা ছিল আপনি বুকেই গুলিটা মারবেন। দামী যন্ত্রটা খুব বাঁচিয়ে ফায়ার করেছিলেন— থ্যাঙ্কু! যা হোক, এবার আসুন, মিসেস হালদার।

অমায়িক আহ্বান শুনে মনে হতে পারে, নিখিলের হাতে বুঝি কফির কাপ অথবা থার্মস্ আপ-এর বোতল। আসলে তা নয়। নিখিল বাড়িয়ে ধরেছে একজোড়া স্টেনলেস স্টিলের বালা।

।। চোদ্দ ।।

পরদিন সন্ধ্যায় বাসুসাহেবের লনে জমায়েত হয়েছে সবাই। অনির্বাণ মুক্তি পেয়ে এসে জুটেছে। এসেছে করবীও এবং সস্ত্রীক ইন্সপেক্টর নিখিল দাশ।

রানু বললেন, আমি ভেবেছিলাম : কিংশুক।

বাসু বললেন, ঠিকই ধরেছিলে। তবে কালিপদ কুণ্ডুকে নয়। কিন্তু জোড়াখুনের দায়টা তো তারই!

জোড়া খুন! জোড়া খুন আবার হল কোথায়— জানতে চায় সুজাতা।

কৌশিক বলে, আপনে খালিচরণের চিৎফট্টাংটারেও মার্ডার বলি ধরতি ফার্লেন, মামু?

বাসু হেসে ফেলেন। বলেন, না ভাগ্নে! তা ধরিনি। ওটা বাদ দিয়েও জোড়া খুন! শোন বুঝিয়ে বলি : গোড়ায় গলদ করেছিল অনির্বাণ। কেসটা গুলিয়ে গিয়েছিল ওর একটা অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্ত অনুবাদে। কালিপদ টেলিফোনে ওকে বলেছিল পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে সে একটি 'মৃতব্যক্তির দিনলিপি হস্তান্তরিত করবে'। অনির্বাণ তার ভুল অনুবাদ করে সমস্যাটা গুলিয়ে দিল। 'মৃতব্যক্তির দিনলিপি' রাতারাতি হয়ে গেল 'ডেড ম্যানস ডায়েরি'।

কবরী প্রতিবাদ করে, ভুল অনুবাদ কোথায় হল? 'মৃতব্যক্তির দিনলিপি' তো 'ডেড ম্যানস' ডায়েরি।

বাসু ওর দিকে ফিরে হেসে বললেন, ওভাবে জেন্ডার বদলানো যায় না করবী। বয়েজ কাট চুল কাটলেই কি স্ত্রীলোক পুরুষ হয়ে যায়? 'ব্যক্তি' উভলিঙ্গ শব্দ, 'ম্যান' পুংলিঙ্গ। 'ডেড-ম্যান' শুনে আমরা বারে বারে রঘুবীর সেনের কথা ভেবেছি। তিনি দিনপঞ্জিকা রাখতেন কি না এই খোঁজ করেছি। একবারও খেয়াল হয়নি, কালিপদ যে বাঈজীর আশ্রয়ে থাকত সেই মেয়েটি বেমক্কা খুন হয়ে গিয়েছিল। কালিপদকে পুলিসে ধরে, দীর্ঘদিন তাকে হাজতবাস করতে হয়। কালিপদর বিরুদ্ধে হত্যামামলা শেষ পর্যন্ত টেকেনি। সে মুক্তি পেয়ে ফিরে আসে। আর ঐ বাড়িতেই আশ্রয় পায়। বাঈজীর এক সঙ্গিনী ওকে একই বাড়িতে থাকতে দেয়। বাঈজীর মৃত্যুরহস্যের কোনও কিনারা হয়নি। আমার মনে হল : এমনও তো হতে পারে যে, কালিপদ ঐ বাড়িতে ফিরে এসে মৃতা বাঈজীর একটি দিনপঞ্জিকা উদ্ধার করেছিল। তাহলে সেটাও হবে "মৃতব্যক্তির দিনপঞ্জিকা।" হয়তো তাতে এভিডেন্স আছে : কে বাঈজীকে খুন করেছিল। হয়তো বাঈজী সেই সম্ভাব্য হত্যাকারীর নাম, এবং কেন সে বাঈজীকে হত্যা করতে চাইছিল, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত রেখে গেছে দিনলিপিতে।

আমার মনে হল, এমনটা হওয়া স্বাভাবিক। —তাহলে ধরে নিতে হবে, বাঈজী লেখাপড়া জানা মেয়ে। যে পরিবেশে থাকত সেখানে সবাই অক্ষর পরিচয়হীনা। তাই ঐ দিনপঞ্জিকার প্রকৃতমূল্য কেউ বোঝেনি। হাজত থেকে ফিরে এসে কালিপদ কুণ্ডু সেটা পড়ে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারে : কে বাঈজীকে খুন করেছিল।

—সেক্ষেত্রে দিনপঞ্জিকাটা কালিপদ থানায় গিয়ে জমা দিল না কেন? বলা কঠিন। অনেকগুলি হেতু হতে পারে। প্রথমত, দু-দুবার মিথ্যা অপরাধে হাজতবাস করে এদেশের বিচার-ব্যবস্থার উপরেই তার আস্থা হারিয়ে গিয়ে থাকতে পারে। তার আশঙ্কা হয়, যেহেতু পুলিস কেসটা ইতিপূর্বেই ডিসমিস করে দিয়েছে, তাই ঐ ডায়েরির মাধ্যমে তাকে পুনরুজ্জীবিত করা যাবে না। মৃত বাঈজীর তরফে থানাকে কেউ বারে বারে তাগাদা দেবে না। উপরন্তু হয়তো থানায় ঐ ডায়েরিটা জমা দিলে কোনও অসাধু পুলিস ওটার সুযোগ নেবে। ওর সাহায্যে দিব্যি একটা ব্ল্যাকমেলিং-এর ব্যবসা ফেঁদে বসবে। দু'দুবার হাজতবাস করা কালিপদ কিছুই করতে পারবে না।

—কারণ জয়ন্তী কোনও রিস্‌ক নিতে চাননি। সন্ধ্যা সাতটায় ঐ ঘরে কিংশুক থাকতে পারে বা অন্য কেউ থাকতে পারে। তাই হয়তো কোনও অছিলায় কিংশুককে কিছু কাজে পাঠিয়ে দিলেন। নিজেও বাড়িতে থাকলেন না। ওঁর মেড-সার্ভেন্টকে নির্দেশ দিয়ে গেলেন, ঠিক সন্ধ্যা সাতটায় কেউ যদি ফোন করে তবে তাঁকে একটা বিশেষ টেলিফোন নাম্বার দিতে। সেটা ওঁর বাড়ির কাছেই একটা পাবলিক টেলিফোন বুথ। সাতটা বাজতে পাঁচে তিনি ঐ বুথে ঢুকে অপেক্ষা করেন।

করবী বলে, অনিদা 'মৃতব্যক্তি'-কে 'ডেড ম্যান' অনুবাদ করায় আপনি পাঁচ কথা শোনালেন; কিন্তু ও যে ঐ চারটে নম্বর ঠিক ঠিক মনে রাখল সেজন্য ওকে কম্‌প্লিমেন্টস দিলেন না তো?

বাসু বলেন, কারেক্ট। ঐ ওয়ান এইট থ্রি সিক্স নম্বরটা যদি ও মনে রাখতে না পারত তাহলে এ কেস কিছুতেই সলভ করা যেত না। এ কৃতিত্ব নিশ্চয়ই অনির্বাণের!

করবী বলে, অথবা বলতে পারেন, এটা ঠাকুরের করুণা।

বাসু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, অনির প্রতি ঠাকুরের অপার করুণা তো আছেই, না হলে ফাঁসির দড়ি থেকে এভাবে ফিরে আসত না। কিন্তু বেচারির প্রতি ঠাকুরানীর করুণা কি হবে না, বাইশতম জন্মদিনের পরে?

করবী দুহাতে মুখ ঢাকে।

সবাই সমস্বরে হেসে ওঠে।

কৌশিক বাদে।

সে গম্ভীর হয়ে বলে ওঠে, 'ও মা আমি কনে যাব! মামু! এডা কী কইলেন আপনে! ঠাকরানের করুণা হবেনি বলি আপনি ভাবতে ফার্লেন? ঐ দ্যাহেন! মাঠান সরমে দুইহাতে তঁইর মুখ ঢাকিসেন!'

boirboi.net

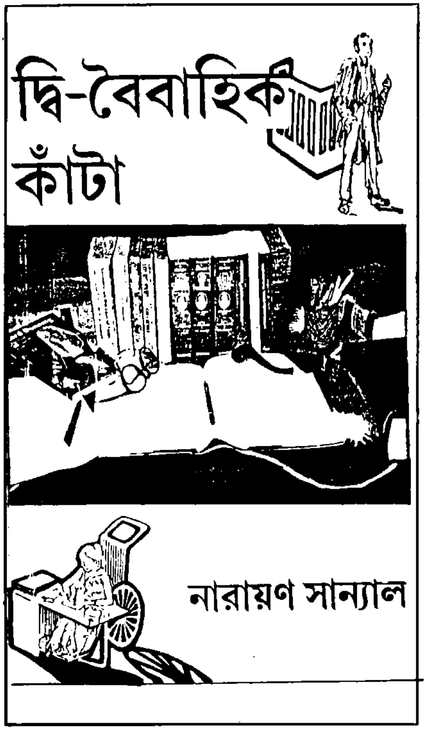

দ্বি-বৈবাহিক কাঁটা

রচনাকাল : প্রাক্‌পূজা '94

[শারদীয়া 'নবকল্লোল' '94-এ প্রকাশিত]

পুস্তকাকারে প্রকাশ : বইমেলা '95

গ্রন্থ ক্রমিক : '97

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : খালেদ চৌধুরী

প্রচ্ছদ আলোকচিত্র : প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

অলঙ্করণ : সন্দীপন ভট্টাচার্য
অলকানন্দা সেনগুপ্ত

উৎসর্গ : ডাঃ দেবাশিস কুমার রায়

।। এক ।।

ইন্টারকমে রানী দেবীর প্রশ্নটা শুনে খেপে উঠলেন বাসুসাহেব : এসব কী শুরু করেছ তোমরা? বাড়িতে 'এইচটুও গার্ড' বসানো হবে কি হবে না, 'ভ্যাকুয়াম ক্লিনার' কেনা হবে কি হবে না, তাও স্থির করবে এই বুড়োটা? কেন? তুমি আছ কী করতে? সুজাতা সারাদিন কোথায় কোথায় টো-টো করে ঘোরে? তোমরা এসব ডিসাইড করতে পার না?

রানী দেবী জবাবে বলেন, আচ্ছা আমি আসছি ও ঘরে, বুঝিয়ে বলছি ব্যাপারটা।

—বোঝাবার আবার আছেটা কী? —বাকিটা বলা হল না। তার আগেই রানী ইন্টারকমের সুইচটা অফ করে দিয়েছেন। সেলস গার্লটিকে বললেন, 'আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।' বলে তাঁর হুইলচেয়ারে পাক মেরে রানী বাসুসাহেবের খাশ কামরার দিকে এগিয়ে গেলেন।

পাঠক-পাঠিকার যে ভগ্নাংশকে এ পর্যন্ত কোনও কণ্টকাকীর্ণ কাহিনীর ঘুলঘুলিয়ায় ঘুরপাক খাওয়ার বিড়ম্বনা সইতে হয়নি তাঁদের এই পর্যায়ে কিছু কৈফিয়ৎ দিতে হয়। পি. কে. বাসু

কলকাতা হাইকোর্টের একজন প্রবীণ ব্যারিস্টার— ক্রিমিনাল লইয়ার। জনশ্রুতি, খুনের মামলায় তাঁর কোনও মক্কেলের এ পর্যন্ত কখনো ফাঁসি বা জেল হয়নি। বস্তুত সবাই বেকসুর খালাস পেয়েছে। তথ্যটা সত্য কি না এ নিয়ে মতানৈক্য আছে। তবে কলকাতা বারের প্রবীণ আইনজীবীরাও মনে করতে পারেন না, বাসু কোনও কেস হেরে বাড়ি ফিরেছেন। নিউ আলিপুরে তাঁর দ্বিতল বাড়ি। রানী দেবী ওঁর সহধর্মিণী তথা একান্তসচিব। এককালে ভাল গান গাইতেন, রান্নার হাতও খুব ভাল ছিল; কিন্তু একটি মারাত্মক দুর্ঘটনার পর সব ছেড়ে দিয়েছেন। ঐ দুর্ঘটনায় তাঁর নিম্নাঙ্গ পঙ্গু হয়ে যায়। তিনি হুইলচেয়ার ব্যবহার করে গোটা একতলাটা ঘোরাঘুরি করেন। এজন্যই একতলায় থাকতে বাধ্য হয়েছেন ব্যারিস্টার-দম্পতি। দ্বিতলে থাকে ওঁদের স্নেহধন্য কৌশিক আর সুজাতা। তারা ঐ বাড়িরই অপর অংশে একটা কনফিডেনশিয়াল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির দপ্তর খুলেছে। সোজা কথায়, প্রাইভেট গোয়েন্দা অফিস। নামকরণটা বাসুসাহেবই একদিন করে দিয়েছিলেন : "সুজাতার 'সু' আর কৌশিকের 'কৌ' বাকি 'শলী'টা 'খলু' অর্থাৎ পাদপূরণার্থে।"

রানী এ ঘরে এলেন দরজাটা ঠেলে। ডোর-ক্লোজারের অমোঘ আকর্ষণে দরজাটা আপনিই বন্ধ হয়ে গেল। রানী বললেন, তোমার কোনটা বিগড়েছে? মাথা না কান? আমি বলছি, 'ধান' তুমি শুনছ 'কান'! হাতে ওটা কী বই? ও বুঝেছি— 'এ. বি. সি. অব রিলেটিভিটি'। তাতেই এই অবস্থা।

বাসু বললেন, বাঃ! তুমিই তো বললে, একটি সেলস গার্ল এসেছে; সে নাকি বাড়ি-বাড়ি ঐ সব হাবিজাবি বিক্রি করে বেড়ায়...

—হ্যাঁ, তাই ও বিক্রি করে। কিন্তু সেই অপরাধে ওর অসুখ হলে কোনও ডাক্তারের চেম্বারে যেতে পারবে না? বিপাকে পড়লে আইনের পরামর্শ নিতে কোন উকিল-ব্যারিস্টারের চেম্বারে আসতে পারবে না?

—ও! আই সি! ক্লায়েন্ট! তা সেকথা গোড়াতে বললেই হয়! ভ্যাকুয়াম ক্লিনার-টিনার...

—বলতে তুমি দিলে কোথায়? মাঝপথেই তো ধমকে উঠলে!

—বুঝেছি, বুঝেছি। তা সেকথা তো ইন্টারকমেই বলা চলত রানু। আবার এত কষ্ট করে চাকায় পাক মেরে এঘরে চলে এলে কেন?

—তোমাকে ধমক দিতে। মেয়েটার সামনে সেটা দেওয়া শোভন হবে না বিবেচনা করে।

—আই সি! ও ভাবতো, 'কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ?' মানে ভুল অর্থে। তা কী নাম? কত বয়স? সমস্যাটা কী?

—অ্যাতক্ষণে আইনস্টাইনের চতুর্মাত্রিক জগৎ থেকে তোমার চতুষ্পদীর পরিচিত ত্রিমাত্রিক গোয়ালে নেমে এসেছ মনে হচ্ছে। ওর নাম— অপরাজিতা কর। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। কিছু বেশিও হতে পারে। তবে ত্রিশের ওপারে নয়। আর সমস্যা? ও একটা দুমড়ানো-মুচড়ানো টিসু-পেপার নিয়ে এসেছে। ও জানতে চায়, তাতে স্ট্রিকনিনের ট্রেস পাওয়া যায় কি না।

—স্ট্রিকনিন! সে তো তীব্র বিষ! কোথায় পেল মেয়েটি?

—সব কথা আমাকে বলেনি। ওর কথা শুনে আমার মনে হল, ওর আশঙ্কা : কেউ ওকে বিষ দিয়ে হত্যা করতে চাইছে।

—বধূহত্যা? স্ট্রিকনিন কি আজকাল কেরোসিনের চেয়ে সহজলভ্য?

—আরে না বাপু! বধূহত্যার কেস নয়। মেয়েটি অবিবাহিতা। ওর আশঙ্কা, ওকে বিষ খাইয়ে মারতে চেয়েছিল ওর সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবীর স্বামী!

—স্বামী? যা ব্বাবা! সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবী বিষ খাওয়াতে চাইছে শুনলে না হয় ধরে নেওয়া যেত যে, তার স্বামীর সাথেই ওর 'লটঘট'। তাইতেই...

—তুমি কি ওর কেসটা নেবে?

—নেব কি না এখনি বলতে পারছি না। তবে শুনব তো বটেই! বান্ধবীর স্বামী চুমু খেতে চাইলে তার মানে বুঝি, কিন্তু স্ট্রিকনিন খাওয়াতে চাইবে কেন? পাঠিয়ে দাও।

রানী আবার চাকা দেওয়া চেয়ারে রিসেপশনে চলে এলেন। মেয়েটি চোখ তুলে তাকালো। রং ময়লা, কিন্তু মুখশ্রী সুন্দর। আর যৌবন কানায়-কানায়। কারণ তার ফিগারটি অনিন্দ্য। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ওর চোখ দুটি। তাতে বুদ্ধির দীপ্তিও আছে, আবার অতলান্ত গভীরতার আভাসও মেলে।

রানী বলেন, মিস্টার বাসু আপনার কেসটা শুনতে চান। আসুন আপনি এ ঘরে।

মেয়েটি বললে, আমাকে 'তুমিই' বলবেন। আপনি আমার মায়ের বয়সী।

ম্লান হাসলেন রানী। যে মোটর দুর্ঘটনায় তিনি চিরজীবনের মতো পঙ্গু হয়ে গেছেন সেই দুর্ঘটনাতেই মারা গেছে মিঠু, ওঁদের একমাত্র কন্যাটি। সত্যিই, বেঁচে থাকলে সে এই অপরাজিতার বয়সীই হত বটে।

বাসু বললেন, বস মা। শুনি তোমার সমস্যাটা কী। আমার সেক্রেটারির কাছে শুনলাম—বাই দ্য ওয়ে, উনি আমার স্ত্রীও বটে। তুমি নাকি একটা টিস্যু পেপার নিয়ে এসেছ, আর জানতে চাইছ যে তাতে 'স্ট্রিকনিন'-এর হদিস পাওয়া যায় কি না।

মেয়েটি বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, সেটা প্রাথমিক পর্যায়ের সমস্যা। আমার মূল সমস্যাটা আরও গভীরে।

—হ্যাঁ, সেকথার আভাসও পেয়েছি। তোমার প্রিয়তমা বান্ধবীর স্বামীকেই তুমি নাকি সন্দেহ করছ। কেন? হেতুটা কী?

—তাহলে আপনাকে গোড়া থেকে সব কথা খুলে বলতে হয়। অনেকটা সময় লাগবে।

—কিন্তু তাই বলতেই তো তুমি এসেছ, মা। সময় লাগুক। সব কথা খুলে বল। কেমিস্ট যদি রাসায়নিক পরীক্ষা করে জানান যে ওতে স্ট্রিকনিনের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি, তাহলেই কি তোমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?

মেয়েটি নড়েচড়ে বসল। বলল, আজ্ঞে না। তা যাবে না। আমার সমস্যাটা বড় বিচিত্র! প্রায়

অবিশ্বাস্য! তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি; কিন্তু আপনাকে... মানে... আমাকে কী পরিমাণ...

—না, না, এমন একটা বিচিত্র গল্প শোনানোর জন্য কোনও ফি আমি নেব না। তোমাকে পরামর্শ দিতেও না।

—না, না, তা কেন? আমার যেটুকু সাধ্য...

—দেখ মা। আমার স্ত্রীকে দেখছ তো? একটা দুর্ঘটনায় ও হুইলচেয়ারটা ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে। মোটর অ্যাকসিডেন্টে। আমিই চালাচ্ছিলাম। ঐ অ্যাকসিডেন্টে আমাদের একমাত্র মেয়েটি মারা যায়। থাকলে, সে আজ তোমার বয়সী হত। কার জন্য টাকা রোজগার করব? টাকার কথা ভেব না। বল, কী তোমার সমস্যা?

অপরাজিতা উঠে এসে দুজনকে প্রণাম করল। তারপর শুরু করল তার দীর্ঘ জবানবন্দি—

অপরাজিতা কর শৈশবেই মাতৃহীনা। ওর বাবা দ্বিতীয়বার যখন বিবাহ করেন তখন ওর বয়স বছরখানেক। দিদিমার কোলেই ও মানুষ। বাবা অথবা বৈমাত্রেয় ভাইদের সঙ্গে ওর যোগাযোগ নেই। দাদামশায়ের আর্থিক সাহায্যে সে পড়াশুনা শেষ করে। ও যে বছর বি. এ. পাস করে সেই বছরেই ওর দাদামশাই মারা যান। দিদিমা গেছেন তার আগেই। এই সময়েও একটি মালটিন্যাশনাল কোম্পানিতে সেলস গার্লের চাকরি পায়। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সুনাম অর্জন করে। প্রমোশন পায় 'এস. এস. পি.এন.' পদে। অর্থাৎ 'সুপারভাইজার অব সেলস পার্সন্স, নর্থ, ওর অধীনে দশজন মহিলা কাজ করেন— শ্যামবাজার থেকে উত্তরমুখো বারাসাত, ব্যারাকপুর, বেলুড় পর্যন্ত। ওদের কোম্পানি দুটি প্রোডাক্ট এখন বিক্রি করার দিকে জোর দিয়েছে। প্রথমত 'এইচটুও-গার্ড', দ্বিতীয়ত ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। প্রথমটিতে পানীয় জল বিশুদ্ধ করা যায়, দ্বিতীয়টিতে ঘরদোর আসবাবপত্র। প্রতি সপ্তাহে ওর বস 'ক্যুরিয়ার সার্ভিস'-এ পনের দিনের আগাম একটি তালিকা পাঠিয়ে দেন : সম্ভাব্য ক্রেতার। ওর এলাকায় যেসব পরিবারের মোট উপার্জন একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার ঊর্ধ্বে, যারা আধুনিক মনোভাবাপন্ন...

বাসু বাধা দিয়ে বলেন, তোমার চাকরির ব্যাপারটা কি আমার পক্ষে এত বিস্তারিত জানার প্রয়োজন আছে?

—আছে, স্যার। না হলে সমস্যার ধরতাইটা আপনি ধরতে পারবেন না।

—তাহলে প্রশ্ন করি : তোমার 'বস' কী ভাবে সম্ভাব্য ক্রেতার তালিকা প্রস্তুত করেন?

মেয়েটি বললে, আমাদের সমান্তরালে, কিন্তু দুই-তিনমাস আগে আর একদল লোক বাড়ি-বাড়ি ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করে। তারা হচ্ছে মার্কেট সার্ভেয়ার। তারা বলে, 'আমরা কিছু বেচতে আসিনি, বাজারটা যাচাই করতে এসেছি।'

রানী বলেন, বুঝেছি। এই কিছুদিন আগেই আমাদের বাড়িতে এসেছিল এমন একজন। সে যে কী বেচতে চায়— টি.ভি., ফ্যান, সিঙ্গার মেশিন, না এয়ার-কন্ডিশনার সেটা বুঝতেই পারলাম না। শুধু যাবতীয় হাঁড়ির খবর জেনে খুশিমনে চলে গেল!

বাসু বলেন, যা হোক, তারপর কী হল বলে যাও।

মেয়েটি জানায় : সে সপ্তাহে দুদিন সরঞ্জাম বেচতে যায়। সোম আর শুক্র। একদিন সে ওর অধীনস্থ কোনও সেলস পার্সনকে সঙ্গে নিয়ে বের হয়— ট্রেনিং কোর্সে! অর্থাৎ তাকে তালিম দিতে : কী ভাবে মালটা খদ্দেরকে গছাতে হবে। আর বাকি দুদিন সে অফিসের কাজ করে। ঘরে বসেই। অথবা আগের আগের খদ্দেরদের সঙ্গে ফলো-আপ অ্যাকশনে দেখা করতে যায়। বাকি দুদিন— শনি ও রবি— ওর ছুটি।

বছর দেড়েক আগে ওর দাদামশাই মারা যান। মামাদের সংসারে ও থাকতে ইচ্ছুক ছিল না। ঐ সময়ে ওর বান্ধবী নির্মলা ওকে পেয়িং গেস্ট হিসাবে তার সংসারে রাখতে চায়। নির্মলা বাসু ছিল কলেজে ওর সহপাঠিনী, ঘনিষ্ঠতমা বান্ধবী। পরে বছর দুয়েক হল সুশোভন রায়কে বিয়ে করে এখন ও নির্মলা রায়। ওরা বিরাটিতে একটা বাড়ি করেছে। তিনতলা ফাউন্ডেশন, কিন্তু শুধু একতলা শেষ হয়েছে। একতলায় চারখানা বেডরুম। তার একটি— সংলগ্ন টয়লেট-সহ— সে অপরাজিতাকে ছেড়ে দিয়েছে। সামান্য ভাড়ায়। বাস্তবে সুশোভনের যা রোজগার তাতে নির্মলার পক্ষে পেয়িং গেস্ট রাখার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ওর বিজনেসটা এমন বেয়াড়া ধরনের যে, মাসের মধ্যে পনেরো দিন তাকে বাইরে বাইরে কাটাতে হয়। নির্মলার এখনো কোনও ছেলেপিলে হয়নি। টি.ভি. দেখে আর বই পড়ে পড়ে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এদিকে অপরাজিতাও গ্রেটার ক্যালকাটার উত্তরাঞ্চলে একটা নিরাপদ মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজছিল। ফলে দুপক্ষই এক কথাতে রাজি হয়ে যায়। তাছাড়া কোম্পানি অপরাজিতাকে একটা টেলিফোন দিয়েছে। একটা স্ট্যান্ডার্ড-হেরাল্ড গাড়িও দিয়েছে। এসবের যাবতীয় খরচ কোম্পানির। সুশোভনের গাড়ি আছে বটে, তবে টেলিফোন কানেকশন পায়নি। অপরাজিতা আসাতে ওদের খুব সুবিধা হয়েছে। টেলিফোনটা রাখা আছে ডাইনিং হলে। ফলে অপরাজিতা নিজের ঘর তালাবন্ধ করে গেলেও নির্মলার ফোন করতে বা ফোন ধরতে অসুবিধা হয় না। তাছাড়া সুশোভন মারুতি সুজুকি গাড়িটা নিজের ব্যবসায়ের কাজেই ব্যবহার করে। নির্মলা ড্রাইভিং জানে না। তার গাড়ি চড়াই হয় না। ফলে, অপরাজিতার গাড়িটা আসায় তার খুব সুবিধা হয়েছে। তিনতলার ফাউন্ডেশন বলে সুশোভন তিনটে গ্যারেজ বানিয়েছে। সেদিক থেকে অসুবিধা নেই।

বাসু বললেন, সুশোভনের ব্যবসা তো বেশ জোরদার মনে হচ্ছে। এদিকে তিনতলা ফাউন্ডেশনের বাড়ির একতলা তুলে ফেলেছে, ওদিকে আবার তারই মধ্যে মারুতি সুজুকি গাড়িও কিনেছে। কী করে সে? মন্ত্রী-টন্ত্রী নাকি?

—সেটা স্যার রহস্যের আর একটা দিক। ওর যে কীসের ব্যবসা তা নির্মলাও জানে না। তবে প্রচুর ঘুরতে হয় সুশোভনকে।

বাসু বলেন, তারপর?

অপরাজিতা বলে, গত বছর সাতাশে ডিসেম্বর, সোমবার, ক্যুরিয়ারের ডাকে পঞ্চান্নটা নামের একটি লিস্ট পাই। আমি সেটা থেকে আর একটি লিস্ট বানাই। আমার অধীনের দশজনকে পাঁচটি করে নাম-ঠিকানা দিই, আর নিজের জন্য পাঁচটি নাম রাখি। ঐ সঙ্গে আমার ডায়েরিতে আমার নিজের নামে সংরক্ষিত ক্রেতাদের নাম-ঠিকানা লিখে রাখি। ডায়েরিটা

আমার অ্যাটাচি কেসে তালাবন্ধ ছিল কিন্তু টাইপ করা লিস্ট যেটা তৈরি করেছিলাম সেটা আমার টেবিলেই কাগজ চাপা দিয়ে রাখা ছিল। তারপর আমি কাজে বের হয়ে যাই। ঘর তালাবন্ধ ছিল না। সন্ধ্যায় ফিরে এসে লিস্টটা নিয়ে দশটি পৃথক চিঠি টাইপ করতে বসি— প্রত্যেকটি সেলস পার্সনকে তার নির্দিষ্ট সম্ভাব্য ক্রেতার নাম-ঠিকানা জানাতে। সচরাচর রাত্রে টাইপ করে পরদিন পাড়ার এক ক্যুরিয়ার সার্ভিসে খামগুলি দিয়ে আসি। কিন্তু টাইপ করতে বসে আমার মনে হল, কাগজ চাপার নিচে আমি যে টাইপ করা লিস্টটা রেখে গেছিলাম এটা সেটা নয়। কারণ মুখার্জি, চ্যাটার্জি, ব্যানার্জি ইত্যাদি বানান আমি বরাবর 'ডবল-ই' দিয়ে লিখি বা টাইপ করি। আমার বেশ মনে আছে, এখানেও তাই করেছিলাম। অথচ এখন দেখছি 'ডবল-ই'র বদলে 'আই' ছাপা রয়েছে। কেউ নিশ্চয় ওটা আবার নতুন করে টাইপ করেছে। কে হতে পারে? নির্মলা বা সুশোভন ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, কী উদ্দেশ্যে এটা করা হয়েছে? যা হোক, আমি কাউকেই কিছু বলিনি। অ্যাটাচি কেস খুলে ডায়েরি বার করতে গিয়ে দেখি, প্রথমবার আমি কার্বন রেখে টাইপ করেছিলাম, সেটা আমার খেয়াল ছিল না। অ্যাটাচি কেসে সেই অফিস কপিটা আছে। দুটো লিস্ট মিলিয়ে দেখলাম 'Mukherjee-Mukherji' বানানগুলি শুধু নয়, আর একটি মারাত্মক পরিবর্তনও করা হয়েছে। আমার নিজের জন্য নির্দিষ্ট একটি নাম— যেখানে গত শুক্রবারে আমার যাবার কথা ছিল, সেই নাম-ঠিকানা আমার একজন কর্মচারীকে দেওয়া হয়েছে, তার বদলে কর্মচারীর জন্য নির্দিষ্ট একটি নাম-ঠিকানা— আমার তালিকায় পরিবর্তন করা হয়েছে। আমি ডায়েরিতেও দেখলাম লেখা আছে, শুক্রবার সাত তারিখে সকালে আমার যাবার কথা ছিল মিসেস শর্মিষ্ঠা পালের কাছে, বারাসাতে। মিস্টার পরেশচন্দ্র পালের স্ত্রী তিনি। আমার নিজের টাইপ করা চিঠির অফিস কপিতেও তাই লেখা আছে। অথচ পরিবর্তিত টাইপ-করা লিস্টে ঐ নাম-ঠিকানা দেওয়া হয়েছে আর একজনকে।

নিজের অজান্তেই রানী দেবী কৌতূহলবশে প্রশ্ন করে বসেন, কে এটা করতে পারে? কেনই বা করবে?

বাসু বলেন, কে করেছে বলা যাবে না, কিন্তু কেন করেছে তা আন্দাজ করা যায়। সে চায় না— অপরাজিতা শর্মিষ্ঠা পালের বাড়িতে যাক।

মেয়েটি বললে, একজ্যাক্টলি! কিন্তু তার হেতুটা একশ বছর ধরে চিন্তা করলেও আপনি আন্দাজ করতে পারবেন না।

বাসু গম্ভীরভাবে বললেন, অতটা সময় আমার হাতে নেই মা, কিন্তু এটুকু আন্দাজ করছি, গত শুক্রবার, সাতই জানুয়ারি, হেতুটা তুমি নিজে বুঝতে পেরেছ।

—তা পেরেছি! শুনুন বলি। আমি কাউকে কিছু বলিনি। দশজনকে দশটা চিঠি ক্যুরিয়ারে ছেড়ে এলাম। শর্মিষ্ঠা পালের নাম কাউকেই না দিয়ে। পাঁচই জানুয়ারি, বুধবার সুশোভন ট্যুরে বেরিয়ে গেল। বলে গেল, দিন পনের পরে ফিরবে। আমি সাত তারিখ, শুক্রবার সকালে নিজের গাড়ি নিয়ে চলে গেলাম বারাসাতে, শর্মিষ্ঠা পালের ঠিকানায়। বেল বাজাতে দরজা খুলে দিলেন মিসেস পাল স্বয়ং। আমাকে বসতে বললেন, আমি ওঁর সঙ্গে 'এইচটুও গার্ড'-এর

প্রয়োজনীয়তা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলাপ করতে থাকি। কলের জলে বৃহত্তর কলকাতায় সর্বত্র আন্ত্রিক রোগ বৃদ্ধি পাওয়ায়— শুনতে খারাপ লাগবে আপনাদের— আমাদের কিন্তু ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে উঠছে। ভদ্রমহিলা আমাদের লিটারেচার, টেস্ট রিপোর্ট ইত্যাদি খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন। বেলা তখন এগারোটা। এই সময় স্কুলের পোশাক পরে ফিরে এল ওঁর ছেলেটি— বছর সাতেক বয়স। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সুশোভনের সঙ্গে তার আশ্চর্য সাদৃশ্য। আমি ছেলেটিকে কাছে ডেকে নিয়ে আলাপ করলাম। ভাব জমালাম। বাচ্চাদের জন্য কিছু টফি সবসময় থাকে আমার ভ্যানিটি ব্যাগে। ওকে জিজ্ঞেস করলাম— মামুলি প্রশ্ন। তোমাকে কে বেশি ভালবাসে? মা না বাবা?

ছেলেটি জবাব দিল না। মাকে বলল, মা, তোমাদের দুজনের ছবিটা কোথায় গেল?

মিসেস পাল বললেন, কাল তোমার বাবা ঝাড়পোঁছ করতে গিয়ে ছবির কাচটা ভেঙে ফেলেছে, সোনা। আমি সরিয়ে রেখেছি।

—ছবিটা তুমি নিয়ে এস, মা। আমি আন্টিকে দেখাব।

ওর মা বললেন, 'আন্টি তো তোমার বাবার ছবি দেখতে চাননি, জানতে চেয়েছেন কে বেশি ভালবাসে।' বাচ্চাটা কিছুতেই শুনবে না। তার আবদারে ভদ্রমহিলা শেষ পর্যন্ত পাশের ঘর থেকে ফাটা কাচ, বাঁধানো ফটোখানা নিয়ে এলেন। বছর সাত-আট আগেকার ছবি। বিয়ের পর কোনও স্টুডিওতে তোলা। আমার মনে হল ঐ ছবির বর যদি সুশোভন রায় না হয় তাহলে নির্ঘাৎ যমজ ভাই! কিন্তু আমি কোনক্রমে মুখের একটি পেশীকেও বিশ্বাসঘাতকতা করতে দিলাম না। ওঁর স্বামী যে আমার পরিচিত, আমরা একই ছাদের তলায় থাকি, এটা উনি বুঝতেই পারেননি।

আরও মিনিট পাঁচেক কথাবার্তা চালিয়ে আমি বিদায় নিলাম। উনি বললেন, ওঁর স্বামীর সঙ্গে ব্যাপারটা শনি-রবিবারের মধ্যে আলোচনা করে রাখবেন। উনি আমাকে সোমবার অর্থাৎ আজ রাত সাড়ে-আটটা নাগাদ একবার ওঁর বাড়িতে যেতে বললেন।

—তা তুমি কী স্থির করেছ? যাবে, না না?

—আমাকে যেতেই হবে। না হলে সুশোভন বুঝে ফেলবে আমি ওর গোপন ব্যাপারটা জানতে পেরেছি। ও আমাকে খুন করে ছাড়বে।

—বুঝলাম। এবার তাহলে এই স্ট্রিকনিন টিস্যু কাগজের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল।

অপরাজিতা বলে, পরদিন, শনিবার সকালে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে সুশোভন ট্যুর থেকে ফিরে এল। বলল, ওর কাজ হল না। পার্টি 'এমার্জেন্সি-কলে' দিল্লি চলে গেছে। নির্মলা তো খুব খুশি। মাংস আনালো। ফ্রায়েড রাইস বানালো। ডিনারের আগে সুশোভন রোজই ড্রিংক করে। নির্মলা মাঝে মাঝে সঙ্গ দেয়। আমি ড্রিংক করতে চাই না। তবু সঙ্গ দিতে সামান্য পান করতে হয়। আমরা তিনজনে তিনটি গ্লাস নিয়েছি। ড্রিংক মিশিয়ে এনেছে সুশোভন। নিজের জন্য ব্যাগপাইপার হুইস্কি অন রকস্, নির্মলার জন্য বরফ দেওয়া ব্র্যান্ডি, আর আমার জন্য জিন উইথ টনিক। কী বলব আপনাকে— প্রথম সিপটা মুখে দিয়েই আমার গা গুলিয়ে উঠল! মনে হল বেশ

তেতো! বলতে গিয়েও কি জানি কী ভেবে আমি কোনও কথা বললাম না। কেশে উঠলাম। তারপর গ্লাসটা হাতে নিয়েই আমার ঘরের সংলগ্ন বাথরুমের ওয়াশ বেসিনে থুথু ফেলতে উঠে গেলাম। মুহূর্তমধ্যে গ্লাসটা বেসিনে উবুড় করে সম পরিমাণ সাদা জল গ্লাসে নিয়ে ফিরে এলাম। সুশোভন বারে বারে আমাকে লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ বলে উঠল, এটা কেরুর ইউজুয়াল জিন নয়, একটা নতুন ব্র্যান্ড। একটু তিতকুটে স্বাদ, তাই নয়?

আমি বললাম, হ্যাঁ! এক পেগের বেশি খাব না।

তারপর আহারাদি সেরে আমরা যে যার বিছানায় শুতে গেলাম। আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, 'সুতপা-হত্যা মামলা'র কথা— স্ট্রিকনিনের স্বাদ তেতো! ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা টিস্যু পেপার নিয়ে বেসিনে যে জলটুকু লেগেছিল তা সযত্নে মুছে নিলাম। রবিবার সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে সুশোভন যেভাবে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছিল তাতে মনে হল ও যেন ম্যাকবেথের মতো ব্যাঙ্কোর ভূতকে দেখতে পাচ্ছে ডিনার টেবিলে! আমি নিজে থেকেই বললাম, কাল রাতে আমার শরীরটা খারাপ হয়েছিল। ব্রেকফাস্ট খাব না। নির্মলা আর সুশোভন অনেক পীড়াপীড়ি করল। কিন্তু টিন থেকে নিজে হাতে বার করে নেওয়া বিস্কিট আর তিনজনের-পট থেকে ঢালা চা ছাড়া আমি কিছু মুখে দিইনি। টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে আপনার নম্বর লেখা আছে,— কিন্তু টেলিফোন করতে সাহস হল না। সুশোভন হয়তো আড়ি পেতে বসে আছে। আমি রবিবারটা একটা হোটেলে কাটিয়েছি। ভেবেছিলাম রবিবারে আপনি কেস নেন না। আজ সকালেই সোজা আপনার কাছে চলে এসেছি।

বাসু বললেন, কালই তোমার আসা উচিত ছিল। যাহোক, খুব বুদ্ধিমতীর মতো কাজ করেছ। প্রথম ঐ টিস্যু পেপারটা এই খামে ভর্তি করে আঠা দিয়ে বন্ধ কর। তারপর খামের ওপর তোমার নাম-ঠিকানা আর তারিখ লিখে দাও। যেখানে খামটা বন্ধ করা হয়েছে সেই ফ্ল্যাপের ওপর আড়াআড়িভাবে তোমার নামটা আবার সই কর!

অপরাজিতা তাই করে দিল।

বাসু জানতে চাইলেন, তুমি কী স্থির করেছ? আজ সন্ধ্যাবেলা বারাসাতে শর্মিষ্ঠা পালের কাছে যাবে?

—বললাম তো, আমাকে যেতেই হবে। না হলে সুশোভন সন্দেহ করবে যে আমি সব জানতে পেরেছি।

—অলরাইট! সেখানে যদি শর্মিষ্ঠার স্বামী পরেশ পালের সঙ্গে ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে যায়...

বাধা দিয়ে অপরাজিতা বলে, হবে না। আমি বাজি রাখতে পারি। ও কিছুতেই আমার মুখোমুখি হবে না— দূরে বসে সব কিছু লক্ষ্য করবে।

বাসু বলেন, অলরাইট, শোন মন দিয়ে। প্রথম কথা : মিসেস পালের বাড়িতে তুমি কিছু খাবে না, বা পান করবে না। বলবে, তোমার একটা ব্রত আছে। সারাদিন উপবাস করছ। পূজা করে মুখে জল দেবে। দ্বিতীয় কথা : যদি ঘটনাচক্রে পরেশ পালের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে

যায়, এবং বুঝতে পার যে, সে সুশোভন রায়, তাহলে সেটা তার স্ত্রীর সামনে স্বীকারই করবে না। যেন তাকে নতুন দেখছ। তাকে বলবে : মিস্টার পাল, আপনি পি. কে. বাসু, ব্যারিস্টারের নাম শুনেছেন? আমি আজ সকালে, একটা কাজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছিলাম। কথা প্রসঙ্গে আপনার কথা উঠল। উনি বললেন, উনি আপনাকে চেনেন, ইন ফ্যাক্ট একটা কেসে আপনাকে খুঁজছেন। এই কার্ডটা রাখুন। আপনার সময় মতো তাঁকে টেলিফোন করবেন। বলে, আমার এই কার্ডটা তার হাতে ধরিয়ে দেবে। তৃতীয়ত, আজ দুপুরে বাড়িতে লাঞ্চ কর না। কিছু খেও না। বল, এক বন্ধু জোর করে খাইয়ে দিয়েছে। বাড়িতে যদি আজ সুশোভনের দেখা পাও প্রথম সুযোগেই ঐ একই কথা বলবে, আর আমার ঐ কার্ডখানা তার হাতে ধরিয়ে দেবে। বুঝলে?

—সার্টেনলি! পরেশ পাল অথবা সুশোভন রায় তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারবে অপরাজিতা করের স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক যে-কোনও ভাবে মৃত্যু হলেই পি. কে. বাসু ঝাঁপিয়ে পড়বেন। কারণ তার সব গোপন কথা আমি ছাড়াও জানেন ঐ পি. কে. বাসু। আমাকে হত্যা করলে তার কোনও লাভ হবে না। তাই নয়?

—একজ্যাক্টলি। টিস্যু পেপারে স্ট্রিকনিন থাক আর নাই থাক, তোমাকে যেটা প্রিক করছে সেটা দ্বিবৈবাহিক কাঁটা।

—'দ্বিবৈবাহিক কাঁটা!' তার মানে?

—Bigamy শব্দটার বাংলা হয়েছে দ্বি-বিবাহ। তাতে ষ্ণিক্ প্রত্যয় করে শব্দটা এই মাত্র তৈরি করলাম। অর্থাৎ দ্বিবিবাহ সম্বন্ধীয়। ব্যাকরণ থাক। অনুবাদে বুঝবে : Bigamous thorn!

মানিব্যাগ বার করে অপরাজিতা জানতে চায়, আপনাকে কী রিটেইনার দেব?

বাসু জানতে চান, রাফলি স্পিকিং, তোমার মাসিক গড় রোজগার কত?

—কেটেকুটে পে প্যাকেট যা হাতে পাই তা প্রায় তিন হাজার।

—ঠিক আছে। তুমি আমাকে অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেকে একশ টাকা দাও। যাতে মক্কেল হিসাবে তোমাকে স্বীকার করতে পারি। দ্বিতীয়ত, সাড়ে আটটার অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেরেই তুমি আমাকে যে কোনও পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে ফোন কর। না হলে রাতে আমার ঘুম আসবে না।

—আপনি বাড়িতে থাকবেন?

—না। নিউ আলিপুর থেকে ঘটনাস্থল অনেকটা দূরে। আমি রাত সাড়ে আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত থাকব দমদমের এয়ারপোর্ট হোটেলের ডাইনিং হলে। ওদের হেড স্টুয়ার্ড আমাকে খাতির করে। তাকে আমি বলে রাখব। নম্বর দু'তিনটে আছে। ডায়েরিতে টুকে রেখ।

রানী বলেন, এয়ারপোর্ট হোটেল আবার কেন? সেখানে গেলেই তো পেগের পর পেগ শিভাস রিগাল খাবে।

বাসু হেসে বললেন, শিভাস রিগাল কেউ খায় না গো, পান করে। কতবার বলেছি! কিন্তু শুনলে না, আমাদের একটা ব্রত আছে আজ? অপরাজিতাও যেমন সুশোভন রায় অথবা পরেশ

পালের বাড়িতে বিষ মেশানো জলস্পর্শ করবে না আমিও তেমনি এয়ারপোর্ট হোটেলে মদ মেশানো জল স্পর্শ করব না। 'টিটোটালার্স ডিনার' খাব আমরা দুজন— কৌশিক আর আমি। বুঝলে না? আমি বারাসাতের কাছাকাছি থাকতে চাইছি আজ রাত সাড়ে আটটায়। যাতে ফোন পেলেই প্রয়োজনে অকুস্থলে পৌঁছাতে দেরি না হয়।

।। দুই ।।

কৌশিককে নিয়ে বাসুসাহেব যখন এয়ারপোর্ট হোটেলের ডাইনিং হলে ঢুকলেন রাত তখন আটটা। হেড স্টুয়ার্ড ওঁকে দেখে এগিয়ে এল। একটা 'কার্টসি বাও' করে ইংরেজিতে বলে, এবার অনেকদিন পরে এলেন স্যার। বলুন, কী দেব? আপনার ইউজুয়াল শিভাস রিগাল?

বাসু বললেন না, বাল্‌টিমোর। আজ ড্রিংক করব না। আমরা দুজন স্রেফ ডিনার খাব— ড্রাই ডিনার; কিন্তু আমি একটা জরুরি ফোন কল আশা করছি। তাই এমন একটা জায়গায় আমাদের নিয়ে গিয়ে বসাও যেখান থেকে ফোনটা কাছে হবে। আর অপারেটরকে ব্যাপারটা জানিয়ে রেখ।

হেড স্টুয়ার্ড বললে, আপনি তাহলে ডাইনিং হলে না বসে এই কেবিনটাতে বসুন। আমি অপারেটরকে বলে রাখছি, আপনার কোন ফোন এলে কর্ডলেস টেলিফোনটা এখানে পাঠিয়ে দেবে।

—দ্যাটস ফাইন। চল, কোথায় নিয়ে যেতে চাইছ।

মেনু কার্ড দেখে উনি খাবারের অর্ডার দিলেন। সংক্ষিপ্ত তিন-কোর্সের ডিনার। যাতে প্রয়োজন হলে তাড়াতাড়ি উঠে চলে যেতে পারেন।

নটা বেজে পনের মিনিটে এল প্রথম টেলিফোন। বাসু আত্মঘোষণা করতেই ও প্রান্ত থেকে প্রশ্ন হল, তোমরা ভালভাবে পৌঁছেছ তো? অপরাজিতা কি ফোন করেছে?

—কে রানু? না। তুমি ব্যস্ত হয়ো না। ড্রিঙ্কস নিইনি আমরা। ফিরতে আমাদের রাত হতে পারে। অপরাজিতা এখনো ফোন করেনি।

তিন-কোর্সের সংক্ষিপ্ত ডিনার শেষ হল। বাসু বিল মিটিয়ে দিলেন। এর পরে বসে থাকতে হলে একটা আফটার ডিনার ড্রাই-মার্টিনি নিতেই হয়। কী করবেন স্থির করতে করতেই খিদমদগার দ্বিতীয়বার এসে হাজির হল কর্ডলেস ফোনটা নিয়ে : সাব! আপকা ফোন!

বাসু টেলিফোনটা নিয়ে আত্মঘোষণা করতেই ও প্রান্ত থেকে ভেসে এল, শুভ সন্ধ্যা স্যার। আমি অপরাজিতা বলছি।

—কোথা থেকে?

—বারাসাত থেকে মাইল চারেক দূরে দমদমের দিকে একটা পেট্রল পাম্প থেকে।

—তোমার কাজ কেমন হল?

—এভরিথিং ফাইন স্যার, কেউ কিছু সন্দেহ করেনি। মিস্টার পাল যথারীতি অনুপস্থিত। মিসেস পাল জানালেন উনি খুবই দুঃখিত, ঠিক এখনই ওঁরা 'এইচটুও গার্ড' যন্ত্রটা কিনতে পারছেন না। পরে জানাবেন বললেন।

বাসু বললেন, তোমাকে জানাবার মতো একটা খবর আছে, অপরাজিতা। আমি ইতিমধ্যে আমার বিশ্বস্ত কেমিস্টের কাছ থেকে রিপোর্ট পেয়েছি। টিস্যু পেপারে ঐ বিশেষ কেমিক্যালটার ট্রেস পাওয়া গেছে!

—গুড গড। এ রকম লোককে তো গুলি করে মেরে ফেলা উচিত!

বাসু বলেন, টেলিফোনে এসব কথা বলতে নেই।

—তা তো বলতে নেই: কিন্তু আপনি আমাকে না জানিয়ে আমার দেহরক্ষীর ব্যবস্থা করেছিলেন কেন? আমি ভীষণ ঘাবড়ে গেছিলাম প্রথমটায়, পরে আন্দাজ হল— ও হয় আপনার, না হলে সুকৌশলীর এজেন্ট।

—'ও' মানে? 'ও' কে? খুলে বলতো?

—আহা! যেন কিছুই জানেন না। যাই হোক, কৌশিকবাবুর সঙ্গে দেখা হলে বলবেন, তাঁর এজেন্ট আমাকে মাঝপথেই রুখে দিয়েছিল। তাকে নিয়েই আমি এই পেট্রল পাম্পে এসেছি। সে তার গাড়ির চাকা মেরামত করাচ্ছে। তাকে আবার সেই রায়চৌধুরী-ভিলার কাছে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরব আমি।

বাসু বলেন, বিশ্বাস কর অপরাজিতা, আমি বা সুকৌশলী কোনও এজেন্টকে বারাসাত পাঠাইনি। তুমি যদি কোনও অজানা লোককে গাড়িতে তুলে থাক তাহলে সে আমাদের লোক নয়। ইম্পস্টার! তুমি আত্মরক্ষা...

কথাটা শেষ হল না। অপরাজিতা বললে, আপনি চিন্তা করবেন না, স্যার। আমার হাতে এখন একটা রিভলভার আছে, তাতে ছয়-ছয়টা তাজা বুলেট। ঐ ইম্পসটারটির যদি বিন্দুমাত্র বেচাল দেখি তাহলে আমি তার বুকের ওপর রিভলভার ঠেকিয়ে গাড়ি থেকে নেমে যেতে বলব! আপনি চিন্তা করবেন না। ইতিমধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে। কাল সকালেই আপনার সঙ্গে দেখা করে সব কিছু বলব। টিস্যু-পেপারের রেজাল্ট যখন পজেটিভ তখন আমি রাত পোহালেই ঐ বাড়ি ছাড়ব। কোনও হোটেলে গিয়ে উঠব। তার আগে সুশোভনের হাতে আপনার কার্ডখানা ধরিয়ে দিতে হবে।

—কেন ওর বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছ তা কি তুমি নির্মলাকে বলে যেতে চাও?

—অফ কোর্স। তার স্বামী...

—না, অপরাজিতা! সুশোভন রায় তোমার নিকটতমা বান্ধবীর স্বামী নয়। আইনের চোখেও নয়। ওরা এক বিছানায় শোয়, এইমাত্র!

—বিগেমির চার্জে ম্যাক্সিমাম কত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়, স্যার?

—কাল সকাল সাড়ে দশটায় এস। এ প্রশ্নের জবাব দেব। তবে মনে রেখ, সুশোভনের সঙ্গে

দেখা হওয়া মাত্র তুমি জানিও তাকে আমি খুঁজছি। আমার কার্ডখানা ওকে ধরিয়ে দিও।

—দেব, গুড নাইট, স্যার!

—গুডনাইট! বি পাঙ্কচুয়াল। কাল আমার অনেক কাজ। ঠিক সকাল সাড়ে দশটায় আসবে।

।। তিন ।।

পরদিন সকাল দশটা পঁয়ত্রিশে ইন্টারকমে সাড়া জাগতেই বাসু সুইচ টিপে বললেন, বল রানু? অপরাজিতা এসেছে?

—না, আসেনি। তুমি কি সেই এফিডেবিটের ডিকটেশনটা এখন দেবে?

বাসু সেকথার জবাব না দিয়ে বলেন, এরা সময় রাখতে পারে না কেন? ট্র্যাফিক জ্যামের আশঙ্কা করে কিছু সময় আগে বেরুলেই পাঙ্কচুয়াল হওয়া যায়।

রানী বললেন, এটা আমার প্রশ্নের জবাব নয়। ডিকটেশনটা...

—না! —মাঝপথেই রানীকে থামিয়ে দিয়ে বাসু সুইচটা অফ করে দিলেন।

একটু পরেই কৌশিক আর সুজাতা এল। বাসু জানতে চাইলেন, কোনও সূত্র আবিষ্কৃত হল?

—না, মামু। কমপ্লিট ব্ল্যাঙ্ক! সুশোভন রায় বা পরেশ পাল চাকরি করে না। ব্যবসা যদি কিছু করে তবে তার কোনও হদিস এখনো পাওয়া যায়নি। ওরা দুজন একই লোক কি না তা হলফ করে বলা যাচ্ছে না। তবে দুজনেই বড়লোক। যে গাড়িটা চালায় তার নম্বর অভিন্ন। মারুতি সুজুকি— কোবাল্ট ব্লু রং, নম্বর WBF 2457।

—গাড়িটা কার নামে রেজিস্টার্ড?

—পরেশ পাল, বারাসাতের। মোটর ভেইকলস এবং এ. এ. ই. আই.-তে একই তথ্য।

—লোকটার পিছনে গুপ্তচর লাগাও, তিন শিফটে। প্রতিটি মুহূর্তে সে কোথায় আছে, কী করছে তা আমি জানতে চাই।

—তাতে একটাই অসুবিধা মামু, কোথা থেকে আমরা শুরু করব তা বুঝে উঠতে পারছি না। সুশোভন রায় বা পরেশ পাল কাল সন্ধ্যা থেকে নিরুদ্দেশ। তার গাড়িখানাও হাওয়া।

বাসু রানীকে এ ঘরে আসতে বললেন, অপরাজিতার বাড়িতে ফোন করতে বললেন। বেলা তখন এগারোটা। ও প্রান্তে রিঙ্গিং টোন বন্ধ হতেই রানী বলেন, অপরাজিতা আছে?

—না নেই। আপনি কে বলছেন?

—আমি ওর অফিস থেকে বলছি... ও কোথায় গেছে?... কখন?... আই সি!... লাঞ্চে ও কি বাড়িতে আসবে?... না, কোনও মেসেজ রাখার দরকার নেই। আমি আবার ফোন করব বরং!

ও প্রান্তচারিণী কোনও কথা বলার আগেই রানী টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন। বললেন,

নির্মলা ধরেছিল। অপরাজিতা খুব সকালে কাউকে কিছু না বলে নিজের গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে। কোথায় গেছে তা নির্মলা জানে না। দুপুরে বাড়িতে খেতে আসবে কি না তাও জানা নেই।

বাসু বলেন, কোথায় গেল মেয়েটা!

ঠিক তখনি কলিং বেল বেজে উঠল। কৌশিক বলল, আমি দেখছি। বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। পরমুহূর্তেই ফিরে এল। সঙ্গে অপরাজিতা কর। একরাত্রেই যেন তার ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে। বাসু বললেন, তুমি ঐ সোফাটাতে বস অপরাজিতা। সুকৌশলী দম্পতিকে বললেন, তোমার দুজন যাও। তবে নিজেদের অফিসে থেকো। অপরাজিতার কথা শোনার পর তোমাদের ডাকব।

রানী দেবী অবশ্য থেকে গেলেন। বাসু জানতে চান, কী হয়েছে, অপরাজিতা? কাল রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত তো তুমি ভালই ছিলে! রাত্রে কি সুশোভন আচমকা ট্যুর থেকে বাড়ি ফিরে এসেছে?

মেয়েটি দুদিকে মাথা নেড়ে জানালো, তা হয়নি। কথা বলতে গিয়ে ওর ঠোঁট দুটো কেঁপে গেল। তবু মুখ নিচু করেই কোনক্রমে বললে, সুশোভন আর কোনদিনই ট্যুর থেকে বাড়ি ফিরে আসবে না। সে বেঁচে নেই।

—বেঁচে নেই! কে বেঁচে নেই? সুশোভন রায়?

ওপর নিচে শিরশ্চালন করে অপরাজিতা স্বীকার করে।

—তুমি কেমন করে জানলে যে, সে বেঁচে নেই?

—আমি তার মৃতদেহ স্বচক্ষে দেখেছি।

—কখন? কোথায়?

—প্রায় দু ঘণ্টা আগে। বেলা নটা নাগাদ। রায়চৌধুরী ভিলার গেটের পাশে, একটা ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর।

রানী বলেন, কী বলছ তুমি, অপরাজিতা? এই তো পাঁচ মিনিটও হয়নি আমি টেলিফোনে নির্মলার সঙ্গে কথা বললাম—

—ও জানে না। কেউই এখনো কিছু জানে না। সুশোভন খুন হয়েছে।

—কেমন করে জানলে ও খুন হয়েছে?

—ওর বুকে বুলেটের দাগ। রক্তে জায়গাটা ভেসে গেছে...

বাসু বললেন, তুমি মুখ নিচু করে কথা বলছ কেন? আমার দিকে তাকাও দেখি?

অপরাজিতা ওঁর চোখে চোখে তাকালো।

বাসু বললেন, কাল টেলিফোনে তুমি বলেছিলে, তোমার হাতে একটা রিভলভার ছিল। তুমিই কি আত্মরক্ষা করতে ওকে গুলিটা করেছ? নাউ বিফোর য়ু আনসার— মনে রেখ, আমি তোমার সলিসিটর, রানী আমার সেক্রেটারি। এ কনফেশনে তোমার কোনও ভয় নেই!

ওঁর চোখে চোখ রেখে অপরাজিতা বলল, না! আমি গুলি করিনি।

—তুমি এখনি বললে, রায়চৌধুরী ভিলার গেটের পাশে মৃতদেহটা দেখেছ। সাতসকালে উঠে তুমি হঠাৎ সেই রায়চৌধুরী ভিলায় কেন গিয়েছিলে?

—আমি ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাছে সেই ডিটেকটিভটির খোঁজ নিতে গেছিলাম, যে লোকটা কাল রাত্রে আমাকে ঐ লোডেড রিভলভারটা গছিয়ে দিয়েছিল।

বাসু রানী দেবীকে ইঙ্গিত করলেন। রানী নোটবইটা তুলে নিলেন হাতে। বাসু বললেন, তুমি পরপর সব কথা বলে যাও তো মা। শর্মিষ্ঠা পালের বাড়িতে যাওয়া থেকে। ভাল কথা, সেই ফটোটা দেওয়ালে ছিল?

—ছিল। কাচটা এই কয়দিনের মধ্যে মেরামত করানো হয়েছে। বুঝতেই পারছেন, সুশোভন ওটা বাইরের ঘর থেকে সরিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যেই বৃহস্পতিবারে ছবির কাচটা ভেঙে ফেলে। পরে যখন শোনে যে, তা সত্ত্বেও আমি ওর ফটোটা দেখেছি তখন ও কাচটা মেরামত করে ছবিটা আবার টাঙায়।

—অলরাইট। ছবিটা স্ব-স্থানে ছিল। মিসেস পাল তোমাকে জানালেন যে, ওঁরা এখন ঐ ওয়াটার পিউরিফায়ার কিনতে পারছেন না। তারপর তুমি রাত নটা নাগাদ বেরিয়ে এলে। তারপর কী হল বল?

অপরাজিতা তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা গুছিয়ে বলে :

প্রথম কথা— শর্মিষ্ঠা পালের বাড়ির কাছাকাছি, যাবার পথে, প্রায় পঞ্চাশ মিটার দূরে একটা ফিয়েট গাড়িকে পার্ক করা অবস্থায় দেখি। গাড়িতে লোক ছিল না। এ কথা কেন বলছি, তা একটু পরে বুঝিয়ে বলব। গাড়িটার নম্বর 1757; নম্বরটা আমার মনে থাকার কথা নয়, মনে আছে এজন্য যে, বি. এ.-তে আমার ইতিহাসে অনার্স ছিল, আর ঐ সালটা হচ্ছে পলাশীর যুদ্ধের চিহ্নিত বৎসর। সে যাই হোক, মিসেস পালের বাড়ি থেকে আমি রওনা হই পৌনে নটায়। ফেরার সময় গাড়িটা ওখানে আছে কি না আমি নজর করে দেখিনি। সেটার কথা আমার মনেও ছিল না। বারাসাত থেকে আমি দমদমের দিকে ফিরতে থাকি। মিসেস পালের বাড়িটা ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার ভিতরে। সে রাস্তাটা বেশ নির্জন। তবে চওড়া রাস্তা। ঐ রাস্তাটা যেখানে ন্যাশনাল হাইওয়েতে পড়েছে সেই জংশনেই ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বিরাট বাগানবাড়ি। ইন্দ্রনারায়ণ ঐ অঞ্চলের একজন বিখ্যাত লোক— কোটিপতি ব্যবসাদার। তবে ওঁর ব্যবসা, কারখানা পশ্চিমবঙ্গে নয়। মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে, কর্নাটকে। তবু বছরে তিন-চার বার উনি এই বাগানবাড়িতে এসে ওঠেন।

আমি যখন হাইওয়ে থেকে দুশো মিটার দূরে তখন দেখি একজন লোক মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে আমাকে থামতে বলছে। দুহাত তুলে চিৎকার করছে। হেডলাইটের আলোয় দেখলাম, লোকটার বয়স বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ, পরনে জীনস প্যান্ট, ঊর্ধ্বাঙ্গে কোট-টাই, সোয়েটার। ভদ্র চেহারা। গুণ্ডা-গোছের নয়। আমি গাড়ি সাইড করে থামালাম। আমার গাড়ির চারটে কাচই সম্পূর্ণ ওঠানো ছিল। পাশের কাচখানা একটু নামিয়ে বললাম, কী চান?

ভদ্রলোক জানলার কাছে সরে এল। বলল, সে ইন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তাঁর সঙ্গে ওর কী যেন বিজনেস অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। ইন্দ্রনারায়ণের আজ দুপুরে মুম্বাই থেকে ফেরার কথা ছিল। কিন্তু ওঁর প্লেনটা ক্যানসেল হয়ে গেছে। উনি মাঝরাতে হয়তো দমদমে পৌঁছবেন। এদিকে দুর্ভাগ্যবশত ওর গাড়ির একটা টায়ার পাঙ্কচার হয়ে গেছে। স্টেপনিতে যে টায়ার আছে সেটাও জখম। ও আমাকে অনুরোধ করল ওকে হাইওয়ের পেট্রল পাম্প পর্যন্ত লিফট দিতে। তাহলে ও টায়ার-টিউবটা মেরামত করিয়ে আনতে পারে। কিন্তু এসব রাস্তায়, আজকাল মস্তানদের দারুণ দৌরাত্ম্য। পুলিশ-মস্তান-রাজনৈতিক নেতাদের ত্রিকোণ আঁতাতের কথা সবাই জানে। আমি রাজি হতে পারি না। ও আমার বিশ্বাস উৎপাদন করতে ওর গাড়ির দিকে টর্চের আলো ফেলে দেখালো। দেখলাম, পিছনের ডিকিটা ওঠানো, পিছনের একটা টায়ার একেবারে বসে গেছে। আর ঐ সঙ্গে নজর হল ফিয়াট গাড়িটার নম্বর : পলাশীর যুদ্ধ! আমার মনে হল, এ আপনাদের এজেন্ট। আপনার অথবা সুকৌশলীর। সে জন্যই ও মিসেস পালের বাড়ির কাছাকাছি এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। আমি ওকে সরাসরি প্রশ্ন করলাম, আপনি পি. কে. বাসু, বার-অ্যাট-ল'র নাম শুনেছেন?

ও বললে, নিশ্চয়ই। তাঁকে কে না চেনে? তবে চাক্ষুষ কখনো দেখিনি বা আলাপ-পরিচয় নেই। হঠাৎ একথা কেন?

আমি বললাম, তিনি আমার গার্জেন। তিনি আমাকে পরামর্শ দিয়ে রেখেছেন, শহরের বাইরে, রাত্রে বিশেষত নির্জন রাস্তায় কোনও অপরিচিত লোককে গাড়িতে লিফট না দিতে। আয়াম সরি।

লোকটি বললে, তিনি পণ্ডিতের মতোই সুপরামর্শ দিয়েছেন। কারেক্ট, ভেরি কারেক্ট। এটা শহরের বাইরে, রাত্রিকাল এবং নির্জন রাস্তা। নাউ দিস ইজ মাই অ্যানসার! এবার কী বলবেন?

কোথাও কিছু নেই, সে কাচের ফাঁক দিয়ে একটা লোডেড রিভলভার আমার কোলের উপর ফেলে দিল। বলল, এখন আপনি সশস্ত্র, আমি নিরস্ত্র! আমি, কোনও বাঁদরামো করলেই আপনি গুলি চালাবেন। হল তো? এবার দরজাটা খুলুন। আমি জখম টায়ারটা নিয়ে আসি।

বাসু বললেন, জাস্ট এ মিনিট। ওটা লোডেড রিভলভার তা কী করে বুঝলে?

—আমি চেম্বারটা খুলে দেখলাম। ছয়টা ফোকরে ছয়টা বুলেট ভরা আছে!

—কিন্তু ছটাই যে ব্ল্যাঙ্ক কার্টিজ নয়, বা এক্সপেন্ডেড কাট্রিজ নয়, তা তুমি কী করে বুঝলে?

একটু চিন্তা করে অপরাজিতা বললে, আয়াম সরি, স্যার, এসব সম্ভাবনার আশঙ্কা আমার আদৌ হয়নি! বোধহয় আমি তখনো বিশ্বাস করছিলাম ও আপনাদের লোক, না হলে আমার কোলে ওভাবে রিভলভারটা ফেলে দেবে কোন সাহসে? তা কেউ কখনো দেয়? অজানা-অচেনা মানুষকে — যে ইচ্ছে করলেই গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যেতে পারে! গুলি করতে পারে?

বাসু বলেন, বয়স বললে বছর ত্রিশ, দেখতে কেমন?

—ভালই, আই মিন সুন্দরই। কেন বলুন তো?

—যা হোক, তারপর কী হল বল?

অপরাজিতা জানায়, লোকটা কোন রকম অসভ্যতা করেনি। যেখানে লোকটাকে গাড়িতে তুলে নিয়েছিল সেখান থেকে ন্যাশনাল হাইওয়ের পেট্রল পাম্পের দূরত্ব প্রায় সাত কিলোমিটার। লোকটাকে ও পেট্রল পাম্পে নামিয়ে দিল। পাশেই ছিল একটা টায়ার মেরামতের দোকান। লোকটা যখন টায়ার-টিউব মেরামত করতে ব্যস্ত তখন সুযোগ বুঝে অপরাজিতা বাসুসাহেবকে ফোনটা করে। এয়ারপোর্ট হোটেলের ডাইনিং হলে। তারপর মেরামত-করা টায়ার-টিউব নিয়ে ওরা ফিরে যায় রায়চৌধুরী ভিলার পাশ দিয়ে সেই 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রাঙ্গণে। অপরাজিতা তার গাড়ির হেডলাইটটা ফেলে ওকে সাহায্য করে টায়ারটা বদলাতে। সব কিছু মিটে গেলে ছেলেটি বললে, কী আশ্চর্য দেখুন, যদিও আধঘণ্টা আগে পথ বন্ধনহীন গ্রন্থী বেঁধে দিয়েছে, তবু আমরা এখনো পরস্পরের নাম জানি না।

অপরাজিতা তখন তার গাড়ির ভেতর। দরজাটা লক করা। কাচ অল্প নামিয়ে কথা হচ্ছে। ওর তখনো দৃঢ় ধারণা যে, লোকটা বাসুসাহেবের এজেন্ট, অথবা কৌশিকদার। ওর কাছে নামটা অনায়াসেই জানা যেতে পারে। তাই কৌতুক করে বললে, এমনটাই তো হয় জীবনে— 'অন্য মনে চলি পথে, ভুলিনে কি ফুল? ভুলিনে কি তারা?'

ছেলেটি বললে, তবু আপনার নামটা...

অপরাজিতা কৌতুক করে বললে, 'অপরাজিতা গুপ্তা।'

ছেলেটি মিষ্টি হেসে বললে, আপনি 'গুপ্তা'? আমি আবার আপনার 'দাস' : অপ্রকাশ দাস। চলি? গুড নাইট!

দুজনে একের পিছে এক গাড়িতে স্টার্ট নেয়। অপ্রকাশ ন্যাশনাল হাইওয়েতে পড়ে বাঁদিকে মোড় নেয় বারাসাতের দিকে; অপরাজিতা ডানদিকে মোড় নিয়ে ফিরে আসে বিরাটিতে। গাড়িটা গ্যারেজে ঢোকাতে গিয়ে হঠাৎ নজর হল : কী সর্বনাশ! ওর পাশের সিটে পড়ে আছে সেই রিভলভারটা। সেটাকে অ্যাটাচি কেসে ভরে নিয়ে ও ফিরে আসে বাড়িতে। নির্মলাকে বলে, প্রচণ্ড মাথা ধরেছে, আমি আর কিছু খাব নারে। শুতে যাচ্ছি!

নির্মলা খপ করে ওর হাতখানা চেপে ধরে বলে, কী হয়েছে বল তো?

—হয়েছে! মানে? কার?

—তোর! শুধু তোর একার নয়, সুশোভনের! তোরা দুজন কি আমাকে লুকিয়ে প্রেম-মহব্বতের খেল খেলছিস?

বাসু বলেন, তখন তুমি সব কথা খুলে বললে তোমার বান্ধবীকে?

—আজ্ঞে না, সব কথা বলিনি, সুশোভনের সঙ্গে আমার যে কোনও অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, একথা ওকে জোর দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করি। ও হয়তো মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে পারে না। কেন এত রাত হল বোঝাবার জন্য সন্ধ্যার বিচিত্র অভিজ্ঞতাটা বিস্তারিত জানাই। মাঝরাস্তায় একটি ছেলে আমাকে কীভাবে আটকেছিল তাই থেকে শুরু করে তার রিভলভার

ফেলে যাওয়া। নির্মলা বিশ্বাস করে না। বলে, কই দেখি যন্ত্রটা?

অপরাজিতা তার অ্যাটাচি কেস খুলে রিভলভারটা দেখায়। চেম্বারটাও খুলে দেখায়, তাতে পরপর ছয়টা বুলেট সাজানো। নির্মলা কেমন যেন অবাক হয়ে যায়। কী যেন সে ভাবছিল। তারপর হঠাৎ নিজের ঘরে চলে যায়। দোর বন্ধ করে দেয়।

ওর এই ভাবান্তরের কোনও অর্থ খুঁজে পায় না অপরাজিতা। সেও জামাকাপড় ছেড়ে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ে। স্থির করে কাল খুব ভোরে উঠে রায়চৌধুরী ভিলায় চলে যাবে। রাত্রে ইন্দ্রনারায়ণ মুম্বাই থেকে নিশ্চয় ফিরে এসেছেন, তাঁর কাছ থেকে জানা যাবে, গতকাল সন্ধ্যায় কার সঙ্গে তাঁর বিজনেস অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। সারে দশটায় বাসুসাহেবের চেম্বারে ওর দেখা করার কথা। সেটা অনেক দূরে— নিউ আলিপুরে। তাই স্থির করে, খুব ভোর-ভোর নির্মলাকে কিছু না বলেই ও রায়চৌধুরী ভিলায় চলে যাবে। মনে মনে ভাবে, গতকাল ইন্দ্রনারায়ণের নিশ্চয় খুব ধকল গেছে, প্লেন ক্যানসেল হওয়াতে। হয়তো ভোর রাত্রে ফিরেছেন। হয়তো সকালে ঘুম ভাঙতে তাঁর বেলা হবে। কিন্তু, তাঁর ভ্যালে, বা পার্সোনাল সেক্রেটারি জাতীয় কেউ-না-কেউ নিশ্চয় বলতে পারবে, কাল সন্ধ্যায় কার সঙ্গে তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে বাতি নিভিয়ে দিয়ে সন্ধ্যার ঘটনার কথা ওর মনে পড়ছিল। বিরাটি শহর কলকাতার একটু বাইরে। বেশ শীত শীত ভাব। ওয়াড়-পরানো কম্বলটা ভাল করে গায়ে টেনে নেয়। মনে পড়ে, ছেলেটির চেহারা। সুন্দর দেখতে। আর কী স্মার্ট! আশ্চর্য! অবলীলাক্রমে সে তার লোডেড রিভলভারটা অপরাজিতার কোলে ফেলে দিল, কি করে বিশ্বাস করল অপরিচিতা মেয়েটিকে? ও যদি যন্ত্রটা নিয়ে সিধে রওনা দিত। না, তাহলেও পালাতে পারত না। নম্বর প্লেট দেখে ও পলাতকাকে ঠিক পাকড়াও করত। কিন্তু লোকটা কী করে? ইন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল বিজনেসের ব্যাপারে। হয়তো ঐ অল্প বয়সেই সে বড় বিজনেসম্যান হয়ে উঠেছে। তাই ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য একটি রিভলভার লাইসেন্সও পেয়েছে।... কেমন ঘুরিয়ে 'শেষের কবিতার' উদ্ধৃতিটা শুনিয়েছে : "পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থী"। ও বোধহয় ইচ্ছে করেই রিভলভারটা ফেলে গেছে। উপন্যাসে বা সিনেমায় এমনটি প্রায়ই দেখা যায়। রিভলভারটা ফেরত দিতে ওকে খুঁজে খুঁজে যেতে হবে 'অপ্রকাশের' কাছে। অথবা খুঁজে খুঁজে অপ্রকাশকে প্রকাশিত হতে আসতে হবে 'অপরিচিতার' কাছে।... বাসুসাহেব জোর দিয়ে বলেছিলেন, তিনি কোনও এজেন্টকে বারাসাতে পাঠাননি। সে যাই হোক, ইন্দ্রনারায়ণের দপ্তর থেকে যদি খোঁজ না পাওয়া যায় মোটর ভেইকেলস ডিপার্টমেন্ট নিশ্চয় বলতে পারবে 1757 গাড়ির... কিন্তু না, ঐটা তো গাড়ির পুরো নম্বর নয়! তাহলে? ঠিক আছে, প্রয়োজনে খবরের কাগজে পার্সোনাল কলাম তো আছেই। গরজ কি তার একলার?

রাতে ভাল ঘুম হয়নি। কী সব আজেবাজে স্বপ্ন দেখেছে। যা হোক, ও যখন বিরাটি থেকে রওনা দেয় তখনো নির্মলা বিছানা ছাড়েনি। তার সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি।

রায়চৌধুরী ভিলাতেও সব সুনসান। গেট খুলে ভিতরে ঢুকে আবার গেট বন্ধ করে দিল। না হলে গরু-ছাগল ঢুকে গাছপালা নষ্ট করবে। ত্রিসীমানায় কাউকে দেখতে পেল না। পোর্চের নিচে

গাড়িটা রেখে ও নেমে এল। কটা ধাপ উঠে বেল বাজালো। ভিতরে একটা সুরেলা আওয়াজ শুরু হতে না হতেই শোনা গেল সারমেয় গর্জন। খুব ভারি গলায়। ডোবারম্যান না হলেও অ্যালসেশিয়ান। ভৃত্যশ্রেণীর একটি লোক দরজা খুলে দাঁড়ালো। হাঁটু পর্যন্ত খাটো ধুতি, গায় গেঞ্জির উপর হাতকাটা সোয়েটার। কাঁধে তোয়ালে বা ঝাড়ন। জানতে চাইল, কোত্থেকে আসছেন?

—বিরাটি থেকে। সাহেব কি মুম্বাই থেকে কালরাত্রে ফিরেছেন?

—সাহেব! মানে কোন সাহেবের কথা বলতিছেন?

—মিস্টার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী!

—হায় রে মোর পোড়া কপাল। ত্যানি মুম্বাই থিকে আসতে যাবেন কেন গো? এ বাড়িতেই তো ত্যানি রইছেন, তা মাসখানেক হবে। আপনে তাঁর সাথে দেখা করতে চান? ঐ যে কী বলে— হ্যাঁ, অ্যাপনমেন্ট আছে?

অপরাজিতা বেশ ঘাবড়ে যায়, ইন্দ্রনারায়ণ যদি মাসাধিক কাল কলকাতাতেই আছেন তাহলে কাল সন্ধ্যায় সেই ছেলেটি অহেতুক মিছে কথা বলল কেন?

ভৃত্যশ্রেণীর লোকটি তাগাদা দেয়, অ্যাপনমেন্ট না কি-যেন-কয় তা আছে, মাঠান?

অপরাজিতা সামলে নিয়ে বলে, না নেই। আমি ঠিক বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করতেও চাইছি না। তাঁর ভ্যালে, সেক্রেটারি বা বাড়ির লোকজন কেউ কি আছেন?

লোকটা স্পষ্টতই বিরক্ত হল। বলল, কাল অনেক রাত পর্যন্ত খানাপিনা হয়েসে। সবাই এখন কুম্ভকন্য। এখন তো সাড়ে আটটাও বাজেনি। আপনে দশটা নাগাদ আসবেন মাঠান।

অপরাজিতা নিজের গাড়িতে ফিরে এল। লোকটা সদর দরজা বন্ধ করে দিল। ত্রিসীমানায় জনমানব নেই। শুধু বাড়ির ভিতর থেকে সেই মেঘগর্জনের মতো সারমেয় গর্জন : 'কে বট হে তুমি? সাতসকালে আমাদের বাড়িতে ঝামেলা পাকাতে এসেছ? তুমি জান না, এখানে আমার মনিবেরা নাচগান খানাপিনায় মাঝরাতের ওপারে শুতে যান? বেলা নটার আগে তাঁদের খোঁয়াড় ভাঙে না!'

গাড়িটা স্টার্ট দিতে গিয়ে মনে হল, তাহলে লোকটা কাল কেন ওকে রুখেছিল? অসৎ উদ্দেশ্য তো কিছু ছিল না। টায়ার সারিয়ে নিয়ে খোসমেজাজে বাড়ি চলে গিয়েছিল। কিন্তু রিভলভারটার কথা তার একেবারে খেয়ালই হল না?

ভাবতে ভাবতেই ফার্স্ট গিয়ারে গেট পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। এবার নামতে হল, গেট খুলতে এবং ওপারে গিয়ে গেট বন্ধ করতে। হঠাৎ কী খেয়াল হল। গাড়িটা থামিয়ে ও অ্যাটাচি কেস থেকে রিভলভারটা বার করল। ওর দাদুর একটা রিভলভার ছিল। চেম্বার খোলার কায়দা ও জানে। দিনের আলোয় ভালো করে দেখবে বলে ও চেম্বারটা খুলল। আর তৎক্ষণাৎ ওর নজরে পড়ল, ব্যারেলের সামনে রয়েছে যে বুলেটটা, সেটা এক্সপেন্ডেড। তার গায়ে 'ইন্ডেন্টেশনের' দাগ। সেটি 'ব্যয়িতবীর্য'! নিক্ষেপকারী যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে থাকে তাহলে ঐ ছোট্ট দাগটার

অর্থ : একটা মানুষের প্রাণ। ও কী করবে ভাবতে ভাবতেই আর একটা অপ্রত্যাশিত জিনিস ওর নজরে পড়ে গেল। আঁৎকে উঠল অপরাজিতা! এ কী?'

ব্যুগেনভেলিয়ার ঘন ঝোপের ভিতর থেকে বার হয়ে আছে একটা মানুষের জুতো সুদ্ধ পা! পুরুষমানুষ। পরনে জিনস্ প্যান্ট, ফিতে বাঁধা শু্য। ঊর্ধ্বাঙ্গে গলাবন্ধ সোয়েটার। মুখটা দেখা যাচ্ছে না। সেটা জঙ্গলের ভিতর। অপরাজিতার হাত-পা হিম হয়ে এল। গাড়িটা রাস্তার পাশে পার্ক করাই ছিল। ও গাড়ি থেকে নেমে চারদিকে তাকিয়ে দেখল। ত্রিসীমানায় মানুষজন নজরে পড়ল না। রায়চৌধুরী ভিলার সদর দরজাটা ওখান থেকে সরাসরি দেখা যায়। কিন্তু সেটা বন্ধ। সেই ভৃত্যশ্রেণীর লোকটা নিজের কাজে চলে গেছে। সারমেয় গর্জনটাও থেমে গেছে। অপরাজিতা দ্রুতপদে এগিয়ে গেল। রাস্তা ছেড়ে 'বার্ম'-এ, তারপর ব্যুগেনভেলিয়া জঙ্গলের ভিতর। কাছে গিয়ে দেখল, গোটা মানুষটাকে। শুধু মুখটুকু একটা ব্যুগেনভেলিয়ার ডালে ঢাকা পড়েছে। হাত দিয়ে শাদা শাদা ফুলে ভরা ডালটাকে সরিয়ে ও বজ্রাহত হয়ে গেল : সুশোভন। হ্যাঁ, সুশোভন রায়! তার বুকে বাঁদিকে বুলেটের ক্ষতচিহ্ন। শাদা ব্যুগেনভেলিয়ার ফুলগুলো রক্তে লালে-লাল হয়ে গেছে। রক্তে ভেসে গেছে ঘাস। নিচু হয়ে স্পর্শ করে দেখল ওর দেহটা। নাড়ি দেখার প্রশ্নই ওঠে না। জানুয়ারির শীতে বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে মৃতদেহটা।

পায়ে-পায়ে ও ফিরে আসছিল। দুটো পাই টলছে, যেন কালরাতের শ্যাম্পেনের প্রভাব এখনো কাটেনি। হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল— ওর হাতে একটা রিভলভার, যার একটি বুলেট এক্সপেন্ডেড! বিদুৎচমকের মতো ওর মনে হল, এটাই মার্ডার ওয়েপন। কাল সেই বদমায়েসটা কায়দা করে সেটা ওর হাতে গছিয়ে দিয়ে গেছে।

দূরে একটা তেঁতুলগাছকে লক্ষ্য করে প্রাণপণ জোরে সে ঐ রিভলভারটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

তখন ঠিক কটা তা ওর খেয়াল নেই। তারপর কী করে সেই রায়চৌধুরী ভিলা থেকে মাথা ঠাণ্ডা রেখে এই নিউ আলিপুর পর্যন্ত ড্রাইভ করে আসতে পেরেছে তা ও নিজেই জানে না। তবে এটুকু মনে আছে, মাঝে মাঝে ও গাড়ি থামিয়েছে, রাস্তার টিউবওয়েলে সেই জানুয়ারির সকালে মুখ-হাত ধুয়েছে। তারপর ধুকপুকানিটা থামলে আবার গিয়ে বসেছে স্টিয়ারিং-এর সামনে।

বাসু বললেন, শোন মা, এ জীবনে মানুষ সব চেয়ে বড় ভুল করে যখন ডাক্তারের কাছে লজ্জায় রোগের লক্ষণ লুকায়, অথবা ভয়ে সলিসিটরের কাছে সত্য! বল, অপরাজিতা : তুমি যা বললে তা সত্য, আদ্যন্ত সত্য, সত্য বই মিথ্যার কোনও প্রলেপ লাগাবার চেষ্টা নেই?

বাসুসাহেবের চোখে চোখ রেখে ও বললে, আমি মিছে কথা বলিনি। যা বলেছি তা সত্য, আদ্যন্ত সত্য। বর্ণে-বর্ণে সত্য!

বাসু বললেন, অলরাইট! তোমাকে জেরা করার সময় নেই। আমি মেনে নিচ্ছি, যা বললে তা সত্য। তুমি যদি এক বিন্দু মিথ্যা কথা বলে থাক তাহলে সেটাই তোমার মৃত্যুবাণ হয়ে ফিরে আসতে পারে। যা হোক, যা বলছি তা মন দিয়ে শোন। আজও তোমার নানারকম

অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে নিশ্চয়। সেই মতো কাজ করে যাও। সকালে কী দেখেছ তা ভুলে যাও।

অপরাজিতা বলে, কিন্তু একটা মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখলে পুলিসে খবর দেওয়া কি আমার কর্তব্য নয়?

—নিশ্চয়। খবর তো তুমি দিয়েছ। পুলিশকে জানাবার জন্য তোমার সলিসিটারকে সব কথা জানিয়েছ। বাকি দায়িত্ব আমার। তবে খুব সাবধানে ড্রাইভ কর। শরীর খারাপ মনে হলে কোনও হোটেলে গিয়ে একটা ঘর বুক করে বিশ্রাম নাও। হয়তো এই অবস্থায় তুমি নির্মলার মুখোমুখি হতে চাও না। তাই নয়?

—আমি নির্মলাকেও জানাব না?

—না! তুমি যদি চাও তো বল, কৌশিককে বলি তোমাকে কোনও হোটেলে পৌঁছে দিতে। সেখান থেকে ফোন করে অফিসে একদিনের ক্যাজুয়াল লিভ নাও!

—তার দরকার হবে না। আমি পারব। আচ্ছা চলি।

অপরাজিতা রওনা হয়ে যেতেই বাসুসাহেব টেলিফোন তুলে নিয়ে ভবানীভবনে হোমিসাইডে ফোন করে সার্জেন্ট বরাটকে চাইলেন। বরাট বহুবার আদালতে বাসুসাহেবের জেরার মুখোমুখি হয়েছে। ছদ্ম বিনয়ে বলে, বলুন স্যার, কীভাবে আপনার সেবা করতে পারি?

বাসু বলেন, আমাকে নয়, বরাট। সেবা করবে জনগণকে। তোমাকে একটা খবর দেবার জন্য এই ফোন করছি। ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে রানাঘাট যাবার পথে, বারাসতের তিন কিলোমিটার আগে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বিরাট একটা বাগানবাড়ি পড়বে...

—চিনি। ইন্দ্রনারায়ণ একজন এ-ওয়ান ভি. আই. পি.। বলে যান।

—ঐ রায়চৌধুরী ভিলায় ঢুকতে গেটের ডানদিকে, রাস্তা থেকে একটু ভিতরে ব্যুগেনভেলিয়া ঝোপের মধ্যে পড়ে আছে একটি মৃতদেহ। পুরুষ মানুষ, বছর ত্রিশ বয়স। মনে হয় কাল সন্ধ্যারাতে খুন হয়েছে।

—খুনই যে হয়েছে তা কেমন করে জানলেন?

—জানি না। আন্দাজ করছি। বুকে যেহেতু বুলেটের চিহ্ন। আত্মহত্যা করলে সচরাচর জঙ্গলে গিয়ে কেউ করে না।

—আপনি এ তথ্যটা কেমন করে জানলেন?

—আমার একজন মক্কেল মৃতদেহটা দেখতে পেয়েছে।

—কী নাম মক্কেলের? কোথায় আছেন তিনি এখন?

—সেটা আমি বলতে পারব না।

—আপনি জানেন না?

—এ প্রশ্নটাই অবৈধ। আইনের নির্দেশ একটা অপরাধ সংঘটিত হয়েছে জানলে তা পুলিশকে জানানো। তা আমি জানালাম। আইন একথা বলে না যে, কোন্ মক্কেলের মাধ্যমে আমি তথ্যটা

জেনেছি তা পুলিশকে জানাতে হবে। আচ্ছা, আপাতত এই পর্যন্তই। রাখলাম।

—থ্যাঙ্কু, স্যার!

বাসু ক্র্যাডেলে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন।

।। চার ।।

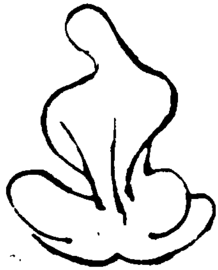

কৌশিককে নিয়ে তখন বাসুসাহেব রওনা দিলেন বিরাটির দিকে। রানীকে বলে গেলেন, তুমি আর সুজাতা লাঞ্চ সেরে নিও। আমাদের ফিরতে হয়তো বিকেল হয়ে যাবে। আমরা দুপুরে পথে কোথাও লাঞ্চ সেরে নেব।

সুজাতা বললে, আপনার ভাগ্নে এবার বরং বাড়িতে থাক, মামিমাকে সঙ্গ দেবে। সদ্যবিধবার কাছে যাচ্ছেন, আমি গেলেই...

বাসু বলেন, বেশ তুমিই চলো। কিন্তু তুমি যা ভাবছ তা নাও হতে পারে। আমরা হয়তো এয়ারপোর্ট হোটেলে লাঞ্চ খাব না। পথের ধারে কোন ধাবায় গোস্ত-রুটি খাব।

কৌশিক হো-হো করে হেসে ওঠে। বলে, বসুন মামু, গাড়িটা বার করি। তেল কম আছে কিন্তু, নিয়ে নেবেন।

বাসু আর সুজাতা তৈরি হয়ে গাড়িতে উঠতে যাবেন এমন সময় এল এক ক্যুরিয়ার পিয়ন। বাসুসাহেবের নামাঙ্কিত খাম। প্রেরকের ঘরে নামটা লেখা আছে মিনতি দাসী, মেরীনগর। রানী দেবী সই করে খামটা নিলেন। বাসু বললেন, খুলো না। দাও পকেটে রাখি। সময়মতো পড়ে নেব। নতুন কোনও কেস হবে। পড়লেই চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।

গাড়ি নিয়ে ওঁরা যখন বিরাটিতে অপরাজিতার ঠিকানায় এসে পৌঁছলেন তখন বেলা পৌনে একটা। ডোরবেল বাজাতে দরজা খুলে দিল নির্মলা নিজেই। একটু অবাক হয়ে বললে, কাকে খুঁজছেন?

বাসু বললেন। তুমি নির্মলা তো? নির্মলা রায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে তো ঠিক...

—না, মা, আমাকে তুমি আগে কখনো দেখনি। আমার নাম পি. কে. বাসু, আমি হাইকোর্টে ক্রিমিনাল সাইডে...

ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে নির্মলা বলে, আপনি ব্যারিস্টার? কাঁটা সিরিজের পি. কে. বাসু?

বাসু বললেন, তা বলতে পার... আমি এসেছি তোমার সঙ্গে কিছু জরুরি আলোচনা করতে। আমার সঙ্গের এই মেয়েটি...

এবারও বাধা দিয়ে নির্মলা বললে, জানি, সুকৌশলীর সুজাতা। আসুন, আসুন, ভিতরে এসে বসুন।

সুজাতার খুব খারাপ লাগছিল। বিশেষ করে নির্মলার সিঁথিতে জ্বলজ্বল করছে সিঁদুর। ও বোধহয় এখনি স্নান করে প্রসাধন করেছে। বেচারি জানে না, এই ওর শেষবারের মতো সধবা-শৃঙ্গার!

বৈঠকখানায় ওঁদের বসিয়ে নির্মলা বললে, বলুন? ঠাণ্ডা কিছু খাবেন?

—না! আমি তোমার সঙ্গে অপরাজিতা করের বিষয়ে কিছু কথা বলতে এসেছি।

—জিতা। কেন তার কী হয়েছে? সে কোথায়?

—অপরাজিতা তোমাদের এ বাড়িতেই ভাড়া আছে। তাই না?

—না, ভাড়াটে নয়। পেয়িং গেস্ট। শয্যা আর প্রাতঃরাশ। রাত্রে মাঝে মাঝে ডিনার করি আমরা একই সঙ্গে, কখনো বা লাঞ্চও খাই; কিন্তু সেসব হিসাবের বাইরে। কেন বলুন তো?

—ও তো ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আর ওয়াটার পিউরিফায়ার বিক্রি করতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কাল সন্ধ্যারাতে সে কোথায় গেছিল তুমি জান?

—ওর ক্লায়েন্টের নাম-ঠিকানা জানি না। কিন্তু বাড়িটা রায়চৌধুরী ভিলার কাছাকাছি। বারাসাত যেতে রায়চৌধুরী ভিলা পড়ে চেনেন?

—চিনি। ও ফিরে এসে রাত্রে তোমাকে অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতার কথা বলেছিল, তাই নয়?

নির্মলা একটু চিন্তা করে নিয়ে বলল, জিতা, আই মিন অপরাজিতা কি আপনার ক্লায়েন্ট?

—ইয়েস! সে আমার মক্কেল।

নির্মলা আবার একটু ইতস্তত করে বললে, কিছু মনে করবেন না, স্যার— কিন্তু আপনি যে সত্যিই সেই পি. কে. বাসু তা আমি কেমন করে বুঝব?

বাসু নিঃশব্দে হিপ পকেট থেকে ওঁর ড্রাইভিং লাইসেন্সটা বার করে দেখালেন। বললেন, আমি কিছু মনে করিনি, নির্মলা। বরং এটা যাচাই না করে যদি তোমার নিকটতম বান্ধবীর গোপন কথা আমাকে বলে ফেলতে তাহলেই আমি তোমাকে নিরেট ভাবতাম। এবার বল?

নির্মলা সবিস্তারে গতরাত্রের অভিজ্ঞতার কথা বলে গেল। রিভলভারের কথাও গোপন করল না। অপরাজিতা যা বলেছে, হুবহু তাই।

বাসু বললেন, তুমি চেম্বারটা খুলে দেখলে তাতে ছয়টা বুলেট আছে?

—আজ্ঞে না। রিভলভার কী ভাবে খুলতে হয় আমি জানি না। জিতাই খুলে দেখালো, ছয়-ছয়টা তাজা বুলেট।

—'তাজা' বুলেট? কেমন করে বুঝলে?

—আজ্ঞে? আমি আপনার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

—বলছি কি, ছয়টাই যে 'তাজা' বুলেট তা বুঝলে কেমন করে? একটা ব্ল্যাংক কার্টিজ ছিল কি ছিল না, কোনও বুলেট এক্সপেন্ডেড মানে ব্যয়িত বুলেট কি না তা বুঝলে কী করে?

নির্মলা সলজ্জে স্বীকার করে এর আগে কখনো কোনও রিভলভার সে স্পর্শ করে দেখেনি। সিনেমায় আর টিভিতে দেখেছে শুধু। এসব বিষয়ে ওর কোনও ধারণাই নেই।

বাসু বললেন, তোমাকে খুলেই বলি নির্মলা, তোমার বান্ধবী অপরাজিতা একটা ভীষণ বিপদে পড়ে গেছে।

ওর মুখচোখ শুকিয়ে ওঠে। বলে, ঐ রিভলভারটার ব্যাপারে?

—হ্যাঁ। তোমার কি মনে হয়নি যে, ঐ রিভলভারে কেউ একটা খুন করে তোমার বান্ধবীর কাছে গছিয়ে দিতে পারে? যাতে হত্যাপরাধ তার উপর বর্তায়?

রীতিমতো শুকনো মুখে নির্মলা স্বীকার করে ও আশঙ্কা তার আদৌ হয়নি।

—তোমার কর্তাটি কোথায়?

সুজাতা এই নৃশংস প্রশ্নটা সহ্য করতে পারল না। উঠে গেল দেওয়ালে একটা গ্রুপ ফটো কাছ থেকে দেখতে।

নির্মলা স্বীকার করল, ওর স্বামী ট্যুরে গেছে। মাসের মধ্যে দিন-পনের তাকে বাইরে থাকতে হয়। স্বামীর ব্যবসাটা কিসের তা ও জানে না। না, কোনও লোক ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে ওর স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে কখনো আসে না। বা টেলিফোন করে না। কিন্তু এসব কথা কেন উঠছে?

বাসু বলেন, তোমার কৌতূহল হয় না?

—হয়, কিন্তু জিজ্ঞেস করলেই ও প্রচণ্ড ধমক দেয়। বলে রোজগার করার দায়িত্ব আমার, সংসার চালানোর দায়িত্ব তোমার। অত কৌতূহল ভাল নয়।

—কতদিন বিয়ে হয়েছে তোমাদের?

—দুবছর এখনো হয়নি।

বাসু একটু ইতস্তত করে বললেন, তুমি আমার মেয়ের বয়সী। একটা কথা খোলাখুলি জানতে চাইছি, কিছু মনে কর না, মা। তোমার মনে কি কখনো কোনও সন্দেহ জাগেনি যে, তোমার পিছনে ওরা দুজনে গোপনে...

বাসু অর্থপূর্ণভাবে বাক্যটি অসমাপ্ত রাখলেন।

নির্মলা মাথা নিচু করে স্বীকার করল, সন্দেহ হয়, হয়েছে! আপনি কি কিছু জানেন?

বাসু বললেন, অপরাজিতার বয়ফ্রেন্ডকে আমি দেখেছি। তোমার স্বামীর কোনও ফটো আমাকে দেখাতে পার?

নির্মলা তখনি উঠে গেল। সুজাতা অস্ফুটে বললে, উফ্‌! কী নৃশংস আপনি! মেয়েটা এখনো জানে না ও বিধবা হয়েছে আর আপনি...

বাসু চাপা ধমক দেন, শাট আপ! আইনত নির্মলার বিয়েই হয়নি। ও বিধবা হবে কোত্থেকে?

সুজাতা জবাব দেবার সুযোগ পেল না। তার আগেই নির্মলা ফিরে এল ফ্যামিলি অ্যালবাম

নিয়ে। সুশোভনের একাধিক ফটোগ্রাফ আছে অ্যালবামে। প্রথম পাতাতেই ওদের যুগল ফটো। বিয়ের পরেই তোলা। বাসু বললেন, না, এই ছেলেটি অপরাজিতার সেই বয়ফ্রেন্ড নয়।

এমন সময় ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে উঠল টেলিফোনটা। বাসু খপ্‌ করে চেপে ধরলেন নির্মলার হাত। বললেন, থানা থেকে হতে পারে। আমি দেখছি।

এগিয়ে এসে টেলিফোনটা তুলে নিয়ে নাম্বারটা ঘোষণা করলেন। ও প্রান্ত থেকে একটি মহিলাকণ্ঠে মোলায়েম প্রশ্ন হল, জিতা আছে, অপরাজিতা?

—আপনি কে বলছেন?

ওপ্রান্তবাসিনী ধমকে ওঠে, আপনি কে?

বাসু প্রতিধ্বনি করেন, আপনি কে?

এবার ও প্রান্তে টেলিফোনটা হাত বদল হয়। গম্ভীর কণ্ঠে কেউ ঘোষণা করে, লোকাল থানা থেকে বলছি। মিস অপরাজিতা কর কি বাড়িতে আছেন?

—না নেই।

—তিনি কোথায় গেছেন?

—তা তো জানি না।

—আপনি কে?

—এ প্রশ্ন অবান্তর।

বাসু বাঁ হাত দিয়ে ক্র্যাডলটা টিপে দিলেন। লাইনটা কেটে গেল। টেলিফোনটা ধারক অঙ্গে বসালেন না, পাশে নামিয়ে রাখলেন। বললেন, নির্মলা, আপাতত তোমার ফোনটা এনগেজড হয়ে থাক। না হলে থানা থেকে আবার এখনি বিরক্ত করবে। অবশ্য নিষ্কৃতি তোমার নেই। একটু পরেই ওরা গাড়ি নিয়ে আসবে। তোমার জবানবন্দি নেবে। আমরা চলি—

—ওরা জিজ্ঞেস করলে আমি কি স্বীকার করব যে, আপনি এসেছিলেন? আপনিই ফোনে কথা বলেন?

—নিশ্চয়ই। আদ্যন্ত সত্যি কথা বলবে।

।। পাঁচ।।

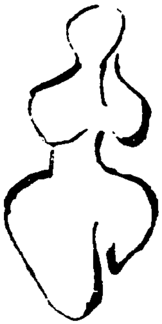

বলেছিলেন বটে যে, ধাবায় বসে গোস্ত-রুটি চিবাতে হবে সুজাতাকে, বাস্তবে অতটা নিষ্ঠুর হলেন না। গাড়িটা নিয়ে এসে উঠলেন এয়ারপোর্ট হোটেলের ডাইনিং রুমে। হেড-স্টুয়ার্ড এগিয়ে আসতেই বাসু বললেন, এই দেখ বালটিমোর, কতদূর থেকে তোমাদের টানে আবার এসে পড়েছি।

অ্যাংলো ইন্ডিয়ান স্টুয়ার্ড ওঁদের যত্ন করে বসালো। খাবারের অর্ডার নিয়ে গেল। খাবার

সার্ভ করতে যেটুকু সময় লাগল তার মধ্যে উঠে গিয়ে বাসু বাড়িতে একটা ফোন করলেন। না, কোনও ডেভেলপমেন্ট হয়নি তারপর। থানা কেন অপরাজিতার খোঁজ করছে কৌশিক জানে না।

সুজাতা মনে করিয়ে দিল। মামু, আপনার পকেটে সেই চিঠিখানা আছে কিন্তু যা আপনি খুলে পড়েননি।

বাসু বললেন, মনে আছে আমার। নতুন কোন পার্টি।

সুজাতা বললে, অনেকদিন পরে আপনার ভুল ধরেছি, মামু। আপনি চিঠির প্রেরককে চিনতে পারেননি। মিনতি দাসী মানে মেরীনগরের সেই মিণ্টিদি, যাকে সমস্ত সম্পত্তি উইল করে দিয়ে গিয়েছিলেন পামেলা জনসন। আপনার মনে নেই! মরকতকুঞ্জের মিণ্টিদি?

বাসু বললেন, তাই তো! সেই 'সারমেয় গেণ্ডুকের' মিণ্টি। রস, চিঠিখানা এই মওকায় পড়ে নিই।

ইতিমধ্যে সুজাতার জন্য একটা সিট্রা আর বাসুসাহেবের জন্য বিয়ার এসে গেছে। সঙ্গে ফিঙ্গার চিপস।

বাসু খামটা খুলে ওর গর্ভ থেকে বার করলেন একটা ফটোগ্রাফ আর মিনতির চিঠি। ফটোটা দেখেই আপন মনে বলে ওঠেন, গুড গড।

সুজাতার ঝুঁকে পড়ে বলে, কী? কার ফটো?

বাসু সেটা বাড়িয়ে ধরেন। সুজাতাও বলে, আশ্চর্য কোয়েন্সিডেন্স! আধঘণ্টার মধ্যে দুটি ভিন্ন ভিন্ন সূত্র থেকে একই লোকের ছবি হাতে এল।

বাসু প্রশ্ন করেন, তুমিও তাহলে চিনতে পারছ?

—নিশ্চয়ই। সুশোভন রায়ের! যদি না তার যমজ ভাইয়ের হয়।

—অথবা পরেশ পালের। দাঁড়াও, মিণ্টির চিঠিখানা পড়ি।

যাঁরা মেরীনগরের মিনতি দাসীকে চেনেন না, তাঁদের জানিয়ে রাখা ভাল যে, মিনতি ছিল মিস পামেলা জনসনের শেষ জীবনের সঙ্গিনী, যাঁকে ঐ ভদ্রমহিলা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছিলেন। মিনতির লেখাপড়া বিশেষ হয়নি, কিন্তু মনটা সরল। মেরীনগরের সবাই তাকে ভালবাসে। চিঠিখানা মিনতি নিজে লেখেনি। কাউকে দিয়ে লিখিয়েছে। তলায় গোটা গোটা হরফে মিনতির স্বাক্ষরটা আছে। কাগজ সেই মরকতকুঞ্জের মনোগ্রাফ-করা দামী বন্ড পেপার। মিনতি এত কম চিঠি লেখে যে, পামেলা জনসনের সেই সখের কাগজ এখনো শেষ হয়নি।

মিনতি অশেষ প্রণাম জানিয়ে লিখেছে যে, বাসুসাহেবের পক্ষে কোন কাজই নাকি অসম্ভব নয়। তাই সে একটি ব্যাপারে ওঁর সাহায্যপ্রার্থী। মেরীনগরে মিনতির এক প্রতিবেশী খ্রীস্টান বৃদ্ধ দুদিন আগে মারা গেছেন। তাঁর মৃতদেহ স্থানীয় চার্চের ডেথ-চেম্বারে এমবাম করে রেখে দেওয়া হয়েছে। কারণ এই দুনিয়ায় বৃদ্ধের একটি মাত্র নিকট আত্মীয় আছে। তাঁর পুত্র। সে প্রতিমাসে বৃদ্ধের খোরপোশের টাকা পাঠাতো। বৃদ্ধের নাম জগদীশ পাল। তাঁর পুত্রের নাম কেউ জানে না। তবে মিনতি তাকে দেখলে চিনতে পারবে। মৃত বৃদ্ধের বাক্স ঘেঁটে পুত্রের একটি ফটোগ্রাফ

পাওয়া গেছে। ফটোখানা মিনতি চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দিচ্ছে। মিনতি জানে, কলকাতা বিরাট শহর। সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের বাস। যার নামটা পর্যন্ত জানা নেই, ফটো দেখে তাকে খুঁজে বার করা অসম্ভব। কিন্তু মিনতি একথাও জানে যে, পি. কে. বাসুর অসাধ্য কাজ কিছুই নেই। একটা মানুষ— ওরই প্রতিবেশী— ডেথ চেম্বারে পচছে, তাকে কবর দেওয়া যাচ্ছে না। খ্রীস্টান না হয়েও এটা মিনতির সহ্য হচ্ছে না। বাসুসাহেব যেন যথাকর্তব্য করেন। অন্তত ওর প্রতিবেশী জগদীশ পালের গোর দেওয়ার ব্যবস্থাটা যাতে ত্বরান্বিত হয়।

বাসু বলেন, ব্যস, উঠে পড় সুজাতা। এখনি মেরীনগর যাব।

সুজাতা বলে, ও মা সেকি! আপনি আইসক্রিমের অর্ডার দিয়েছেন যে, বিল এখনো আসেনি—

বাসু বলেন, আইসক্রিমটা ক্যানসেল করে দিই, বিল দিতে বলি, কি বল?

—না। আপনি একা মেরীনগর যান। তবে যাবার আগে বিল মিটিয়ে যাবেন। আমি মিনিবাসে বাড়ি ফিরে যাব।

—এ তো তোমার রাগের কথা!

—রাগের কথা তো বটেই। মুখের সামনে থেকে কেউ আইসক্রিম কেড়ে নিলে কি অনুরাগের কথা বার হয় মুখ দিয়ে?

অগত্যা আরও আধঘণ্টা দেরি হল। মেরীনগর এ পথেই যেতে হয়। জাগুলিয়ার মোড় থেকে বাঁক মেরে। কল্যাণীর কাছাকাছি। মেরীনগরে মিস পামেলা জনসনের মৃত্যুরহস্যের কিনারা করতে এসেছিলেন সত্তরের দশকে। পুরানো আমলের অনেকেই অবশ্য নেই— ডাক্তার পিটার দত্ত, মিস ঊষা বিশ্বাস ইত্যাদি। কিন্তু মিনতি আছে। তার চিঠি পেয়েছেন। হয়তো ডক্টর প্রীতম ঠাকুরও আছে। সে বলেছিল মেরীনগরেই ডাক্তারি প্র্যাকটিসে বসবে।

মরকতকুঞ্জে যখন গিয়ে পৌঁছিলেন তখন বেলা সাড়ে তিনটে। এবার কিন্তু সারমেয় গর্জন শুনতে পেলেন না। মিনতি বাসুসাহেবকে দেখে দারুণ উচ্ছ্বসিত। ওঁদের দুজনকে যত্ন করে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালো। প্রথম প্রশ্নই জিজ্ঞেস করল : কী খাবেন বলুন? আজ রাতে এখানেই খেয়ে যেতে হবে কিন্তু!

বাসু বললেন, তা হয় না, মিনতি। আমি বরং বিকালবেলা তোমার কাছে চা পান করে যাব। তোমার চিঠিখানা আজই পেয়েছি, তৎক্ষণাৎ আমি ছুটে এসেছি; কারণ আমার মনে হচ্ছে, এ আমার কাজিন-ব্রাদার জগদীশদা, দেখলে চিনতে পারব। তোমার সঙ্গে চার্চের ফাদারের আলাপ আছে?

—থাকবে না? চার্চটা গড়ে দিয়েছিলেন তো এই মরকতকুঞ্জেরই মিস জনসনের বাবা, আমি সেই মরকতকুঞ্জেই থাকি। যদিও আমি খ্রীষ্টান নই, তবু উনি আমাকে খুব ভালভাবেই চেনেন, স্নেহ করেন, চলুন, আমিই নিয়ে যাব।

—বস, তার আগে জগদীশ পাল সম্বন্ধে তুমি কতটুকু কী জান বল দিকিন। আমি বুঝে নিতে

চাই এই আমাদের সেই জগদীশদা কি না।

মিনতি বললে, আমি বাজি রেখে বলতে পারি তা নয়। কারণ জগদীশ পাল নিতান্ত গরিব ঘরের ছেলে। যৌবনে এই মরকতকুঞ্জেই বাগানের মালির কাজ করেছে। এখানকারই মানুষ। বিয়ে করে। একটি ছেলেও হয়। তারপর বউ-ছেলেকে ফেলে ও পালিয়ে যায়। ও আপনার দূরসম্পর্কের ভাই হতেই পারে না।

—এ সব কথা তোমাকে কে বলেছে?

—ঐ জগদীশ বুড়োই বলেছে। যখন মদের ঝোঁকে পুরানো দিনের গল্প করতে বসত।

শোনা গেল স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে ফেলে জগদীশ পালিয়ে যায়। মিস জনসন স্বামীত্যক্তাকে মালির ঘরেই থাকতে দেন। দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর জগদীশ যখন ফিরে আসে তখন তার স্ত্রীও মারা গেছে, মিস জনসনেরও দেহান্ত হয়েছে। ছেলেটা কোথায় গেছে কেউ জানে না।

সব কথা শুনে মিনতির দয়া হয়। জগদীশ বলেছিল, অর্থাভাবে জর্জরিত হয়ে কাউকে কিছু না বলে সে টাকা রোজগার করতে বোম্বাই চলে যায়। সেখান থেকে খালাসি হয়ে জাহাজ চেপে বিদেশে। বিভিন্ন দেশে সে ঘুরেছে। এখন ষাট বছর বয়সে সে চাকরি থেকে অবসর পেয়ে দেশে ফিরে এসেছে। মিনতির দয়ার শরীর। আউট-হাউসের সাবেক পোড়ো ঘরেই বৃদ্ধকে থাকতে দেয়। লোকটা কুকুর ভালবাসতো। সে একটা কুকুর পুষতে শুরু করে। রোজ সকাল-সন্ধ্যায় কুকুরকে চেন দিয়ে বেঁধে বুড়ো বেড়াতে নিয়ে যেত। একাই থাকত। তামাক খেত। মাঝে মধ্যে মদ্যপানও করত।

বাসু বলেন, একটা কথা, ওর বাড়ি ভাড়া লাগত না। ইলেকট্রিক বিলও দিতে হত না; কিন্তু ও দুবেলা খেত কী করে? উপার্জন করত কিছু?

—আজ্ঞে না। জাহাজ কোম্পানি থেকে ওর নামে মাঝে মাঝে মানি অর্ডারে পেনশন আসত। দু-চারমাস অন্তর। কখনো দুশো, কখনো পাঁচশো।

বাসু বললেন, তার মানে তুমি কিছুই জান না। জাহাজ কোম্পানি মানি অর্ডারে কাউকে পেনশন পাঠায় না। অবসরপ্রাপ্তকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে বলে এবং অ্যাকাউন্ট-পেয়ি চেক বা ড্রাফটে পেনশন দেয়। তাতে খরচ পড়ে কম। দ্বিতীয়ত, পেনশন মাসে মাসে আসে। দু-চার মাস অন্তর নয়। তৃতীয় কথা, পেনশনের পরিমাণ দুশো-পাঁচশ হয় না। হতে পারে প্রতিমাসে দুশো তের টাকা, অথবা পাঁচশ সাতটাকা। তুমি বরং দেখ, প্রীতম সিং ঠাকুর তার বাড়িতে আছে কি না।

খবর পেয়ে ডক্টর প্রীতম সিং ঠাকুর দেখা করতে এলেন। জানা গেল, ডক্টর ঠাকুর এই মরকতকুঞ্জের একান্তে একটা তিন কামরা বাড়ি তৈরি করে এখানেই প্র্যাকটিসে বসেছেন। ওর ছেলে রাকেশ আছে আমেরিকায়। সেখানেই বিয়ে-থা করেছে। কিন্তু ওর ছোট মেয়ে আজও অবিবাহিতা। এম. এ., বি. এড. করে স্থানীয় স্কুলে পড়ায়। ও ডক্টর ঠাকুরের দেখভাল করে। কিছুটা পুরানো দিনের স্মৃতিচারণের পর বাসুসাহেব জানতে চাইলেন, ডক্টর প্রীতম ঠাকুর

জগদীশ পাল সম্বন্ধে কী জানেন।

প্রীতম বলে, শেষ থেকে শুরু করি। লোকটা ছিল হার্ট-পেশেন্ট। আমার চিকিৎসাতেই ছিল। মারা গেছে দিন-তিনেক আগে। শুনেছি, যৌবনে সে এই মরকতকুঞ্জের মালি ছিল। বিয়ে করেছিল। তারপর বৌ আর শিশুপুত্রকে ফেলে পালায়। বোম্বাই ডকে গিয়ে খালাসির চাকরি নেয়। দেশ-বিদেশ ঘুরে বছর পাঁচেক আগে লোকটা ফিরে আসে। এসবের সত্যি-মিথ্যা জানি না, পালবুড়োর কাছেই শোনা কথা। মেরীনগরের অনেক প্রাচীন ব্যক্তিই ওকে সেই জগদীশ মালী বলে চিনতে পারেন। মিনতি ওকে ঐ আউট-হাউসে বিনা ভাড়ায় থাকতে দেয়।

বাসু বলেন, বুঝলাম। ওর বাড়ি ভাড়া লাগত না, ইলেকট্রিক বিল মেটাতে হত না। কিন্তু ও খেত কী? ওর উপার্জন কী ছিল?

প্রীতম মিনতির দিকে ফিরে বললে, তুমি কী জান?

মিনতি বলে, জগদীশ তো বলত, জাহাজ কোম্পানি ওকে পেনশন পাঠাতো!

প্রীতম বাসুসাহেবের দিকে ফিরে বললে, লোকটা ছিল ধূর্ত। ঐ রকম একটা খবরই সে রটিয়েছিল। মাঝে মাঝে ওর কাছে মানি-অর্ডারে টাকা আসত ঠিকই; কিন্তু পেনশন নয়!

—তুমি কেমন করে জানলে?

—নিতান্ত ঘটনাচক্রে। বছরখানেক আগে একবার ওর নামে যখন একটা মানি-অর্ডার আসে তখন ও জ্বরে বেহুঁশ। মানি-অর্ডার পিয়নও আমার পেশেন্ট। টাকাটা আমাকে দিয়ে গেল। শ-চারেক টাকা। কোন জাহাজ কোম্পানি ওকে পেনশন দিচ্ছে না। পাঠাচ্ছে ব্যক্তিবিশেষ। মনে হল, প্রেরকের ঠিকানাটায় গোঁজামিল আছে। কুপনটা বাংলায় লেখা। প্রেরক বুড়োকে কোনও সম্বোধন করেনি। জানিয়েছিল যে, তার সে সময় টানাটানি যাচ্ছে, মাস তিনেক আর টাকা পাঠাতে পারবে না। বুড়ো যেন ঐ চারশ টাকায় তিন মাস চালিয়ে নেয়। নাম সই করেছিল 'প'!

—আই সি! তোমার সন্দেহ হল নিশ্চয়।

—তা তো হলই। জগু আমার চিকিৎসাতেই ছিল। ভাল হয়ে ওঠার পর টাকা আর কুপন ওকে দিই। বলি, জগু! এই 'প'-টি কে? সে কি তোমাকে ব্ল্যাকমেলিংয়ের খেসারতি টাকা পাঠাচ্ছে?

ও একেবারে লাফিয়ে ওঠে। বলে, "না ডাক্তারবাবু। 'প' আমার ছেলে— পরেশ! ছোট্টবেলায় তাকে মায়ের কোলে ফেলে চলে গেছিলাম তো? তাই সবার কাছে স্বীকার করতে লজ্জা করে। ও বুড়ো বাপকে ক্ষমা করেছে। যখন যা পারে পাঠায়।" জগু আমাকে অনুরোধ করেছিল ব্যাপারটা গোপন রাখতে। তাই আমি কাউকে কিছু জানাইনি। এখন ওর দেহান্ত হয়েছে। তাই সব কথা খুলে আপনাকে বললাম।

বাসু মিনতিকে প্রশ্ন করেন, জগদীশের মৃত্যুর পর ওর ঘরে কি কেউ ঢুকেছে? পরেশ তো আসেইনি। এলে বাপের সমাধি হয়ে যেত।

মিনতি জানাল, ঘরটা তালাবন্ধ পড়ে আছে। চাবি তার কাছে।

—চাবি নিয়ে এস। আমি ঘরটা একবার দেখব। তারপর চার্চে যাব। কেমন? আর শোন, তোমার মালিকে বল, আমাকে একটা ছোট্ট ফুলের 'ব্যুকে' বানিয়ে দিতে। চার্চে গিয়ে জগুদার বুক-পকেটে গুঁজে দিয়ে আসব।

প্রীতম বলে, ও লোকটা আপনার কাজিন ব্রাদার না হতেও পারে। ইন ফ্যাক্ট, না হবার সম্ভাবনাই বেশি।

—নাই বা হল। তাই বলে যে লোকটা দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে চলেই গেছে তাকে কি একটা গোলাপ উপহার দেওয়া যায় না? জাস্ট আউট অব পিটি?

প্রীতম বলল, য়ু আর পার্ফেক্টলি কারেক্ট, স্যার। আমি তাহলে চলি। মীনার স্কুল থেকে ফেরার সময় হয়ে এল।

প্রীতম ঠাকুর নিজের বাড়ির দিকে রওনা হল। মিনতি গেল ভিতরবাড়িতে আউট-হাউসের চাবির খোঁজে। সুজাতা এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। এবার বলে, আপনি এবার কি মর্গে যাবেন?

বাসু বলেন, যাব। 'মর্গে' নয়, ওটা চার্চের 'ডেথ-চেম্বার'। গৌরবে 'ক্যাটাকুম্ব'ও বলতে পার।

সুজাতা বলল, সে যাই হোক, আমি বাপু ঐ মৃত্যুপুরীতে যেতে পারব না।

বাসু বললেন, এই জন্যেই বলেছিলাম তুমি তোমার মামিমার কাছে থাক, আমি কৌশিককে নিয়ে আসি। সে যা হোক, তোমার ভ্যানিটি ব্যাগে যে পিংক রঙের লিপস্টিকটা আছে, ওটা বার করে আমাকে দাও দেখি?

সুজাতা আঁৎকে ওঠে, লিপস্টিক! আপনি কী করবেন?

বাসু ধমকে ওঠেন, আরে এ তো মহা জ্বালা! সব কিছুরই কৈফিয়ৎ চায়! লিপস্টিক নিয়ে আবার কী করব? সবাই যা করে, তাই। ঠোঁটে মাখব! দাও, দাও, ক্যুইক! এখনি মিনতি এসে যাবে।

একটু পরেই মিনতি চাবিটা নিয়ে ফিরে এল। তার হাতে দুটো ফুলের ব্যুকে।

বাসু বলেন, দুটো কেন? তুমিও একটা ফুলের ব্যুকে জগদীশকে দেবে নাকি?

—আজ্ঞে না। ঐ চার্চেই তো ম্যাডামের সমাধি আছে। চার্চে গেলেই আমি তাঁর জন্য কিছু ফুল নিয়ে যাই।

ওঁরা তিনজনে প্রথমে গেলেন আউট-হাউসে, জগদীশ পালের তালাবন্ধ ঘরে। কুকুরটা এখন নেই। তাই কোনও সারমেয়-প্রতিবাদ শুনতে হল না। ছোট্ট এক-কামরা ঘর। সংলগ্ন বারান্দাতে রান্নার আয়োজন। ঘরে একটা নেয়ারের খাটিয়া। ময়লা তোষক, চাদর, বালিশ। একটা প্যাকিং বাক্স। সেটা ছিল ওর টেবিল। লেখাপড়ার জন্য নয়, জিনিসপত্র রাখার। নস্যির ডিবে, গ্লাস, মাটির ভাঁড় অর্থাৎ অ্যাশট্রে। ঘরের বিপরীত অংশে একটা দেওয়াল আলমারি। পাল্লা নেই। তিন সারি কাঠের তাক। তাতে জগদীশের কিছু জামাকাপড়, কিছু বাসনপত্র— অধিকাংশই অ্যালুমিনিয়ামের বা হিন্ডেলিয়াম। নিচের তাকে কিছু খবরের কাগজ। বাসু মিনতির কাছে

জানতে চাইলেন, জগদীশ কি খবরের কাগজ পড়ত?

—আজ্ঞে না। এগুলো ডাক্তারবাবুর বাড়ি থেকে ও চেয়ে আনত। পুরানো কাগজ। আমার বামুনদির কাছ থেকে ময়দার আঠা বানিয়ে আনত। ঠোঙা বানাতো। দোকানে বেচে আসত। যা দুপয়সা বাড়তি রোজগার হয় আর কি।

সুজাতা ঘরে ঢোকেনি। বাইরেই অপেক্ষা করছিল। বাসু খুঁটিয়ে দেখছিলেন ঘরের সবকিছু। হঠাৎ মিনতির দিকে ফিরে বললেন, তুমি ওর ছেলের একটা ফটো পেয়েছিলে। সেটা কোথায় পেয়েছিলে?

—ওর খাটিয়ার নিচে ঐ দেখুন একটা টিনের স্যুটকেস আছে। ঐটা থেকে।

বাসু নিচু হয়ে দেখলেন। হ্যাঁ, সেখানে একটা স্যুটকেস আছে বটে। টেনে আনলেন সেটাকে। তার ভিতরে জগদীশের কিছু জামাকাপড়, একটা পেনসিল, একটা বাতিল চশমা, দেশলাই, কিছু বিড়ি, দুটো শাদা পোস্টকার্ড, আর এক কপি ইংরেজি পত্রিকা : 'বিজনেস ওয়ার্ল্ড'। প্রায় চার বছরের পুরানো। বাসু মিনতিকে জিজ্ঞেস করলেন, জগদীশ কি ইংরেজি জানত?

মাথা নেড়ে মিনতি বলল, না, নিশ্চয় না।

—দেন দিস ইজ মোস্ট ইনকম্প্যাটিবল অ্যান্ড মিস্টিরিয়াস।

—আজ্ঞে?

সুজাতা দ্বারের কাছ থেকেই কথোপকথন শুনছিল। বললে, হয়তো ডাক্তারসাহেবের বাড়ি থেকে ছবি দেখতে পত্রিকাটি এনেছিল। তারপর আর ফেরত দেওয়া হয়নি।

বাসু বললেন, এটা যদি স্টার ডাস্ট, ডেবনেয়ার, ইলাসট্রেটেড উইকলি বা স্পোর্টস-ওয়ার্ল্ড হত তাহলে হয়তো মেনে নিতাম। তাছাড়া ডক্টর ঠাকুরই বা বিজনেস ওয়ার্ল্ড কিনবে কেন? এটা তো ওর লাইনের নয়।

—হয়তো শেয়ার কেনাবেচার ঝোঁক আছে।

—নাঃ। খুঁটিয়ে দেখতে হচ্ছে পত্রিকা।

মিনতি বললে, কী দরকার? ওটা আপনি সঙ্গে করে নিয়েই যান না হয়। এমনিতে আমিও তো সব কিছু ঝেঁটিয়ে আঁস্তাকুড়েই ফেলে দেব।

বাসু পাতা উল্টাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটা পাতায় দৃষ্টি আটকে গেল ওঁর। তৎক্ষণাৎ বললেন, সেই ভাল। এটা নিয়েই যাই।

চার্চটা মরকতকুঞ্জের থেকে দূরে নয়। চার্চ গেটের বাইরে সড়কের ওপর গাড়িটা রেখে ওঁরা তিনজনে পদব্রজে এগিয়ে গেলেন। মিনতি একটি ফুলের তোড়া বাসুসাহেবের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে, নিন ধরুন। ম্যাডামের কবরে আপনিই এটা দেবেন।

বাসু বলেন, বাঃ! আমি কেন? তুমিই তো বরাবর দাও।

—আমি তো প্রায়ই আসি। ওঁর কবরে ফুল দিই। আপনি অনেক-অনেক দিন পর আজ এসেছেন আমার ইচ্ছাপূরণের জন্য। কিন্তু মেরীনগরে প্রথম এসেছিলেন ম্যাডামের ইচ্ছাপূরণের

জন্য। তাই নয়?

''ইচ্ছাপূরণ!'' বাসুসাহেবের মনে পড়ে গেল সব কথা। ততক্ষণে ওঁরা এসে উপস্থিত হয়েছেন সেই বিশেষ সমাধির কাছে। সমাধি ফলকে লেখা আছে : "SACRED/.. TO THE MEMORY OF/ ...PAMELA HARRIET JOHNSON/ ...DIED MAY 1, 1970/ ...'THY WILL BE DONE'".

'দাই উইল বি ডান'— 'তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী।'

বাসুসাহেব মাথা থেকে টুপিটা আগেই খুলেছিলেন। এবার ফুলের ব্যুকেটা নামিয়ে দিলেন সমাধির পাদমূলে।

ফাদার মার্লো মিনতির কাছে সব কিছু শুনে খুব অবাক হয়ে গেলেন। ইংরেজিতে বললেন, আমি নিশ্চিত, আপনি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে এতদূর এসেছেন ব্যারিস্টার সাহেব। জগদীশ পাল ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ, যাকে বলে নির্ভেজাল 'হ্যাভ-নট'! ও কোন ব্যারিস্টারের কাজিন-ব্রাদার হতেই পারে না।

বাসু হেসে বলেন, এতটা পেট্রল পুড়িয়ে এসেছি। দেখে যাব না? আপনি যদি অনুমতি করেন...

—ও শ্যিওর! আসুন আপনি আমার সঙ্গে। তা এঁরা দুজন...?

—না, ওরা এখানেই অপেক্ষা করুক। আমরা দুজনেই শুধু যাব। কিন্তু তার আগে আমি কিছু বড় ক্যান্ডল স্টিক কিনতে চাই। মা মেরীর মূর্তির সামনে দেব বলে।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়! আসুন ভিতরে।

মা মেরীর মূর্তির পাদদেশে মোমবাতি জ্বেলে দিয়ে বৃদ্ধ ফাদারের পিছু পিছু বাসুসাহেব এগিয়ে গেলেন চার্চের নিচে ভূগর্ভস্থ 'ডেথ-চেম্বারে'। কবরস্থ করার আগে মৃতদেহ এখানে রাখা থাকে। আপাতত মৃতদেহ মাত্র একটিই ছিল। সেটি আপাদমস্তক একটা শাদা চাদরে ঢাকা। ফাদার মোমবাতিটি বাড়িয়ে ধরলেন। তারপর ধীরে ধীরে মৃতের মুখের আবরণটি সরিয়ে দিলেন। বাসু ঝুঁকে পড়ে বেশ কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন : থ্যাংকস্, ফাদার, আমার দেখা হয়েছে।

—আপনার কাজিন-ব্রাদার নয় তো?

—না 'কাজিন' নয়। নেভারদিলেস্ হি ইজ মাই ব্রাদার। এঁকে কবরস্থ করার যাবতীয় ব্যয়ভার আমি বহন করব। মোটামুটি ভদ্র ব্যবস্থায় ক্রিশ্চিয়ান সমাধিতে যা খরচ পড়ে।

ফাদারের ভ্রূকুঞ্চন হল। বলেন, আপনি কি ক্রিশ্চিয়ান নন?

—নো ফাদার! আয়াম এ হিন্দু!

—আশ্চর্য! তাহলে কেন এ খরচ দিচ্ছেন? বিশেষ এ লোকটা যখন আপনার কাজিন ব্রাদার নয়?

বাসু মোমবাতির মৃদু আলোয় হাসলেন। বললেন, কাজিন না হওয়ার অপরাধে ঐ মৃত

ভ্রাতাটিকে প্রত্যাখ্যান করে যাওয়া বিশ্বভ্রাতৃত্বকে অবমাননা করা হত না কি?

ফাদার মার্লো বুকে ক্রুশচিহ্ন এঁকে অস্ফুটে বললেন, গড ব্লেস য়ু, মাই চাইল্ড।

বাসু বললেন, ও হো! একটা ভুল হয়ে গেছে। কাজিন জগদীশের জন্য একটা ছোট্ট ফুলের 'ব্যুকে' এনেছিলাম। সেটা আমার ভাগ্নীর কাছে রয়ে গেছে।

মার্লো বললেন, এই মাত্র বিশ্বভ্রাতৃত্ব নিয়ে আপনি যে কথাটা বলেছেন তাতে আমি আপনার ইচ্ছাপূরণ করব। একটু অপেক্ষা করুন। আমি ব্যুকেটা নিয়ে আসছি। এখানে একা একা...

—সার্টেনলি নট! এ কক্ষটা তো স্বর্গতোরণের সম্মুখে ওয়েটিং রুম মাত্র। আমি অপেক্ষা করব। কোন অসুবিধা হবে না আমার।

আর একটি মোমবাতি জ্বেলে বাসুসাহেবের হাতে ধরিয়ে দিয়ে আলখাল্লাধারী ধীর পদক্ষেপে ফিরে চললেন।

ফাদার মার্লো দৃষ্টিপথের বাইরে যাওয়া মাত্র বাসুসাহেব পকেট হাতড়ে বার করলেন তাঁর নোটবই আর সুজাতার লিপস্টিক। ক্ষিপ্রহস্তে মৃত জগদীশ পালের মৃত্যুশীতল দশটি আঙুলের ছাপ একে একে উঠে এল ওঁর নোটবইতে। আঙুল থেকে লিপস্টিকের দাগ মুছে দিয়ে আবার হাত দুটি শাদা চাদরের তলায় চালান করে দিলেন। আপাদমস্তক ঢাকা দেওয়া থাকল মৃতদেহ।

ফাদার মার্লো ফুলের 'ব্যুকে'টা নিয়ে একটু পরেই ফিরে এলেন। বাসু জগদীশের চাদরটা সরিয়ে ওর হাফশার্টের বুক পকেটে ফুলটা লাগিয়ে দিলেন। তারপর দুজনে ফিরে এলেন অফিসে। গরিব ঘরের একটি খ্রীস্টানের মরদেহ ভদ্রভাবে সমাধিস্থ করতে যা খরচ হয় সে অর্থ বাসুসাহেব একটি চেক কেটে ফাদার মার্লোকে দিলেন। ফাদার বিদায়কালে বললেন, আমি শুনেছি, এই জগদীশ পালের একটি পুত্রসন্তান আছে, তাকে খবর দেওয়া যায়?

বাসু বললেন, না ফাদার। যায় না। আমি জানি, কাজিন জগদীশের সেই ছেলেটি সম্প্রতি মারা গেছে। ও আমার কাজিন নয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিতও নয়।

প্রত্যাবর্তন পথে মিনতির বাড়িতে চা-পান করতেই হল।

* * *

ফেরার পথে বাসু একটা পেট্রল পাম্পে দাঁড়িয়ে গাড়িতে আবার কিছু পেট্রল ভরে নিলেন। ঐ সুযোগে পর পর দুটো ফোন করলেন কলকাতায়। রানী দেবী জানালেন ইতিমধ্যে বলবার মতো কোনও খবর জমেনি। কৌশিক বাড়ি নেই। কোথায় কোথায় ঘুরছে। বিরাটিতে নির্মলার বাড়িতে ফোন করলেন। নির্মলাই ধরল। জানালো, ইতিমধ্যে থানা থেকে পুলিশ এসেছিল। অপরাজিতার বিষয়ে অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে গেছে তারা। —না, জিতা দুপুরে লাঞ্চ করতে আসেনি। নির্মলার স্বামী সুশোভনও কোন ফোন-টোন করেনি। তা সেটা ওর স্বভাবও নয়। কোনকালেই ট্যুরে গেলে বাড়িতে ফোন করে না।

বাসু সুজাতাকে বললেন, হয় পুলিশ মৃতদেহটা শনাক্ত করতে পারেনি, অথবা ইচ্ছে করেই

খবরটা নির্মলাকে জানায়নি। কিন্তু অপরাজিতার পাত্তা পুলিশ পেল কী করে?

সুজাতা এ প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না। বাসু যতক্ষণ টেলিফোন করছিলেন ততক্ষণ সে ঐ 'বিজনেস ওয়ার্ল্ড' পত্রিকাটি উল্টেপাল্টে দেখছিল। এখন প্রশ্ন করে, মামু : আপনি এ পত্রিকার মধ্যে কী একটা দেখেছেন, যা আমার নজরে পড়ছে না। কী বলুন তো?

—কিছু একটা যে দেখেছি তাই বা তুমি ধরে নিচ্ছ কেন?

—প্রথম কথা, পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আপনাকে চমকে উঠতে স্বচক্ষে দেখেছি। দ্বিতীয় কথা, কিছু একটা সূত্র না পেলে আপনি এ পত্রিকাটি সঙ্গে নিয়ে আসতেন না। বলুন ঠিক কি না?

বাসু গাড়ি চালাতে চালাতেই বললেন, বলছি। তার আগে বলতো, সুশোভন রায় ওরফে পরেশ পালের মৃতদেহটা কোথায় পাওয়া গেছে?

—বিরাটি পার হয়ে বারাসতের দিকে যেতে এক ধনকুবেরের বাগানবাড়ির গেটের কাছে জঙ্গলের ভিতর।

—হুঁ। সেই ধনকুবেরের নামটা কী?

—গুড গড! তাইতো! নামটা মনে ছিল না বলেই এতক্ষণ ধরতে পারিনি। এই ইস্যুর 'বিজনেস ওয়ার্ল্ড'-এর কাভার স্টোরিটাই তো ঐ ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর উপর।

বাসু বললেন, অদ্ভুত কোয়েন্সিডেন্স, নয়? বাপ আর বেটা মারা গেল আটচল্লিশ ঘণ্টার এদিক-ওদিক। ছেলের মৃতদেহ পাওয়া গেল যে ধনকুবেরের প্রমোদভবনের দ্বারপ্রান্তে সেই লোকের কাভার স্টোরি-সুশোভিত ইংরেজি ম্যাগাজিন পাওয়া গেল তার বাপের স্যুটকেসে— যে বাপ ইংরেজি জানে না।

'কিউরিঅসার অ্যান্ড কিউরিঅসার!'

।। ছয় ।।

পরদিন ঘুম ভাঙতে ওঁর কিছু বেলা হল। বাইরে অকাল বর্ষণ হচ্ছে। প্রাতঃভ্রমণ আজ বাদ দিতে হয়েছে। প্রাতঃরাশ টেবিলে কৌশিককে না দেখতে পেয়ে সুজাতাকে প্রশ্ন করেন, তোমার কর্তাটি কোথায়?

—কাল অনেক রাত করে ফিরেছে। আবার আজ খুব সকালেই বেরিয়ে গেছে, বলেছে লাঞ্চে আসবে, একটা নাগাদ।

—ও কি ফিঙ্গার প্রিন্টগুলো নিয়ে গেছে?

—হ্যাঁ, কালই যত্ন করে ওর অ্যাটাচি কেসে তুলে রাখল।

এইসময় বেজে উঠল টেলিফোন। বাসু সাড়া দিতেই ভবানীভবন থেকে ইন্সপেক্টর বরাট বললে, সরি টু ডিসটার্ব য়ু, স্যার। আপনার মক্কেল বলছে আপনার অনুপস্থিতিতে সে কোনও

প্রশ্নের জবাব দেবে না।

—আমার মক্কেল! কে আমার মক্কেল?

—ঐ যে সুন্দরীটির নাম গতকাল আপনি আমাকে জানাতে রাজি ছিলেন না। বললেন, আইনে তার প্রভিশন্স নেই!

বাসু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, সরাসরি কথা বলুন ইন্সপেক্টর বরাট! আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনারা একজনকে অ্যারেস্ট করেছেন, যে ক্লেম করছে যে, সে আমার ক্লায়েন্ট। তার নাম কী?

—মিস অপরাজিতা কর।

—কোন কেসে তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে? কী চার্জ?

—চার্জ তো ফ্রেম হবে পরে। আপাতত তাকে আমরা উঠিয়ে এনেছি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে, ঐ ইন্দ্রনারায়ণবাবুর গেটে প্রাপ্ত মৃতদেহটা সম্বন্ধে। তা উনি বলছেন, আপনার উপস্থিতি ছাড়া তিনি কিছুই বলবেন না।

—অলরাইট। আমি এখনি আসছি!

টেলিফোনের লাইনটা কেটে দিয়ে বাসু এদিকে ফিরে বললেন, ওরা অপরাজিতাকে স্পট করল কী ভাবে? আশ্চর্য!

বাসু ভবানীভবনে হোমিসাইড লক-আপে চলে এলেন। অপরাজিতার সঙ্গে জনান্তিকে কথা হল। কোন সূত্র থেকে পুলিশ ওকে সন্দেহ করেছে তা অপরাজিতাও আন্দাজ করতে পারল না। তাকে পুলিশ খুঁজে পায় বেলা পাঁচটা নাগাদ। যে সম্ভাব্য ক্রেতার কাছে ওর যাওয়ার কথা ছিল সেখানে পৌঁছতেই অপেক্ষমাণ পুলিশে ওকে অ্যারেস্ট করে। তবে অপরাজিতা কোন কিছুই স্বীকার করেনি। কোনও জবানবন্দিও দেয়নি।

বাসু বললেন, দেবে না। ওরা তোমাকে কিছুতেই জামিন দেবে না। তোমাকে ক্রমাগত অনেক প্রলোভন দেখাবে। বলবে, আমরা জানি, আপনি খুন করেননি, আপনি নিরপরাধ, কিন্তু আপনি যেটুকু জানেন তা বলে দিন, এক্ষুনি আপনাকে ছেড়ে দেব। তুমি রাজি হয়ো না! ইন ফ্যাক্ট, তোমার জবানবন্দি এমনি বিচিত্র যে আমারই বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি কি কিছু গোপন করেছ, জিতা? অথবা কিছু মিছে কথা বলেছ?

অপরাজিতা দৃঢ়স্বরে বললে, না! আমি যা বলেছি তা আপনার কাছে যতই অবিশ্বাস্য মনে হোক, সেটাই সত্য! আদ্যন্ত সত্য!

—অলরাইট! আমি মেনে নিলাম। আগেও বলেছি, আবারও বলছি, সামান্যতম মিছে কথা বললেও তা তোমার কাছে 'বুমেরাং' হয়ে ফিরে আসতে পারে!... ঠিক আছে।

* * *

লাঞ্চে খেতে এল কৌশিক। বললে, অনেক খবর জমেছে। একে-একে বলি। প্রথম কথা, আপনি যখন হোমিসাইডকে প্রথম টেলিফোনে জানান যে, ইন্দ্রনারায়ণের গেটের কাছে একটি

যুবকের মৃতদেহ পড়ে আছে, তার আগেই হোমিসাইড সেটা জেনেছে। আপনি যখন রিপোর্ট করছেন সে সময় ঘটনাস্থলে চার-পাঁচজন অফিসার সরেজমিনে তদন্ত চালাচ্ছে। সার্চ করছে। ফটো তুলছে।

বাসু বলেন, ফার্স্ট রিপোর্ট কে করে? কটার সময়?

—আপনি রিপোর্ট করেছিলেন প্রায় সাড়ে এগারোটার সময়, অপরাজিতা এখানে এসে আপনাকে সব কথা বলার পর। কিন্তু সকাল নটা দশ মিনিটে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ি থেকে হোমিসাইডকে জানানো হয় যে, ঐ বাড়ির গেটের সামনে একটা মৃতদেহ পড়ে আছে।

—কে জানায়? ইন্দ্রনারায়ণ?

—না! ইন্দ্রনারায়ণের একান্ত সচিব। আসলে বাগানের মালিটা দরজার ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করছিল, অপরাজিতার প্রস্থান। হয় যুবতী নারী দেখার লোভে কিংবা দুরন্ত কৌতূহলে। সে দেখে, অপরাজিতা গেটের কাছে গাড়ি থামায়, নেমে আসে, এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে। তারপর জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়ে। একটু পরেই ফিরে আসে। মেয়েটির হাতে কী একটা ভারি জিনিস ছিল, সেটা সে তেঁতুল গাছটা লক্ষ্য করে ছুড়ে ফেলে দেয়। গাড়ি চালিয়ে দ্রুত চলে যায়।

—বুঝলাম। তারপর?

—মালিটার কৌতূহল হয়। অপরাজিতার গাড়ি চলে যেতেই সে নিজে এগিয়ে আসে তদন্তে। মৃতদেহটাকে আবিষ্কার করে। ঐ সময়েই গাড়ি নিয়ে এসে পড়েন চৌধুরীসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি পল্লব চট্টোপাধ্যায়। মালিটা তাঁকে সব কথা জানায়। মৃতদেহটা দেখায়। একটু আগে একটি মেয়ে একটা গাড়ি নিয়ে এসে সাহেবের খোঁজ করছিল, তাও জানায়। মালিটার মনে হয়েছিল, তেঁতুলতলার দিকে মেয়েটি কী একটা জিনিস ছুড়ে ফেলে। সেটা রিভলভারও হতে পারে। মিস্টার চ্যাটার্জি বলেন, তোমরা খোঁজাখুঁজির চেষ্টা কর না, প্রথমেই চল পুলিশে ফোন করে ব্যাপারটা জানাই। যা করার ওরাই করবে।

বাসু জানতে চান, মালিটার নাম কী?

—তা জানা হয়নি। খোঁজ নিলেই অবশ্য জানা যাবে।

বাসু বললেন, বুঝলাম। ফিঙ্গার প্রিন্টের কোন হদিস হল?

—হয়েছে। গোয়েন্দা দপ্তর ভীষণ কৌতূহলী : আপনি কী করে এই টিপছাপ সংগ্রহ করলেন। হয়তো স্বয়ং আই. জি., ক্রাইম আপনার কাছে জানতে চাইবেন।

—তার মানে, ফিঙ্গার প্রিন্ট একজন কুখ্যাত দাগী আসামীর? আর্চ ক্রিমিনাল? যাকে পুলিশে এতদিন খুঁজছে?

—আজ্ঞে না। তাহলে খুলেই বলি। আমি ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট থেকে এ তথ্য পেয়েছি, এটুকু জানিয়ে যে, টিপছাপগুলো কার, তা আমি জানি না; কিন্তু যে জানে তাকে জানি। ওরা আন্দাজ করেছে সে ব্যক্তি আপনি। কিন্তু পুলিশের কোন জুনিয়ার স্টাফ আপনাকে অ্যাপ্রোচ করতে সাহস করছে না। আই. জি., ক্রাইম দিল্লি গেছেন। কাল ফিরবেন। হয়তো কাল আপনার

সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

—তুমি কতটুকু কী জানতে পেরেছ?

কৌশিক দীর্ঘ একটি কাহিনী শোনালো :

বিশ বছর আগে মুম্বাইয়ের ক্রুফোর্ড মার্কেটে একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়— প্রায় দশ লাখ টাকা। পুলিশ ডাকাতদের ধরে; কিন্তু টাকাটার হদিস পায় না। তিনজন মূল আসামীরই যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড হয়। আসামী তিনজনের নাম : বিশ্বনাথ যাদব, জগদীশ পাল আর চাঁদু রায়। একজন বিহারী, দুজন বাঙালি। বছর তিনেক মেয়াদ খাটার পর তিনজনই জেলের পাঁচিল টপকে পালায়। পাঁচিলের বাইরে ডাকাতদলের পার্টির লোক ছিল। জিপ নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ঠিক তখনি পাগলা ঘণ্টি বাজে। পুলিশে তাড়া করে। ঘটনাচক্রে সে রাত্রে পুলিশের এক বড়কর্তা জেলখানা পরিদর্শনে এসেছিলেন। তিনিই দু-তিনখানি জিপ নিয়ে ওদের তাড়া করেন। তারপর কিছুটা হিন্দি সিনেমার কেরামতি। দুপক্ষই গুলি চালায়। বিশ্বনাথ যাদব এবং ডাকাতদলের জিপ ড্রাইভার ঘটনাস্থলেই মারা পড়ে। আহত জগদীশ পাল ধরা পড়ে; কিন্তু চাঁদু রায় পালিয়ে যায়। ঐ এনকাউন্টারে একজন কনস্টেবল আর ঐ পুলিশের বড়কর্তাটি মারা যান। সেই থেকে বিভিন্ন স্টেটের পুলিশ এবং সি. বি. আই. আর্চ ক্রিমিনাল চাঁদু রায়কে খুঁজছে। জগদীশ পাল দীর্ঘদিন মেয়াদ খেটে ছাড়া পায়। বোম্বাইয়ের একটা বস্তিতে অতি দীনহীনভাবে বাস করতে থাকে। বছরখানেক নজর রেখে পুলিশের ধারণা হয়, জগদীশের সঙ্গে চাঁদুর কোনও যোগাযোগ বর্তমানে নেই। তাছাড়া অপহৃত ঐ টাকার পাত্তাও জগদীশ জানে না। তারপর হঠাৎ একদিন দেখা গেল, জগদীশ সেই মুম্বাই বস্তি থেকে উধাও। পুলিশের ধারণা, ইচ্ছে করেই বছরখানেক জগদীশ পাল মুম্বাইয়ের ঐ বস্তিতে কৃচ্ছ্রসাধন করেছে। পুলিশের সন্দেহভঞ্জন করতে। আমি কাল আপনার দেওয়া ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে হাজির হবার দুঘণ্টার মধ্যে ওরা ঐ ফিঙ্গারপ্রিন্ট শনাক্ত করে। নিঃসন্দেহে জগদীশ পালের। আমাকে খুব চাপাচাপি করে। এটা এভিডেন্স, আমি গোপন করতে পারি না। যেহেতু আমি লাইসেন্সড গোয়েন্দা, ইত্যাদি। আমি বাধ্য হয়ে বলেছি— আমি জানি না, আপনি কোথা থেকে কীভাবে এগুলো সংগ্রহ করেছেন। আপনার নামটা জানিয়ে দেওয়ার পর ওরা আমাকে নিষ্কৃতি দেয়। এখন বেড়ালের গলায় কে ঘণ্টাটা বাঁধবে এই নিয়ে ওরা গবেষণা করছে। সম্ভবত আই. জি., ক্রাইম দিল্লি থেকে ফিরে এসে আপনাকে ফোন করবেন। আমার ধারণা, পুলিশের কেস রেডি। ওরা দু-এক দিনের মধ্যেই আসামীর বিরুদ্ধে চার্জ ফ্রেম করবে।

—মাইতির হিসাব মতো হত্যাকারী অপরাজিতা কর?

—তাছাড়া কে? মালিটা স্বচক্ষে দেখেছে তাকে রিভলভারটা ছুড়ে ফেলতে। পুলিশ তেঁতুলতলা থেকে সেটা নিশ্চয় উদ্ধার করেছে। তাতে যদি অপরাজিতার আঙুলের ছাপ থাকে তাহলে তো সোনায় সোহাগা। কারণ, যতদূর মনে হয়, ব্যালিসটিক এক্সপার্ট কম্পারিজিন মাইক্রোস্কোপে প্রমাণ করবেন যে, রিভলভারের এক্সপেন্ডেড বুলেটটা...

বাসু বাধা দিয়ে বলেন, তোমাকে ও নিয়ে পণ্ডিত্বেমি করতে হবে না। তুমি তোমার কাজ

করে যাও। ইন্দ্রনারায়ণের গতিবিধির ওপর তোমার লোক নজর রাখছে তো?

—হ্যাঁ, ডবল শিফটে।

—না, ওটা ট্রিপল শিফট করে দাও। তিন-আষ্টা চব্বিশ। সর্বক্ষণ ইন্দ্রনারায়ণ কোথায় থাকছে, কার-কার সঙ্গে দেখা করছে, আমি বিস্তারিতভাবে জানতে চাই।

—সুজাতা বলে, আমি একটা আন্দাজে ঢিল ছুড়ব মামু? ওয়াইল্ড গেস্?

—ছোড়!

—আপনি ফর্মুলাটা তৈরি করে ফেলেছেন এভাবে : শ্রীমান চাঁদু রায় ইকুয়াল্টু ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী!

বাসু বললেন, উঃ! কী দারুণ গোয়েন্দা! শোন বাপু! এটা আর এখন আন্দাজে ঢিল ছোড়ার পর্যায়ে নেই। এটা এখন দুয়ে-দুয়ে চার! জগদীশ জেল থেকে ছাড়া পাবার পর আর তার পুরনো বন্ধুবান্ধবদের সন্ধান পায় না। পনের-বিশ বছরে দুনিয়াটা আদ্যোপান্ত পাল্টে গেছে। পুলিশের নজর এড়াতে নয়, হয়তো সত্যিই অর্থাভাবে জগদীশ মুম্বাইয়ের বস্তিতে পড়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। ও আন্দাজ করেছিল, লুণ্ঠিত টাকাটা মূলধন করে চাঁদু এতদিনে হয়তো কোটিপতি। কিন্তু চাঁদু নিজের খোল-নলচে সম্পূর্ণ বদলে ফেলেছে। তাকে চেনা যাচ্ছে না। আমার আন্দাজ, জগদীশ বইয়ের স্টলে গিয়ে 'বিজনেস ওয়ার্ল্ড' পত্রিকার পাতা ওল্টাতো। প্রতি সংখ্যাতেই এক-একজন বিজনেস ম্যাগনেটের ওপর ওতে তখন ছবিসহ কভার স্টোরি ছাপা হত। জগদীশ বইয়ের স্টলের একান্তে দাঁড়িয়ে প্রতিটি সংখ্যার পাতা উল্টে ছবি দেখত। হয়তো স্টলওয়ালাকে বিড়ি-টিড়ি খাইয়ে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিল। জগদীশের অবস্থা তখন 'ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর'। তারপর একদিন— বছর চারেক আগে— ক্ষ্যাপা পরশ পাথরটা খুঁজে পেল। ফটো দেখে চাঁদুকে চিনতে পারল। মাথার ঘাম পায়ে ফেলা টাকায় ঐ সংখ্যাটা কিনে ফেলল। টিকিট কেটে বা না কেটে যেমন করেই হোক, চলে এল কলকাতায়। ওর মতো ভ্যাগাবন্ডের পক্ষে কোটিপতির সাক্ষাত পাওয়া নিতান্ত অসম্ভব। কিন্তু 'চিচিং ফাঁক' মন্ত্রটা জগদীশ ঘটনাচক্রে শিখে ফেলেছে। ইন্দ্রনারায়ণের লেটার বক্সে সে চিঠি ফেলে দিল। ব্ল্যাকমেলিং-এর প্রস্তাব। না হলে জগদীশ সোজা চলে যাবে লালবাজারে। চাঁদুর ফিঙ্গারপ্রিন্ট সযত্নে রাখা আছে লালবাজারে।

রানী বললেন, তুমি যা বলছ, তার একটাই বিরুদ্ধ-যুক্তি। জগদীশ যদি চাঁদু রায়ের সন্ধান পেত এবং দেখত যে সে ইন্দ্রনারায়ণ, তাহলে সে মেরীনগরে এককামরা-ঘরে ঠোঙা বানাতো না, কলকাতায় ফ্ল্যাটবাড়ি কিনত। টিভি, ফ্রিজ আর গাড়ি কিনত!

কৌশিক বললে, আই এগ্রি!

বাসু বললেন, তোমার যুক্তিপূর্ণ সওয়ালের জবাবটা দিই রানু : আমার আন্দাজটা পুরোপুরি সত্যি না হলেও মোটামুটি সত্য হতে পারে! ধরা যাক, ঘটনাপ্রবাহ অন্যরকম হয়েছিল। হয়তো জগদীশ মুম্বাইয়ের 'বিজনেস ওয়ার্ল্ড' পত্রিকাটি দেখেনি। স্ত্রী-পুত্রের খোঁজ নিতে মেরীনগরে এসেছিল প্রথমে। মিনতির বদান্যতায় মাথাগোঁজার আশ্রয় পায়। ইতিমধ্যে হয়তো তার একটা

হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। সে প্রায়-অথর্ব। যেহেতু পরেশ পালের বাল্যজীবন কেটেছে মেরীনগরে তাই পরেশের কোন বন্ধুবান্ধবের মাধ্যমে হয়তো জগদীশ তার পুত্র পরেশ পালের বারাসাতের ঠিকানাটা জোগাড় করতে পারে। ধরা যাক, কাকতালীয়ভাবে ঐ সময়েই সে 'বিজনেস ওয়ার্ল্ড' পত্রিকাটি হাতে পায়। ও নিজে হার্ট পেশেন্ট। তাই ছেলেকে চিঠি দেয়। পরেশ জানত, বাবা জেলখাটা আসামী— কিন্তু একথাও জানত যে, ব্যাঙ্ক-লুটের কয়েক লক্ষ টাকার হদিস পাওয়া যায়নি। হয়তো জগদীশ সেকথার ইঙ্গিত দিয়েই পুত্রকে দেখা করতে বলেছিল। এ পর্যন্ত যা বলেছি তা কি কোন কারণে অসম্ভব মনে হচ্ছে তোমাদের কারও কাছে? কী? রানু? কৌশিক?

কেউ কোন জবাব দেয় না।

—ধরা যাক, পরেশ এসে বাপের সঙ্গে দেখা করল। চাঁদু রায়ের বর্তমান পরিচয় জেনে গেল। ব্ল্যাকমেলিং শুরু করল জগদীশ নয়, পরেশ। বাবাকে মাঝে মাঝে দয়া করে দু-তিনশ টাকা মনি-অর্ডার করে। তাই নখদন্তহীন জগদীশ— যে একদিন চলন্ত জিপ থেকে পুলিশের সঙ্গে গুলি বিনিময় করেছে— সে ডাক্তারের বাড়ি থেকে পুরানো কাগজ নিয়ে এসে ঠোঙা বানায়। পুত্রের ভিক্ষায় টিকে থাকে। আর এদিকে পরেশ পাল শুধু শর্মিষ্ঠাকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। নতুনত্বের স্বাদে নির্মলাকে বিয়ে করে বসে। বাড়ি বানায়, গাড়ি কেনে, দু-দুটি সংসারের খরচ চালায়। আর হয়তো সেই কারণেই মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে চাঁদু রায়ের দুই শত্রু— বাপ ও বেটা, মৃত্যুবরণ করে।

সুজাতা বলে, আপনি কি সন্দেহ করছেন, 'আপনার কাজিন ব্রাদার' জগদীশ পালের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি?

—না, তা সন্দেহ করছি না। কিন্তু এটা আশঙ্কা করছি যে, চাঁদু রায়ের চর যেই সংবাদ নিয়ে আসে যে, মেরীনগরে জগদীশ পালের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে সেই মুহূর্তেই চাঁদু ব্যবস্থা করে পরেশ পালের অস্বাভাবিক মৃত্যুর— এমন কায়দায় যাতে হত্যাপরাধটা বর্তায় অপরাজিতার স্কন্ধে। তাহলেই সে বাকি জীবন নিশ্চিন্ত।

কৌশিক বলে, আপনি এখন কী করতে চান?

—ইন্দ্রনারায়ণকে নজরবন্দি রাখতে। পুলিশ শুনছি রেডি। আমার মক্কেল জামিন পায়নি। সম্ভবত দু-চারদিনের মধ্যেই দায়রা জজের আদালতে কেসটা উঠবে। নোটিস পাওয়া মাত্র আমি ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর উপর আদালতের সমন জারি করতে চাই। রানু, তুমি নোটবইটা নিয়ে এস তো— আমি এখনি ডিকটেশনটা দিয়ে তৈরি হয়ে থাকতে চাই। যাতে মুহূর্তমধ্যে তারিখ বসিয়ে সমনটা ধরানো যায়!

কৌশিক বলে, কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী একজন বিজনেস ম্যাগনেট, সেন্ট্রাল ক্যাবিনেটের অনেকের সঙ্গে তাঁর দহরম-মহরম।

—সো হোয়াট? সে তো হর্ষদ মেহতারও ছিল। ইন্দ্রনারায়ণ কি ভারতীয় নাগরিক নয়?

—কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মামলার সঙ্গে তাঁর যে কোনও সম্পর্ক নেই!

—আপাতদৃষ্টিতে না থাকলে দৃষ্টিভঙ্গিটা বদলাতে হবে। সেটা আমার দায়িত্ব। তুমি চিন্তা কর না। ও— ভাল কথা! একটা তথ্য আমি জানতে চাই। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী কি ধূমপান করে? করলে কী?— পাইপ, চুরুট না সিগারেট? যদি চুরুট বা সিগারেট হয় তাহলে কী ব্র্যান্ড?

—এসব তথ্য জেনে আপনার কী লাভ?... আচ্ছা আচ্ছা... আয়াম সরি... আপনি রাগ করবেন না— আমি জেনে নিয়ে আপনাকে জানাব।

।। সাত।।

অপরাজিতা যে জামিন পাবে না এতটা আশঙ্কা করেননি বাসু। আজকাল দাগী মাস্তানেরাও ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে জামিন পেয়ে যায়— এক্ষেত্রে একটি মহিলা, যাঁর নামে কোন পুলিশ রেকর্ডই নেই, তাঁকে ম্যাজিস্ট্রেট জামিন দেবেন না— এটা সত্যিই অপ্রত্যাশিত। বোধহয় তার হেতু আসামী কোন জবানবন্দি দিতে অস্বীকার করেছে। অবশ্য আসামী জামিন না পাওয়ায় বাসুসাহেবের আবেদনক্রমে বিচারক পুলিসকে নোটিস দিয়েছিলেন সাতদিনের মধ্যে চার্জ ফ্রেম করে কেসে ফাইল করতে হবে। মোট কথা, বুধবার উনিশে জানুয়ারি মামলার প্রথম শুনানীর দিন পড়েছে। পুলিশ চার্জ ফ্রেম করে ফাইল করেছে— ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার : পূর্ব পরিকল্পিত হত্যা।

মামলার নোটিস পাওয়ামাত্র বাসুসাহেব ধনকুবের ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর উপর আদালতের সমন জারি করলেন। বারাসাতে দায়রা জজের আদালতে প্রতিবাদী পক্ষের সাক্ষী হিসাবে ইন্দ্রনারায়ণকে বুধবার, উনিশে জানুয়ারি উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

ইতিমধ্যে কৌশিক আরও নানান তথ্য সংগ্রহ করেছে। প্রথম কথা, রিভলভারটা খুঁজে পাওয়া গেছে। তাতে একটিমাত্র ডিসচার্জড বুলেট। ব্যালিসটিক এক্সপার্টের কী রিপোর্ট তা জানা যায়নি। সেটা গোপন রাখা হয়েছে। এমনকি রিভলভারের গায়ে অপরাজিতার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে কি না, তাও জানা যায়নি। তবে এটুকু জানা গেছে যে, রিভলভারটা ক্রয় করেছিলেন স্বয়ং ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, প্রায় মাস ছয়েক আগে। ওঁর বাড়িতে সে সময় একটা চোর আসে। চুরি কিছু করতে পারেনি। দারোয়ানের তাড়া খেয়ে পালায়। সে সময় ইন্দ্রনারায়ণ পশ্চিম ভারতে ছিলেন। ফিরে এসেই ঐ লাইসেন্সটি করান। রিভলভার কেনেন, নিজের নামেই লাইসেন্স কিন্তু দারোয়ানের নামে কেরিয়ার লাইসেন্স করানো হয়।

বাসু সব শুনে বলেন, চমৎকার! সে রিভলভার অপরাজিতার কাছে গেল কী করে?

কৌশিক বলে, সে কৈফিয়ৎ তো আসামী দেবে!

—না! লাইসেন্স-হোল্ডার দেবে। কখন কী ভাবে সে রিভলভারটা হারায়। সে কি তৎক্ষণাৎ পুলিশে রিপোর্ট করেছিল? না করে থাকলে, কেন করেনি?

কৌশিক বলে, ইন ফ্যাক্ট, করেনি। দারোয়ান সেটা হারায়। ভয়ে স্বীকার করেনি। যতদূর মনে

হয়, খরচপত্র করে চৌধুরীসাহেব একটা ব্যাকডেটেড রিপোর্ট লিখিয়ে এসেছেন। লোকাল থানায় এবং লালবাজারে আমর্স অ্যাক্ট সেকশনে। সত্যি-মিথ্যে জানি না। আর একটি দুঃসংবাদ আছে, মামু। আসামী ভেঙে পড়েছে। সে একটা জবানবন্দি দিয়েছে। যা আপনাকে বলেছে হুবহু তাই।

—পুলিশ কি সেই 1757 নম্বর গাড়িটা ট্রেস করতে পেরেছে?

কৌশিক বলে, সম্ভবত না। পুলিশের মতে আসামী যদি সত্যি কথা বলে থাকে তাহলে ঐ 1757 নম্বর-প্লেটটা ফেক — জাল। আর আসামী যদি গল্পটা বানিয়ে বলে থাকে তাহলে 1757 নম্বর গাড়িটার মালিক কে, তা খোঁজার মানেই হয় না। তাছাড়া ঐ নম্বরের আগে WBA থেকে WBM পর্যন্ত কী আছে তা তো অপরাজিতাও বলতে পারছে না।

বাসু বললেন, বুঝলাম। কিন্তু পরেশ পালের মারুতি-সুজুকি গাড়িখানা? সেটার কত নম্বর তা তো নির্মলাও জানে, শর্মিষ্ঠাও জানে। সেই গাড়িটা কোথায়?

কৌশিক বলে, সেটাও একটা চরম রহস্য। সে গাড়িটা হাওয়ায় উবে গেছে। পরেশ পাল ওরফে সুশোভন রায় ইন্দ্রনারায়ণের বাড়ির গেট পর্যন্ত নিশ্চয় নিজের গাড়ি চেপে যায়নি। কারণ, তাহলে গাড়িটা কাছে-পিঠে কোথাও না কোথাও থাকত। তা নেই।

বাসু বললেন, নট নেসেসারিলি। হয়তো কোনও গাড়ি-চোর সুযোগ বুঝে সেটা নিয়ে কেটে পড়েছে। এতদিনে নেপাল বর্ডার পার হয়েছে বা বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছে।

কৌশিক বলে, তাও হতে পারে।

বাসু প্রশ্ন করেন, বাই-দ্য-ওয়ে! সিগারেট কেস দুটো এনেছ? আর লাইটার?

কৌশিক বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। একটা মামিমার টেবিলে রেখে এসেছি। এই নিন আপনারটা।

পকেট থেকে একটা ঝকমকে জার্মান সিলভারের মসৃণ সিগারেট কেস আর লাইটার বার করে দেয়। বাসু সিগারেট কেসটা খুলে দেখে বললেন, ইন্ডিয়া কিং? এই ব্র্যান্ডই খায় ও?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তাই তো খবর।

বাসু রুমাল দিয়ে সিগারেট কেসটা ভাল করে মুছে ওঁর টেবিলের একান্তে রাখলেন। কৌশিক বলে, এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না, মামু? এ যেন সেই গোষ্ঠমামার ফাঁদ পাতার কায়দা : 'দ্যাখ বাবাজি দেখবি নাকি'... ধরা যাক, ইন্দ্রনারায়ণ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এল— মানে ঐ 'সমন' ধরানোর জন্য প্রতিবাদ জানাতে— কিন্তু সে কি নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে সতর্কভাবে সচেতন নয়? সিগারেট কেস সে ছোঁবে?

বাসু বললেন, ও আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে এ একেবারে নির্ঘাৎ। কারণ আঠারোই জানুয়ারি ওর টোকিও ফ্লাইট বুক করা আছে। একটা বিজনেস কনফারেন্সে যাচ্ছে ও। উনিশ তারিখ কলকাতায় থাকলে তার সমূহ লোকসান। সে একবার আমার সঙ্গে দরবার করতে আসবেই। আমি তাকে সিগারেট অফার করব। সে খুবই উত্তেজিত থাকবে। যদি ভুলে সিগারেট কেসটা ছোঁয় তাহলে তার আঙুলের ছাপ ওতে পড়বেই। লাইটারটাতেও পড়বে। যদি অতি সুকৌশলে সে ওটা এড়িয়ে যায় বা যদি হাতে গ্লাভস পরে দেখা করতে আসে তাতেও আমার

সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হবে।

ওঁরা দুজনে কথা বলছিলেন বাসুসাহেবের চেম্বারে। এই সময় টেলিফোন যন্ত্রটা সজীব হয়ে উঠল। পাশের ঘর থেকে রানী দেবী টেলিফোনে জানালেন, বারাসাত থেকে মিস্টার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এসেছেন। তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। জানতে চাইলেন, বাসু কি পাঁচ মিনিটের জন্য সময় দিতে পারবেন?

বাসু কৌশিকের দিকে তাকিয়ে একটা চোখ বন্ধ করে বললেন, 'পড়-পড়-পড়, পড়বি পাখি, ধপ!' তারপর টেলিফোনে জানালেন, ওঁকে বসতে বল। আমি যে ক্লায়েন্টের সঙ্গে কথা বলছি তাঁকে বিদায় করেই ওঁকে ডাকব। পাঁচ মিনিটের মধ্যে। জিজ্ঞেস কর, চা-কফি খাবেন কি না। নিশ্চয় বলবে, না। তখন বল, হ্যাভ আ স্মোক!

রানী বললেন, সে তো জানাই আছে। অলরাইট।

লাইন কেটে দিলেন। বাসু ঘড়ি দেখলেন। কৌশিক রুমাল দিয়ে ঝকঝকে সিগারেট কেসটা আবার মুছে দিয়ে ধীরপদে পিছনের দরজা দিয়ে নিঃশব্দে কেটে পড়ল।

বাসু মিনিট পাঁচেক চোখ বুজে যেন ধ্যান করলেন। তারপর টেলিফোনটা তুলে নিয়ে পাশের ঘরে জানতে চাইলেন, ও কী করছে? বসে আছে? না পায়চারি করছে?

—দ্বিতীয়টা।

—সিগারেট কেসটা ছুঁয়েছে?

—না!

—ওকে ভিতরে পাঠিয়ে দাও।

পরমুহূর্তে দড়াম করে খুলে গেল রিসেপশনের দিকের দরজাটা। ঝড়ের বেগে প্রবেশ করলেন ধনকুবের ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। বাসুসাহেবের প্রায় সমবয়সী, কিছু ছোট হতে পারেন। থ্রি পিস দামী স্যুটে আপাদমস্তক টিপটপ। ডোর ক্লোজারের অমোঘ আকর্ষণে ওঁর পিছনে দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। ঘরে একজস্ট-ফ্যানটা চালু আছে।

আগন্তুক উচ্চকণ্ঠে বললেন, বাসু! আমার নাম ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। এর মানেটা কী? হিপপকেট থেকে এক গোছা কাগজ বার করে উনি টেবিলে প্রায় ছুড়ে ফেলে দিলেন। সেটা আদালতের সমন।

বাসু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাসলেন। বললেন, আমার রিসেপশনিস্ট ইতিমধ্যে নামটা জানিয়েছেন। অল রাইট চৌধুরী, আমার নাম পি. কে. বাসু! এভাবে ঝড়ের বেগে আমার ঘরে প্রবেশ করার কী অর্থ?

—কারণ তোমার আচরণে আমি উন্মাদ হয়ে গেছি।

বাসু বললেন, অল রাইট! এখনো যদি নিজেকে উন্মাদ বলে মনে কর, তাহলে একই রকম ঝড়ের বেগে ঐ দরজা দিয়েই উল্টোপথে বেরিয়ে যেতে পার। প্রবেশ আর প্রস্থান একই রকম ড্রামাটিক টেম্পোয় হবে! আর যদি আলোচনা করার ইচ্ছে থাকে তবে ঐ চেয়ারটায় বস। লেটস

টক ইট ওভার।

—কথা বলতেই তো এসেছি সেই বারাসাত থেকে।

—তাহলে বস। ধীরে সুস্থে আলোচনা করা যাক!

—বসার কোন প্রয়োজন নেই। আমার বক্তব্য সামান্য। আমার যা বলার দাঁড়িয়ে বলতে পারব!

—অ্যাজ য়ু প্লিজ। তবে আপনি মাননীয় অতিথি। অযাচিত আমার বাড়িতে এসেছেন। আপনি না বসলে আমার বসাটা ভাল দেখায় না। ঠিক আছে, বলুন, আপনার বক্তব্য। না হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনব।

ইন্দ্রনারায়ণ সামনের সোফাটায় বসলেন। বললেন, লুক হিয়ার, মিস্টার বাসু। আপনি অহেতুক আমাকে এ কেসে জড়াচ্ছেন। আমি কেসটার বিন্দুবিসর্গও জানি না। তাছাড়া টোকিয়োতে আমার একটা অত্যন্ত জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আমার প্লেনের টিকিট পর্যন্ত কাটা আছে।

বাসু বললেন, আয়াম সরি! বুঝতে পারছি, আপনার কিছুটা অসুবিধা হবে। হয়তো কিছুটা আর্থিক লোকসানও। কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন, মিস্টার চৌধুরী! — এটা একটা ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার কেস। মেয়েটি তরুণী! তার ফাঁসিও হয়ে যেতে পারে।

—আমি তার কী করতে পারি? আমি তো এ কেসের বিন্দুবিসর্গও জানি না!

—সো কলড মার্ডার ওয়েপনটার লাইসেন্স আপনার নামে।

—তাতে কী? সেটা কিনেই আমি আমার দারোয়ানকে দিয়েছি। দায়দায়িত্ব সমস্ত সেই দারোয়ানের। সেটা সে কী ভাবে খোয়ালো...

—এগুলোই তো আদালতে প্রতিষ্ঠা করতে চাই! আপনার সাক্ষ্যটা অত্যন্ত প্রয়োজন!

—কী ভাবে? কী কারণে?

—বলছি! আপনি উত্তেজিত হয়ে থাকলে চলবে না। আমার বক্তব্যটা শুনুন। আর পরেও যদি মনে করেন যে আপনার সাক্ষ্যটাতে আসামীর কোন উপকার হবে না, তাহলে আমি আপনাকে অব্যাহতি দেব। প্লিজ সোবার ডাউন অ্যান্ড জাজ মাই আর্গুমেন্টস...

চৌধুরী বললেন, অল রাইট, বলুন?

—হ্যাভ আ সিগার...

ড্রয়ার টেনে একটা সিগারের প্যাকেট বার করেন।

চৌধুরী বলেন থ্যাংস, নো, আমি সিগার খাই না। সিগারেট খাই।— কোটের পকেটে হাত চালান।

বাসু তৎক্ষণাৎ বলেন, ইন্ডিয়া কিং চলবে?

—ওটাই আমার ব্র্যান্ড।

চৌধুরী এ পকেট সে পকেট হাতড়াতে থাকেন।

বাসু বলেন, ঐ সিগারেট কেসটাতে ইন্ডিয়া কিং আছে। আমার ভিজিটার্সদের জন্য। আমি নিজে পাইপ খাই। প্লিজ হেলপ য়োরসেলফ।

ইন্দ্রনারায়ণ অম্লানবদনে জার্মান সিলভারের সিগারেট কেস থেকে একটি ইন্ডিয়া কিং নিয়ে ধরালেন। বললেন, এবার বলুন?

—লোকটা খুন হয়েছে আপনার জমিতে। তার গাড়িটা চুরি গেছে আপনার বাড়ির সামনে থেকে। ফার্স্ট ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে আপনার বাড়ির টেলিফোন ব্যবহার করে। সো-কলড মার্ডার ওয়েপনের লাইসেন্স আপনার নামে। সেটা পাওয়া গেছে আপনার জমিতে। প্রতিবাদীর তরফে আপনার সাক্ষ্য অপরিহার্য!

ইন্দ্রনারায়ণ একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলেন, আই বেগ টু ডিফার! আমি নই; আমার বাড়ির অনেকে— মালি, দারোয়ান, এফ. আই. আর. যে করেছে সেই চ্যাটার্জি, এদের আপনি কাঠগড়ায় তুলতে পারেন। নিশ্চয় পারেন। আমাকে নয়। আয়াম সরি— আমি ব্যক্তিগতভাবে এ কেসের বিন্দুবিসর্গ জানি না। যে লোকটা খুন হয়েছে তাকে আমি চিনি না, জীবনে কখনো দেখিনি। যে মেয়েটিকে পুলিশে আসামী খাড়া করেছে তাকেও আমি চিনি না, জীবনে কখনো দেখিনি। আমার মালি যখন আসামীর সঙ্গে কথা বলে তখন আমি ঘুমোচ্ছি। আমি তাই প্রতিবাদী পক্ষে সাক্ষী দিতে পারব না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে আমাকে কাঠগড়ায় তুললে আপনার মক্কেলের ক্ষতিই হবে। এই আমার শেষ কথা। আমাকে আপনি অব্যাহতি দিন— বিনিময়ে আমি বাইরে থেকে প্রভাব খাটিয়ে যেটুকু সম্ভব আপনার উপকার করতে পারি করব, আই মীন, আপনার মক্কেলের।

বাসু বললেন, এই যদি আপনার শেষ কথা হয় তাহলে আমারও শেষ কথা : আয়াম সরি মিস্টার চৌধুরী। আদালতে আপনাকে হাজিরা দিতেই হবে। আমি সমনটা প্রত্যাহার করতে পারব না।

আধ-খাওয়া সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ইন্দ্রনারায়ণ। বললেন, আমি জানতাম। সত্যি কথা বলতে কি, আমি স্বেচ্ছায় আসিনি। আমার কোম্পানির আইন বিশারদেরা আমাকে বাধ্য করেছে এভাবে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রত্যাখ্যাত হতে। এর কী মর্মান্তিক ফলাফল হবে আপনি কি তা বুঝতে পারছেন?

—আয়াম সরি! না, মিস্টার চৌধুরী। একটু বুঝিয়ে বলুন না।

—আপনি আদালতের ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন। ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির একটি অপূরণীয় ক্ষতি করছেন। কারণ টোকিয়োতে যে বাণিজ্যিক সম্মেলনে আমার আমন্ত্রণ হয়েছে তাতে আমি উপস্থিত থাকলে ভারতের বাণিজ্য লাভবান হবে। আমি আপনাকে সাবধান করে যেতে চাই, মিস্টার বাসু। আমি কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে কম্পেনসেশন ক্লেম করব।

বাসু সহাস্যে বললেন, ইটস য়োর প্রিভিলেজ অ্যান্ড উইদিন য়োর লিগাল রাইটস।

ইন্দ্রনারায়ণ আর কথা বাড়ালেন না। ঝড়ের বেগে চলে গেলেন।

ইন্দ্রনারায়ণের লিমুজিন দৃষ্টিপথের বাইরে যেতেই বাসুসাহেবের চেম্বারে হুড়মুড়িয়ে ঢুকলেন রানী, সুজাতা আর কৌশিক।

কৌশিক বলে, শেষ পর্যন্ত কী হল গোষ্ঠমামা? 'এই যাঃ! গেল ফস্‌কে ঘেঁষে?' সিগারেট কেসটা ছুঁলো না তো?

বাসু ধমকে ওঠেন, জ্যাঠামো কর না। ঐ সিগারেট কেস আর লাইটারটা সাবধানে উঠিয়ে নাও। দুটোতেই ইন্দ্রনারায়ণের আঙুলের ছাপ আছে। চাঁদুর ফিঙ্গারপ্রিন্ট তো তুমি সংগ্রহ করেই রেখেছ। কতক্ষণের মধ্যে রিপোর্ট পাব?

কৌশিক বলে, স্ট্রেঞ্জ। আপনি সাকসেসফুল? ধরুন ঘণ্টা দেড়েক। আমি আপনার গাড়িটা নিয়ে বের হচ্ছি। ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টকে খবর দেওয়াই আছে। আঙুলের ছাপ বিষয়ে উনি কলকাতায় একজন অথরিটি। ফরেনসিক ইন্সটিটিউটে অধ্যাপনা করেন ঐ আঙুলের ছাপ বিষয়ে।

রানী বললেন, লোকটা এত সহজে তোমার ফাঁদে ধরা দেবে এটা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না বাপু। চাঁদু রায় পনের-বিশ বছর পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে লুকিয়ে আছে, সে জানে তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পুলিশ-রেকর্ডে সযত্নে রাখা আছে। সে জানে, তার গুলিতে পুলিসের একজন বড়কর্তা মারা গেছিল— পুলিস তাকে প্রতিহিংসা নিয়ে খুঁজছে, শুধু কর্তব্যবোধে নয়।

বাসু বললেন, দেখা যাক।

একটু পরেই বাইরের ঘরে বেল বাজল। সুজাতা দেখে এসে বলল, আদালতের প্রসেস-সার্ভার। আপনাকে কিছু কাগজপত্র দিতে চায়।

—আসতে বল।

প্রসেস-সার্ভার ভিতরে এসে নমস্কার করে বলল, আমার কোন অপরাধ নেবেন না, স্যার। আমি আদালতের নির্দেশে কাজ করি।

—জানি। কী কাগজ আছে? দাও।

—বারাসতের শ্রী ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী আদালতের কাছে আবেদন করেছেন আপনার সমনটা নাকচ করতে, এছাড়া উনি আপনার বিরুদ্ধে এক কোটি টাকার একটা ড্যামেজ সিভিল স্যুটও এনেছেন— এই দাবি করে যে, আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে, বিশেষ ব্যক্তিগত উদ্দেশে তাঁর বাণিজ্যিক ক্ষতি করতে আদালত প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন।

বাসু বললেন, কী আনন্দ! দাও, কাগজগুলো সই করে দিই।

লোকটা কাগজপত্র সই করিয়ে নিয়ে চলে গেল। সুজাতা বলল, একটু কফি-ব্রেক করলে কেমন হয়?

বাসু বললেন, হোক!

কফি পান শেষ হতে হতেই টেলিফোনটা বাজল।

বাসুই হাত বাড়িয়ে তুললেন। আত্মপরিচয় দিতেই ও প্রান্ত থেকে কৌশিক বলল, মামু,

দুঃসংবাদ আছে...

—বলো! সুসংবাদ আবার কবে দিতে পারবে তুমি?

—আমি ডাক্তার গোস্বামীর বাড়ি থেকেই ফোন করছি, মানে সেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট...

—বুঝেছি। এত শীঘ্র ফটো তুলে ডেভেলপমেন্ট হয়ে গেল?

—না মামু। উনি পাউডার-ডাস্টিং করেই বললেন, ফটো তুলে এনলার্জ করার দরকারই হবে না। ম্যাগনিফাইং গ্লাসেই বোঝা যাচ্ছে— এ দুটো ফিঙ্গারপ্রিন্টে কোন মিলই নেই। চোরে-চোরে মাস্তুতো ভাইয়ের সম্পর্ক আছে কি না জানি না— কিন্তু দুটো প্রিন্ট সম্পূর্ণ ভিন্ন গ্রুপের! ভিন্ন মানুষের!

বাসু জবাব দিলেন না।

কৌশিক বলে, কী বললাম বুঝতে পেরেছেন?

বাসু ক্র্যাডেলে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন। নীরবে।

রানী জিজ্ঞেস করলেন, ইন্দ্রনারায়ণ তাহলে চাঁদু রায় নয়?

—তাই তো দেখছি এখন! আশ্চর্য!

—এদিকে ইন্দ্রনারায়ণ তো তোমার বিরুদ্ধে এক কোটি টাকার খেসারত দাবি করে মামলা ঠুকেছেন। কী করবে?

বাসু পাইপে তামাক ঠেশতে ঠেশতে বললেন, মুম্বাই-এর বস্তিতে জগদীশের ছেড়ে-আসা সেই ঝুপড়িটা খালি আছে কি না খোঁজ নিতে কৌশিককে মুম্বাই পাঠাব ভাবছি।

—মানে? কী হবে সে খোঁজে? —রানী দেবী হালে পানি পান না।

—মানে, বলছিলাম কি নিউ আলিপুরের বাড়িটা বেচলেও তো এক কোটি টাকা হবে না। ঐ বস্তিতে ঝুপড়ি ভাড়া নিতে হবে আর কি। তুমি আমি দুজনে বাকি জীবন না হলে থাকব কোথায়?

।। আট ।।

বুধবার, উনিশে জানুয়ারি, সকালে বারাসাতে চব্বিশ পরগনা নর্থের দায়রা জজের আদালত বসল।

অভিজ্ঞ বিচারক টি. কে. আনসারি আদালতের উপর চোখ বুলিয়ে দেখলেন। আদালতে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। তার কারণ একাধিক। প্রথমত, খুনী আসামী তরুণী, অবিবাহিতা, সেলস গার্ল। দ্বিতীয়ত, কাগজে নানান সাংবাদিক ঘটনাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। কেউ কেউ এ কথাও ইঙ্গিতে বলেছেন যে, নিহত ব্যক্তি নাকি হিন্দু ম্যারেজ-অ্যাক্টকে কদলী প্রদর্শন করে দু-দুটি বিবি পুষতেন— দুটি বিভিন্ন স্থানে। সাংবাদিকের মতে, নিহত ব্যক্তির

বিশ্বাস ছিল, 'নাল্পে সুখমস্তি'। মহিলা সেলস গার্লের দিকে তাই হাত বাড়িয়েছিলেন। ফলে 'ভূমৈব সুখম' বস্তুটা কী তা অস্থিতে অস্থিতে বুঝতে পেরেছেন। তৃতীয়ত, বারাসাতের এক স্বনামখ্যাত ধনকুবের নাকি এক বিখ্যাত ব্যারিস্টারের বিরুদ্ধে এক কোটি টাকার সিভিল স্যুট এনেছেন। এই মামলারই সেটি এক শাখা মামলা।

বাদী-প্রতিবাদী প্রস্তুত কি না জেনে নিয়ে এবং আসামী তার চেয়ারে বসে আছে দেখে নিয়ে বিচারক লক্ষ্য করলেন, বাদীপক্ষে কলকাতার পাবলিক প্রসিকিউটর নিরঞ্জন মাইতিও উপস্থিত। যদিও জেলার পি. পি. সখারাম হাজরাও হাজিরা দিয়েছিলেন বাদীপক্ষে।

বিচারক বলেন, মিস্টার পি. পি., আপনি আপনার প্রথম সাক্ষীকে আহ্বান করতে পারেন।

তৎক্ষণাৎ তড়াক করে উঠে দাঁড়ান মাইতি সাহেব। একটি 'বাও' করে বলেন, ইফ দ্য কোর্ট প্লিজ, বিচার শুরু হওয়ার আগেই আমি একটি বিষয়ে হুজুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আদালতে একটি 'মোশন' পেন্ডিং আছে, এই মামলা সংক্রান্ত আবেদনই। বারাসাতের শ্রী ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী হুজুরের কাছে আবেদন করেছেন তাঁর নামে যে সমন প্রতিবাদী পক্ষ থেকে জারি করা হয়েছে সেটা 'কোয়াশ' করতে।

—কী কারণ দেখিয়ে? —জানতে চাইলেন দায়রা জজ।

মাইতি বললেন, মিস্টার চৌধুরীর পক্ষের আইনজীবীরাও আদালতে উপস্থিত আছেন। কিন্তু সাধারণভাবে আমি আদালতে একথা পেশ করতে পারি যে, আবেদনকারীর মতে প্রতিবাদী পক্ষের ব্যারিস্টার মিস্টার পি. কে. বাসু তাঁর আদালত প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। ইচ্ছাকৃতভাবে মিস্টার চৌধুরীর পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রামে বাধা সৃষ্টি করা ছাড়া প্রতিবাদীর অ্যাটর্নির আর কোন উদ্দেশ্য নেই। মিস্টার চৌধুরী আগামীকাল টোকিয়োতে একটি কনফারেন্সে যোগ দিতে আহূত হয়েছেন। সেটাকে বানচাল করাই মিস্টার বাসুর একমাত্র উদ্দেশ্য।

বিচারক বাসুসাহেবের দিকে ফিরে বললেন, আপনার মতে মিস্টার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সাক্ষ্য আবশ্যিক?

—আমি তাই মনে করি, য়োর অনার।

মাইতি পুনরায় বলেন, ইফ দ্য কোর্ট প্লিজ, মিস্টার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী না চেনেন আসামীকে, না নিহত ব্যক্তিকে। তাঁর বাড়ির দারোয়ান, মালি, একান্তসচিব ইত্যাদি অনেকের সাক্ষ্য হয়তো প্রয়োজন হবে— বাদীর অথবা প্রতিবাদীর— কিন্তু মিস্টার চৌধুরীর সাক্ষ্যে প্রতিবাদীর আইনজীবী ঠিক কী প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন? তা জানালে আমরা তা স্টিপুলেটও করে দিতে পারি।

বাসুর দিকে ফিরে জাজ আনসারি জানতে চান, আপনি এ বিষয়ে কী বলেন, মিস্টার বাসু?

বাসু উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, য়োর অনার, এ প্রশ্নের জবাব দেবার পূর্বে আমি আদালতের কাছে জানতে চাইব, অ্যাডভোকেট মাইতিকে কেন এ কেস কন্ডাক্ট করতে কলকাতা থেকে ছুটে আসতে হয়েছে? পাবলিক মানি খরচ করে সরকার তো এ জেলায় একজন পাবলিক

প্রসিকিউটার নিযুক্ত করেছেন। আমরা দেখতেও পাচ্ছি তিনি আদালতে উপস্থিত। তা সত্ত্বেও কেন ঐ সিনিরয় মোস্ট পি. পি.-কে কলকাতা থেকে এখানে এসে সওয়াল করতে হচ্ছে? এ প্রশ্নের জবাব পেলে আমরা আদালতের প্রশ্নটির জবাব দিতে পারি।

দায়রা জজকে প্রশ্নটা করতে হল না। নিরঞ্জন মাইতি নিজে থেকেই বললেন, য়োর অনার! এই ফৌজদারী মামলার একটি দেওয়ানী শাখা গজিয়েছে। মিস্টার চৌধুরী একটি পৃথক মামলায় মিস্টার পি. কে. বাসুর বিরুদ্ধে এক কোটি টাকার খেসারত দাবি করেছেন। এই মামলায় সমন ধরানোর জন্য ক্ষতিপূরণ।

বাসু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আদালত যে প্রশ্ন তুলেছেন সহযোগীই তার উত্তর দিয়েছেন। উনি চাইছেন, আমি আমার ডিফেন্স ট্যাকটিক্স আগেভাগে জানিয়ে দিই, আর মিস্টার চৌধুরী তাঁর বক্তব্যটা স্টিপুলেট করে অব্যাহতি পান। তাহলে পরবর্তী মামলাটা ওঁদের পক্ষে জেতা সহজ হবে।

জজসাহেব বললেন, মিস্টার চৌধুরী যদি বলেন গাছেরও খাব, তলারও কুড়াব তা তো চলবে না। হয় কেকটা খাবেন, নয় সঞ্চয় করবেন। তিনি মনস্থির করে আদালতকে জানান, তিনি কোনটা চাইছেন? সমন থেকে মুক্তি, না দেওয়ানী আদালতে খেসারতের দাবি। কোনটা?

দর্শক-আসনের প্রথম চেয়ারখানি দখল করে বসেছিলেন ইন্দ্রনারায়ণ। সঙ্গে দুজন ব্যারিস্টার। কলকাতা থেকেই এসেছেন। ইন্দ্রনারায়ণ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, য়োর অনার, এই আদালতে প্রতিবাদী পক্ষ আমার উপর যে সামনস জারি করেছেন তা থেকে আমি অব্যাহতি চাই এবং লিগাল রাইটস অনুসারে যে কম্পেন্সেশনের মামলা লড়েছি তাও আমি চালিয়ে যেতে চাই।

বিচারক আনসারি তৎক্ষণাৎ বললেন, দ্য মোশান ইজ ডিনায়েড। মিস্টার চৌধুরীকে এ আদালতে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না প্রতিবাদীপক্ষ তাঁকে সাক্ষীর মঞ্চে তোলেন। নাউ মিস্টার পি. পি., আপনি আপনার প্রথম সাক্ষীকে ডাকতে পারেন।

পি. পি. সখারাম হাজরা একের পর একজনকে সাক্ষী হিসাবে মঞ্চে তুলে ধীরে ধীরে তাঁর কেসটা গড়ে তুলতে থাকেন। প্রথমে এলেন একজন আমিন। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ি ও জমির স্কেলে-আঁকা নকশা দাখিল করলেন। মৃতদেহটি কোথায় পাওয়া গেছে তা ঐ নকশায় দেখানো হয়েছে। এরপর এলেন ইন্সপেক্টর বরাট। তিনি জানালেন, এগারো তারিখ, বুধবার সকাল নয়টা নাগাদ বারাসাতের ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ি থেকে লোকাল থানায় জানানো হয়, ওখানে একটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। পরে থানার নির্দেশে ঐ বাড়ি থেকেই হোমিসাইড সেকশনে সরাসরি একটি ফোন আসে। জানানো হয় যে, ঐ বাড়ির গেটের কাছে জঙ্গলের ভিতর একটি যুবকের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ পড়ে আছে। খবরটা পেয়েই বরাট লোকাল থানায় যোগাযোগ করে। তদন্ত করার কথা বারাসাত থানার; কিন্তু যেহেতু মৃতদেহটি একজন ভি. আই. পি.-র বাগানবাড়িতে পাওয়া গেছে সে নিজেই কিছু লোকজন নিয়ে বারাসাতে চলে যায়। মিস্টার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে সে দেখা করেনি, প্রয়োজনও বোধ করেনি। যিনি টেলিফোনে খবর দিয়েছিলেন সেই একান্ত-সচিব মিস্টার পল্লব চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা হয়। মৃতদেহটি সে পরীক্ষা

করে। যুবক। বছর ত্রিশ বয়স। ঊর্ধ্বাঙ্গে গরম সোয়েটার, নিম্নাঙ্গে জিনস-এর প্যান্ট। তার পকেটে মানিব্যাগে এক হাজার বত্রিশ টাকা ছিল। এছাড়া সিগারেট কেস, লাইটার, রুমাল ছাড়াও হিপ-পকেটে ছিল আট ইঞ্চি ব্লেডের একটা তীক্ষ্ণ ছোরা— যার বোতাম টিপলে খাপ থেকে ব্লেডটা বার হয়ে আসে। আর ছিল তার ড্রাইভিং লাইসেন্স। তা থেকে জানা যায়, মৃতের নাম পরেশচন্দ্র পাল। মিস্টার পল্লব চ্যাটার্জি জানান যে, তিনি পৌনে নয়টা নাগাদ আসেন। আসতেই ঐ বাড়ির মালি জানায় যে, বাগানে একটি মৃতদেহ পড়ে আছে। তিনি সেটা স্বচক্ষে দেখে প্রথমে থানায় ও পরে হোমিসাইডে ফোন করেন। তিনি আরও জানান যে, সকাল সাড়ে-আটটা নাগাদ একটি মেয়ে একটা স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড গাড়ি চেপে চৌধুরীসাহেবের বাড়িতে আসে। বেল বাজানোতে বাড়ির মালি দরজা খোলে, কথাবার্তা বলে। সাহেব ঘুমোচ্ছেন শুনে মেয়েটি বলে দশটার পরে ফিরে আসবে। কিন্তু গেটের কাছাকাছি এসে মেয়েটি তার গাড়ি থামায়। গাড়ি থেকে নেমে আসে...

বাসুসাহেব আপত্তি জানালেন। বললেন, য়োর অনার, আমরা এতক্ষণ আপত্তি করিনি যেহেতু সাক্ষী দিচ্ছেন স্বয়ং ইনভেস্টিগেটিং অফিসার। কিন্তু ক্রমশই দেখা যাচ্ছে তিনি 'হেয়ার-সে' রিপোর্টের হিমালয় বানাতে শুরু করেছেন। আসামীর অনুপস্থিতিতে মিস্টার চ্যাটার্জি মালির কাছে কী শুনেছিলেন তা গ্রাহ্য হতে পারে না বর্তমান সাক্ষীর মুখে। সহযোগী ইচ্ছা করলে মিস্টার চ্যাটার্জি অথবা মালিকেই সাক্ষীর মঞ্চে তুলতে পারেন। তখন সেটা এরকম থার্ডহ্যান্ড রিপোর্ট হবে না।

বিচারক বললেন, অবজেকশান সাসটেইন্ড।

বরাট অতঃপর জানালো— মিস্টার চ্যাটার্জি মেয়েটির দৈহিক বর্ণনা দিয়েছিলেন। তার স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড গাড়ির নম্বরটাও জানিয়েছিলেন। সেই সূত্র থেকেই বেলা পাঁচটা নাগাদ আসামীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভবপর হয়। সার্চ করার সময় তেঁতুলগাছটার গুঁড়ির কাছে সে একটি পয়েন্ট থ্রি টু রিভলভার কুড়িয়ে পায়। তাতে পাঁচটা টাটকা এবং একটি ব্যয়িত বুলেট ছিল। সেটা সে তার ব্যাগ খুলে দেখায়।

বাসুর অনুমতি নিয়ে সেটি আদালতে পিপলস একজিবিট 'A' রূপে চিহ্নিত হয়ে নথিভুক্ত হল। ঐ সঙ্গে মৃতের পকেটে প্রাপ্ত সবকিছুই আদালতে নথিভুক্ত হল। পি. পি. বাসুকে বললেন : জেরা করতে পারেন।

বাসু বললেন, ইন্সপেক্টার বরাট, আপনি বললেন যে, চৌধুরীসাহেবের একান্তসচিব আসামীর পোশাক ও চেহারার বর্ণনা দিয়েছিলেন। তিনি ঠিক কী কী বলেছিলেন— মানে যতটা আপনার মনে আছে— জানাবেন কি?

বরাট একটু বিজ্ঞের হাসি হেসে বললে, 'মনে থাকাথাকির' প্রশ্ন উঠছে না, স্যার। উনি যা-যা বলেছিলেন, আমি তখনি তা নোটবুকে টুকে নিয়েছিলাম। পড়ে শোনাচ্ছি, শুনুন : কোট শ্যামবর্ণা, সুঠাম চেহারা, চোখে চশমা নেই, বয়স পঁচিশ থেকে সাতাশের মধ্যে, উচ্চতা পাঁচ-দুই

থেকে পাঁচ-তিন, ওজন অ্যারাউন্ড পঞ্চান্ন কেজি। পরনে বাসন্তী রঙের শাড়ি, বেগুনী পাড়। ঐ বেগুনীরঙের ম্যাচিং ব্লাউজ। পায়ে মিডিয়াম হিল কালো জুতো। ও এসেছিল একটা নীলচে রঙের স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ডে চেপে। নম্বর : WBF 9850! —আনকোট!

বাসু বলেন, বাঃ! বেশ সিসটেমেটিক্যালি নোট রেখেছেন তো। এবার আমি জানতে চাইছি— আপনি ডাইরেক্ট এভিডেন্সে 'ভাববাচ্যে' জানিয়েছিলেন যে, খবরটা টেলিফোনে জানানো হয় মিস্টার চৌধুরীর বাড়ি থেকে। আমার প্রশ্ন : ফোনটা কে করেছিলেন? এবং ঠিক কটায়?

নোটবই দেখে বরাট বলল, ফোন করেন মিস্টার পল্লব চ্যাটার্জি পি. এ. টু মিস্টার চৌধুরী। সকাল নয়টা দশ মিনিটে। উনি বললেন, একটু আগে উনি ওখানে পৌঁছেছেন। মালির কাছে সব কিছু শুনে, নিজে প্রাথমিক তদন্ত করে তারপর উনি প্রথমে লোকাল থানায়, পরে তাদেরই নির্দেশে সরাসরি হোমিসাইডে ফোন করেছেন।

—মালির নামটা কী?

—সুবল।

—নামের পরে উপাধি-টুপাধি কিছু আছে?

—নিশ্চয় আছে। আমি লিখে রাখিনি।

—বুঝলাম। তারপর আপনি মোটর ভেইকেলসে যোগাযোগ করে জানতে পারেন যে, ঐ WBF 9850 গাড়িটা আসামীর, তাই তো?

—আজ্ঞে না। মোটর ভেইকেলস জানায়, ওটা একটা কোম্পানির গাড়ি। ইন ফ্যাক্ট ঐ কোম্পানিতেই কাজ করেন আসামী। সেখানে যোগাযোগ করে আমরা যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করি।

বাসু জানতে চাইলেন, ঘটনাস্থলে যে রিভলভারটি পাওয়া যায় তার লাইসেন্স কার নামে খোঁজ নিয়েছিলেন কি?

—নিশ্চয়ই। এটা তো রুটিন কাজ। রিভলভারটি মাসছয়েক আগে কলকাতার সি. সি. বিশ্বাসের দোকান থেকে কিনেছিলেন বারাসাতের শ্রীইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। লাইসেন্স তাঁরই নামে, তবে ওটা বরাবর থাকত দারোয়ান মিশিরলালের কাছে। তার কেরিয়ার লাইসেন্স আছে।

—আপনি কি লাইসেন্স হোল্ডারের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, কীভাবে তাঁর রিভলভারটা ঐ জঙ্গলে চলে যায়?

—আজ্ঞে না। আমি জানতে চাইনি। কারণ মিস্টার চৌধুরী আটই জানুয়ারি বারাসাত পুলিশ স্টেশনে এবং লালবাজারে আর্মস-অ্যাক্ট সেকশনে জানিয়েছিলেন যে, ওটা চুরি গেছে।

—এ নিয়ে আপনারা কি কোন তদন্ত করেছিলেন? কীভাবে, কবে, কখন সেটা চুরি গেল?

—আজ্ঞে আমি করিনি। এটা হোমিসাইডের কাজ নয়। যাঁর কাজ তিনি করেছিলেন কি না আমি জানি না।

—কী আশ্চর্য! আপনার কি কখনো সন্দেহ হয়নি যে, ওটা এ কেসের মার্ডার ওয়েপন হলেও হতে পারে?

—সন্দেহ কি বলছেন, স্যার? ব্যালিস্টিক এক্সপার্টের রিপোর্ট তো আমি নিজে চোখে দেখেছি। ওটাই তো মার্ডার ওয়েপন!

—তখনও আপনি মিস্টার চৌধুরীর জবানবন্দি নিলেন না?

—আজ্ঞে না। কারণ কবে, কীভাবে ওটা চুরি গেছে তা তো উনি আটই জানুয়ারি বিস্তারিত রিপোর্টে জানিয়েছেন।

বাসু বললেন, দ্যাটস অল, য়োর অনার।

এরপর সাক্ষী দিতে এলেন অটপ্সি-সার্জেন। তাঁর মতে মৃত্যু হয়েছে সোমবার, নয় তারিখ সন্ধ্যা ছয়টার পর এবং রাত এগারোটার আগে। মৃত্যুর হেতু একটি পয়েন্ট-থ্রিটু বুলেট, যা নিহত ব্যক্তির হৃদপিণ্ড ভেদ করে শিরদাঁড়ায় আটকে যায়। বুলেটটি শবব্যবচ্ছেদের সময় উদ্ধার করে তিনি ব্যালিস্টিক এক্সপার্টকে হস্তান্তরিত করেন।

ব্যালিস্টিক এক্সপার্ট জানালেন তিনি নিঃসন্দেহ যে, অটপ্সি-সার্জেনের কাছ থেকে পাওয়া বুলেটটি পিপলস্ একজিবিট 'A' চিহ্নিত রিভলভার থেকেই নিক্ষিপ্ত।

এরপর এক ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট এলেন সাক্ষী দিতে। মাইতির প্রশ্নের জবাবে জানালেন, ঐ পিপলস্ একজিবিট 'A' চিহ্নিত রিভলভারে দুটি ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে, যা নিঃসন্দেহে আসামীর দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর।

বাসু এঁদের কাউকেই কোন জেরা করলেন না।

পি. পি. উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, য়োর অনার, এবার আমরা নিহত ব্যক্তির পরিচয়টা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। মৃতের পকেট থেকে একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া গেছে, সেটি আদালতে 'D' চিহ্নিত এক্‌জিবিট। সে লাইসেন্স পরেশচন্দ্র পালের নামে। ফটো দেখে বোঝা যায় যে, সেটি নিহত ব্যক্তির। তবু সেটা প্রতিষ্ঠা করতে— করার প্রয়োজনও যে আছে, তা পরে আমরা ব্যাখ্যা করে দেখাব— আমাকে একটি অপ্রীতিকর কাজ করতে হচ্ছে। মৃত পরেশচন্দ্র পালের বিধবা শর্মিষ্ঠা পালকে আমি সাক্ষীর মঞ্চে উঠে বসতে বলছি।

সাদা কালো-পাড় শাড়ি পরা সদ্যবিধবা শর্মিষ্ঠা পাল সাক্ষ্য দিতে ওঠে। প্রথামাফিক শপথবাক্য পাঠ করে। পি. পি.-র প্রশ্নের উত্তরে তার নাম, ঠিকানা জানায়। স্বীকার করে সে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী। আট বছর আগে পরেশ পালের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। তার একটি পুত্রসন্তান আছে। স্বামীর মৃতদেহ সে দেখেছে এবং সৎকারেও অংশ নিয়েছে।

পি. পি. বলেন, মিস্টার বাসু, আপনি কি জেরা করবেন?

বাসু ও বাহুল্য প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সাক্ষীকে বলেন, মিসেস পাল, আমি চেষ্টা করব আমার জেরাকে যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করতে, আর কম বেদনাদায়ক করতে। আপনি যখন পরেশবাবুকে বিবাহ করেন, তখন তিনি কী করতেন?

—কাশীপুর গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন।

—কী কাজ?

—ঠিক কী কাজ জানি না। শ্রমিক হিসাবে কোনও সেকশনে কাজ করতেন।

—সে কাজ উনি কবে ছেড়ে দেন? তারপর কী করতেন?

—প্রায় তিন বছর আগে সে কাজ ছেড়ে দিয়ে উনি বিজনেস শুরু করেন। এখন তাই করতেন।

—কিসের বিজনেস?

—সেটা আমি জানি না। জানতে চাইলে উনি বিরক্ত হতেন। তবে বিজনেস থেকে ওঁর উপার্জন ভালই হত।

—পরেশবাবু মারা যাবার পর ওঁর খাতাপত্র ঘেঁটে আন্দাজ করতে পারেননি, উনি কিসের বিজনেস করতেন?

—না। খাতাপত্র বা হিসাব লেখার বই কিছুই খুঁজে পাইনি।

—কিন্তু ব্যাঙ্কের পাস বই, এন. এস. সার্টিফিকেট বা শেয়ারের কাগজ কিছু পেয়েছেন কি? পেলে সব কিছুর মোট অ্যাসেট কত হবে— নেহাত আন্দাজে?

পি. পি. আপত্তি করেন, এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। এভাবে বাসু ওঁকে বাধ্য করতে পারেন না সাক্ষীর অ্যাসেট কত তা জানাতে।

আদালতের নির্দেশের অপেক্ষা না রেখে বাসু বলেন, অলরাইট, আই উইথড্র। মিসেস পাল, আপনাদের গাড়ি ছিল তা আমরা জানি। আপনার বাড়িতে ফ্রিজ, টি.ভি. টু-ইন-ওয়ান, ভি. সি. পি. এই চারটি বস্তুর মধ্যে কোন্ কোন্‌টি আছে?

পি. পি. আবার আপত্তি করেন : অবজেকশন। অন দি সেম গ্রাউন্ডস।

জজসাহেব বলেন, এগুলি ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বা শেয়ার সার্টিফিকেটের মত গোপনে রাখা যায় না। অবজেকশন ইজ ওভাররুল্ড! মিসেস পাল, আপনি ওঁর প্রশ্নের জবাব দিন।

—চারটিই আছে।

—বাড়িটা তো ভাড়া বাড়ি?

—আজ্ঞে না। উনি এটা কিনেছেন।

—মাত্র তিন বছর আগে যিনি ছিলেন কারখানার শ্রমিক, তিনি কীভাবে এত শীঘ্র এত সম্পদের মালিক হলেন তা জানবার কৌতূহল কখনো হয়নি আপনার?

—অবজেকশন য়োর অনার। সাক্ষীর প্রশ্নটি কনক্লুশন সংক্রান্ত।

বাসু এবারও বিচারকের নির্দেশের অপেক্ষা না করে বললেন, দ্যাটস অল য়োর অনার।

পি. পি.-র পরবর্তী সাক্ষী ইন্দ্রনারায়ণের বাগানের মালি। খেটো ধুতি, হাফ শার্ট, মাথায় পাগড়ি। জানা গেল তার নাম, সুবলচন্দ্র সাঁই। সে ঐ বাগানবাড়ির মালিই শুধু নয়। মালিকের

অনুপস্থিতিতে সে হচ্ছে কেয়ারটেকার। ওর অধীনে আরও তিনজন মালি ও দারোয়ান আছে। একজন ঠাকুরও আছে। পি. পি. তার মাধ্যমে একটি বিশেষ তথ্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। জানতে চাইলেন, আসামীকে তুমি আগে কখনো দেখেছ?

—দেখেছি হুজুর। এগারো তারিখ সকালে, উনি যখন বেল বাইজে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন।

—তোমার সঙ্গে তাঁর কী কী কথা হল, যতদূর মনে আছে বলে যাও।

সাক্ষী বর্ণনা দিল। অপরাজিতা বাসুসাহেবকে যা-যা বলেছিল তাই। সাহেব বোম্বাই থেকে ফিরেছেন কি না, ইত্যাদি।

—তারপর কী হল?

—আমি ওঁরে বললাম, দশটা নাগাদ আইসতে। উনি গাড়ি করে গেটের পানে চলি গেলেন। আমি দরজা বন্ধ করলাম; কিন্তু পুরোটা নয়। ইক্‌টুখান ফাঁক রেখে অঁর উপর নজর রাখলাম। যতক্ষণ না উনি গেট ছাড়্যে চলি যান।

—তারপর কী দেখলে?

সাক্ষী পুলিশের কাছে জবানবন্দি দেবার সময় ইতিপূর্বে যা বলেছে, পুনরায় তাই বলল।

—আসামী ঐ তেঁতুলগাছের দিকে কী ছুঁড়ে ফেলে দিল তা তুমি দেখনি?

—দেকিছি। কিন্তু অত দূর থেকে জিনিসডারে সনাক্ত করতে পারিনি। কালো মতন ভারি কোন দোব্য।

—সেটা কি একটা রিভলভার হতে পারে?

বাসু বলেন, অবজেকশন। ইটস্ এ কনক্লুশন অব দ্য উইটনেস।

সুবলচন্দ্র বোধকরি বুঝতে পারল না যে, এখন তার চুপ করে থাকার কথা। একবার বাসুসাহেবের দিকে দেখে নিয়ে পি. পি.-কে বললে, হতিও পারে, নাও হতি পারে। হলপ নিয়ে তা আমি বলতে পারবনি বাবু।

জাজ রুলিং দিলেন, শেষ প্রশ্নটি অবৈধ। তার জবাবটাও। কেসের বিবরণ থেকে তা বাদ দিতে। পি. পি. বাসুকে বললেন, য়োর উইটনেস।

বাসু এগিয়ে এলেন। সুবলচন্দ্রকে আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, মিস্টার সাঁই, আপনি কী ভাবে আদালতে এসেছেন? চৌধুরীসাহেবের গাড়িতে চড়ে কি?

সুবল মরমে মরে গিয়ে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর! কিন্তুক আমারে 'আপনি' বলি কথা বলবেন না।

বাসু ভ্রূক্ষেপ করলেন না। বললেন, আপনি নিশ্চয় ড্রাইভারের পাশের সিটে বসেছিলেন। আর চৌধুরীসাহেব, দুই ব্যারিস্টার নিয়ে পিছন দিকে। তাই নয়?

পি. পি. বলেন, অবজেকশন য়োর অনার! ইররেলিভ্যান্ট!

—অবজেকশন সাসটেইন্ড!

বাসু এবারও কর্ণপাত করলেন না। একই সুরে প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে গেলেন, এবার বলুন, ড্রাইভারের গায়ে যে শার্ট ছিল তার কী রঙ, প্যান্টের কী রঙ, তার পায়ে কী ছিল, চটি, কাবলি, না ফিতে বাঁধা জুতো? জুতো হলে কী রঙ?

পি. পি. পুনরায় দাঁড়িয়ে ওঠেন, অবজেকশন এগেন। সহযোগী প্রশ্নোত্তরকে কোথায় নিয়ে যেতে চান?

এবার দায়রা জজ আনসারি বললেন, ওয়েল কাউন্সেলর, এসব প্রশ্ন আপনি কেন করছেন একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন কি?

—শিওর! তবে তার আগে একটা অনুরোধ আছে, য়োর অনার। ইন্সপেক্টর বরাট তাঁর নোট বই থেকে যেটুকু পাঠ করে শুনিয়েছিলেন সেটা কোর্ট-রেকর্ডারকে একবার পড়ে শোনাতে বলুন—

দায়রা জজের নির্দেশে কোর্ট-রেকর্ডার পড়ে শোনালো— "শ্যামবর্ণা, সুঠাম চেহারা, চোখে চশমা নেই, বয়স পঁচিশ থেকে সাতাশের মধ্যে, উচ্চতা পাঁচ-দুই থেকে পাঁচ-তিন, ওজন অ্যারাউন্ড পঞ্চান্ন কে.জি.। পরনে বাসন্তী রঙের শাড়ি, বেগুনি পাড়। ঐ রঙেরই ম্যাচিং ব্লাউজ...

বাসু তাকে থামিয়ে দিলে বললেন, এনাফ! এনাফ!

জজসাহেবের দিকে ফিরে বাসু বললেন, বাদীপক্ষের মতে, আসামী যখন ডোরবেল বাজায় তখন থেকে সে যখন গেট পার হয়ে চলে যায় তখন পর্যন্ত একমাত্র এই সাক্ষী, মিস্টার সুবলচন্দ্র সাঁই, যিনি একটু গ্রাম্য উচ্চারণে কথাবার্তা বলেন, তিনি ছাড়া আর কেউ তাকে দেখেনি। মিস্টার পল্লব চ্যাটার্জি তখনো অকুস্থলে এসে পৌঁছননি।... আপনি কি আরও ব্যাখ্যা চাইছেন, য়োর অনার?

—নো! দ্য অবজেকশন ইজ ওভাররুলড।

বাসু তৎক্ষণাৎ সাক্ষীর দিকে ফিরে বললেন, ঐ সঙ্গে আরও বলুন, আপনার পার্শ্ববর্তী সিটে উপবিষ্ট ড্রাইভারের বয়স কত আন্দাজ করছেন? উচ্চতা কত? ওজন কত কে. জি.?

সুবল সাঁই রীতিমতো বিহ্বল হয়ে পড়ে। বলে, মাপ করবেন হুজুর। আমি জানি না।

—দ্যাটস্ অল, য়োর অনার।

জাজ কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে সাক্ষীর দিকে তাকিয়েছিলেন। মনে হল, তিনি নিজেই সাক্ষীকে কিছু প্রশ্ন করবেন। তারপর মনস্থির করে তিনি নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্তই নিলেন। সুবল সাঁই গুটিগুটি নেমে এল সাক্ষীর মঞ্চ থেকে।

মাইতি তড়াক করে উঠে দাঁড়ান। বলেন, আমি রিডাইরেক্টে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।

অগত্যা সুবল সাঁইকে আবার ডকে উঠে দাঁড়াতে হল।

মাইতি প্রশ্ন করেন, মেয়েটির গায়ে কী পোশাক ছিল তা তোমার মনে আছে?

সুবল নতনেত্রে বললে, কেন থাকবেনি? তাছাড়া এইমাত্র তো পেশকারবাবু পড়ে

শোনালেন।

—মেয়েটি কী গাড়ি চেপে এসেছিল? কত নম্বর?

—আজ্ঞে স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড গাড়ি। নম্বরটা অ্যাদ্দিনে ভুলে গেছি। বোধহয় ডাবলু বি এফ ন-হাজার আটশ পঞ্চাশ।

—দ্যাটস্ অল। তুমি এবার নেমে এস, সুবল।

বাসু এগিয়ে আসেন, উঁহু, উঁহু! আমার রি-ক্রসটা যে বাকি। বলুন মিস্টার সাঁই, আপনার সাহেবের গাড়ির নম্বর কত, কী মেক?

—ডি এল ও জিরো টু থ্রি ফাইভ সেভেন। ক্যাডিলাক গাড়ি।

—আপনি চৌধুরীসাহেবের কাছে কত বছর চাকরি করছেন?

—তা পনের-বিশ বছর হবেনে।

—দ্যাটস অল!

পি. পি. এরপর সাক্ষী দিতে ডাকলেন বিরাটির নির্মলা রায়কে। ধীরপদে সে উঠে দাঁড়ালো সাক্ষীর মঞ্চে। তার পরিধানেও শাদা শাড়ি, শাদা ব্লাউজ। দুহাতে দুগাছি বালা ছাড়া গলায় বা কানে কিছু পরেনি। শপথবাক্য পাঠ হয়ে যাবার পর বিচারক বললেন, আপনি বসে বসে সাক্ষ্য দিন।

নির্মলা চেয়ারে বসল। আদালত কক্ষের চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে সে যেন বিশেষ একজনকে খুঁজছিল।

পি. পি. প্রশ্ন করেন, আপনার নাম শ্রীমতী নির্মলা রায়?

নির্মলা তার আয়ত চোখ দুটি তুলে বললে, ঠিক জানি না।

পি. পি. বলেন, তার মানে? নিজের নামটাও জানেন না?

নির্মলা বিচারকের দিকে ফিরে বললে, ধর্মাবতার। ছেলেবেলায়, স্কুল-কলেজে যখন পড়তাম তখন আমার নাম ছিল নির্মলা বসু। একজনকে রেজিস্ট্রি মতে বিয়ে করার পর শুনলাম আমার নাম হয়ে গেছে : নির্মলা রায়। এখন শুনছি, আইনত আমার সেই বিবাহটা সিদ্ধ নয়। এক্ষেত্রে আমার নাম আইনত কী হয়েছে তা আমি তো ঠিক জানি না। ওঁর প্রশ্নের জবাবে হলফ নিয়ে কী বলব, বুঝতে পারছি না।

পি. পি. অ্যাডভোকেট হাজরা বলেন, আমার প্রশ্নে তুমি দুঃখ পেয়েছ, মা। এমনটা হবে তা আমি বুঝতে পারিনি। কিছু মনে কর না। এবার বল, তুমি যখন সুশোভন রায়কে রেজিস্ট্রি মতে বিবাহ কর, তখন তুমি জানতে না যে, সে বিবাহিত?

নির্মলা মাথা নিচু করে জবাব দিল, না।

—সেই বিয়েতে তোমার মা-বাবার সম্মতি ছিল না বলেই কি তোমাদের রেজিস্ট্রি বিয়ে করতে হয়?

—আমার মা তখন বেঁচে ছিলেন না। বাবার অমত ছিল।

—বাবার কেন অমত ছিল?

বাসু আপত্তি জানালেন, প্রশ্নটি সাক্ষীর মতামত আহ্বান-করা। কনক্লুশন।

প্রশ্নটি বাতিল হল।

পি. পি.-র প্রশ্নে নির্মলা স্বীকার করল, আর্থিক হেতুতে নয়, নিঃসঙ্গতার কারণে সে অপরাজিতাকে পেয়িং গেস্ট হিসাবে গ্রহণ করেছিল, কারণ তার স্বামী— অর্থাৎ যাকে সে স্বামী বলে মনে করত সে— মাসের মধ্যে পনের দিনই ট্যুরে গিয়ে বাইরে রাত কাটাতো।

—আসামী অপরাজিতা কর কতদিন ধরে আছে তোমাদের বাড়িতে?

—প্রায় দেড় বছর, আমাদের বিয়ের প্রায় ছয়-মাস পর থেকে।

—এই দেড় বছরের ভিতর তুমি কি কখনো সুশোভনবাবু এবং তোমার বান্ধবীকে অবাঞ্ছনীয় ঘনিষ্ঠতায় একত্র অবস্থায় আবিষ্কার করেছিলে?

নির্মলা এবারও দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বললে, না!

—তোমার কি কখনো সন্দেহ হয়নি যে, তোমার চোখের আড়ালে ওরা অনৈতিক ঘনিষ্ঠতায় আসে?

বাসু তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ান : অবজেকশন, য়োর অনার! সাক্ষীর 'সন্দেহ' কোনও এভিডেন্স নয়। এটা কনক্লুশন মাত্র।

বিচারক বললেন, অবজেকশন ইজ সাসটেইন্ড।

পি. পি. এবার সুশোভনের আয়ের উৎস সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। নির্মলা জানালো, তার স্বামীর উপার্জন বেশ ভালই ছিল। সে ব্যবসা করত। কীসের ব্যবসা তা ও জানে না। তবে দুই বছরের মধ্যে সে গাড়ি-বাড়ি করেছে, টি. ভি., ফ্রিজ কিনেছে। অবশ্য সে জানে না, ওর 'তথাকথিত' স্বামীর ছেড়ে যাওয়া গাড়ি-বাড়ি-ফ্রিজ-টিভির মালিকানা কার। তাতে ওর কতটা দাবি আইনে টিকবে।

পি. পি. জানতে চান, ওর কি কোনও রিভলভার ছিল?

—রিভলভার? ওর নিজের? আজ্ঞে না। আমি জানি না।

—তুমি ওর পজেশনে কখনো কোন রিভলভার দেখেছ কি? ওর হাতে বা স্যুটকেসে?

—হ্যাঁ, তা দেখেছি। একবার মাত্র। আলমারির চাবিটা খুঁজে না পাওয়ায় ওর অ্যাটাচি কেসটা হাতড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা রিভলভার দেখতে পাই। ও তখন স্নান করছিল। পরে ও স্নানঘর থেকে বেরিয়ে এলে আমি জানতে চেয়েছিলাম, সেটা কার, কোত্থেকে এল। ও আমাকে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়।

—সেটা কতদিন আগে? কবে?

—এই মাসের প্রথম দিকে। তারিখ আমার মনে নেই।

—কিন্তু এটুকুও কি মনে নেই যে, উনি ট্যুর থেকে ফিরে আসার পর?

বাসু আপত্তি তোলেন, লিডিং কোশ্চেন!

বিচারক আপত্তি নাকচ করে দেন, বলেন, তাঁর মতে এটি সাক্ষীর স্মৃতিকে উজ্জীবন করার প্রচেষ্টা মাত্র।

নির্মলা এবার স্বীকার করে, হ্যাঁ, তাই বটে। রবিবার, নয় তারিখ দুপুরে, ও তখন বাথরুমে স্নান করছিল।

পি. পি. পিপলস্ এক্‌জিবিট A-টি দেখিয়ে বলেন, এই রিভলভারটা কি?

—হতে পারে। নাও পারে। ঐ রকমই দেখতে ছিল সেটা।

—তুমি ইতিপূর্বেই বলেছ যে, সোমবার, দশ তারিখ, তোমার বান্ধবী, আসামী অপরাজিতা কর, বেশ রাত করে বাড়ি ফেরে। সেদিন আসামী কি তোমাকে কিছু অপ্রত্যাশিত জিনিস দেখিয়েছিল? দেখিয়ে থাকলে সেটা কী?

—হ্যাঁ, দেখিয়েছিল। একটা রিভলভার।

—হুবহু ঐ একই রকম দেখতে? যেমন দেখেছিলে দুপুরে সুশোভনের অ্যাটাচি কেসে, এবং এখন আমি দেখাচ্ছি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আসামীর সঙ্গে সে সন্ধ্যায় তোমার কী কথোপকথন হয়? মানে, কেমন করে তোমার স্বামীর অ্যাটাচি কেসে দেখা ঐ রিভলভারটি তার হাতে এল?

—অবজেকশন, য়োর অনার। সাক্ষী যেকথা বলেননি সহযোগী তাঁর মুখে সে কথা বসিয়ে প্রশ্নটি করছেন!

পি. পি. তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংশোধন করে বলেন, বেশ, আমি নতুন করে প্রশ্নটি পেশ করছি। আসামীর সঙ্গে সে সন্ধ্যায় তোমার কী কথোপকথন হয়, মানে কেমন করে একই রকম দেখতে একটি রিভলভার তার হাতে এল?

নির্মলা দীর্ঘ বর্ণনা দেয়। সে রাত্রে অপরাজিতা ফিরে এসে যা-যা বলেছিল। শুধু সে যে অপরাজিতাকে ধমক দিয়েছিল অবৈধ প্রেমে তার স্বামীর সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে— একথা বাদ দিল।

—তখন কি তোমার সন্দেহ হয়নি যে...

—অবজেকশন য়োর অনার। কনক্লুশন।

প্রশ্নটি যদিও পুরোপুরি পেশ করা হয়নি, তবু তা নাকচ হয়ে গেল।

পি. পি. জানতে চাইলেন, এগারো তারিখ, মঙ্গলবার দুপুরে, এ মামলার প্রতিবাদী পক্ষের ব্যারিস্টার মিস্টার পি. কে. বাসু কি তোমার সঙ্গে দেখা করেন?

—হ্যাঁ, করেন।

—তাঁর সঙ্গে একজন মহিলাও ছিলেন?

—ছিলেন। 'সুকৌশলী'র মিসেস সুজাতা মিত্র।

—মিস্টার বাসু তোমার কাছে কী জানতে চাইলেন?

আবার বাধা দিলেন বাসুসাহেব, অবজেকশন য়োর অনার। ইনকম্পিটেন্ট, ইররেলিভ্যান্ট অ্যান্ড ইম্মেটিরিয়াল! প্রতিবাদী পক্ষের আইনজীবী কখন, কাকে, কোথায় কী প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন তার সঙ্গে এ মামলার কোন সম্পর্ক নেই।

পি. পি. বলেন, য়োর অনার! মিস্টার পি. কে. বাসু আসামীর অ্যাটর্নি!

বাসু বলেন, সো হোয়াট? তাতে কী হল? আমার বর্তমানে পাঁচ-সাত জন মক্কেল আছে। আমি যেখানে যা করছি, বলছি, তার জন্য ঐ দশজনই দায়ী? কে কত পার্সেন্ট? বাদীপক্ষ যদি প্রতিষ্ঠা করতে চান যে, আমি যা করছি তার জন্য বর্তমান আসামী দায়ী, তাহলে তাঁদের প্রথমে প্রমাণ করতে হবে যে, আমার কাজ সম্বন্ধে আসামীর পূর্বনির্দেশ— অন্ততপক্ষে পূর্বজ্ঞান— ছিল।

জাজ আনসারি বললেন, আই থিংক দ্য পয়েন্ট ইজ ওয়েল টেকেন। আপত্তিটা গ্রাহ্য হল।

পি. পি. হতাশ হয়ে বললেন, তাহলে আমার সওয়ালের এখানেই শেষ। উনি এবার জেরা করতে পারেন।

বাসু জেরা করতে উঠে বললেন, নির্মলা, তুমি মনে করে দেখ, বেশ ভেবে জবাব দাও। জানুয়ারি মাসের তিন তারিখ থেকে দশ তারিখের মধ্যে তোমার অপরিচিত কোন লোক কি তোমাদের বাড়িতে এসেছিল? তোমার স্বামী বা বান্ধবীর সন্ধানে? অথবা কোনও অপরিচিত লোক কি টেলিফোন করেছিল?

নির্মলা একটু ভেবে নিয়ে বলল, হ্যাঁ, একজন অপরিচিত লোক দেখা করতে এসেছিলেন। সেটা শুক্রবার, সাত তারিখ দুপুরে। আর টেলিফোন একজন করেছিলেন— তিনি আমার অপরিচিত হলেও আমার স্বামীর, আই মিন সুশোভনের, পরিচিত।

—প্রথমে তুমি ঐ সাত তারিখ, শুক্রবারের দুপুরের কথা বল। যিনি দেখা করতে এসেছিলেন তাঁর দৈহিক বর্ণনা দাও। কী কী কথোপকথন হল বলে যাও।

নির্মলার জবানবন্দি থেকে জানা গেল, দেখা করতে যিনি এসেছিলেন তিনি সুদর্শন, যুবাপুরুষ। বয়স আন্দাজ ত্রিশ। সে এসে জানতে চাইল, 'অপরাজিতা কর কি এই বাড়িতে থাকেন?' নির্মলা জবাবে বলেছিল, 'থাকেন। কিন্তু এখন সে বাড়িতে নেই।' ছেলেটি তখন জানতে চায় 'ওঁর গাড়ি কি স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড, WBF 9850?' এবার নির্মলা প্রতিপ্রশ্ন করেছিল, 'আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন?' ছেলেটি বলে, সে আসছে ক্যালকাটা ক্রেমস্ ব্যুরো থেকে। ঐ গাড়িটা একটি অ্যামবাসাডারকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে গেছে, তাই ও তদন্তে এসেছে। তখন নির্মলা বলে, 'সে ক্ষেত্রে আপনি অপরাজিতার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেখা করতে আসবেন।' ছেলেটি নির্মলাকে ধন্যবাদ দেয়, টেলিফোন নম্বরটা টুকে নেয়। তারপর বলে, 'একটা অনুরোধ করছি, রাখবেন? আপনার ননদের কোন ফটো থাকলে আমাকে একবার

দেখিয়ে দেবেন?' নির্মলা ইতস্তত করে, তারপর ভাবে এতে অপরাজিতার কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। সে বলে, 'অপরাজিতা আমার ননদ নয়, পেইং গেস্ট। আচ্ছা, আপনি বসুন, আমি ফটো অ্যালবামটা নিয়ে আসি।' নির্মলার হাত থেকে ফ্যামিলি ফটো অ্যালবামটা নিয়ে ছেলেটি পাতা উল্টে দেখে। অপরাজিতার ফটো কোনটা দেখে চলে যায়। এ নিয়ে পরে নির্মলা তার বান্ধবীকে জিজ্ঞেস করেছিল। অপরাজিতা মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেনি। বলেছিল, তার স্মরণকালে সে কোনও অ্যামবাসাডার গাড়িকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়নি। লোকটার কোন বদ মতলব আছে।

—বুঝলাম। সে ছেলেটি আর ফিরে আসেনি, বা ফোন করেনি?

—না।

—আর কোন অপরিচিত লোক সুশোভন বা অপরাজিতার খোঁজ করতে এসেছিল কি?

নির্মলা একটু ভেবে নিয়ে জবাবে বলল, না। আর কোন অপরিচিত লোক দেখা করতে আসেনি। তবে একজন অচেনা লোক টেলিফোন করেছিলেন। আগেই বলেছি, তিনি আমার অপরিচিত বটে, কিন্তু আমার স্বামীর পরিচিত।

—কী করে জানলে যে, তিনি তোমার স্বামীর পরিচিত?

—যেহেতু তিনি ক্যামাক স্ট্রিটের কোনও অফিস থেকে প্রথমে আমাকে ফোনে ধরে তারপর ফোনটা সুশোভনকে দেন। সুশোভন তখন ক্যামাক স্ট্রিটে ওঁর অফিসেই ছিল।

—সেটা কত তারিখ?

নির্মলা নতনেত্রে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলে, তারিখটা আমার মনে আছে, ঐ শেষ রবিবার, নয় তারিখ। বেলা এগারোটা নাগাদ।

—ঠিক কী কী কথা হয়েছিল, আনুপূর্বিক বলে যাও তো।

নির্মলা বলে, আমি তখন বাড়িতে একাই ছিলাম। টেলিফোন বাজতে সেটা তুলে নিয়ে বললাম, 'হ্যালো?' ওপাশ থেকে প্রশ্ন হল, 'আপনি মিসেস রায় বলছেন কি?' আমি কণ্ঠস্বরটা চিনতে না পেরে জানতে চাই, 'আপনি কে?' ও প্রান্ত থেকে ভদ্রলোক বললেন, 'আমি ক্যামাক স্ট্রিট অফিস থেকে বলছি। আপনি আমাকে চিনবেন না। এটা মিস্টার সুশোভন রায়ের বাড়ি? আমি তখন বললাম, 'হ্যাঁ'। উনি বললেন, 'তাহলে মিসেস সুশোভন রায়কে একটু ডেকে দেবেন?' তখন আমি বললাম, 'আমিই মিসেস সুশোভন রায়।' ভদ্রলোক বললেন, 'থ্যাঙ্কু! এই নিন মিস্টার রায়ের সঙ্গে কথা বলুন।'

—তারপর?

—তারপর ও প্রান্তে টেলিফোনটা হাত বদল হল। ও— মানে সুশোভন, বললে, 'নির্মলা, শোন আমি ক্যামাক স্ট্রিটের একটা অফিস থেকে বলছি। আমি বোধহয় ভুলে আলমারির ডুপলিকেট চাবিটা আলমারির গায়েই লাগিয়ে চলে এসেছি। ওটা তুলে রেখ।' বলে ও লাইন কেটে দিল। আমি অনেক খুঁজেও আলমারির ডুপলিকেট চাবিটা খুঁজে পেলাম না। চাবিটা

আসলে ওর অ্যাটাচি কেসেই ছিল। দুপুরে যখন এল তখন বলল, অ্যাটাচি কেসের উপরের পকেটে এমনভাবে ঢুকে গিয়েছিল যে, দেখতে পাচ্ছিল না।

মধ্যাহ্ন বিরতির সময় আসন্ন। জজসাহেব জানতে চাইলেন, বাদীপক্ষের আর কয়জন সাক্ষী বাকি আছেন? মাইতি জানালেন, একজন, বড়জোর দুজন।

জজসাহেব তখন আদালত মুলতুবি ঘোষণা করলেন। বেলা দুটোয় আবার আদালত বসবে। আসামী পুলিশের জিম্মাদারীতেই থাকল।

আদালত ভাঙল, কৌশিক এগিয়ে এসে বাসুসাহেবের কানে কানে বলল, মাইতি একজন 'সারপ্রাইজ স্টার উইটনেস' লুকিয়ে রেখেছে তার আস্তিনের তলায়। আদালতের একটা ঘরে রাখা আছে সেই 'এনোলা গে!' আদালত বসলেই সে হিরোসিমায় অ্যাটম বমটা ঝেড়ে আসবে।

—হুলো না মেনি? —বাসু জানতে চাইলেন।

—আজ্ঞে না। স্ত্রীলোক নয়। আমাদেরই বয়সী। হুলোই। তবে তাকে পর্দানসীন মেনির মতো পুলিশে ঘিরে রেখেছে। সাংবাদিকদের ওদিকে ভিড়তেই দিচ্ছে না।

।। নয় ।।

মধ্যাহ্ন বিরতির পর আদালত বসতেই নিরঞ্জন মাইতি এগিয়ে আসেন। জজসাহেবকে একটা অহেতুক বাও করে বললেন, এটিই আমার লাস্ট উইটনেস য়োর অনার : মিস্টার রজত গুপ্ত।

একজন পুলিশ অফিসার সংলগ্ন কক্ষের দ্বার খুলে দিলেন। ভি. আই. পি. পদক্ষেপে আদালতে প্রবেশ করলেন একজন সুদর্শন যুবাপুরুষ। স্যুটেড-বুটেড। সাক্ষীর মঞ্চে উঠে শপথবাক্য পাঠ করতে থাকে। এই অবসরে বাসু এগিয়ে এলেন আসামীর কাছে। অস্ফুটে বললেন, 'অপ্রকাশ গুপ্ত?'

অপরাজিতা দাঁতে-দাঁত চেপে বললে, ঐ বদমায়েশটার জন্যই আমার এত হেনস্থা! শয়তানটা আমার হাতে রিভলভারটা গছিয়ে দিয়ে...

বাসু ওর কর্ণমূলেই বললেন, স্থিরো ভব! ফরগেট হিম!'

—ভুলে যাব? ঐ নিমকহারাম বেইমানটাকে। কোনদিন ভুলব না!

বাসু ওর কানে কানে বললেন, 'অন্য মনে চলি পথে, ভুলিনে কি ফুল, ভুলিনে কি তারা?'

মেয়েটি ম্লান হয়ে যায়। বাণবিদ্ধ হরিণীর মতো বাসুর দিকে তাকায়। উনি তার হাতে একটু চাপ দিয়ে ফিরে এসে বসেন নিজের আসনে। ইঙ্গিতে সুজাতাকে কাছে ডাকলেন। সে কাছে এলে বললেন, ঐ বসে আছে নির্মলা। ওর কাছে গিয়ে জেনে এস তো— ঐ ছোকরাই সেদিন 'ক্যালকাটা ক্লেমস্ ব্যুরো'র তরফে ওর বাড়িতে হানা দিয়েছিল কি না। আমার কাছে ফিরে এসে

উত্তরটা জানাতে হবে না। আমি তোমার দিকে তাকালে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বা 'না' জানাবে, কেমন?

সুজাতা ওদিকে এগিয়ে যায়।

মাইতি ততক্ষণে জেরা শুরু করে দিয়েছেন, নাউ মিস্টার গুপ্ত, নাম-ধাম তো বলেছেন, এবার বলুন আপনার প্রফেশনটা কী?

—আমি একজন লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর।

—ঐ যাকে চলতি বাংলায় বলে 'গোয়েন্দা', আর শরদিন্দুর মতো পণ্ডিতেরা বলতেন : 'সত্যান্বেষী'? কেমন?

রজত গুপ্ত মৃদু হেসে বললে, তা বলতে পারেন।

—আপনার লাস্ট অ্যাসাইনমেন্ট কে দিয়েছিলেন? শেষ কাজটা?

—তাঁর নাম ছিল পরেশচন্দ্র পাল।

—ছিল? তিনি কি বেঁচে নেই?

—না। পরেশবাবু মারা গেছেন, তাঁর হত্যারহস্য নিয়েই তো এই মামলা হচ্ছে।

—তাই বুঝি? তা কবে তিনি আপনাকে এ কাজে এমপ্লয় করেন? কাজটা কী ছিল?

—এ বছর ছয়ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার দুপুরে। উনি আমার অফিসে এসে বললেন যে, পরদিন শুক্রবার সকালে ওঁর বারাসাতের বাড়িতে ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে একটি ভদ্রমহিলার দেখা করতে আসার কথা। উনি ঐ সময় কলকাতায় থাকতে পারছেন না। উনি জানতে চান—মহিলাটি আদৌ দেখা করতে এলেন কি না। মিস্টার পাল আমাকে সেই মহিলার একটি ফটোগ্রাফ দেখিয়ে বললেন, 'ও ট্যাক্সি নিয়েও আসতে পারে অথবা নিজের স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড চেপে, যার নম্বর WBF 9850।

—তারপর?

—আমি ওঁকে বললাম, 'সে তো আপনি কলকাতায় ফিরে এসে আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন।' উনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'তাহলে আর পয়সা খরচা করে তোমাকে এমপ্লয় করব কেন?'

—তাই আপনি শুক্রবার, সাত তারিখ, সকালে পরেশ পালের বাড়ির কাছাকাছি লুকিয়ে রইলেন? কেমন?

স্পষ্টতই লিডিং কোশ্চেন। বাসু আপত্তি করলেন না। অপ্রয়োজনে। সাক্ষী বিস্তারিত বিবরণ দিল। ফটোতে দেখা মেয়েটি নির্দিষ্ট সময়ে ঐ স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড গাড়ি চেপেই এসেছিল। পরেশ পালের বাড়িতে ঘণ্টাখানেক থেকে ফিরে যায়। পরেশ পরে সাক্ষীর সঙ্গে যোগাযোগ করে তথ্যটা জেনে নেয়।

—তারপর কী হল?

—তারপর সোমবার, দশ তারিখে মিস্টার পাল আবার দুপুরে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে

বলেন...

বাসু বাধা দেন, ইফ দ্য কোর্ট প্লিজ। প্রথমবার আমি বাদীপক্ষকে বাধা দিইনি, সময় সংক্ষেপের কারণে, কিন্তু বারে বারে এভাবে 'হিয়ার সে' রিপোর্ট বরদাস্ত করা চলে না।

মাইতি প্রতিবাদ করেন, এটা 'রেজ জেস্টে'র অংশমাত্র!

দায়রা জজ মাথা নেড়ে বললেন, নো কাউন্সেলর, আরও জোরালো এভিডেন্স ছাড়া এটাকে **res gestae**-র অংশ বলে মেনে নেওয়া চলে না। আপত্তি গ্রাহ্য হল।

মাইতি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, ঠিক আছে। পরেশবাবুর নির্দেশানুসারে তুমি কী কী করলে বলে যাও?

রজত গুপ্ত বলতে থাকে, পরেশবাবুর নির্দেশানুসারে সে সোমবার দশ তারিখ সন্ধ্যা ছয়টার সময় তার নিজের গাড়ি নিয়ে বারাসাতে চলে আসে। পরেশ পাল তার গাড়ি নিয়ে রায়চৌধুরী ভিলার গেটের কাছাকাছি অপেক্ষা করছিল। সেটাই ছিল নির্ধারিত মিটিং পয়েন্ট। ওরা দুজনে দুখানা গাড়ি নিয়ে একটু নির্জনে সরে যায়। সেখানে পরেশবাবুর নির্দেশে ও নিজের গাড়ির নম্বর প্লেট দুটো বদলে ফেলে।

মাইতি জানতে চান : কেন?

—কেন বোঝাতে হলে আমাকে বলতে হয় আমার এমপ্লয়ার আমাকে কী বলেছিলেন; কিন্তু সে কথায় যে আদালতের আপত্তি। কী করে বোঝাব বলুন?

মাইতি অসহায়ভাবে বিচারকের দিকে তাকালেন।

বাসু বললেন, আমার মনে হয় আমার আপত্তি এখন উইথড্র করা উচিত। দিস হ্যাজ নাউ বিকাম পার্ট অব 'রেজ জেস্টে'!

মাইতি বলেন, 'থ্যাঙ্কু'! সাক্ষীকে বলেন, এবার বল, 'কেন?'

রজত বলে, পরেশবাবু ওকে বলেছিলেন ঐ গাড়ি নিয়ে পুনরায় পরেশবাবুর বাড়ির কাছাকাছি থাকতে। সেদিনও রাত সাড়ে আটটায় সেই মেয়েটির আবার আসার কথা। এসেছে দেখলেই রজত ফিরে এসে একটা নির্দিষ্ট নির্জন স্থানে অপেক্ষা করবে। পরেশ পাল লুকিয়ে থাকবে আরও কিছুটা দূরে, রায়চৌধুরী ভিলার গেটের কাছাকাছি। রজত তার নিজের গাড়ির পিছনের চাকার হাওয়া বার করে দিয়ে অপেক্ষা করবে। ঐ মেয়েটির শহরে ফেরার এই একটাই রাস্তা। ফিরছে দেখলেই সে মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি করে গাড়িটাকে রুখবে। অনুরোধ করবে তাকে একটা লিফ্‌ট দিতে— কয়েক কি. মি. দূরের একটা পেট্রল পাম্পে। সেখানে গিয়ে যাতে ও চাকায় হাওয়া দিয়ে নিতে পারে। পরেশ বলেছিল, পেট্রল পাম্পে ঐ মেয়েটি নির্ঘাৎ একটা জরুরি টেলিফোন করবে। তুমি যেমন করে পার লুকিয়ে থেকে শুনবে মেয়েটি কাকে টেলিফোন করে কী বলছে।

মাইতি বললেন, মিস্টার গুপ্ত! আপনি অনেক কিছুই বললেন, কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাবটা দিলেন না। গাড়ির নাম্বার প্লেট কেন বদলাতে হল?

—ও আয়াম সরি। পরেশবাবু চাননি যে, মেয়েটি বা কোন পথচারী আমার গাড়ির নম্বরটা মনে রাখে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে তদন্ত হলে আমার গাড়িটার কথা উঠলেও সেটাকে যাতে খুঁজে না পাওয়া যায়। এ জন্য দুটি নম্বর প্লেট উনি বানিয়েই এনেছিলেন। সে দুটি আমার গাড়িতে আমরা লাগিয়ে নিই।

—নম্বর প্লেটটা কত ছিল?

—WMW 1757।

—তারপর কী হল বলে যান।

রজত বলতে থাকে। সে প্রশ্ন তুলেছিল, 'মেয়েটি যদি গাড়ি না থামিয়ে আমাকে কাটিয়ে চলে যেতে চায়, তো আমি কী করব?' পরেশ বলে, 'ওর পিছনের চাকায় ফায়ার করে গাড়িটা অচল করে দিও। ও বুঝতে পারবে না কেউ ফায়ার করেছে, ভাববে টায়ার বার্স্ট করেছে। গাড়ি থামাতে ও বাধ্য হবে।' রজত তখন জবাবে জানায় যে, ওর কাছে ওর নিজের রিভলভারটা নেই। পরেশ বিরক্ত হয়। শেষে সে তার হিপ পকেট থেকে একটা ছোট্ট পয়েন্ট থ্রিটু রিভলভার বার করে রজতের হাতে দেয়। বলে, 'এটা রাখ, কাজ খতম হলে ফেরত দিও।' তারপর পরেশ ওকে বলে, সে রায়চৌধুরী ভিলার কাছাকাছি আবছায়ায় গাড়িটা পার্ক করে অপেক্ষা করবে রাত এগারোটা পর্যন্ত। রজত যেন এসে রিপোর্ট করে। একটা জোরালো বিদেশী ছোট্ট টেপ রেকর্ডারও পরেশ রজতকে দিয়েছিল। বলেছিল, মেয়েটি টেলিফোনে কথা বলতে শুরু করলেই তুমি তার কথা রেকর্ড করে নিও।

মাইতি বলেন, তারপর?

রজত বর্ণনা দেয়, কী ভাবে সে অপরাজিতাকে মাঝপথে রুখে দেয়। টায়ার ফাটাতে হয়নি, কিন্তু মেয়েটির বিশ্বাস উৎপাদন করার প্রয়োজনে তাকে রিভলভারটা হস্তান্তর করতে হয়। মাইতির প্রশ্নোত্তরে রজত আরও জানায় পরেশের কাছ থেকে রিভলভারটি হাতে পেয়েই সে প্রথামাফিক পরীক্ষা করে দেখে নেয় যে, তাতে ছয়টাই তাজা বুলেট ছিল। তারপর যা যা ঘটে—অর্থাৎ অপরাজিতা বাসুসাহেবকে ঠিক যা যা বলেছিল— তাই রজত তার জবানবন্দিতে বলে যায়। এমন কি মেয়েটির সঙ্গে তার শেষ দিকে যে রোমান্টিক কথাবার্তা হয়— রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি পর্যন্ত, অকপটে স্বীকার করে।

মাইতি বলেন, টেপ রেকর্ডারটা আপনার সঙ্গে আছে? থাকলে বাজিয়ে আদালতকে শোনান।

রজত তার হিপ পকেট থেকে ছোট্ট একটা টেপ রেকর্ডার বার করে বাজিয়ে শোনালো। দারুণ নিখুঁত যন্ত্রটা। স্পষ্ট শোনা গেল অপরাজিতার কণ্ঠস্বর— প্রথমে ইংরেজিতে 'এটা কি এয়ারপোর্ট হোটেল?... আপনাদের ডাইনিং রুমের এক্সটেনশন নম্বরে আমাকে দিন... ইজ দ্যাট ডাইনিং রুম?... কুড আই টক টু মিস্টার পি. কে. বাসু, বার-অ্যাট-ল? হি মাস্ট বি... ওয়েল, ইয়েস, ইয়েস। থ্যাঙ্কু।" এরপর বাংলায়... "শুভসন্ধ্যা! আমি অপরাজিতা বলছি।... বারাসাত থেকে মাইল চারেক দমদমের দিকে একটা পেট্রল পাম্প থেকে।... এভরিথিং ফাইন স্যার, কেউ

কিছু সন্দেহ করেনি।”— থেকে “এরকম লোককে তো গুলি করে মেরে ফেলা উচিত!”... এবং তারপর “আপনি চিন্তা করবেন না স্যার, আমার হাতে এখন একটা রিভলভার আছে। তাতে ছয়-ছয়টা তাজা বুলেট!” পর্যন্ত।

মাইতি বললেন, এনাফ! আর শোনাতে হবে না।

রজত যন্ত্রটা সুইচ অফ করে দিল। বাসু আপত্তি জানালেন : আমরা পুরো টেকরেকর্ডিংটা শুনতে চাই!

মাইতি বলেন, বাকিটা এ মামলার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক।

বাসু বলেন, সেটা হয় তো বাদীপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

বিচারক দুপক্ষের বাদানুবাদ থামিয়ে দিয়ে নির্দেশ দেন, বাকি একতরফা কথোপকথনটাও বাজিয়ে শোনাতে হবে। ফলে রজতকে সেটা শোনাতে হল। পরদিন সকালে সাড়ে দশটায় বাসুসাহেবের অফিসে আসবে বলে কথা দেওয়া পর্যন্ত। টেপ রেকর্ডারটা আদালতে জমা পড়ল।

মাইতি জানতে চান, তারপর কী হল?

রজত বিস্তারিত বর্ণনা দেয়। অপরাজিতা আর রজত দুজন দুদিকে রওনা হওয়া পর্যন্ত। তখন রাত দশটা দশ।

মাইতি জানতে চান : তারপর কী হল?

—মিস্টার পালের ইন্সট্রাকশন ছিল ওঁকে যেন রিপোর্ট করি ঐ রায়চৌধুরী ভিলার গেটের কাছে। সেখানে উনি আমার জন্য রাত এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। ভদ্রমহিলার গাড়ি বাঁকের মুখে মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল : রিভলভারটা ফেরত নেওয়া হয়নি। হয়তো সেজন্য পরেশবাবু রাগারাগি করবেন; কিন্তু ওঁর গাড়ির নম্বরটা আমার মনে ছিল; ফলে রিভলভারটা ফিরে পাওয়া কষ্টকর হবে না। তাই গাড়ি ঘুরিয়ে আমি রায়চৌধুরী ভিলার দিকে ফিরে আসতে থাকি। কিন্তু কিছু দূর থেকেই দেখতে পাই ঐ বাগানবাড়ির গেটের বিপরীত দিকে পার্কিং করা আছে ঐ মহিলার গাড়িখানা। WBF 9850— আমি বুঝতে পারি, ঐ মহিলাটিও ফিরে এসেছেন। বিদায়কালে আমি যেমন লক্ষ্য করেছিলাম যে, রায়চৌধুরী ভিলার কাছাকাছি, একটু আবছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে পরেশবাবুর ঐ 2457 নম্বর গাড়িটা, উনিও নিশ্চয় তা লক্ষ্য করেছেন। আমার আরও মনে হল, মহিলাটি পরেশবাবুর পরিচিতা। তাই স্ত্রীর উপস্থিতিতে উনি তার সঙ্গে দেখা করতে চান না। তার মানে ভদ্রমহিলাও পরেশবাবুর গাড়ির নম্বর জানেন। তাই আমি পুনরায় গাড়ি ঘুরিয়ে নিজের বাড়ি চলে যাই। রাত তখন প্রায় সাড়ে দশটা হবে।

—সেই সময় পরেশচন্দ্রের WBF 2457 গাড়িটা ওখানে ছিল?

—ছিল। পরেশবাবুকেও দূর থেকে দেখতে পেয়েছিলাম— গাড়ির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সিগ্রেট টানছেন।

—আসামীকে ঘটনাস্থলের কাছাকাছি দেখতে পাননি?

—নো স্যার। তিনি তাঁর নিজের গাড়ির ভিতর ছিলেন কি না জানি না। কারণ তাঁর গাড়ির সব আলো নেভানো ছিল। তবে তাঁকে কোথাও দেখতে পাইনি।

মাইতি বললেন, তারপর আপনার এমপ্লয়ারকে টেপ রেকর্ডিংটা কখন শোনালেন?

—কোথায় আর শোনালাম, স্যার? পরদিন তো পরেশবাবুর পাত্তাই পেলাম না কোথাও। তারপর সন্ধ্যার এডিশন ট্যাবলয়েড পেপারে দেখলাম পরেশচন্দ্র পাল খুন হয়েছেন ঐ রাত্রেই। রায়চৌধুরী ভিলার গেটের কাছাকাছি।

মাইতি এবার বাসুসাহেবের দিকে ফিরে পুনরায় একটি অহেতুক বাও করে বললেন, য়োর উইটনেস স্যার!

বাসু এগিয়ে এসে বললেন, মিস্টার গুপ্ত, পরেশবাবু যখন আপনাকে রিভলভারটা দেন তখন আপনি কি তার নম্বরটা দেখেছিলেন, বা টুকে রেখেছিলেন?

—না, স্যার।

—তাহলে আপনি বলতে পারেন না যে, পিপলস্ একজিবিট 'A'-টাই সেই রিভলভার?

—হুবহু একই রকম রিভলভার দুটো।

—আপনি একজন লাইসেন্সড প্রাইভেট ডিটেকটিভ। সো, আই রিপিট : তাহলে আপনি কি হলপ নিয়ে বলতে পারেন যে, পিপলস্ একজিবিট 'A'-টা সেই রিভলভার?

—না স্যার, তা বলতে পারি না।

—আপনাকে আপনার এমপ্লয়ার নির্দেশ দিয়েছিল মেয়েটির সঙ্গে ভাব জমাতে, তার বিশ্বাস উৎপাদন করতে, যাতে সে আপনাকে পেট্রল পাম্প পর্যন্ত নিয়ে যায়, কারণ পরেশচন্দ্র জানত, পেট্রল পাম্পে টেলিফোন আছে। সেখানে গেলেই সে জরুরি প্রয়োজনে একটি ফোন করবে। ফোনে মেয়েটি কাকে কী বলল এইটুকুই পরেশবাবু চুরি করে জানতে চেয়েছিল, তাই নয় কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই।

—সেজন্যই ওর কোলে রিভলভারটা ফেলে দিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। ওঁর বিশ্বাস উৎপাদন করতে।

—যাতে আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করার সুযোগটা পান?

—না। যাতে আমি আমার এমপ্লয়ারকে রিপোর্ট করতে পারি।

—এক মুঠো টাকার জন্য আপনি মিথ্যা করে বললেন যে, আপনার গাড়ির টায়ার বার্স্ট করেছে? সজ্ঞান মিথ্যাভাষণ?

—এটা আমার প্রফেশন, স্যার। আমাকে রোজগার করতে হয়! আমার সংসার আছে, আমার...

—আনসার দ্য কোশ্চেন : এক মুঠো টাকার জন্য আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করতে প্রস্তুত, সজ্ঞান মিথ্যাভাষণে প্রস্তুত?

—কী আশ্চর্য! আপনি বুঝতে চাইছেন না, প্রফেশনের জন্য আমাকে অনেক কিছুই করতে হয়।

—মিস্টার গুপ্ত, আমি ক্রমাগত ঐ একই প্রশ্ন করে যাব, যতক্ষণ না আপনি আমার প্রশ্নের জবাবে সরাসরি 'হ্যাঁ' বা 'না' বলেন। নাউ আনসার দ্য কোশ্চেন : এক মুঠো টাকা উপার্জনের জন্য আপনি আপনার উপকারীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে প্রস্তুত? সজ্ঞান মিথ্যাভাষণে প্রস্তুত?

রজত গুপ্ত গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মাইতি হঠাৎ উঠে দাঁড়ান : অবজেকশন, য়োর অনার। এটা সাক্ষীর একটা 'কনক্লুশন'!

জাজ আনসারি বললেন, অবজেকশন ওভাররুল্ড। আনসার দ্যাট কোশ্চেন!

রজত বলল, তাই যদি আপনি আমাকে দিয়ে বলাতে চান, তো তাই বলছি : হ্যাঁ!

—একজ্যাক্টলি। তাই আমি তোমাকে স্বমুখে স্বীকার করাতে চাইছিলাম। যাতে তোমার চরিত্রটা আদালত সমঝে নিতে পারেন। এবার বল, বিশ্বাসঘাতকতা সম্পন্ন করার পর, টেপরেকর্ডারে তোমার উপকারীর কণ্ঠস্বর ধরে ফেলার পর, ওকে কেন রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি শুনিয়েছিলে? তখন তো দুমুঠো টাকা রোজগারের ধান্দা তোমার ছিল না?

রজতের মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে। বাসুর বাচনভঙ্গিতে, আপনি থেকে হঠাৎ 'তুমি'-তে অবতরণের অবজ্ঞায়। বলে, কী বলতে চাইছেন? রবীন্দ্রনাথের কী উদ্ধৃতি আমি শুনিয়েছি?

—না শোনাওনি। শুনেছ— "অন্যমনে চলি পথে, ভুলিনে কি ফুল, ভুলিনে কি তারা?" — শুনেছ, তা এনজয় করার অভিনয় করেছ, এবং তার আগে 'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থী' পংক্তিটার ইঙ্গিত দিয়েছ! কেন, মিস্টার সত্যান্বেষী? এই মিথ্যা রোমান্টিকতার দৃষ্টির পিছনে তো দুমুঠো টাকা রোজগারের ধান্দাবাজি ছিল না?

মাইতি পুনরায় আপত্তি তোলেন। এবার আপত্তি গ্রাহ্য হল।

বাসু বললেন, দ্যাটস্ অল!

মাইতি উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, বাদীপক্ষের এই শেষ সাক্ষী। আমরা কনক্লুড করছি। এখন পরিষ্কার প্রমাণিত হল যে, এই সাক্ষী রাত দশটা কুড়ি মিনিটে পরেশ পালকে জীবিত অবস্থায় দেখেছে— রায়চৌধুরী ভিলার গেটের সামনে সিগারেট টানতে। দেখেছে, আসামীর গাড়িটা কাছাকাছি পার্ক করা আছে। তখন আসামীর এক্তিয়ারে রয়েছে একটা লোডেড রিভলভার। আসামী স্বমুখে স্বীকার করেছে সে রাতে তার হেপাজতে একটি লোডেড রিভলভার ছিল, যাতে ছয়টি তাজা বুলেট— আই রিপিট : 'ছয়-ছয়টি তাজা বুলেট!' তার পরদিন সকালে আসামী অকুস্থলে পুনরায় এসে হাজির হয়। এটা মার্ডারারদের একটা সাধারণ 'অবসেশন'— খুনের ঘটনাস্থলে ফিরে আসা— সে যাই হোক, মালি সুবলচন্দ্রের সাক্ষ্যে আমরা জেনেছি, আসামী কালো মতন কোন ভারি বস্তু....

বাসু এ সময় বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, সহযোগী কি মামলার মাঝামাঝি আর্গুমেন্টটা চুকিয়ে ফেলতে চাইছেন?

মাইতি বললেন, না। আমি 'সাম আপ' করছিলাম মাত্র।

আনসারি বলেন, মিস্টার বাসু, আপনার কোন সাক্ষী আছে?

—আছে, য়োর অনার; কিন্তু তার পূর্বে আমি বাদীপক্ষের ঐ 'সাম আপ' আর শেষ সাক্ষী সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। আমার মতে : ঐ শেষ সাক্ষীটিই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে গেল : আসামী নির্দোষ!

মাইতি উঠে দাঁড়ান। বলেন : তাই নাকি? সেটা কোন্ যুক্তিতে?

—বাদীপক্ষের উপস্থাপিত এভিডেন্স অনুসারে আসামীর চেয়ে সন্দেহের আঙুলটা যখন ঐ শেষ সাক্ষীর দিকেই বেশি করে নির্দেশ করছে। আসামী নাকি টেলিফোনে তার সলিসিটরকে বলেছিল যে, তার রিভলভারে 'ছয়-ছয়টা তাজা বুলেট'! কিন্তু আসামী রিভলভার সম্বন্ধে কী জানে? হয়তো সে শুধু সিনেমাতেই ঐ বস্তুটা দেখেছে। চেম্বার খুলে ইন্ডেন্টেশন মার্ক লক্ষ্য করে কী ভাবে তাজা আর ব্যয়িত বুলেট চিনতে হয়, তা কি ঐ মেয়েটি জানে? কাউকে খুন করার বাসনা যদি থাকে তাহলে কেউ কখনো টেলিফোনে ওভাবে বড়াই করতে পারে? অপরপক্ষে এক্সপার্টের মতে, মৃত্যুর সময় সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত এগারোটা। ঐ সময়কালের মধ্যে এ দুনিয়ায় একজন, মাত্র একজন ব্যক্তি, নিজ স্বীকৃতিমতে নির্জনে মৃতব্যক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। সেই ব্যক্তি ঐ শেষ সাক্ষী। নিজ স্বীকৃতিমতে সে সময় তার হাতে একটি রিভলভার। সে গোয়েন্দা, তার নিজের রিভলভার আছে। সে জানে, 'ছয়-ছয়টা তাজা বুলেট' কাকে বলে, কীভাবে তা চিনে নিতে হয়। নিজ স্বীকৃতিমতে দুটো টাকা উপার্জনের জন্য সে বিশ্বাসঘাতকতা করতে প্রস্তুত, মিথ্যা কথাও বলতে স্বীকৃত! অবশ্য দুই-এর বদলে চার টাকা পেলে সে হলফ নিয়ে আদালতে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা বলতে পারে কি না, তা আমরা জানি না। কিন্তু আমরা একথা নিশ্চিতভাবে জানি, সহযোগী, বাদীপক্ষের অ্যাডভোকেট, কলকাতা থেকে এতদূর ছুটে আসতে পারলেন অথচ সাহস করে একটা সহজ, সরল, প্রত্যাশিত প্রশ্ন সাক্ষীকে একবারও জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না। কোট : বাপু হে! তুমিই কি পরেশ পাল ওরফে সুশোভন রায়কে খুন করেছ?— আনকোট!

বলেই বাসু আসন গ্রহণ করলেন।

যেন 'সি-স' খেলা। তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন মাইতি। বললেন, য়োর অনার, এটা কী হল? এমন অন্তঃসারহীন, অবাস্তব, অসম্ভব আর্গুমেন্ট আমি জীবনে শুনিনি।... ঠিক আছে, আমরা আদালতের কাছে আর্জি রাখছি, বাদীপক্ষকে তাদের কেস 'রি-ওপেন' করার অনুমতি দেওয়া হোক। তাহলে ঐ শেষ সাক্ষীটিকে আমরা সাক্ষীর মঞ্চে আর একবার তুলে ঐ বাহুল্য প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতে পারি।

বাসু সহাস্যে বললেন, প্রতিবাদী-তরফে এতে আপত্তির কিছু নেই।

মাইতি ঋষভ কণ্ঠে গর্জন করে ওঠেন : মিস্টার রজত গুপ্ত, প্লিজ। আপনি সাক্ষীর মঞ্চে আর একবার উঠে দাঁড়ান।

রজত গুপ্ত পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সাক্ষীর মঞ্চে উঠে দাঁড়ায়।

—তুমিই কি পরেশ পাল ওরফে সুশোভন রায়কে খুন করেছ?

—না!

—দ্যাটস্ অল! এবার তুমি নেমে আসতে পার!

—জাস্ট এ মিনিট— বাসু উঠে দাঁড়িয়েছেন। বলেন কেস আপনি রি-ওপেন করেছেন, ফলে আমার জেরাটা বাকি আছে মাইতিসাহেব! মিস্টার গুপ্ত, আপনাকে মিস্টার পরেশচন্দ্র পাল প্রথম কবে গোয়েন্দাগিরিতে নিয়োগ করেছিলেন?

—অবজেকশন, য়োর অনার! এ প্রশ্ন আমরা আগেই করেছি এবং সাক্ষী তার জবাবও দিয়েছেন।

জাজ আনসারি বলেন, আই থিংক দ্য পি. পি. ইজ কারেক্ট। আপনি এ বিষয়ে কিছু বলবেন, মিস্টার বাসু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সহযোগীর প্রশ্নটা ছিল, —যতদূর আমার মনে আছে— 'কবে তিনি একাজে আপনাকে এমপ্লয় করেন?' আমার প্রশ্নটা ছিল 'প্রথম কবে মিস্টার পাল ওঁকে গোয়েন্দা হিসাবে নিয়োগ করেন?'

মাইতি বলেন, দুটো তো একই প্রশ্ন!

—আমি তা মনে করি না। 'একাজে' নিযুক্ত করার পূর্বেও মিস্টার পাল তাঁকে 'অন্য কাজে' নিয়োগ করে থাকতে পারেন। সাক্ষীর জবানবন্দিতে আমরা শুনেছি, পরেশচন্দ্র প্রথম সাক্ষাতেই সাক্ষীকে 'তুমি' সম্বোধন করছেন। কলকাতায় এত এত গোয়েন্দা থাকতে পূর্বপরিচয় ছাড়া পরেশবাবু কেমন করে ওঁকেই বা বেছে নিলেন এবং প্রথম সম্বোধনেই সমবয়সীকে কেন 'তুমি' সম্বোধন করলেন। এটা জানতে আমরা আগ্রহী।

বিচারক বললেন, কারেক্ট। অবজেকশন ইজ ওভাররুল্ড। প্রশ্নটার জবাব দিন।

রজত এবার বলল, প্রায় তিন বছর আগে!

—হোয়াট! —চীৎকার করে ওঠেন মাইতি! কই, তুমি তো এ কথা আমাকে একবারও বলনি?

বাসু এদিকে ফিরে বলেন, আপনি কি 'রি-ডাইরেক্ট' শুরু করলেন, মিস্টার মাইতি? আমি কিন্তু আমার জেরা শেষ করিনি।

মাইতি গুম হয়ে বসে পড়েন।

বাসু সাক্ষীর কাছে জানতে চাইলেন, প্রায় তিন বছর আগে মিস্টার পরেশ পাল আপনাকে দুই সেট ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে বলেছিলেন যে, কোন একজন ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টকে দিয়ে পরীক্ষা করাতে। তাই নয়?

—ইয়েস স্যার!

—আপনি পরীক্ষা করিয়ে দেখেছিলেন, সেই দুই সেট ফিঙ্গারপ্রিন্ট একই লোকের। ঠিক কি না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক।

—একসেট ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছিল দশটা আঙুলের টিপছাপের জেরক্স কপি, দ্বিতীয়টা কয়েকটি আঙুলের ছাপ। অ্যাম আই কারেক্ট?

—ইয়েস স্যার।

—আপনার দুরন্ত কৌতূহল জাগ্রত হল?

—হ্যাঁ, কিছুটা কৌতূহল জেগেছিল বৈ কি।

—না, না, কিছুটা কৌতূহল হলে আপনি ঐ দুই সেট টিপছাপের জেরক্স কপি করাবেন কেন? নাউ, বিফোর য়ু আনসার, মনে রাখবেন আপনি হলফ নিয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার বেশ কিছুটা কৌতূহল হয়েছিল।

—সেজন্যই দুই সেট জেরক্স কপি তৈরি করান?

—হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমার কাছে সন্দেহজনক লেগেছিল।

—'সন্দেহজনক' কী বলছেন? আপনি লাইসেন্সড গোয়েন্দা! স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন, ঐ দশটা আঙুলের ছাপ পুলিশ রেকর্ড থেকে সংগ্রহ করা কোন একজন দাগী আসামীর। তাই নয়?

—হ্যাঁ, সেটা অনুমান করা শক্ত নয়।

—সেজন্যই লাইসেন্সড গোয়েন্দা হওয়ার সুযোগে লালবাজারের রেকর্ড থেকে ঐ দাগী আসামীর পরিচয়টা জানবার চেষ্টা করেন এবং সাফল্যলাভ করেন?

—দেখুন স্যার... আমি... মানে...

—আনসার মি, 'ইয়েস' অর 'নো'! জ্ঞাতসারে মিথ্যা সাক্ষী দেবেন না। আই ওয়ার্ন য়ু!

—ইয়েস!

—সেই দাগী আসামীটির নাম 'চাঁদু রায়'! কেমন?

—ইয়েস!

—আপনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, কীভাবে পরেশ পাল মাত্র তিন বছরের মধ্যে ফুলে-ফেঁপে উঠল। গাড়ি-বাড়ি বানালো। আপনি তিন বছর ধরে জানেন, পুলিশ জানে না, কিন্তু পরেশ পাল জানে; চাঁদু রায়ের বর্তমান পরিচয়টা কী? পরেশ ব্ল্যাকমেলিং-এ লাখপতি হচ্ছে!

সাক্ষী ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—সেদিন থেকেই আপনি নিজেও পরেশ পালকে ব্ল্যাকমেলিং করতে শুরু করেন, হুমকি দিয়ে যে, আপনার কাছে যে জেরক্স কপি আছে তা লালবাজারে জমা দিলে পরেশ পালের ব্ল্যাকমেলিং-এর খেলা সাঙ্গ হবে। উপরন্তু পরেশের জেল হয়ে যাবে। তাই না?

—আমি ওরকম কিছু করিনি। আমি দৃঢ় আপত্তি জানাচ্ছি।

—তাই বুঝি? দৃঢ় আপত্তি? অলরাইট, এই তিনবছরে আপনি ওর কাছ থেকে কত টাকা

নিয়েছেন?

—গোয়েন্দা হিসাবে শুধুমাত্র প্রফেশনাল ফি-টুকু।

—আই নো, আই নো! টাকার অঙ্কে সেটা কত? দশ হাজার?

—বললাম তো! আমার সার্ভিসের ফি-টুকু। টাকার অঙ্ক মনে নেই।

—বিশ হাজার টাকা? তিন বছরে?

—হতে পারে।

—বছরে গড়ে দশ? তিন বছরে : ত্রিশ হাজার?

—বলছি তো, আমার মনে নেই...

—পঞ্চাশ হাজারের বেশি?

—না, না, অত হবে না।

—তবে অন্তত চল্লিশ হাজারের উপর?

—বলছি তো, আমার মনে নেই।

আদালতের দিকে ফিরে বাসু বলেন, য়োর অনার! পয়সা পেলে এই ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করতে রাজি, মিথ্যা কথা বলতে রাজি। ব্ল্যাকমেলিং যে করেন তা নিজ মুখে এখনি স্বীকার করলেন। এমন একটি গোয়েন্দা— সহযোগীর ভাষায় 'সত্যান্বেষী'— নিহত ব্যক্তিকে জীবন্ত অবস্থায় শেষবার দেখেছেন। দেখেছেন নির্জনে এবং এমন একটা সময়ে, যখন অটোপ্সি-সার্জেনের মতে মৃত্যুটা সংঘটিত হয়েছিল। আর ঐ সময় নিজ স্বীকৃতিমতে তাঁর হাতে ছিল মার্ডার ওয়েপন, যার নম্বরটা একজন প্রফেশনাল গোয়েন্দা হওয়া সত্ত্বেও তিনি অস্ত্রটা গ্রহণ করার সময় টুকে রাখেননি, অথচ সিলিন্ডার খুলে দেখে নিয়েছেন, তাতে ছয়-ছয়টা তাজা বুলেট! আমার আর কিছু বলার নেই। আদালত নিজ সিদ্ধান্তে আসবেন।

দায়রা জজ আনসারি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, ফিঙ্গারপ্রিন্টের কথাটা আপনি কী করে আবিষ্কার করলেন?

মাইতি বলে ওঠেন, স্রেফ আন্দাজে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে, য়োর অনার।

আনসারি ভর্ৎসনামিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, তাহলে বলতে হবে অদ্ভুত ওঁর টিপ। আন্দাজে অন্ধকারে উনি বুলস্ আইয়ের কেন্দ্রবিন্দুটা বিদ্ধ করেছেন। বলুন মিস্টার বাসু, হঠাৎ ফিঙ্গারপ্রিন্টের কথা কেন মনে এল আপনার?

বাসু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আপনি আমাকে বলতে বাধ্য করলেন তাই বলি; বাদীপক্ষের অপদার্থতায়! সহযোগী তাঁর আর্গুমেন্ট করেননি, কিন্তু সকাল থেকে যে দশ-পনেরজন তাঁর তরফে সাক্ষী দিলেন তাঁদের সাক্ষ্য 'সাম-আপ' সমাপ্ত করেছেন। সে সময় আসামীর মোটিভ সম্বন্ধে তিনি একটিমাত্র বাক্যও উচ্চারণ করেননি। আমরা জেনেছি, অপরাজিতা কর আর সুশোভন রায় একই বাড়িতে থাকে। দীর্ঘদিন! এদের মধ্যে একে অপরজনকে কেন হত্যা করবে? কী উদ্দেশ্য? বাদীপক্ষ এ বিষয়ে নীরব! ফলে, আমাকে অন্যান্য বিষয়ে তদন্ত করতে হয়েছে—

যে কাজ ছিল আরক্ষা বিভাগের, তাই আমাকে করতে হয়েছে। আর সেজন্যই আমি এমন অনেক তথ্য জানি, যা সহযোগী জানেন না।

আনসারি ঝুঁকে পড়ে বলেন, আপনি জানেন, কে, কোন্ উদ্দেশ্যে এই খুনটা করেছে?

বাসু ক্ষণকাল নতমস্তকে অপেক্ষা করে বললেন, এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কি প্রকাশ্য আদালতে শোভন হবে, য়োর অনার?

জাজ নিজেকে সামলে নিলেন। বললেন, আদালত বন্ধ হলে আপনারা দুজন, মিস্টার মাইতি এবং আপনি, আমার চেম্বারে দেখা করে যাবেন। নাউ, আপনি কি প্রতিবাদী পক্ষের কোন সাক্ষীকে মঞ্চে তুলবেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার বিরুদ্ধে যিনি এক কোটি টাকার ড্যামেজ স্যুট করেছেন। তবে ঐ কারণেই প্রথম থেকে তাঁকে আমি 'হোস্টাইল উইটনেস' হিসাবে লিডিং প্রশ্ন করার আর্জি রাখছি।

দায়রা জাজ বললেন, ইয়েস, আপনি লিডিং প্রশ্ন করতে পারেন। দ্য উইটনেস, বাই ভার্চু অব হিজ ল-স্যুট, একজন হোস্টাইল উইটনেস।

বাসু বললেন, মিস্টার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, প্লিজ টেক য়োর সিট অন দ্য উইটনেস স্ট্যান্ড।

।। দশ ।।

ইন্দ্রনারায়ণ উদ্ধত ভঙ্গিতে সাক্ষীর চেয়ারে গিয়ে বসলেন। শপথবাক্য পাঠ করলেন। কিন্তু বাসু কোন প্রশ্ন করার পূর্বেই উঠে দাঁড়ালেন মাইতি। বললেন, আমরা আদালতকে এই পর্যায়ে জানিয়ে রাখতে চাই, বর্তমান মামলার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে শুধু এমন প্রশ্নই আমরা অ্যালাও করব। ওঁর অপ্রাসঙ্গিক প্রতিটি প্রশ্নে অবজেকশন দেব!

জজ জানতে চাইলেন, জেরা শুরু হবার আগেই এমন একটা হুমকি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল কি?

—ইয়েস, য়োর অনার। সহযোগী শুধুমাত্র আইন বাঁচাতেই মিস্টার চৌধুরীকে উইটনেস-বক্সে তুলেছেন। বিনা প্রয়োজনে। শুধুমাত্র প্রমাণ করতে যে, তাঁর কোন কোন জিজ্ঞাস্য ছিল। এটা হচ্ছে ওঁর পরবর্তী মামলার খেসারত থেকে অব্যাহতি পাবার প্রচেষ্টা!

আনসারি কী যেন বলতে গিয়েও বললেন না। বাসুসাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, ইয়েস, য়ু মে প্রসিড।

—মিস্টার চৌধুরী, আপনি বারাসাতের বাগানবাড়িটা কবে কিনেছেন?

মাইতি তৎক্ষণাৎ আপত্তি দাখিল করেন, অবেজেকশান য়োর অনার। ইররেলিভ্যান্ট অ্যান্ড ইম্মেটিরিয়াল। বর্তমান মামলার সঙ্গে এ প্রশ্নের কোন সম্পর্ক নেই।

জজ বললেন, অবজেকশন ইজ সাসটেইন্ড।

বাসুর পরবর্তী প্রশ্ন, আপনার উপাধি চৌধুরী, কিন্তু বাগানবাড়িটার নাম 'রায়চৌধুরী ভিলা'। কেন? আপনি কি ওটা কোন রায়চৌধুরীর কাছে কিনেছিলেন?

মাইতি ঝাঁপিয়ে পড়ে আপত্তি জানালেন। তা গৃহীত হল।

—সুবলচন্দ্র সাঁই আপনার এস্টেটে কতদিন কাজ করছে?

মাইতি যথারীতি আপত্তি জানালেন। জজসাহেব এবার সেটি ওভাররুল করলেন। ইন্দ্রনারায়ণ জানালেন, সুবল ওঁর মালি হিসাবে প্রায় বিশ বছর চাকরি করছে। ঐ সঙ্গে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি আরও বললেন, আপনার এ প্রশ্নটাও কিন্তু বর্তমান মামলার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, মিস্টার পি. কে. বাসু, বার-অ্যাট-ল!

বাসু হাসি হাসি মুখে বললেন, তাই বুঝি? গোলা মানুষ তো? তাই আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। তাহলে এবার এমন একটা প্রশ্ন করি, যা বর্তমান মামলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত।

—করুন?

—আপনি কতদিন ধরে জানেন যে, আপনার মালি ঐ শ্রীসুবলচন্দ্র সাঁই-এর আসল নাম শ্রীচন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী— যাকে পুলিশ মহলে জানে 'চাঁদু রায়' নামে? যে চাঁদু রায়কে পুলিশ পনের-বিশ বছর ধরে খুঁজছে একটা হত্যা মামলায়— জেল-ফেরার, হত্যা এবং ব্যাঙ্ক-লুট?

মাইতি যেন ইলেকট্রিক শক খেয়েছেন। লাফিয়ে ওঠেন তিনি, অবজেকশন দিতে। কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর একটু দেরি হয়ে গেল। সামলে নিয়ে কোনক্রমে বললেন, অবজেকশন! ইনকম্পিটেন্ট, ইররেলিভ্যান্ট অ্যান্ড ইম্মেটিরিয়াল।

ঐ খণ্ডমুহূর্তের বিলম্বেই জজসাহেব কী যেন বুঝে নিলেন। তাকিয়ে দেখলেন সাক্ষীর দিকে। ইন্দ্রনারায়ণ যেন বজ্রাহত হয়ে বসে আছেন। জজসাহেব ধীরে ধীরে বললেন, দ্য অবজেকশন ইজ ওভাররুলড। আপনি প্রশ্নটার জবাব দিন, মিস্টার চৌধুরী।

ইন্দ্রনারায়ণ তখনো আত্মস্থ হতে পারেননি।

বাসু জানতে চান, আপনি আমার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছেন তো?

—ইয়েস!

—তাহলে জবাব দেবার আগে আপনাকে কয়েকটা কথা জানাই, এইটে হচ্ছে একটা স্ট্যাম্প প্যাড, এইটে চাঁদু রায়ের ফিঙ্গার প্রিন্টের জেরক্স কপি, আর ঐ বসে আছেন আপনার বাগানের মালি সুবলচন্দ্র সাঁই। এবার বলুন, কী বলবেন?

ইন্দ্রনারায়ণ একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে নিয়ে বললেন, বিশ বছর।

—আপনার সঙ্গে চন্দ্রনারায়ণের রক্তের সম্পর্ক আছে?

—ও আমার সহোদর ছোট ভাই।

—আপনারা আসলে 'রায়চৌধুরী', চন্দ্রনাথ 'চাঁদু রায়' হয়ে যাবার পর আপনি নিজে 'রায়'টা বাদ দিয়ে শুধু 'চৌধুরী' পরিচয়টুকু বহন করেন। তাই না?

—ইয়েস।

—আপনি জানতেন, আপনার ভাইকে পুলিশে হত্যাপরাধে খুঁজছে। তাই তাকে মালি সাজিয়ে...

মাইতি উঠে দাঁড়িয়ে মাঝপথে বলে ওঠেন, ইফ দ্যা কোর্ট প্লিজ, এসব আলোচনা বর্তমান মামলার প্রসঙ্গে...

দায়রা জাজ আনসারিও তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেন, মিস্টার পি. পি.! আপনি যদি কোন 'অবজেকশন' দেবার জন্য আদালতের কাজে বাধা দিতে উঠে থাকেন তবে আগাম জানিয়ে রাখছি তা নাকচ করা হল। এখানে আমরা দুই আইনজ্ঞ প্রতিযোগীর কুস্তির লড়াই দেখতে আসিনি। এসেছি সত্যান্বেষণে। প্লিজ সিট ডাউন অ্যান্ড ডোন্ট ইন্টারাপ্ট এগেন! আপনি বলুন, মিস্টার বাসু—

ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, না, ওঁকে আর সওয়াল করতে হবে না। আমি নিজে থেকেই একটা জবানবন্দি দিতে চাই। ইন ফ্যাক্ট, কথাটা আর আমি চেপে রাখতেও পারছিলাম না। আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল।

ইন্দ্রনারায়ণ তাঁর দীর্ঘ জবানবন্দিতে জানালেন :

ইন্দ্রনারায়ণের পিতৃদেব সূর্যনারায়ণ রায়চৌধুরী জমিদারী অ্যাবলিশন বাবদ ভাল টাকাই খেসারত পেয়েছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র লেখাপড়া শিখে মানুষ হল বটে, কিন্তু কনিষ্ঠ চন্দ্রনারায়ণ কুসঙ্গে পড়ে অমানুষ হয়ে ওঠে। সূর্যনারায়ণ যখন স্বর্গারোহণ করেন তখন ইন্দ্রনারায়ণ সাবালক কিন্তু চন্দ্র নাবালক, কিশোর। ইন্দ্র আপ্রাণ চেষ্টাতেও ভাইকে সৎপথে রাখতে পারেননি। সে বাড়ি ছেড়ে পালায় অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়। দীর্ঘদিন পরে জেল-পালানো আসামী হিসাবে 'চাঁদু রায়' তার দাদার কাছে আত্মসমর্পণ করে। সেটা বোম্বাইয়ে। ইন্দ্রনারায়ণ ভাইকে আশ্রয় দেন। সে হয় ওঁর বাগানের মালি; সুবল সাঁই। বোম্বাইয়ে খোঁজাখুঁজিটা বেশি হচ্ছিল। তাই চাঁদুকে বারাসাতের বাড়ির মালি করে পাঠিয়ে দেন। একবার বিজনেস ওয়ার্ল্ড পত্রিকা থেকে ইন্দ্রনারায়ণের একটি কাভার স্টোরি ছাপার আয়োজন হয়। ওঁদের অসতর্কতায় প্রেস ফটোগ্রাফারের একটি 'ক্যানডিড' ফটোয় ইন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে চন্দ্রনারায়ণেরও একখানি ছবি উঠে যায়। ঐ ছবিটি হস্তগত হয় জগদীশ পালের, তার হাত থেকে ক্রমে পরেশ পালের। গত তিন বছরে পরেশ কয়েক লক্ষ টাকা ব্ল্যাকমেল আদায় করেছে। উপায় নেই— ভাইয়ের মুখ চেয়ে ইন্দ্রনারায়ণ টাকা জুগিয়ে গেছেন।

তারপর, এ বছর নাইন্থ জানুয়ারি, রবিবার, সকালে পরেশ এসে ইন্দ্রনারায়ণকে বলে সে একটা ভীষণ বিপদে পড়ে গেছে। সে ভারতবর্ষ থেকে পালাতে চায়। ইন্দ্রনারায়ণ তাঁর প্রভাব খাটিয়ে দু-একদিনের মধ্যে যদি ওকে একটি পাসপোর্ট এবং দক্ষিণ আমেরিকার যে কোন দেশের ভিসা জোগাড় করে দেন, আর প্যাসেজ মানি বাবদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেন তাহলে ও তাঁকে ব্ল্যাকমেলিং থেকে চিরমুক্তি দিয়ে যাবে। ইন্দ্রনারায়ণ তখন জানতে চান, পরেশ পালের বিপদটা কী। ও তা জানাতে রাজি হয় না। ফলে, ইন্দ্রনারায়ণও রাজি হন না। পরেশ পাল তখন চলে যায়

তার মাসিক প্রাপ্য টাকাটা নিয়ে। ঐ দিনই দারোয়ানের হেপাজত থেকে রিভলভারটা চুরি যায়।

দীর্ঘ বিবৃতির শেষে বিচারকের দিকে ফিরে ইন্দ্রনারায়ণ বলেন, আয়াম সরি, য়োর অনার। বর্তমান হত্যা মামলার বিষয়ে আমি আর কিছুই জানি না; কিন্তু মৃত ব্যক্তি যে আমাকে গত তিন বছর ধরে শোষণ করে গেছে সেটা স্বীকার করছি। আমার ভাইয়ের পরিচয় গোপন করে আমি আইনত অপরাধী হয়েছি; কিন্তু সে আমার সহোদর ভাই। পিতার অবর্তমানে আমিই তার পিতৃতুল্য। চন্দ্রনারায়ণের বিচারের সময় এ অপরাধের জন্য বিচারক আমাকে যে শাস্তি দেবেন তা আমি মাথা পেতে নেব।

বাসু বললেন, দ্যাটস্ অল। পি. পি. কি এঁকে ক্রস করতে চান?

মাইতি কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে কী যেন ভাবছিলেন। বললেন, নো কোশ্চেন্স!

বাসু বললেন, আদালত যদি অনুমতি করেন তাহলে বাদীপক্ষের একজনকে পুনরায় জেরা করতে চাই।

—কাকে?

—ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বাগানের মালি, সুবলচন্দ্র সাঁইকে।

পি. পি. হাজরা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আমাদের কোনও আপত্তি নেই। প্রসিকিউশন উপলব্ধি করেছেন যে, এ মামলার কোন কোন দিক উদঘাটনের চেষ্টাই করা হয়নি। এইমাত্র আদালতে যে তথ্য উদঘাটিত হল সে সম্বন্ধে আমরা যথোচিত ব্যবস্থা নেব। মিস্টার পি. কে. বাসু বাদীপক্ষের যে কোন সাক্ষীকে ক্রস করে সত্য উদঘাটনে আমাদের সাহায্য করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

জাজ আনসারি বললেন, থ্যাঙ্কু, কাউন্সেলার। এটাই আপনার অফিসের নীতি হওয়া উচিত। শ্রীসুবলচন্দ্র সাঁইকে সাক্ষীর মঞ্চে আর একবার উঠতে হবে।

সুবলচন্দ্রও বোধহয় বিশবছরের আত্মগোপনের গ্লানিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। শান্তচিত্তেই সে মেনে নিল তার দুর্ভাগ্যকে। ধীর পদক্ষেপে উঠে দাঁড়ালো সাক্ষীর মঞ্চে।

বাসু বললেন, আপনি চেয়ারে বসুন, মিস্টার রায়চৌধুরী।

ম্লান হাসল চাঁদু রায়। মাথা থেকে পাগড়িটা খুলে চেয়ারের হাতলে রাখল। তার মাথায় ছোট ছোট কদমছাঁট চুল। বসল চেয়ারে। বলল, বলুন?

—আপনি জানেন যে, আদালত এলাকার বাইরে গেলেই পুলিশ আপনাকে গ্রেপ্তার করবে। আপনার দীর্ঘ আত্মগোপনের জীবন শেষ হল। আপনি জানেন, বিশ্বনাথ যাদব পুলিশ এনকাউন্টারে ঘটনাস্থলেই মারা যায় আর জগদীশ পাল দীর্ঘ দিন মেয়াদ খাটে। কিন্তু শেষ জীবনে জগদীশ বেচারি কাগজের ঠোঙা বানিয়ে গ্রাসাচ্ছাদন করেছে। ছেলের কাছ থেকে বিশেষ কিছু পায়নি। সে হিসাবে আপনি অনেক বেশি ভাগ্যবান। আত্মগোপন করে থাকলেও সমাজের দৃষ্টির অন্তরালে জীবনকে নিশ্চয় উপভোগ করেছেন। অন্তত ঠোঙা বানিয়ে আপনাকে গ্রাসাচ্ছাদন করতে হয়নি।

চন্দ্রনারায়ণ বাধা দিয়ে বলেন, ভূমিকা ছেড়ে প্রশ্ন কী করবেন, সরাসরি জিজ্ঞেস করুন না? সঙ্কোচ করছেন কেন?

—ভূমিকা করছি এটুকু বোঝাতে যে, আপনার স্বীকারোক্তিতে আপনার অপরাধের ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। আমি আপনাকে ঐ তরুণী আসামীটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখতে বলব। ওকে নিরপরাধ প্রমাণ করতে আমি এ আদালতে এসেছি। দু-একটি প্রশ্ন আপনার কাছে পেশ করতে চাই। আপনার কিছু অপরাধের স্বীকৃতিও আছে তার ভিতর...

চন্দ্রনারায়ণ দুঃসাহসিক হাসি হেসে বললেন, সেই অপরাধের স্বীকৃতির জন্য কি আমার দুইবার ফাঁসি হবার আশঙ্কা আছে, ব্যারিস্টার সাহেব?

বাসু ম্লান হেসে বললেন, আপনার এ জবাব লা-জবাব! আমার প্রথম প্রশ্ন সেক্ষেত্রে আপনিই কি পরেশ পাল ওরফে সুশোভন রায়কে গুলি করে মেরেছেন? আপনার দাদাকে ব্ল্যাকমেলিং-এর হাত থেকে চিরতরে রক্ষা করতে?

বাসুসাহেবের চোখে চোখ রেখে চন্দ্রনারায়ণ বললেন, না!

—এটা কি সত্য যে, জানুয়ারির নয় তারিখে, রবিবার সকালে, যেদিন পরেশ পাল আপনার দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তার পাসপোর্ট-ভিসার আর্জি নিয়ে, সেদিন সে আলোচনায় আপনি উপস্থিত ছিলেন?

—হ্যাঁ, ছিলাম।

—সেদিনই দারোয়ানের ঘর থেকে রিভলভারটি চুরি যায়। তাই নয়?

—হ্যাঁ, পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী তাই বটে।

—আপনি জানেন, দারোয়ানের ঘর থেকে কীভাবে রিভলভারটা চুরি যায়?

চন্দ্রনারায়ণ বললেন, এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না, কারণ তাহলে আমি নিজেই নিজেকে ইনক্রিমিনেট করব!

বাসু বলেন, মিস্টার রায়চৌধুরী! আপনার তো দু'দুবার ফাঁসি হতে পারে না। রিভলভারটা আপনি নিজেই সরিয়েছিলেন এ কথা স্বীকার করতে এত আপত্তি কেন?

—আমি জবাব দেব না। কারণটা এইমাত্র বলেছি।

—আপনি চাইছিলেন, আপনার দাদাকে ঐ ব্ল্যাকমেলিং-এর নাগপাশ থেকে মুক্তি দিতে, কেমন?

—ন্যাচারালি! ইয়েস!

—আপনি ঐ রায়চৌধুরী ভিলা থেকেই নির্মলা রায়কে নয় তারিখে ফোন করেন এবং মিথ্যা করে বলেন যে, আপনি ক্যামাক স্ট্রিট থেকে বলছেন। অ্যাম আই কারেক্ট?

—আমি জবাব দেব না। একই হেতুতে!

—আমি বুঝতে পারছি, আপনি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন না। কেন করবেন না,

তাও আমি বুঝেছি। আপনি কি আমার এই শেষ প্রশ্নটার জবাব দয়া করে দেবেন?

—কী আপনার শেষ প্রশ্ন?

—আপনি কি জানতেন যে, পরেশ পালের দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যু হলে, বিশেষ করে খুন হয়ে গেলে, আপনার দাদা মুক্তি পাবেন না?

চন্দ্রনারায়ণ এবার বললেন, ইয়েস! য়ু আর অ্যাবসোলিউটলি কারেক্ট!

বাসু বললেন, দ্যাটস্ অল, য়োর অনার।

মাইতি একেবারে চুপ করে গেছেন। চন্দ্রনারায়ণকেও রি-ডাইরেক্ট সওয়াল করলেন না। জাজ আনসারি প্রশ্ন করেন, মিস্টার বাসু, আপনার আর কোন সাক্ষী আছে?

—নো, য়োর অনার। কিন্তু আদালত অনুমতি দিলে বাদীপক্ষের আরও একজন সাক্ষীকে কিছু জেরা করতে চাই। মানে, নতুন যে সব তথ্য পাওয়া গেল তার ভিত্তিতে। আমার বিশ্বাস, তাতে এই হত্যারহস্যের আর একটা দিক উদঘাটিত হয়ে যাবে।

জজসাহেব মাইতিকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে গেলেন; কিন্তু তার পূর্বেই মাইতি উঠে দাঁড়িয়ে শ্লেষভরে বললেন, বাই অল মিনস্! আপনিই তো এখন আদালতের সুপার হিরো! বলুন কাকে সাক্ষীর মঞ্চে তুলব, স্যার?

—মিস্টার রজত গুপ্ত!

নিতান্ত অনিচ্ছায় রজত গুপ্তকে আবার সাক্ষীর মঞ্চে উঠে বসতে হল। বিচারক বললেন, আপনি আগেই শপথবাক্য পাঠ করেছেন, তাই দ্বিতীয়বার তা করানো হল না। আপনি যা বলবেন তা হলফ নিয়ে বলা বলেই ধরে নেওয়া হবে।

রজত বলল, আই নো, য়োর অনার!

বাসু বললেন, মিস্টার গুপ্ত, আপনি নিশ্চিত বুঝতে পারছেন মামলাটা এখন কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে। আপনি জানেন যে, আসামীকে সাক্ষীর মঞ্চে তুলে আমি যদি ঘটনার রাত্রির পূর্বাপর বর্ণনা দিতে বলি, তাহলে তার জবানবন্দির সঙ্গে আপনার জবানবন্দির অনেকটাই মিল হবে; কিন্তু শেষের দিকে কিছুটা মিলবে না। আদালত জানেন না, কিন্তু আপনি জানেন : কোথায় অমিল হবে। ঐ দশটা দশ-এর পর থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত ঘটনা মিলবে না! তাই নয়?

রজত এদিক-ওদিক তাকিয়ে জজসাহেবের দিকে ফিরে বলল, য়োর অনার! আমার নিজস্ব কোনও সলিসিটর নেই। থাকলে তিনিই বলতেন, এ প্রশ্নটি অবৈধ! এ প্রশ্নের জবাব সাক্ষীর কনক্লুশন। অ্যাম আই টু আনসার দ্য কোশ্চেন?

জজ মাথা নেড়ে বললেন, দ্য অবজেকশন ইজ ওয়েল টেকন। না, আপনাকে জবাব দিতে হবে না। মিস্টার বাসু, আপনি ওঁকে অন্য প্রশ্ন করুন।

বাসু বললেন, অলরাইট! যেহেতু আপনার স্বার্থ দেখবার জন্য আপনি কোনও আইনজীবীকে ইতিপূর্বে নিয়োগ করেননি এবং এখন আর তার সময়ও নেই, তাই আমি আপনাকে কোন প্রশ্নই করব না। আমি শুধু এখানে দাঁড়িয়ে এ হত্যাকাণ্ডটা কী করে ঘটেছে তার একটা সম্ভাব্য বর্ণনা

দেব। আমার বক্তব্য বলা হয়ে গেলে আমি জানতে চাইব : আপনি কি আমার সঙ্গে একমত? জবাবে আপনি স্বচ্ছন্দে জানাতে পারেন যে, জবাব আপনি দেবেন না— কোনও আইনজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ না করে। কারণ জবাবটা আপনাকে হয়তো 'ইনক্রিমিনেট' করতে পারে! অর্থাৎ অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে পারে। অ্যাম আই ক্লিয়ার?

—ইয়েস।

—আদালত জানেন, আমরাও জানি— আপনি আড়াই-তিন বছর আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, চাঁদু রায়ের বর্তমান পরিচয় পরেশ পাল জানে। পুলিশ জানে না। আপনি পরেশ পালের উপর নজর রাখেন। দেখেন, সে প্রায়ই রায়চৌধুরী ভিলায় যায়। আপনার সন্দেহ হল ইন্দ্রনারায়ণই হচ্ছেন চাঁদু রায়। কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণ এত উঁচুতলার মানুষ যে, আপনার পক্ষে নিশ্চিত প্রমাণ সংগ্রহ করা মুশকিল। আবার নিশ্চিত প্রমাণ ছাড়া ব্ল্যাকমেলিং শুরু করা চলে না। যেহেতু পরেশ আপনাকে মাঝে-মাঝে দু-পাঁচ হাজার টাকা 'প্রফেশনাল ফি' দিয়ে যাচ্ছিল তাই এতদিন কোন শো-ডাউনের প্রশ্ন ওঠেনি। তারপর নিতান্ত ঘটনাচক্রে পরেশ পাল নিজেই আপনাকে নিযুক্ত করল আর একটা কাজে। শুক্রবার সাত তারিখ সকালে পরেশ পালের বাড়ি থেকে কিছু দূরে গাড়িটা পার্ক করে ব্যাপারটা দেখলেন। আসামীর গাড়ির নম্বরটা যে আপনার স্মরণে ছিল, অথবা নোটবুকে লেখা ছিল একথা আপনি ডাইরেক্ট এভিডেন্সে নিজেই বলেছেন। আপনার চিন্তাটা তখনো একমুখী— 'চাঁদু রায়'! আপনার সন্দেহ হল ঐ মেয়েটিও পরেশ পালের ব্ল্যাকমেলিং-এর কথা কোনও সূত্রে জানতে পেরেছে। তাই মেয়েটি সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে শুরু করলেন। ঠিক যেভাবে পুলিশে আসামীর পাত্তা পেয়েছে, অর্থাৎ মোটর ভেইকেলস এবং ওর কোম্পানির সুবাদে। সেদিন দুপুরের মধ্যেই আপনি এসে হাজির হলেন সুশোভন রায়ের বাড়িতে। ক্যালকাটা ক্রেমস্ ব্যুরোর অফিসারের পরিচয়ে। ...এ পর্যন্ত যা বলেছি, তা সহজেই প্রমাণ করা যাবে। এখনি নির্মলা রায়কে সাক্ষীর মঞ্চে তুললে সে আপনাকে শনাক্ত করবে। ...সে যা হোক, ইতিপূর্বে আসামীর ফটো দেখেছেন, তাই সুনিশ্চিত হতে তার একটি ফটো দেখতে চাইলেন। নির্মলা ওদের ফ্যামিলি অ্যালবামটা এনে আপনার হাতে দিল। আপনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কারণ অ্যালবামের প্রথম ছবিটাই ওদের বিয়ের পর যুগলে তোলা! আপনি বুঝলেন, পরেশ পাল আর সুশোভন রায় একই ব্যক্তি। বিগেমির শিকার। দ্বিবিবাহের! তাতেই ও অপরাজিতার পিছনে লেগেছে। চাঁদু রায়ের কেস এটা নয়।... দশ তারিখে যখন পরেশ আপনাকে পুনরায় এনগেজ করল, ততক্ষণে আপনি আন্দাজ করেছেন যে, পরেশ ঐ মেয়েটিকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চায়। কারণ ঐ সেলস গার্লটি নিতান্ত ঘটনাচক্রে জানতে পেরেছে পরেশের দুই বিবাহের কথা। তাই পরেশ যখন আপনাকে সোমবার সন্ধ্যায় এক নির্জন স্থানে দেখা করতে বলল, তখন আপনি ভাবলেন যে, শো-ডাউনের সময় উপস্থিত।... আমার অনুমান ঐ নিরপরাধ মেয়েটি খুন হয়ে যাক এটা আপনি চাননি! আফটার অল, মেয়েটার দোষটা কী? পরেশ পালের অপরাধটা ঘটনাচক্রে জেনে ফেলা? এজন্যই আপনি বলেছিলেন, নিজস্ব রিভলভারটা আপনার সঙ্গে নেই। পরেশ তখন তার রিভলভারটা বার করে আপনাকে দেয়। আপনি তখন বুঝতে

পারেন, মেয়েটিকে খুন করার জন্যই পরেশ রিভলভারটা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে অস্ত্রটা হাতে পেয়েই চেম্বার খুলে আপনি দেখে নেন তাতে ছয়-ছয়টা তাজা বুলেট আছে।... মিস্টার গুপ্ত! এ পর্যন্ত আমি যা বলেছি তা স্বীকার করুন বা না করুন, কিছু এসে যায় না। আমি সাক্ষী প্রমাণের জোরে এই তথ্যগুলি সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠা করব— একটি ব্যতিক্রম বাদে। আই মিন, কেন নিজের রিভলভার সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও আপনি কায়দা করে পরেশকে নিরস্ত্র করেছিলেন! আপনার মূল উদ্দেশ্য ছিল, আসামী মেয়েটিকে বাঁচানো, এটা আপনার স্বীকৃতি ছাড়া আমি প্রমাণ করতে পারব না।... এনি ওয়ে, এরপর আমি যা বলছি তা আমার আন্দাজ। আমি প্রমাণ দিতে পারব না। আমার ধারণা— রিভলভারটি হাতে পেয়েই আপনি ওকে বলেছিলেন, 'লুক হিয়ার মিস্টার পাল! অহেতুক ঐ মেয়েটিকে খুন করবেন না। কারণ তাতে আপনার সমস্যার সমাধান হবে না। হবে না এজন্য যে, তথ্যটা আমিও জেনে ফেলেছি : আপনার দুটি বিয়ে! সুশোভন রায় হিসাবে আপনার স্ত্রী নির্মলা রায়; পরেশ পাল হিসাবে আপনার স্ত্রী শর্মিষ্ঠা পাল।' হয়তো জবাবে পরেশ বলেছিলেন, 'তোমার সঙ্গে আমার বহুদিনের কারবার। না হয় টাকার অঙ্কে কিছু হেরফের হবে। কিন্তু ঐ মেয়েটি কেউটে সাপ। টাকা দিয়ে ওকে কেনা যাবে না। কাল সকালেই ও ব্যারিস্টার পি. কে. বাসুর কাছে গিয়ে সব ফাঁস করে দেবে। শুধু আজ রাতটুকু আমার হাতে আছে।' আবার বলছি, এ আমার আন্দাজ : হয়তো জবাবে আপনি বলেছিলেন, 'মিস্টার পাল! আপনার টাকা আর চাই না আমি। রাজাকে মুক্তি দেব, যদি 'রাজার রাজার' পরিচয়টা জানিয়ে দেন। বলুন : চাঁদু রায় কে?'... না, না মিস্টার গুপ্ত! ও ভুল করবেন না। বোবার শত্রু নেই! আপনি এই পর্যায়ে কোন কথা বলবেন না। শুধু শুনে যান।... হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম : বুকে উদ্যত রিভলভারটা দেখে পরেশ পাল জবাব দিতে বাধ্য হয়! স্বীকার করে! কিন্তু সে সময় আপনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে, ঐ অবস্থাতেও পরেশ পাল আপনাকে ডাহা মিথ্যে কথা বলেছিল। ও বলেছিল, ''চাঁদু রায়ের বর্তমান পরিচয় ধনকুবের ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী'' আপনি ওর চালাকিটা বুঝতে পারেননি। পারেননি এজন্য যে, আপনার অবচেতন মন এই জবাবটাই প্রত্যাশা করেছিল।... আয়াম অলমোস্ট সার্টেন মিস্টার গুপ্ত, এ পর্যন্ত যা আমি বলেছি, তা নির্ভুল। কথোপকথনে হেরফের হতে পারে কিন্তু ঘটনা এই পর্যায় পর্যন্ত এসে থেমেছিল। কিন্তু তারপর ঘটনা দুটি ভিন্ন ধারায় বইতে পারে। দুটোই সম্ভবপর। আমি জানি না, কোনটা ঘটেছিল। প্রথম সম্ভাবনা : নামটা শুনেই আপনি ওকে গুলিবিদ্ধ করেন। তখন রাত প্রায় নয়টা। আসামীর গাড়ি তখনো আসেনি। আপনি একাজ করে থাকতে পারেন এজন্য যে, আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে পরেশ পালের বেঁচে থাকার আর কোনও প্রয়োজন নেই। এরপর থেকে আপনি একাই ইন্দ্রনারায়ণকে দোহন করতে পারবেন।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা : আপনি হয়তো এভাবে কোল্ড-ব্লাডেড মার্ডার করেননি। আপনি 'বর্ন ক্রিমিনাল' নন। আপনি আসামী মেয়েটিকেও খুন হতে দিতে চান না। ফলে হয়তো চাঁদু রায়ের পরিচয়টা জানতে পেরে বলেছিলেন : ''থ্যাঙ্কু মিস্টার পাল, এখন থেকে আমরা দুজন পালা করে ইন্দ্রনারায়ণকে দোহন করব। একমাস আপনি, একমাস আমি।'' বলে, আপনি পিছন ফেরা

মাত্র পরেশ পাল তার হিপ পকেট থেকে একটা ছোরা বরে করে আপনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রথম আক্রমণে সে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হলে অকুস্থলে ছুরিবিদ্ধ অবস্থায় আপনার মৃতদেহটাই ওখানে পড়ে থাকার কথা! কিন্তু আপনি দারুণ ভাবে 'ডাক' করে ওকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করেন। গুলিবিদ্ধ হল তাই পরেশ পাল।... ওয়েল মিস্টার গুপ্ত! এটাই আমার থিয়োরি! এটাই আমার বিশ্বাস! আপনি বলতে পারেন— আমার থিয়োরিটা ভুল। অথবা বলতে পারেন; "আমি জবাব দেব না, যেহেতু জবাবটা আমাকে ইনক্রিমিনেট করবে।"... নাউ, হোয়াটস য়োর আনসার?

আদালতে আলপিন-পতন নিস্তব্ধতা। প্রায় পঁচিশ সেকেন্ড ধরে রজত নতনেত্রে চিন্তা করল। তারপর মুখ তুলে তাকালো। বলল, আজ্ঞে না। আমি জবাব দেব। আমি আত্মরক্ষা করতেই ওকে হত্যা করি। আপনি ঠিকই বলছেন। আমি পিছন ফেরা মাত্র ও ছোরা হাতে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমি গুলি চালাতে বাধ্য হই। তারপর ছোরাটা ওর হিপ পকেটে গুঁজে দিয়ে ওর মৃতদেহটা জঙ্গলে টেনে আনি। আমার বাকি জবানবন্দিতে মিথ্যা কিছু নেই— একেবারে শেষ পর্যায়ে দশটা দশের পর আবার বারাসাত ফিরে এসে মিস করের গাড়ি ও পরেশ পালকে দেখার বর্ণনা ছাড়া।

—তার মানে আপনি যখন আসামীর কোলে রিভলভারটা ফেলে দেন, তখন তাতে পাঁচটা তাজা বুলেট ছিল? ব্যারেলের সামনেরটা ব্যয়িত?

—ইয়েস স্যার!

—দ্যাটস অল, য়োর অনার। ডিফেন্স কনক্লুডস হিয়ার।

জজসাহেব বললেন, প্রথামাফিক এখন দুপক্ষের আর্গু করার কথা। কিন্তু তার পূর্বে আমি পি. পি. এবং ডিফেন্স কাউন্সেলকে আমার বেঞ্চের কাছে সরে আসতে বলছি। কিছু গোপন পরামর্শ ছিল।

দুজনেই এগিয়ে গেলেন। আনসারি বললেন, মিস্টার পি. পি., মামলা এখন যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে সুবলচন্দ্র সাঁই ওরফে চাঁদু রায় এবং রজত গুপ্তকে এখনি অ্যারেস্ট করা দরকার। সেটা আপনি করবেন, না সু মোটো-কেস করে আদালত করবে?

পি. পি. মাইতি বলেন, নো, য়োর অনার! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আদালত ভাঙলেই আমরা যথাবিহিত ব্যবস্থা নেব। সশস্ত্র পুলিশ আদালত ঘিরে রেখেছে। আর এই সঙ্গেই আমরা জানাতে চাই প্রসিকিউশন মিস অপরাজিতা করের উপর মামলা প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। আপনি মামলা ডিসমিস করে ইচ্ছে করলে আসামীকে এখনি মুক্তি দিতে পারেন।

বাসু বললেন, থ্যাঙ্কু মিস্টার মাইতি।

মাইতি অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে তাকালেন বাসুসাহেবের দিকে। তারপর প্রথামাফিক বললেন : য়ু আর ওয়েলকাম।

* * * * *

আদালত ভাঙল। সবাই বাইরে বার হয়ে আসছে। বাসুসাহেবের হাত ধরে অপরাজিতা— দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে আছে হাতখানা। ইন্দ্রনারায়ণ এগিয়ে এলেন ওদের দিকে। বললেন, একটা কথা

ছিল, মিস্টার বাসু!

ওঁরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন আদালতের করিডোরে। বাসুসাহেব, অপরাজিতা, কৌশিক, সুজাতা আর বাসুসাহেবের কিছু জুনিয়ার শিক্ষার্থী উকিল।

ইন্দ্রনারায়ণ অপরাজিতার দিকে ফিরে বলেন, আপনার উপর যে অন্যায়, অত্যাচার হয়েছে সে জন্য আমরা আংশিকভাবে দায়ী। আমাদের ক্ষমা করে যেতে হবে।

অপরাজিতা হাসতে হাসতে বলে, আজ কারও ওপর আমার কোনও রাগ নেই। বেশ তো, দিলাম ক্ষমা করে!

—ক্ষমা যে করেছেন তার প্রমাণ হিসাবে একটা অনুমতি দিতে হবে।

—কিসের অনুমতি?

—মিস্টার বাসুর ফিজটা আমাকে মেটাতে দিন!

গম্ভীর হয়ে গেল অপরাজিতা। সংক্ষেপে বলল, তা হয় না। আমার যেটুকু ক্ষমতা উনি তাই নেবেন।

বাসু বললেন, মিস্টার চৌধুরী, অপরাজিতার কাছ থেকে আমি কোন কিছুই নেব না। বিশেষ কারণে। কিন্তু আমাদের আর একটি কাজ বাকি আছে।

—কী কাজ?

—আসুন আমার সঙ্গে।

দলটা এগিয়ে গেল আদালতের আর এক প্রান্তে, সেখানে ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করছিল নির্মলা রায়। বাসু পিছন থেকে ডাকলেন, নির্মলা!

মেয়েটি ঘুরে দাঁড়ালো। তার চোখে জল। বাসু বললেন, আদালতে সাক্ষী দেবার সময় তুমি বলেছিলে, সুশোভন তোমার জন্য যা কিছু রেখে গেছে তাতে তোমার অধিকার আছে কি না তা তুমি জান না। কারণ সুশোভন তোমার বৈধ স্বামী ছিল না। আমার এই কার্ডখানা রাখ। কোন দাবিদার বা পাড়ার মস্তান যদি তোমার সঙ্গে বাঁদরামো করতে আসে আমাকে একটা ফোন করে দিও। সুশোভনের সব কিছু এখন আইনত তোমার!

ইন্দ্রনারায়ণও ঐ সঙ্গে তাঁর নামাঙ্কিত একটি কার্ড দিয়ে বললেন, প্রথম ধাক্কাটা সামলাবার পর যদি চাকরি-বাকরি করার ইচ্ছে হয়, তাহলে আমাকে একটা ফোন করবেন। আপনার দুর্দৈবের জন্যও আমি নিজেকে আংশিকভাবে দায়ী মনে করছি।

নির্মলার চোখ আবার অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

অপরাজিতা এগিয়ে এসে বললে, তোর বাড়িতে আমাকে থাকতে দিবি তো, নিমু? দেখলি তো, তোর বরকে আমি নিজের দাদার মতোই...

দুজনেই দুজনকে বাহুবন্ধে জড়িয়ে ধরল।

দুজনেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

।। এগারো ।।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ আদালত থেকে রানী দেবী একটি টেলিফোন পেয়েছিলেন : কে রানু? হ্যাঁ, খবর ভালই। অপরাজিতা বেকসুর খালাস হয়েছে। পরেশকে কে খুন করেছিল তাও জানা গেছে...

রানী জানতে চেয়েছিলেন, আর সেই এক কোটি টাকার খেসারতের মামলাটা?

—সেটার ডেট তো এখনো পড়েনি। তবে চিন্তা কর না, আমাদের দুজনকে বোম্বাইয়ের ঝোপড়িতে যেতে হবে না। ইন্দ্রনারায়ণ কেস উইথড্র করে নিচ্ছেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার মধ্যেই ওঁরা তিনজনে এসে উপস্থিত হলেন। বৈকালিক চা-খাবার খেতে খেতে সুজাতা আর কৌশিক পালা করে আদালতে অভিনীত নাটকটার চুম্বকসার শোনালো।

রাত্রে ডিনার টেবিলে খেতে এলেন ওঁরা মাত্র তিনজন। কৌশিক বলল, কই, মামু কই?

রানী বললেন, ও আজ ডিনার খাবে না। মাংসের কাবাবের প্লেটটা নিয়ে ইজিচেয়ারে বসেছে। শিভাস রিগালের বোতল আর বরফের পাত্রটা নিয়ে। আজ আর আমি 'না' করতে পারলাম না।

সুজাতা বললে, দু-এক পেগ খান তাতে তো ডাক্তারের আপত্তি নেই, কিন্তু গোটা বোতল নিয়ে এভাবে বসলে...

রানী বলেন, আমি বলে বলে হার মেনে গেছি। যেদিন কেস জিতে ফেরে সেদিন ও যেন ছেলেমানুষ হয়ে যায়। আমি বাধা দিই না।

কৌশিক বলে, বুঝেছি! তাতেই মামু কেস জেতার জন্য জান কবুল লড়ে যান। আজ যদি রজত গুপ্ত নিজের থেকে স্বীকার না করত যে, আত্মরক্ষার্থে সে পরেশ পালকে... কথাটা তার শেষ হল না। ভিতরের দরজার দিকে তাকিয়ে মাঝপথেই থেমে গেল। তিনজোড়া চোখ তখন ভিতর দিকের দরজায় নিবদ্ধ। সেখানে উলেন গাউনটা গায়ে দিয়ে গ্লাস হাতে এসে দাঁড়িয়েছেন বাসু। ওখান থেকেই বলে ওঠেন, তাহলে কী-হত তর্কচঞ্চু?

কৌশিক আমতা-আমতা করে, না, মানে তাহলেও আপনি শেষপর্যন্ত কেস জিততেন কিন্তু মামলা আজই ডিসমিস হয়ে যেত না। সব সমস্যার সমাধান একদিনেই হত না।

বাসু এসে বসলেন তাঁর নিত্যব্যবহৃত চেয়ারে। বিশু বুদ্ধি করে একটা প্লেট আর ছুরি-কাঁটা দিল। উনি ফর্কে করে একটা কপির বড়া নিজের প্লেটে তুলে নিয়ে ছুরি দিয়ে সেটাকে কাটতে কাটতে বললেন, তোমাদের বুঝি সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে?

রানী বললেন, ওদের হয়েছে কি না জানি না, আমার বাপু হয়নি! অবশ্য আমি সবই সেকেন্ড-হ্যান্ড রিপোর্ট পেয়েছি!

—তোমার মনে কী প্রশ্ন আছে?

—চাঁদু রায় বলেছিল, পরেশকে খুন করলেও তার সমস্যার সমাধান হবে না। এটা কেন?

পরেশের বাবা জগদীশ মারা গেছে। চাঁদু রায়ের পরিচয় আর কেউ জানে না। এ ক্ষেত্রে পরেশকে হত্যা করার 'মোটিভ' চাঁদু রায়ের পক্ষে যে অত্যন্ত প্রবল। সে বর্ন ক্রিমিনাল! সে যেই বলল যে, খুনটা সে করেনি— অমনি মেনে নিলে তুমি?

—হ্যাঁ, নিলাম। কারণ দেখলাম চন্দ্রনারায়ণ তার সাক্ষ্যে একটাও মিছে কথা বলেনি। এমনকি দারোয়ানের ঘর থেকে রিভলভারটা কে চুরি করেছিল তা সে স্বীকার করেনি। অস্বীকারও করেনি।

কৌশিক বলে, দারোয়ানের হেপাজত থেকে রিভলভারটা পরেশ পালের হেপাজতে কেমন করে এল, এ সমস্যার সমাধানটাও অবশ্য হয়নি।

—দারোয়ানের হেপাজত থেকে ওটা এসেছিল তাই বা ধরে নিচ্ছ কেন? —জানতে চাইলেন বাসু।

কৌশিক কৈফিয়ত দেয়, বাঃ! পরেশ যখন দুপুরবেলা তার বাড়িতে স্নান করছে তখনই তো তার স্ত্রী, আই মিন নির্মলা, ওর অ্যাটাচি কেসে ওটা দেখতে পায়।

—ঐ একই রিভলভার তা বলা চলে না। একই রকম দেখতে একটা রিভলভার।

—বেশ, না হয় তাই হল। আমরা দু'দুজনের জবানবন্দিতে জেনেছি, ঐ একই রকম রিভলভার— দু'দুবার হাত বদলেছে ঐ সন্ধ্যায়। পরেশ দিয়েছে রজতকে। রজত দিয়েছে অপরাজিতাকে। এমনকি রাত্রে ঐ রিভলভারটা নির্মলা আবার দেখেছে। মানছি কেউই রিভলভারের নম্বর টুকে রাখেনি, কিন্তু এ রহস্যে একাধিক পয়েন্ট থ্রিটু-বোরের রিভলভারের কথাও কেউ কখনো বলেনি। ফলে, সিদ্ধান্তে আসা স্বাভাবিক যে, যেমন করেই হোক দারোয়ানের রিভলভারটাই ঘটনার দিন সকালে পরেশ পালের হস্তগত হয়েছিল! কী ভাবে হয়েছিল তা আমরা জানি না।

নৈশাহার তখন পঞ্চমাঙ্কের শেষ দৃশ্যে। বিশু মাংসের প্লেটগুলো উঠিয়ে নিয়ে গেল। এবার পুডিং পরিবেশনের পালা। পাত্রের শেষ তলানিটুকু কণ্ঠনালিতে ঢেলে দিয়ে বাসু বললেন, রিভলভারের প্রসঙ্গটাও না হয় আপাতত মুলতুবি থাক। আসল ব্যাপারটার কী সমাধান সাব্যস্ত হল? অর্থাৎ খুনটা করল কে? কখন? কেন?

সুজাতা বলে, বাঃ, 'সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার বাবা!' সে কথা তো আপনি নিজেই আদালতে প্রমাণ করে দিয়ে এলেন। রজত গুপ্ত কনফেসও করল!

—তা করল। কিন্তু সেই কনফেশনটা কি মেনে নেওয়া চলে?

—মানে! কেন নয়?

—পর পর যুক্তির বিশ্লেষণ যাচাই কর। প্রথম কথা : পরেশ পাল অত্যন্ত ঘাঘু ক্রিমিনাল। সে চাঁদু রায়ের মতো 'আর্চ ক্রিমিনাল'কে তিন বছর ধরে দোহন করেছে। সে রাতারাতি স্ট্রিকনিন জোগাড় করে স্থির মস্তিষ্কে স্ত্রীর বান্ধবীকে বিষ দিতে পারে। এ-হেন ঘড়িয়াল পরেশ পাল কি জানে না যে, পিঠে ছোরা খেলে একটা লোক মরতে দু-তিন মিনিট সময় নেবেই!

রজতের পকেটে নয়, সে মুহূর্তে হাতে ছিল একটা লোডেড রিভলভার! ছোরা খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগেই সে প্রথম ফায়ারটা করবে— এবং মৃত্যুর আগে বাকি পাঁচটা গুলিতে পরেশ পালকে ঝাঁঝরা না করে সে মরবে না! ফলে রজতের ঐ কাহিনী কি বিশ্বাসযোগ্য? পরেশ রজতকে পিছন থেকে ছোরা নিয়ে আক্রমণ করতে এসেছিল? অ্যাবসার্ড!

সুজাতা বললে, এ কথাটা অবশ্য চিন্তা করার।

দ্বিতীয়ত, আত্মরক্ষার্থে ফায়ার করলে রজত কোন মহত উদ্দেশ্যে পরেশের মুঠি থেকে খুলে ছোরাটা তার হিপ পকেটে গুঁজে দেবে? তাই কেউ দেয়? নিজের সেলফ ডিফেন্সের প্রমাণ লোপাট করে?

এবার কৌশিক বলে, সে কথাও ঠিক। খুব সম্ভবত পরেশ যেমন জানত না যে, রজতের হিপ পকেটে তার নিজস্ব রিভলভারটা আছে, তেমনি ঘটনার সময় রজতও জানত না যে, পরেশের হিপ পকেটে একটা ছোরা আছে। জানলে, এবং 'সেলফ ডিফেন্সের' অজুহাত নেবার সম্ভাবনা ভবিষ্যতে দেখা দিতে পারে এটুকু অনুমান করলে— সে পরেশের হিপ পকেট থেকে ছোরা বার করে ওর মুঠিতে ধরিয়ে দিত! পকেটে ছোরা ভরে দিত না।

বাসু বললেন, কারেক্ট! তাছাড়া আরও একটা কথা ভেবে দেখার আছে। আত্মরক্ষার্থেই হোক অথবা ইচ্ছাকৃত হত্যাই হোক, রজত গুপ্ত যদি ঐ সময় পরেশকে হত্যা করত, তাহলে রজতের পক্ষে স্বাভাবিক আচরণ কীরকম হবার কথা? তার প্রথম কাজ হত : রিভলভার থেকে তার নিজের আঙুলের ছাপ মুছে ফেলা। এটা সে করে থাক বা না থাক, রিভলভারে তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছিল না। দ্বিতীয় কাজ : রিভলভারটা ঘটনাস্থলেই ফেলে রেখে অত্যন্ত দ্রুত গাড়ি নিয়ে কেটে পড়া। ভেবে দেখ। পরেশ ছাড়া আর কেউ ওদের নির্জন সাক্ষাতের কথা জানে না। ও নিজে থেকে এগিয়ে না এলে পুলিশ কোনদিনই ওর হদিস পেত না। ওর গাড়ির নম্বরটাও ছিল ফলস। কোন পথচারী নম্বরটা মনে রাখতে পারলেও রজতকে ধরা যেত না। তাহলে সে কেন এক্ষেত্রে পরেশের মৃতদেহের অদূরে অপরাজিতার জন্য অপেক্ষা করবে? অপরাজিতার গাড়ি আসার আগে ট্রাফিক-পেট্রল পুলিশের গাড়ি আসতে পারত। কোন মোটরিস্ট ওর জখম গাড়ি দেখে নিজে থেকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে পারত! সেসব রিসক্ ও নেবে কেন?

সুজাতা বলে, সেটাও ঠিক কথা! অপরাজিতাকে তাহলে ও ঐভাবে ফাঁসাতে চাইবে কেন? তাহলে কি রজত খুন করেনি? এটা হতেই পারে না। সে ক্ষেত্রে সে আদালতে কনফেস করবে কেন?

রানী দেবী বলেন, তুমি এই সবগুলি অসঙ্গতির জবাব জান?

বাসু হেসে বললেন, হলফ যখন নেওয়া নেই তখন বলতে বাধা কী : জানি। জানি, বা না জানি আমি একটা জবর গপ্পো জানি। ঐ যে তুমি কী বল তাকে? আষাঢ়ে গপ্পো না শ্রাবণী গপ্পো! সেই গল্পটা বললে তোমরা দেখবে জিগ্‌স-ধাঁধার মতো সব কটা ফাঁক-ফোকর ভরাট হয়ে যাবে। কোন অসঙ্গতি থাকবে না।

সুজাতা বলে, তবে সেই গল্পটাই বলুন, শুনি।

ইতিমধ্যে বিশু প্লেটে-প্লেটে পুডিং পরিবেশন করতে শুরু করেছে। বাসু বললেন, আমাকে পুডিং দিস না রে। আর কপির বড়া দে বরং দু-একটা।

উঠে দাঁড়ালেন উনি। সবার উপর দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন, পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। ভেবে দেখ! সব সমস্যার সমাধান হতে পারে এমন কোনও আষাঢ়ে গল্প তোমরা বলতে পার কি না। বাই-দ্য-ওয়ে, আমার 'শ্রাবণী গল্পে' এমন কোন নতুন ডাটা থাকবে না, যা তোমরা জান না।

রানী বলেন, কোথায় যাচ্ছ তুমি?

—আসছি, এখনি।

—আর খেও না।

চলতে শুরু করেছিলেন। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। পিছনে ফিরে বলেন, তুমি এ ভুল ক্রিয়াটা ব্যবহার কর কেন বলত? খানা নেহী হ্যায় জী, পীনা! 'শিভাস রিগাল' কেউ খায় না। পান করে!

।। বারো ।।

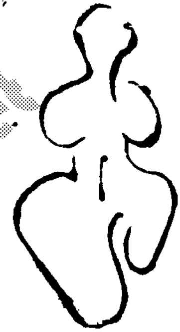

ফিরে এসে যে গপ্পোটা শোনালেন তার চুম্বকসার : চাঁদু রায় মিছে কথা বলেনি। পরেশ পালকে হত্যা করলে তার সমস্যার সমাধান হত না। দেড়-দু'বছর আগে যখন পরেশ তার ব্ল্যাকমানির প্রথম ইনস্টলমেন্ট নিতে আসে তখন ইন্দ্রনারায়ণের উপস্থিতিতে সে চন্দ্রনারায়ণকে বলেছিল, 'দেখুন, আপনি আমার বাবার বন্ধু। বাবা আপনার কীর্তিকাহিনী শোনাবার সময় বারবার 'চাঁদুদা-চাঁদুদা' বলছিলেন। ফলে আপনি আমার 'জেঠু'! তাই আপনাকে বিপদে ফেলা আমার অধর্ম হবে। এজন্য একটা কথা গোড়াতেই জানিয়ে রাখছি : বাবা যা-যা বলেছিলেন তা একটা রিপোর্টের আকারে লিখে আমার ব্যাঙ্ক-ভল্টে রেখে দিয়েছি। আর তার উপসংহারে লিখেছি যে, আমার যদি সন্দেহজনক দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হয়, বা আমি খুন হয়ে যাই, তাহলে ইন্দ্রনারায়ণের বাগানের মালি শ্রীসুবল সাঁইয়ের অ্যালেবাইটা যেন ভাল করে যাচাই করা হয়!'

ব্যস! এক কিস্তিতেই মাৎ! পরেশ পাল বাপকা বেটা! এটা না করলে চাঁদু রায়ের মতো দক্ষ আর্চ ক্রিমিনালের কল্যাণে অনেক আগেই সে ফৌত হয়ে যেত। তার নাম পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যেত না। ঠিক যেভাবে উবে গেছে পরেশ পালের গাড়িটা।

সে যা হোক, জানুয়ারির নয় তারিখ সকালে পরেশ যখন দুই ভাইয়ের দরবারে পাসপোর্ট-ভিসার আর্জিটা পেশ করে তখন ইন্দ্রনারায়ণ জানতে চেয়েছিলেন, পরেশের সমস্যাটা কী। পরেশ বলেনি। ন্যাচারালি। সে বলতে যাবে কেন? কিন্তু সে যখন বেরিয়ে আসে তখন চন্দ্রনারায়ণ তাকে জনান্তিকে পাকড়াও করে। নির্জনে নিয়ে এসে বলে, বাবা পরেশ! তুমি

জগদীশের ছেলে, আমারও পুত্রস্থানীয়। তোমার জ্যেঠা... এই আমি... তিন-তিনটে খুন করেও ফলস পাসপোর্টে বিদেশ যাবার চেষ্টা করিনি। তুমি কী এমন হরধনু ভঙ্গ করলে বলতো, যার জন্যে দেশান্তরী হতে চাইছ?

—আপনাকে তা জানিয়ে আমার কী লাভ?

—তুমি আমাকে চেন। যদি দাদাকে ব্ল্যাকমেলিং থেকে সত্যিই চিরতরে মুক্তি দিতে রাজি থাক, তাহলে আমিই তোমার মুশকিল-আসান করে দিতে পারি।

—কী ভাবে?

—'কী ভাবে', তা কী করে বলব? মুশকিলটা কী জাতের তাই তো তুমি বলনি এখনো। আন্দাজ করছি, দু-একটা খুন করলে হয়তো তোমার মুশকিলটা আসান হতে পারে? তাই কি?

—আপনি আমার হয়ে সেটা করে দেবেন? দু-একটা নয়— মাত্র একটি খুন? সন্দেহটা বর্তাবে আমার উপর, তাই আমি খুব পাক্কা একটা অ্যালেবাই রাখব।

—আমি রাজি আছি। তবে কয়েকটা শর্ত আছে বাবা। প্রথম শর্ত : তোমার ব্যাঙ্ক ভল্টের কাগজখানা আমাকে দিয়ে যেতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত : তোমার অপরাধটা কী তা আমার কাছে স্বীকার করতে হবে। আমি তো প্রথমেই যাচাই করে দেখে নেব। আমি জানব তোমার সিক্রেট, তুমি জানই আমারটা। কেউ কাউকে তঞ্চকতা করতে পারব না। কেউ কাউকে ব্ল্যাকমেল করতে পারব না।

পরেশ একটু চিন্তা করে রাজি হয়ে যায়। চাঁদুর কাছে স্বীকার করে তার দুই বিয়ের কথা। চাঁদু নির্মলা রায়ের কথা জানত না। এবার ক্যামাক স্ট্রিটের এক ব্যাপারী সেজে টেলিফোন করে যাচাই করে জেনে নিল, নির্মলা রায় সুশোভন রায়ের স্ত্রী এবং সুশোভনই হচ্ছে পরেশ পাল। পরেশ এবার বলে, এই গোপন কথাটা জেনে ফেলেছে ওর স্ত্রী মানে নির্মলার এক বান্ধবী : বছর পঁচিশ বয়স। অবিবাহিতা। তার নাম...

চাঁদু বেঁকে বসে। বলে, এতক্ষণ বলনি কেন যে, যাকে খুন করতে হবে সে একটা পঁচিশ বছরের মেয়ে, যার বিয়ে পর্যন্ত হয়নি! একেবারে অরক্ষিতা!

—কেন? তাতে কী হল?

—সে তুমি বুঝবে না, পরেশ! আমাদের জমানা ছিল অন্যরকম! তিন-তিনটে খুন আমি করেছি। সবাই জোয়ান পুরুষ, তাদের প্রত্যেকের হাতেই মারণাস্ত্র ছিল। —একজন আবার তার মধ্যে পুলিশ-অফিসার। আয়াম সরি— স্ত্রীলোককে খুন করতে পারব না! বিশেষ, যার বদলা নেবার মতো মরদ পর্যন্ত নেই!

পরেশ তিক্ত কণ্ঠে বলেছিল, আপনি আমার গোপন কথা জেনে নিয়ে 'জেন্টলম্যান্স এগ্রিমেন্ট' ভাঙছেন!

শুনে অট্টহাস্যে ফেটে পড়েছিল চাঁদু রায়। বলেছিল, হ্যাঁগো! এর মধ্যে জেন্টেলম্যান আবার কোনটা? তুমি না আমি? তুমি কায়দা করে ব্ল্যাকমেল করছিলে, আমি কায়দা করে সেটা বন্ধ

করে দিলাম। না, না, 'জেন্টলম্যান' বলে নয়, তুমি জগদীশের ছেলে এজন্যই একটা কথা বলি। তুমি বিপদে পড়েছ। জগদীশ নেই, আমি যদ্দূর সম্ভব তোমাকে সাহায্য করব। যদি চাও তোমাকে একটা রিভলভার যোগাড় করে দিতে পারি আজ, এখনি। কাজ হাসিল হলে ওটা আবার আমাকে ফেরত দিয়ে যাবে। তুমি কাকে মারছ, কেন মারছ তা আমি জানতে চাইব না।

চাঁদু রায়ই দারোয়ানের ঘর থেকে রিভলভারটা সরিয়েছিল। দারোয়ান জানে না কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণের জ্ঞাতসারেই। তাই সে সত্যটা স্বীকার করেনি, অস্বীকারও করেনি। দাদাকে সে নতুন কোন বিপদে জড়িয়ে ফেলতে চায়নি।

গল্পের মাঝপথে বাধা দিয়ে কৌশিক বলে, তার মানে আপনার মতে, ইন্দ্রনারায়ণের রিভলভারটাই নানান হাতফেরতা হয়ে পৌঁছেছিল রজত গুপ্তের হাতে; দারোয়ান— চাঁদু রায়, পরেশ পালের হাতফেরতা হয়ে! সেক্ষেত্রে হত্যাকারী রজত গুপ্ত ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

—আমি কি সেটা অস্বীকার করেছি? আর হত্যাকারী না হলে রজত আদালতে বেহুদ্দো কনফেসই বা করবে কেন?

—কিন্তু তাহলে সে খুন করার পর অপরাজিতার জন্য অপেক্ষা করেছিল কেন?

—তুমিও যে মাইতির মতো শুরু করলে হে! সাক্ষীর এজাহার নেওয়া শেষ হওয়ার আগেই আর্গুমেন্ট! বলি গল্পটা আগে আমাকে শেষ করতে দাও! সেই 'শ্রাবণী-গল্পটা'। সেই গল্পে রজতের কথা তো এখনো বলাই হয়নি।

রজত সাত তারিখ দুপুরে নির্মলার অ্যালবামে সুশোভনের ছবিটা দেখার পর থেকে নিশপিশ করছে! পরেশ পালকে কীভাবে ব্ল্যাকমেলিং করবে এটাই ওর তখন একমুখী চিন্তা। এই সময় রজত একটা চান্স নেয়। ইন্দ্রনারায়ণের প্রাইভেট সেক্রেটারিকে ফোন করে বড়কর্তার সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চায়। ওঁর একান্ত-সচিব জানতে চান : 'কী বিষয়ে আলোচনা করতে চান?' রজত জবাবে বলেছিল : 'পরেশ পাল'।

বিস্মিত একান্ত-সচিব জানতে চায়, 'তার মানে?'

—মানেটা আপনি না বুঝলেও চলবে, স্যার! হয়তো উনি বুঝবেন। তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করেই দেখুন না, কাইন্ডলি।

বেশ দু-তিন মিনিট টেলিফোনটা নীরব রইল। তারপর ও প্রান্ত থেকে রাশভারী কণ্ঠে ইংরেজিতে প্রশ্ন হল : ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বলছি, কী চান আপনি?

—একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট, স্যার। দশ মিনিটের জন্য। অত্যন্ত জরুরি। ঐ পরেশ পালের বিষয়ে।

—কে পরেশ পাল? তার বিষয়ে কী কথা?

—সেটা স্যার, টেলিফোনে বলা যাবে না। তবে খবরটাতে আপনার ব্যবসায়ে প্রচণ্ড আর্থিক লাভ হবার সম্ভাবনা।

—অল রাইট। আপনি আজ সন্ধ্যা সাতটা পনেরয় আসবেন। সাতটা পনের থেকে পঁচিশ।

তৎক্ষণাৎ লাইনটা কেটে গেল। রজত গুপ্ত আহ্লাদে আটখানা। নিশ্চয় জ্যাকপট হিট করেছে। নাহলে ইন্দ্রনারায়ণের মতো ব্যস্ত মানুষ ওর মতো অজ্ঞাতকুলশীলকে দশ মিনিট সময় দিতেন না। আগামী সপ্তাহে নয়, একেবারে সেই দিনই সন্ধ্যায়! ঠিকই আন্দাজ করেছে সে : চাঁদু রায় ইজুক্যালটু ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

কাঁটায়-কাঁটায় সন্ধ্যা সাতটা পাঁচে সে রায়চৌধুরী ভিলায় উপস্থিত হল। ভ্যালে ওকে অপেক্ষাগারে নিয়ে গিয়ে বসালো। একান্ত-সচিব জানতে চাইলেন, আপনার নাম? অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?

রজত প্রথম প্রশ্নটা এড়িয়ে দ্বিতীয় প্রশ্নটার জবাব দিল, আছে, সাতটা পনের থেকে দশ মিনিট।

একান্ত-সচিব একটা রেজিস্টার খাতা বাড়িয়ে ধরে বলেন, এখানে আপনার নাম, ধাম, টেলিফোন নাম্বার সব এন্ট্রি করুন।

রজত জবাবে বললে, সরি! ওসব বোধহয় আপনার 'বস' পছন্দ করবেন না। ওঁকে ইন্টারকমে শুধু বলুন : পরেশ পা০।

'চিচিং ফাঁক' মন্ত্রটায় কাজ হল। রজত এখনি নিঃসন্দেহ। ছপ্পড়-ফোঁড় সৌভাগ্য লাভ করেছে সে। ঘরে ঢুকল। প্রকাণ্ড বড় একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ও প্রান্তে বসে আছেন ইন্দ্রনারায়ণ। কাকে যেন ফোন করছিলেন। বাক্যটা শেষ করলেন : 'আপাতত এটুকুই... দ্যাটস অল!'

যন্ত্রটা নামিয়ে রজতের দিকে দৃকপাত করে বললেন, ইয়েস! সিট ডাউন। আমার সেক্রেটারি ইন্টারকমে জানালেন যে, আপনি নাকি ভিজিটার্স-রেকর্ডে স্বাক্ষর দেননি?

—ইয়েস স্যার! অহেতুক কোন রেকর্ড রাখার কী দরকার?

ইন্দ্রনারায়ণ ওকে আপাদমস্তক আর একবার দেখে নিয়ে বলেন, প্রথমে বলুন তো, আপনি ব্যক্তিটি কে?

রজত তার ভিজিটিং কার্ড একখানা বাড়িয়ে ধরে। সেটা উল্টেপাল্টে দেখে ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, রজত গুপ্ত, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর! সখের গোয়েন্দা নাকি?

—আজ্ঞে না। সখের নয়। প্রফেশনাল।

—ও। তা আপনার আইডেন্টিটিটা প্রমাণ করতে পারেন?

রজত বিনা বাক্যব্যয়ে তার হিপপকেট থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা বার করে দেখালো। সেটা দেখে ফেরত দিয়ে ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, এবার বলুন, কী বলতে এসেছেন?

—ঐ পরেশ পালের বিষয়ে। ঘটনাচক্রে পরেশ পাল সংক্রান্ত একটা বিচিত্র তথ্য অতি সম্প্রতি আমি আবিষ্কার করেছি। পরেশ পাল একটা মারাত্মক অপরাধ করেছে— যার অকাট্য প্রমাণ আমার দখলে— সেটা পুলিশে রিপোর্ট করলে ওর নির্ঘাৎ জেল হয়ে যাবে...

ইন্দ্রনারায়ণের মুখের দিকে তাকিয়ে মাঝপথেই ও থেমে পড়ে। ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, আর য়ু স্পিকিং গ্রিক, মিস্টার গুপ্ত? কে পরেশ পাল? আমার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? আমাকে এসব

কথা বলতে এসেছেন কেন?

রজত বুঝতে পারে না— এটা অভিনয়, না সত্যি! পরেশ পালকে যদি না-ই চিনবেন তাহলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলেন কেন? রেজিস্টারে সই না দিয়েও সে কেমন করে ওঁর ঘরে ঢুকল। তবে কি উনি নামটা মনে করতে পারছেন না? রজত বললে, পরেশ পাল, মানে বারাসাতের পরেশ। যে তিন-চার বছর আগে কী একটা কারখানায় মজদুরি করত। এই তিন-চার বছরে গাড়ি-বাড়ি করেছে! ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। নিশ্চয় ব্ল্যাকমেলিং-এ।

ইন্দ্রনারায়ণ বলেন, তার সম্বন্ধে কী জাতীয় খবর সংগ্রহ করেছেন আপনি?

—সে প্রশ্নটা স্যার, তখনি উঠবে, যদি পরেশ পালকে আপনি আদৌ লোকেট করতে পারেন।

—আয়াম সরি। তাকে আমি চিনতে পারছি না।

—আপনি কি সুশোভন রায়ের নামটা শুনেছেন?

ইন্দ্রনারায়ণ চটে ওঠেন। বলেন, লুক হিয়ার, ইয়ং ম্যান! আপনি এই ফিশিং এক্সপিডিশনে কেন বার হয়েছেন, তা আপনিই জানেন। আমি সুশোভন রায় কিংবা ঐ যে কী সাম পালের নাম বললেন, ওদের কাউকে চিনি না। আপনি যদি এঁদের কোন অপরাধের নিশ্চিত প্রমাণ সংগ্রহ করে থাকেন, তাহলে আমি পরামর্শ দেব— সোজা থানায় চলে যান। এফ. আই. আর. লজ করে প্রমাণ করুন, আপনাকে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার হিসাবে লাইসেন্স দেওয়া ভুল হয়নি। য়ু মে কাইন্ডলি লিভ মি অ্যালোন!

—আপনি খবরটায় ইন্টারেস্টেড নন?

উনি বেল বাজালেন। আর্দালি প্রবেশ করল ঘরে। উনি বললেন, কী ভাষায় বললে আপনি বুঝবেন মিস্টার রজত গুপ্ত, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার?

রজত উঠে দাঁড়ায়। উনি আর্দালিকে প্রশ্ন করেন, আর কেউ দেখা করার আছে?

সে কী জবাব দিল শুনবার মতো মনের অবস্থা ছিল না রজত গুপ্তের। সে মাথা নিচু করে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

রজত মনে মনে সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করেছিল, ইন্দ্রনারায়ণ হচ্ছেন চাঁদু রায়! পরেশকে সে বহুবার ও বাড়িতে লুকিয়ে লুকিয়ে আসতে দেখেছে। পরেশকে চোখের সামনে কারখানার মজদুর থেকে লাখপতি হতেও দেখেছে। 'পরেশ পাল'-কে ইন্দ্রনারায়ণ চিনতে পারবেন না— এটা হতে পারে না। রজত মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, ঐ দাম্ভিক আর্চ ক্রিমিনালের দম্ভ সে ভাঙবে! যেমন করেই হোক, পরেশ পালের কাছ থেকে তথ্যটা সে আদায় করবেই।

* * * * *

তার মানে আমার কাহিনী অনুসারে রজত জানত পরেশ পাল বেমক্কা খুন হয়ে গেলে ইন্দ্রনারায়ণের মাধ্যমে তথ্যটা পুলিশ জানতে পারবে। কারণ ইন্দ্রনারায়ণ চাইবেন রজতের জেল

বা ফাঁসি হয়ে যাক। উনি জানেন যে, রজত জানে চাঁদু রায়ের কথা! ওর 'ভিজিটিং কার্ড' রয়ে গেছে ইন্দ্রনারায়ণের কাছে। সেটা ফেরত নেওয়া হয়নি। পরেশ দু'দুবার তার অফিসে এসেছে, এই জানুয়ারি মাসেই, তার সাক্ষী যোগাড় করা কঠিন হবে না পুলিশের পক্ষে। তাই মাইতির নাকের ডগায় একটা রাঙামূলো ঝোলানোর প্রয়োজন হল। আমার বিশ্বাস, যে মুহূর্তে পরেশ স্বীকার করেছে— মিথ্যা করেই যে, ইন্দ্রনারায়ণই হচ্ছে চাঁদু রায়— সেই মুহূর্তেই রজত তাকে হত্যা করে! স্থির করে, এখন থেকেই সে নিজেই ইন্দ্রনারায়ণকে ব্ল্যাকমেল করবে। পরেশ পালকে উনি চেনেন না বলেছিলেন, এবার রজতও দেখে নেবে 'চাঁদু রায়' ব্যক্তিটিকে উনি চিনতে পারেন কি না। এবারও যদি তিনি বলতে চান যে, ভাজা-মাছের একটা পিঠই উনি চেনেন, ওপিঠকে দেখতে কেমন তা জানা নেই, তখন রজত ওঁর নাকের ডগায় মেলে ধরবে চাঁদু রায়ের দশটা আঙুলের টিপছাপের জেরক্স কপি। ন্যাকা সেজে বলবে, 'কী যে বলেন স্যার? চাঁদু রায়কে চেনেন না? এই আপনারই মতো দেখতে। বিশ বছর ধরে পুলিশে তাকে খুঁজছে ফাঁসিকাঠ থেকে লটকাবে বলে! এবার কী পরামর্শ দেন স্যার? লালবাজারেই যাব, না কি পরেশ পালের সঙ্গে যে বন্দোবস্তটা ছিল আপনার— তাকে চিনুন বা না চিনুন..'

বেচারি রজত! অত কায়দা করে রিভলভারটা অপরাজিতাকে গছিয়ে দিল, পাছে সেটার কথা শেষ সময় মনে পড়ে যায় তাই রোমান্টিক রবিঠাকুরের কবিতা আউড়ে কুমারী মেয়েটির মনটা ঘুরিয়ে দিল, কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। ও ভেবেছিল 'চাঁদু রায়' প্রসঙ্গ এ মামলাতে আদৌ উঠবে না। কে ওঠাবে? হ্যাঁ, জানে ইন্দ্রনারায়ণ, কিন্তু সে তো ভাজা-মাছের এক পিঠই চেনে। সে খুশিই হবে পরেশ বেমক্কা খুন হয়ে যাওয়ায়। এ মামলা মিটে গেলে তখন শুরু হবে রজত গুপ্তের নতুন খেল!

কৌশিক বলে, আপনি কখন বুঝতে পারলেন যে, ইন্দ্রনারায়ণ নয়, তাঁর বাগানের মালিটাই চাঁদু রায়?

—ঠিক যখন তোমাদের বুঝতে পারা উচিত ছিল। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর একান্ত সচিব অপরাজিতাকে দেখেনি, অথচ সে পুলিশের কাছে যে বিবরণ দিয়েছে তা অভিজ্ঞ চোখের দৃষ্টিতে দেখা ডেসক্রিপশন! তথ্যগুলো সে সংগ্রহ করেছে বাগান-মালির কাছে। কী করে হয়? গ্রাম্য ভাষায় যে কথা বলে সে আন্দাজ করতে পারবে মেয়েটির হাইট, ওয়েট? মনে রাখতে পারবে তার পোশাক, গাড়ির নম্বর? তখনি আমার মনে হয়েছিল, সুবল সাঁই একটি ছিপে রুস্তম! সাক্ষীর মঞ্চে তাকে দেখার পরেও কেন যে তোমরা চিনতে পারলে না তা আমি জানি না। রানু ওকে দেখেনি, কিন্তু সুকৌশলীর দুজনই দেখেছে। অবশ্য বিজনেস ওয়ার্ল্ডে ইন্দ্রনারায়ণের মালির মুখে দাড়ি-গোঁফ ছিল, চোখে ছিল সস্তা নিকেলের চশমা, মাথায় বাব্‌রি। সুবল সাঁইয়ের সেসব কিছুই ছিল না। মাথায় ছিল কদম ছাঁট চুল। বিজনেস ওয়ার্ল্ডে ওর ছবি অসতর্কভাবে ছাপা হওয়াতেই চাঁদু রায় ভোল পাল্টে ফেলে বারাসাত চলে আসার আগে। তা হোক; চিনতে আমার অসুবিধা হয়নি।

কৌশিক বলল, আয়াম সরি, আমি কিন্তু চিনতে পারিনি।

সুজাতা বললে, আপনি তাহলে বুঝতে পেরেছিলেন যে, আত্মরক্ষার্থে নয়, ব্ল্যাকমেলিং-এর অসপত্ন-অধিকার লাভের জন্য রজতই ডেলিবারেট মার্ডার করেছিল?

—না বুঝতে পারার কোন হেতু আছে কি?

—তাহলে সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন না কেন?

—আমার কী গরজ? সে সব কথা তো নতুন করে উঠবেই যখন রজতের বিরুদ্ধে পুলিশ কেস তুলবে। আমি আদালতে গিয়েছিলাম আইনের লক্ষ্যভেদ করতে! আমার দৃষ্টি স্থির ছিল সেই মীনাক্ষীর দিকে! যেই আমার সওয়ালে রজত সেলফ-ডিফেন্স ও গুলি চালানোর কথা কবুল করল অমনি মাইতি সুড়সুড় করে এগিয়ে এল বলতে, ওরা কেস তুলে নিচ্ছে। আর তখনি জাজ এককথায় বেকসুর মুক্তি দিয়ে দিলেন মিঠুকে।

কৌশিক ঝুঁকে পড়ে বললে : কাকে? মিঠু! মিঠু কে?

সুজাতা নিঃশব্দে দৃঢ়ভাবে স্বামীর বাহুমূল চেপে ধরে।

বাসু হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে যান। তাকিয়ে দেখেন রানী দেবীর দিকে। চোখাচোখি হয় না। রানী নতনেত্রে কী যেন ভাবছেন।

বাসু উঠে দাঁড়ালেন। চারিদিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করলেন, আয়াম সরি! এঃ! ছি ছি! নামধাম সব গুলিয়ে যাচ্ছে। আমি বোধহয় আজ একটু টিপসি হয়ে পড়েছি!

কেউ কোন জবাব দেয় না। একটা অস্বোয়াস্তিকর নীরবতা।

গ্লাসটা হাতে নিয়ে বাসু এগিয়ে গেলেন ওয়াশ বেসিনটার দিকে। পা টলছে না কিন্তু। গ্লাসের অবশিষ্ট বাসন্তী রঙের পানীয়টুকু ঢেলে দিলেন ওয়াশ-বেসিনে। তারপর রানীর দিকে ফিরে বললেন, চল, শোবে চল। আজ বোধহয় একটু বেশিই খেয়ে ফেলেছি।

সেই খণ্ডমুহূর্তে বাসুসাহেবের মনে পড়ল না ভুল ক্রিয়াপদটার কথা। মদ জিনিসটা সমুদ্রমন্থনে ওঠা হলাহলের মতো। অপরকে অমৃত খাওয়ানোর জন্য তা কণ্ঠনালিতে শুধু ঢেলেই দেওয়া যায়। খাওয়া যায় না।

'খানা' নেহী হ্যয় জী, সিরেফ 'পীনা'!

যম-দুয়ারে পড়ল কাঁটা

নারায়ণ সান্যাল

যম দুয়ারে পড়ল কাঁটা

রচনাকাল : প্রাকপূজা '94

[শারদীয়া 'প্রতিদিন'-এ 1994 এ প্রকাশিত]

পুস্তাকারে প্রকাশ : বইমেলা '95

গ্রন্থক্রমিক : 98

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : খালেদ চৌধুরী

প্রচ্ছদ-আলোকচিত্র : প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

অলঙ্করণ : সন্দীপন ভট্টাচার্য
অলকানন্দা সেনগুপ্ত

উৎসর্গ : তারাপ্রসাদ শিকদার এবং
সুস্মিতা শিকদার, বাঁকুড়া

।। এক ।।

আজ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। টি.ভি.-তে সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে।

রানু দেবী একাই শুনছেন। বাসুসাহেব আজ আদালতে যাননি। সারাদিন একটি বই পড়েছেন: 'ম্যামাল্‌স অব দ্য ওয়ার্ল্ড'—ই. পি. ওয়াকারের লেখা। দুনিয়ার তাবৎ স্তন্যপায়ী জীবের বিষয়ে হঠাৎ কেন এই কৌতূহল বলা শক্ত। তবে ওঁর ধরনটাই ঐ রকম। ক্রমাগত বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে উত্তরণ। যেন 'জ্যাক অব অল ট্রেডস্' হবার ব্রত নিয়ে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। সারাদিন বই মুখে বসে থাকাটা আবার বরদাস্ত হয়নি রানী দেবীর। তাই তাঁর তাড়নায় বিকালে একচক্কর ঘুরে এসে আবার গিয়ে বসেছেন লাইব্রেরি ঘরে।

A-PDF Page Crop DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to re

কম্বাইন্ড-হ্যান্ড বিশে—এতদিনে সে প্রায় 'পুরাতন ভৃত্য' হতে বসেছে— নিঃশব্দে ওঁর নাগালের মধ্যে টিপয়ে সাজিয়ে দিয়ে গেল শ্যিভাস রিগ্যালের বোতল, বরফের টুকরো, কাজুবাদামের প্লেট, গ্লাস আর টংস। বাসু বইটা খুলে বসলেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঁদ হয়ে গেলেন বইটাতে। কত বিচিত্র, কত অজানা জীবই না বিবর্তিত হয়েছে সূর্যের এই তৃতীয় গ্রহে।

হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন রানী দেবী। তাঁর হুইল চেয়ারে পাক মেরে। বাসু চোখ তুলে দেখে বললেন, এটাই ফার্স্ট পেগ।

হেসে ফেলেন রানী। বলেন, তোমার পেগের হিসাব রাখতে আসিনি। যথেষ্ট বয়স হয়েছে তোমার। অন্তত হিসাব করে হুইস্কি খেতে পারার মতো বয়স। আমি এসেছি অন্য একটা কথা বলতে —

— বল?

— একটি মেয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

— মক্কেল? এই অসময়ে? কী নাম?

— নাম বলেনি, বলতে চাইছে না। জানি না, তুমি ওকে মক্কেল বলে স্বীকার করে নিলে নাম ধাম জানাবে কি না।

— বয়স কত?

— ঠিক বলতে পারছি না। সতের-আঠারো-উনিশ-কুড়ি কিছু একটা হবে।

— না, তাহলে হবে না। সতের আর উনিশে অনেক ফারাক, আইনের চোখে। মোট কথা সাবালিকা তো?

— না, আমারই ভুল। সতের নয়। সাবালিকা সে নিশ্চয়ই।

— তাহলেই হল। সেক্ষেত্রে সংবাদটা ইন্টারকমের মাধ্যমে না জানিয়ে সশরীরে হাজিরা দেবার হেতুটা কী? বাই য়োর ওন অ্যাডমিশন, পেগের হিসাব রাখতে নয় যখন।

— হেতু আছে। একটা নয়, দুটো। প্রথমত একটা খবর তোমাকে জানানো দরকার, সেটা তোমার সঙ্গে ওর সাক্ষাতের আগেই। মেয়েটার সঙ্গে ছোট্ট একটা ভ্যানিটি ব্যাগ ছাড়াও আছে মাঝারি মাপের কালো রঙের একটা অ্যাটাচি কেস। সেটা থাক দেওয়া কারেন্সি-নোটে বোঝাই।

— বল কী! কী করে জানলে?

— ও যখন আসে তখন আমি ভিতরের ঘরে বসে টিভি দেখছি। বিশু ওকে রিসেপশনে বসিয়ে আমাকে খবর দেয়। মেয়েটি বুঝতে পারেনি আমি একেবারে নিঃশব্দে আসব — পদশব্দ হবে না আমার হুইলচেয়ারে। আমি যখন ঘরের মাঝামাঝি এসে গেছি তখনই ও আমাকে দেখতে পায়। তাড়াহুড়ো করে অ্যাটাচি বন্ধ করে আমার দিকে তাকায়। ধরা পড়ে যাওয়ার চাহনি। তার আগেই আমি কিন্তু অ্যাটাচির ভিতরটা একনজর দেখে নিয়েছি।

— বুঝলাম। কত টাকা আছে ওর ব্যাগে? আন্দাজে কী মনে হল তোমার?

— তা কেমন করে বলব? পঞ্চাশ টাকার নোটের বান্ডিল মনে হল। পাশাপাশি থাক দেওয়া। কিন্তু সবটাই যে নোটের বান্ডিল তা নাও হতে পারে। হয়তো নিচের দিকে ওর শাড়ি-ব্লাউজ-তোয়ালে বা বই-পত্র আছে ...

বাসুসাহেব মাথা নেড়ে বললেন, এটা তোমার ব্যারিস্টার-গৃহিণীর উপযুক্ত কথা হল না, রানু। সেক্ষেত্রে মেয়েটি নোটের বান্ডিল নিচে রেখে তোয়ালে চাপা দিত। তার উপর শাড়ি-ব্লাউজ, বই-পত্র সাজাতো। তাই নয়? যাতে ডালাটা খুললেই ...

— তা বটে।

— সে যা হোক, তুমি তখন দুটো হেতুর কথা বলেছিলে। দ্বিতীয়টা?

— দ্বিতীয় হেতু — আশঙ্কা ছিল : তুমি যদি এই অবেলায় ওকে ফিরিয়ে দাও।

— হুঁ! নামধাম জানো না, কী বিপদ তা জান না, অথচ অর্থাভাব যে নেই তা জান, তবু দর্শনমাত্র ও তোমার মন জয় করেছে! মেয়েটি কি খুব সুন্দরী?

— না । তবে নিষ্পাপ সরল চেহারা। ভারি মিষ্টি দেখতে।

— শুধু তাতেই?

এবার রানীর নয়ন নত হল। মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে বললেন, হ্যাঁ, তাতেই। ওর বয়সটা যে ...

মাঝপথেই থেমে গেলেন। বাসু কুঞ্চিতভ্রূভঙ্গে সওয়াল করেন, বয়সটা কী? সে তো আঠারো-উনিশ...

নতনেত্রেই নিম্নকণ্ঠে জবাব দিলেন রানী, এই হুইলচেয়ারটা যদি এ বাড়িতে আদৌ না আসত, তাহলে আজ ঐ বিশেষ বয়েসের একটি মেয়ে ...

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান বাসুসাহেব। দুহাতে রানীর দুটি বাহুমূল চেপে ধরে বলে ওঠেন, আয়াম সরি!

— না, না, এতে 'সরি' হবার কী আছে?

— আছে, রানু, আছে, এবার আমিই বোকার মতো প্রশ্নটা করে বসেছি। ব্যারিস্টার-গৃহিণীর স্বামীর উপযুক্ত নয় ঐ প্রশ্নটা। আমার আন্দাজ করা উচিত ছিল, কেন তোমার এই চঞ্চলতা* । চল যাই। দেখি মেয়েটি কী বিপদে পড়ে অসময়ে ছুটে এসেছে।

লাইব্রেরি ঘরে শ্যিভাস-রিগ্যালের বোতলটার পাদমূলে উবুড় হয়ে পড়ে থাকল এই দুনিয়ার যাবতীয় স্তন্যপায়ী প্রাণী, যারা একটি স্বাধিকারপ্রমত্ত দ্বিপদী প্রজাতির উৎপীড়নে অবলুপ্তির মহানেপথ্যে ডোডো-ডাইনোসরদের সমগোত্রীয় হতে চলেছে। বাসুসাহেব তাঁর সহধর্মিণীর হুইলচেয়ারটা ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে চললেন বাইরের ঘরের দিকে। রিসেপশনের কাছাকাছি এসে রানীর চাকা-চেয়ারের পিঠ থেকে হাত দুটি সরিয়ে নিলেন। বললেন, যাও। ওকে পাঠিয়ে দাও।

* 'মাছের কাঁটায়' এ প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা আছে। প্রায় দশবছর আগে যে দুর্ঘটনায় রানী দেবী পঙ্গু হয়ে যান, সেই দুর্ঘটনাতেই নিহত হয়েছিল ওঁদের কিশোরী কন্যা, মিঠু : একমাত্র সন্তান।

চেম্বারে ঢুকে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলেন। রানী চেয়ারে পাক মেরে এগিয়ে গেলেন রিসেপশন কাউন্টারের কাছে।

একটু পরেই বাইরের দিক থেকে ঘরে ঢুকল একটি তরুণী। ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন রানী — বছর বিশেকের কাছাকাছি তার বয়স।

হালকা কোবাল্ট-ব্লু রঙের সিন্থেটিক শাড়ি, সঙ্গে একই রঙের ম্যাচ-করা হাফ হাতা ব্লাউজ। ঐ রঙেরই টিপ, দুল এবং গলায় হারের লকেট। এত খুঁটিয়ে সচরাচর দেখেন না বাসুসাহেব মেয়েদের সাজপোশাক। আজ ওকে দেখেই ওঁর মনে পড়ে গেল মেয়েটি গেইন্সবরোর ব্লু-বয়-এর স্ত্রীয়াম-ঈপ 'ব্লু-গার্ল!'

তাই এত খুঁটিয়ে দেখা।

বাসুর নির্দেশে মেয়েটি দর্শনার্থীদের নির্দিষ্ট একটি চেয়ার দখল করে বসল। অ্যাটাচি পাশে নামিয়ে রাখল না। রাখল কোলের উপর।

বাসু বলেন, বল মা, আমি কী ভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারি?

কীভাবে শুরু করবে ও বোধহয় স্থির করে উঠতে পারছিল না। হঠাৎ মনস্থির করে বলে ওঠে, দেখুন, একটি বিশেষ কারণে আমি নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে চাই। আমি চাই না আমার পরিচিত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব...

বাক্যটা ওর শেষ হয় না। বাসু মাঝপথেই বলে ওঠেন, 'নিরুদ্দেশ' না 'নিখোঁজ'?

— আজ্ঞে?

— 'নিরুদ্দেশ' মানে উদ্দেশবিহীন। বাউণ্ডুলের মতো। 'ক্ষ্যাপা' যেমন পরশ পাথর খুঁজে ফিরত ঠিক সে ভাবে নয়, কারণ ক্ষ্যাপার লক্ষ্য ছিল স্থির — পরশ পাথর! তুমি বোধহয় বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে 'নিখোঁজ' হতে চাইছ, 'নিরুদ্দেশ' নয়, — ঐ যাদের ফটো টি.ভি.-তে দেখানো হয়, — ভবানীভবনের মিসিং স্কোয়াডে খবর দেবার আবেদন জানিয়ে। তাই নয়?

জবাবে মেয়েটি যা বলল তা ভিন্ন প্রসঙ্গ : এক গ্লাস জল খাব।

— খাবে নয়, পান করবে। জলটা খাদ্য নয়। ... দিচ্ছি।

বেলের আওয়াজ শুনে বিশু এল। পরক্ষণেই আদেশমতো নিয়ে এল এক গ্লাস জল। রানী দেবীর ট্রেনিঙে কায়দামাফিক — অর্থাৎ নিচে ট্রে, উপরে ডিশ দিয়ে ঢাকা। মেয়েটির শুকিয়ে ওঠা কণ্ঠনালী স্বাভাবিক হবার পর বাসু প্রশ্ন করেন :

— কী নাম?

— কার? আমার?

— না তো কি যার আতঙ্কে নিখোঁজ হতে চাইছ, তার?

মেয়েটি নতনয়নে বললে, আমার নামটা জানাতে অসুবিধা আছে ...

— তা তো হতেই পারে। সেক্ষেত্রে তোমাকে মক্কেল বলে মেনে নিতে আমারও অসুবিধা আছে। তুমি এস মা, —

মেয়েটি রীতিমতো ভয় পেয়ে যায়। বলে, আমার আশঙ্কা ছিলই ক্লায়েন্টের নাম-ঠিকানা জানা না থাকলে আপনি আমার কেস নেবেন না। কিন্তু একটু ভেবে দেখুন স্যার, আমি যদি শিখা দত্তের মতো একটা বানানো নাম-ঠিকানা আপনাকে দিতাম তাহলে আপনি নিশ্চয় আমার কাছ থেকে একটা 'রিটেইনার' নিতেন। মক্কেল বলে স্বীকার করতেন? তারপর মিথ্যে নাম-ঠিকানার জন্য সময় নষ্ট করতেন।

— শিখা দত্ত কে? কার কথা বলছ?

— বাঃ। ছন্দা রায়, 'কৌতূহলী কনের কাঁটার।'

বাসুকে মনে মনে স্বীকার করতে হল, মেয়েটি সওয়াল-জবাবে পোক্ত। প্রথম ওভারের ইন-সুইঙ্গারে ঘাবড়ে গেছিল বটে কিন্তু আনাড়ী 'ব্যাটস্ ও-ম্যান' নয়।

বললেন, অল রাইট। বল, কী তোমার বিপদ?

— বিশ্বাস করুন স্যার, আমি কোনও অন্যায় করিনি, — না ধর্মত, না আইনত। কিন্তু বিশেষ কারণে কোন একজন ধুরন্ধর লোক আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে। আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে চাইছে ...

— পুলিশে তোমাকে ধরতে পারে কোনও একটি বিশেষ অপরাধের চার্জে। তা তুমি সেটা করে থাক, বা নাই কর। অপরাধটা কী জাতীয় তা আন্দাজ করতে পারছ?

— ধরুন খুন।

— 'ধরুন খুন'? তার মানে পুলিশে তোমাকে কোন্ অপরাধের আসামী হিসাবে খুঁজছে, তাও তুমি জান না? কোনো অপরাধ আদৌ সংঘটিত হয়েছে কি না সেটুকু অন্তত জান কি?

— আজ্ঞে না।

— সেটা 'এম্বেজল্‌মেন্ট' হতে পারে কি?

— মানে?

— 'Embezzlement' বোঝ না? 'কালো বাংলায়' যাকে বলে তহবিল তছরুপ?

— কালো বাংলায়?

— হ্যাঁ তাই। 'তহবিল তছরুপ' করলে যে টাকা হাতে আসে তা ব্যাঙ্কে ডিপজিট করা যায় না। অ্যাটাচি কেস বোঝাই করে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হয়। সেটা 'কালো' টাকা। তাই 'এম্বেজল্‌মেন্টের' বঙ্গানুবাদ শাদা বাংলায় হয় না। যতক্ষণ সেটা তহবিলে আছে, ততক্ষণ সেটা শাদা, তছরুপ হয়ে গেলেই কালো।

মেয়েটি নতনয়নে বললে, একবার বলেছি, আবারও বলি, আমি জ্ঞানত-অজ্ঞানত কোন অন্যায়, পাপ বা আইনত কোন অপরাধ করিনি। আমি শুধু আমার অত্যন্ত প্রিয় একজনকে বিপদ থেকে বাঁচাতে চাইছি। নিশ্চয়ই সেটা পাপ কাজ নয়, অপরাধ নয়।

— তার মানে তোমার সেই অত্যন্ত প্রিয়জনটি কিছু একটা অপরাধ করেছে? খুন, চুরি, বা তহবিল তছরুপ?

তাই বিজ্ঞাপনের ওপর চোখ বুলিয়ে বাসু বলেন, কী সুজাতা? কাল বলিনি, সন্ধানী দৃষ্টি থাকলে আলোর আভাস ঠিক পাওয়া যাবে।

কৌশিক বলে, তা তো যাবে, কিন্তু বিজ্ঞাপনটা দিচ্ছেন কে? আপনার মক্কেল না তাঁর শত্রুপক্ষ?

বাসু দ্বিতীয়বার পড়লেন শেষ পৃষ্ঠার ব্যক্তিগত কলমে বোল্ড টাইপে ছাপা বিজ্ঞাপনটা।

'হিসাবটা মেটাতে চাই। অবিলম্বে এবং নগদে। হোটেল পান্না, রিপন স্ট্রিট। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটার আগে। ছত্রিশ-চব্বিশ-ছত্রিশ।'

বললেন, দুটোই হতে পারে। তবে 'কোড নম্বর' পড়ে সহজেই বোঝা যাচ্ছে, এটা আমাদের মক্কেল সংক্রান্ত! সুকৌশলী, কী পরামর্শ দাও?

কৌশিক বলে, 'দৈনিক সঞ্জয় উবাচ' অফিসে খোঁজ করব?

— বৃথা। বিজ্ঞাপনটা যদিও মিস্টিরিয়াস, এবং কাউন্টার-ক্লার্ক — তা সে পুরুষই হোক, অথবা নারী — বিজ্ঞাপনের শেষ তিনটি শব্দ শুনে নিশ্চয় বিজ্ঞাপনদাত্রীর দিকে চোখ তুলে তাকাবে — যদি আমাদের মক্কেলই এটা করে থাকে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সে তোমাকে 'কোড নেম'-এ বিজ্ঞাপনদাত্রীর বিষয়ে কিছু বলবে না। এটা কাগজের এথিক্স।

কৌশিক বলে, তাহলে আমিও একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে আসি, কালকের কাগজে, ঐ একই জায়গায়। ধরুন, বিজ্ঞাপনটা এই রকম: "হোটেলের ভিতরে যাব না। ফাঁদ পাতার চেষ্টা করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। বিষ্যুদবার সন্ধ্যা ছয়টার সময় ঐ হোটেলের সামনে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকব। ছত্রিশ-চব্বিশ-ছত্রিশ"।

বাসু বললেন, কিন্তু কে যাচ্ছে? তুমি না সুজাতা?

— দুজনেই। ভেবে দেখুন, মামু: দুটো সম্ভাবনা। প্রথমত, বিজ্ঞাপনটা আপনার মক্কেল দিয়ে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে যে অ্যাটাচি ভর্তি টাকা নিয়ে সে হোটেল পান্নায় অপেক্ষা করছে ব্ল্যাকমেল মেটাতে। তাহলে আরও ধরে নিতে হবে যে, ওরা পরস্পরকে চেনে। না হলে প্রাপক হোটেল পান্নায় এসে, কেমন করে ওকে খুঁজে বার করবে? রিসেপশনে এসে তো বলতে পারে না, ৩৬-২৪-৩৬ কোন ঘরে উঠেছে? দ্বিতীয় সম্ভাবনা, বিজ্ঞাপনটা দিয়েছে 'ব্ল্যাকমেলার'। তাই 'অবিলম্বে' ও 'নগদ' শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে আপনার মক্কেল তাকে চেনে। কিন্তু ঠিকানা জানে না। তাই রিপন স্ট্রিটের হোটেল পান্নায় এসে দিনকয়েক ব্ল্যাকমেলারকে থাকতে হচ্ছে।

বাসু বললেন, তোমার যুক্তিটা ঠিকই আছে। তবে সময়টা বদলে নাও। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছয়টার বদলে কর, বেলা এগারোটা সাত আই. এস. টি.!

— বুঝেছি! সন্ধ্যা ছয়টায় হোটেলের গেটে অনেক লোকজন থাকবে। বেলা এগারোটা সাত মিনিট হলে মানুষটাকে চিহ্নিত করা সহজ হবে। সে স্ত্রীলোকই হোক, অথবা পুরুষ।

এই মতোই ব্যবস্থা হল।

দুপুরে বাসুসাহেবের একটা আর্বিট্রেশন মামলা ছিল। নিজের বাড়িতেই। আদালতে যেতে হয়নি।

সন্ধ্যায় কৌশিক ফিরে এসে খবর দিল — রিপন স্ট্রিটের 'হোটেল পান্না' মোটামুটি খানদানী পান্থশালা। ছয়তলা বাড়ি, লিফ্‌ট আছে, 'বার'ও আছে। দৈনিক সঞ্জয় উবাচ অফিসেও গিয়েছিল। পূর্ববর্তী বিজ্ঞাপনদাতার কোনও পাত্তা পায়নি। তবে সে নিজে যে বিজ্ঞাপনটি দিয়েছে তার কপিটা দেখালো।

"৩৬-২৪-৩৬! হোটেলের ভিতরে নয়। হোটেলের সামনে ট্যাক্সিতে অপেক্ষা করব। বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটা থেকে এগারোটা পাঁচ। একা আসা চাই। তুমিজা নোকে।"

* *

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ সুজাতা এসে পৌঁছাল রিপন স্ট্রিটের হোটেল পান্নায়। ঠিক পৌনে এগারোটায় সে হোটেল লাউঞ্জে ঢুকে রিসেপশন কাউন্টারের কাছাকাছি সোফা দখল করে একটা পেপারব্যাক খুলে বসল। কাউন্টার ক্লার্কের সঙ্গে ওর চোখাচোখি হল। সুজাতা বারে বারে তার মণিবন্ধের দিকে তাকাতে থাকে — ভাবখানা : হোটেল-লাউঞ্জে সওয়া-এগারোটা নাগাদ কারও সঙ্গে তার জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

কৌশিক এল, আলাদা। একটা ট্যাক্সি নিয়ে। ঠিক এগারোটা বাজতে পাঁচ মিনিটে। তার পরনে গ্রে রঙের সুট। চোখে কালো চশমা। মাথায় টুপি এবং তার কানাৎটা এমনভাবে নামানো যাতে মুখটা ভাল দেখা না যায়। কৌশিক বসেছে পিছনের সিটে। ড্রাইভারকে বলেছে, হোটেলের ঠিক সামনে ট্যাক্সিটা পার্ক করতে।

ট্যাক্সিটা ঠিক হোটেলের সামনে পার্ক করা গেল না। কারণ আগে থেকেই সেখানে একটা অ্যাম্বাসাডার পার্ক করা। তার পিছনে একটা মারুতি। অগত্যা গেট থেকে একটু দূরে গাড়িটা পার্ক করে ট্যাক্সি ড্রাইভার জানতে চাইল, কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে?

কৌশিক ওর দিকে একটা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরে বলে, এটা তোমার মিটারের উপর।

ট্যাক্সি ড্রাইভার নোটখানা বুক পকেটে রেখে একটা সিগারেট ধরায়। এতক্ষণে সওয়ারির সাজপোশাকের দিকে তার নজর যায়। 007 মার্কা কিছু পিকচার নিশ্চয় তার দেখা আছে। সে মনে মনে খুশি হয়।

এগারোটা বাজল।

হোটেল থেকে বেশ কিছু লোক বাইরে এল। কিছু ঢুকলও। গাড়ির পাশ দিয়ে দু-চারজন যাতায়াতও করছে। কেউ যে ওকে বিশেষ নজর করছে, তা মনে হল না কৌশিকের। মিনিট তিনেকের মধ্যেই ওর লক্ষ্য হল একটি বিশেষ তরুণীকে। ট্যাক্সিটার পাশ দিয়ে সে তৃতীয়বার যখন হেঁটে গেল। বর্ণনা শোনাই ছিল। কৌশিকের চিনতে অসুবিধা হল না। মেয়েটি কিন্তু

ট্যাক্সিটার কাছে এগিয়ে এল না। কৌশিকও কোন সাড়া দিল না। চতুর্থবার ট্যাক্সিটার পাশ দিয়ে যাবার সময় সে বেশ কাছে ঘনিয়ে এল। তাকিয়ে দেখল ট্যাক্সিটার পিছনের একক যাত্রীটির দিকে। কিন্তু হয়তো যাকে খুঁজছে সে নয় — এ কথা বুঝে নিয়ে দূরে সরে গেল। ফুটপাতের স্টলওয়ালার দোকানে কিছু মাসিকপত্র নাড়াচাড়া করতে থাকে।

কৌশিক বুঝল, ও ভয় পেয়েছে। যোগাযোগ করবে না। যতক্ষণ কৌশিক ট্যাক্সি নিয়ে চলে না যাচ্ছে মেয়েটি ততক্ষণ স্টল ছেড়ে নড়বে না। অগত্যা কৌশিক মনস্থির করে। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে নির্দেশ দেয় পার্ক স্ট্রিটের দিকে যেতে।

ট্যাক্সিটা দৃষ্টিপথের বাইরে যাওয়ার পরেও মেয়েটি দাঁড়িয়ে রইল ম্যাগাজিন স্টলে। ট্যাক্সির নম্বরটা সে নিশ্চয় দেখে রেখেছে; মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সেই নম্বরী ট্যাক্সিটা ফিরে এল না দেখে সে হোটেলে ফিরে গেল। রিসেপশন কাউন্টারে গিয়ে কী একটা চাবি চাইল। কাউন্টার-ক্লার্ক পিছনের বোর্ড থেকে একটি চাবি পেড়ে নামালো। চাবিটা নিয়ে মেয়েটি এলিভেটারের দিকে এগিয়ে গেল। লিফটটা উপরে উঠতে শুরু করতেই সুজাতা এগিয়ে এল কাউন্টারের দিকে। কত নম্বর চাবি মেয়েটি নিয়েছে তা সে দূর থেকে দেখতে পায়নি; কিন্তু পেরেকটা চিহ্নিত করছে; তৃতীয় সারির পঞ্চম চাবিটা। কাছে এসে দেখল চাবিটার পেরেকের পাশে লেখা 315 ।

সুজাতাকে এগিয়ে আসতে দেখে রিসেপশনিস্ট মেয়েটি বললে, ইয়েস? ক্যান আই হেলপ য়ু?

— অফ কোর্স য়ু ক্যান। এক্ষুনি যিনি 315 নম্বর চাবিটা নিয়ে গেলেন উনিই কি শকুন্তলা চ্যাটার্জি? গ্যানন অ্যান্ড ডাঙ্কার্লির ডক্টর সামন্তের পার্সোনাল সেক্রেটারি?

কাউন্টার ক্লার্ক সুজাতাকে আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, আপনি অনেকক্ষণই হোটেল লাউঞ্জে বসে আছেন। কেন বলুন তো?

সুজাতা মিষ্টি হাসল। বলল, এককথায় তার জবাব: চাকরির সন্ধানে। মিস্ চ্যাটার্জিকে আমি চাক্ষুষ কখনো দেখিনি। উনি এগারোটা নাগাদ এই হোটেলে আমাকে আসতে বলেছিলেন। রুম নম্বর কত তাও বলেননি। বলেছিলেন, রিসেপশনে এসে অপেক্ষা করতে। উনি ডেকে নেবেন। সাড়ে দশটা থেকে এগারোটা মধ্যে।

— আই সি। তাহলে আপনার কেন মনে হল যে উনিই ...

মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে সুজাতা বললে, ওঁর বর্ণনা শুনেছি। ওঁদের অ্যানুয়াল সোশালে তোলা গ্রুপ ফটোতে ওঁর ছবিও দেখেছি। অবশ্য গ্রুপ ফটো তো? খুব ছোট মাপের।

মেয়েটির বিশ্বাস হল। রেজিস্টার হাতড়ে বললে, আয়াম সরি। ওঁর নাম শকুন্তলা চ্যাটার্জি নয়। চিত্রলেখা ব্যানার্জি। রাঢ়ী ব্রাহ্মণ — শুধু এটুকুই মিলেছে!

সুজাতার মুখটা ম্লান হয়ে যায়। ধন্যবাদ জানিয়ে সে চলে আসতে যায়। কাউন্টার ক্লার্ক ওকে অপেক্ষা করতে বলে। মেয়েটি সত্যিই ভাল। রেজিস্টারে বেশ কিছুক্ষণ ধরে খোঁজাখুজি করে বলল, আমি দুঃখিত। শকুন্তলা চ্যাটার্জি নামে কোন বোর্ডার এখন এ হোটেলে নেই।

পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে সুজাতা বিদায় হল।

পূর্বপরিকল্পনামতো পার্ক স্ট্রিটের 'পিটার-ক্যাট' হোটেলে এসে কৌশিকের সঙ্গে দেখা করল সুজাতা। সব কথা জানাল। দুজনে মধ্যাহ্ন আহার সেরে নেয়। সুজাতা নিউ আলিপুরে চলে যায়। কৌশিক ফিরে এল হোটেল পান্নায়।

রিসেপশন কাউন্টারে বেশ কিছু লোক ভিড় করে আছে। কৌশিক একটু দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে থাকে। কাউন্টার ক্লার্ক তীক্ষ্ণদৃষ্টির অধিকারিণী — সুদর্শন যুবকটি তার নজর এড়াতে পারে না। কাউন্টারটা একেবারে ফাঁকা হতে মেয়েটি খবরের কাগজখানা টেনে নেয়। তখনই ঘনিয়ে আসে কৌশিক। বলে, এক্সকিউজ মি, আমাকে একটা খবর দিতে পারেন?

— বলুন? আপনাদের সেবা করতেই তো আমি আছি।

— মিস্ চিত্রলেখা ব্যানার্জি কি এই হোটেলে উঠেছেন?

মেয়েটি কোন রেজিস্টার দেখল না। নামটা তার স্মরণে ছিল। তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, উঠেছেন। রুম নম্বর 315। ঘরেই আছেন। দেখা করতে চান?

কৌশিক শশব্যস্ত হয়ে ওঠে, না, না! নিশ্চয় না! সর্বনাশ!

মেয়েটির ওর ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলে। বলে, সে কী! কেন? দেখা করতেই তো এসেছেন? না কি?

কৌশিক তার জ্বলন্ত সিগারেটের দিকে তাকিয়ে বলল, কীভাবে আপনাকে বোঝাব বুঝে উঠতে পারছি না। মানে ... ইয়ে ... আমাদের মধ্যে একটু মিস্-অ্যান্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েচে। ও রাগ করে এই হোটেলে এসে উঠেছে! আমি খোঁজ পেয়ে গেছি জানলে ও আবার হোটেল পালটাবে।

মেয়েটির মজা লাগে। জানতে চায়, মিস্ ব্যানার্জি আপনার আত্মীয়?

কৌশিক সলজ্জে বলে, এখনো হয়নি। নিকট আত্মীয়া যাতে হয় সেই চেষ্টাতেই তো প্রাণপাত করছি।

— তাই বুঝি? তা বাধাটা কোথায়?

কৌশিক চোখ বড় বড় করে বলে, বাধা এক ঝুড়ি। এক নম্বর : আমি বামুন নই। কায়েত। দু-নম্বর : চিত্রার মা! তিনি আমাকে দু-চক্ষে দেখতে পারেন না।

— কিন্তু কেন? আপনি তো তেমন কুৎসিত নন?

— আপনিও তাই বললেন? চিত্রাও তাই বলে, আমি দেখতে ভালই। কিন্তু আমার রোজগার যে ডাক্তার গাঙ্গুলির মতো নয় ...

— ডাক্তার গাঙ্গুলিটি আবার কে?

— যার সঙ্গে চিত্রার মা চিত্রার বিয়ে দিতে চান। ডাক্তার গাঙ্গুলি কি হোটেলে এসেছিল? রোগা বেঁটে বিশ্রী দেখতে কালো ...

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে ওঠে। বলে, তা তো আমি জানি না। তবে শিলিগুড়ির

একজন ডাক্তারবাবুকে উনি ফোন করেছিলেন। মিস্ ব্যানার্জির কে এক আত্মীয় শিলিগুড়ির সরকারি বড় হাসপাতালে আছে ... সাম মিস্টার হরিসাধন অথবা হরিনারায়ণ বসু। চেনেন?

কৌশিককে স্বীকার করতে হয়, হ্যাঁ, চিনি বৈকি। কী হয়েছে হরির?

— ঠিক জানি না? মোটর অ্যাক্সিডেন্ট কেস। দু-দুবার এস. টি. ডি. করেছেন মিস ব্যানার্জি। শিলিগুড়িতে। আমিই কল দুটো এস. টি. ডি.-তে বুক করি। তাই শুনেছি। ডাক্তারবাবু বলছিলেন হরিবাবুর এখনো জ্ঞান হয়নি। কেসটা খারাপের দিকে টার্ন নিতে পারে। আপনি মিস্ ব্যানার্জির সঙ্গে কথা বলবেন? হরিবাবুর ব্যাপারে? উনি ঘরেই আছেন।

— না, না! আমার কথা চিত্রাকে কিছু বলবেন না, প্লিজ। হরির কপালে যা আছে তাই হবে। আমি শুনে কী করব?

— হরিবাবু মিস্ ব্যানার্জির কে হন?

— ওদের গাড়ির ড্রাইভার। ধন্যবাদ! আমি চলি। চিত্রাকে আমার কথা কিছু বলবেন না তো?

— আপনি অত ভীতু কেন?

— এই দেখুন! আপনিও ঐ কথাটা বললেন?

— কেন? আমার আগে আর কেউ ওকথা বলেছে?

— বলেনি? হাজারবার বলেছে! বলে বলে আমাকে ভীতু বানিয়ে ছেড়েছে।

— কে?

— কে আবার? ঐ চিত্রাই!

রিসেপশনিস্ট খিল্‌খিলিয়ে হেসে উঠতে গিয়ে বিষম খায়। কারণ তখনই এক বৃদ্ধ এগিয়ে এসে বলেন, কি ফর রুম নম্বর 212 প্লিজ।

রিসেপশনিস্ট বৃদ্ধকে চাবিটা দিয়ে এপাশ ফিরে দেখে — চিত্রলেখা ব্যানার্জির ভীরু প্রেমাস্পদ ইতিমধ্যে হাওয়া!

।। তিন ।।

শুক্রবার সকালে বাসুসাহেব একাই সরেজমিন তদন্তে এলেন। কিন্তু তার পূর্বে ধাপে ধাপে 'সুকৌশলী' তাঁকে নানান তথ্য সরবরাহ করেছে।

আগের দিন বেলা বারোটা নাগাদ একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে এসেছিল সুজাতা। বাসু সাহেবের সম্মুখীন হতেই বলল, আপনার মক্কেলের নাম চিত্রলেখা ব্যানার্জি। রুম নম্বর 315; এর বেশি আমি আর কিছু জানি না। আপনার ভাগ্নে গেছে বাকি সংবাদের সন্ধানে।

বাসু বললেন, তুমি কেমন করে জানলে ওর নাম চিত্রলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়?

রানী বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, ওসব কথা পরে। তুমি খেতে এস, সুজাতা।

সুজাতা বলে, আমি লাঞ্চ করে এসেছি, মামিমা।

কৌশিক এল বেশ রাত করে। আরও খবর সংগ্রহ করে। না, মেয়েটির নাম চিত্রলেখা নয়, পদবীও ব্যানার্জি নয়, বসু। হোটেলে এসে ছদ্মনাম লিখিয়েছে। ওর নাম চৈতালী বসু। বাসু জানতে চাইলেন, ও যে চিত্রলেখা বন্দ্যোপাধ্যায় নয়, চৈতালী বসু, এটা জানলে কী করে?

কৌশিক তার অভিজ্ঞতা বিস্তারিত জানায়। হোটেল পান্না থেকে বের হয়ে সে একটা ফোন বুথ থেকে ওর শিলিগুড়ির 'লিংক-ম্যান'কে ফোন করে। সুকৌশলী এখন পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলি শহরে এজাতীয় 'লিংক-ম্যান' রেখেছে। তাতে দৌড়াদৌড়িটা কমে এবং খরচও কম হয়। কৌশিকের ফোন পেয়ে সুকৌশলীর শিলিগুরির এজেন্ট হাসপাতালে গিয়ে সব কিছু জেনে এসে ওকে বিস্তারিত জানিয়েছে। হাসপাতালে ডক্টর সামন্তের চিকিৎসাধীনে যে রোগীটি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে তার নাম হরিমোহন বসু। শিলিগুড়ির প্রখ্যাত 'জৈন কিউরিও এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইম্পোর্ট কোম্পানি'-র একজন দক্ষ কর্মী। বছর বিশেক বয়স। দিন কয়েক আগে অফিসের কী একটা কাজে — কী কাজ তা অফিসের কেউ বলতে পারল না — কলকাতা যাবার জন্য তৈরি হয়। মালপত্র গুছিয়ে রেখে সন্ধ্যাবেলা সদর দরজায় তালা দিয়ে সে ট্যাক্সি ডাকতে বেরিয়েছিল। রাস্তায় এক মদ্যপ ড্রাইভার পিছন থেকে ওকে ধাক্কা মারে। পালাতে পারেনি। ধরা পড়ে। পাড়ার লোকেরাই হরিমোহনকে হাসপাতালে পৌঁছে দেয়। হরিমোহন একটি দু-কামরার বাড়িতে থাকত, তার যমজ বোনকে নিয়ে। সে অবিবাহিত। বোনও তাই। বাবা-মা বা আর কোন ভাই বোন নেই। ওর বোনও একই কোম্পানিতে কাজ করে। সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে সদরের তালা খুলবার আগেই প্রতিবেশীদের কাছে দুর্ঘটনার খবর পায়। ছোটে হাসপাতালে।

অফিসের খবর : ওর বোন চৈতালী ছুটিতে আছে। যমজ ভাইয়ের দেখাশোনা করার জন্য। অথচ হাসপাতালের খবর : চৈতালী ভিজিটিং আওয়ারে দেখা করতে আসছে না। কেন, তা কেউ জানে না।

সুকৌশলীর এজেন্ট হরিমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর পরিচয়ে খোঁজ নিয়ে জেনেছে চৈতালী বসু আজ তিনদিন রাত্রে তালা খুলে বাড়ি ঢোকেনি। সম্ভবত সে দ্বিতীয়বার হরিমোহনের অফিসে খোঁজ নিতে গিয়েছিল। ঢুকতে পারেনি। গুজব : ক্যাশ সেফ থেকে বিরাট একটা টাকার অঙ্ক কী করে বুঝি তছরুপ হয়েছে। কত টাকা তা তখনো জানা যায়নি। অ্যাকাউন্টেন্টবাবু মালিকের সঙ্গে বসে ক্যাশ মেলাচ্ছেন।

এই সমস্ত খবর সংগ্রহ করে পরদিন সকাল আটটা নাগাদ বাসুসাহেব হোটেল পান্নায় সরেজমিন তদন্তে এলেন।

হোটেলটার অবস্থান সম্পর্কে বাসুসাহেবের ধারণা ছিল না। তিনি ট্যাক্সি নিয়ে বেলা আটটা নাগাদ এসে উপস্থিত হলেন। রিসেপশন কাউন্টারে এসে দেখলেন এক প্রৌঢ়া অ্যাংলো ইন্ডিয়ান

মহিলা বসে আছেন। তাঁর কাছে জানতে চান, আপনাদের হোটেলে মিস্ চিত্রলেখা ব্যানার্জি নামে একজন বোর্ডার আছেন কি?

রিসেপশনিস্ট বললেন, জাস্ট এ মোমেন্ট, স্যার ...

একটা রেজিস্টারে চোখ বুলিয়ে বললেন, ইয়েস। রুম 315 ...

— উড য়ু কাইন্ডলি অ্যানাউন্স মি, প্লিজ?

মহিলাটি ইংরেজিতে জানতে চান, কী নাম বলব?

— নাম বললে উনি আমাকে চিনতে পারবেন না। ওঁর একটা ম্যাচিওর্ড ইন্সিওরেন্স পলিসির ক্লেম কেসের বিষয়ে কথা বলতে এসেছি। পলিসি নম্বরটা ওঁকে বললেই ওঁর মনে পড়বে: থ্রি-সিক্স-টু-ফোর-থ্রি-সিক্স।

প্রৌঢ়া একটু অবাক হলেন। যা হোক অনুরোধ মত টেলিফোন তুলে তিনশ পনেরো নম্বর ঘরে রিং করলেন। ওপ্রান্ত উৎকর্ণ হতেই বললেন, একজন ভদ্রলোক ইন্সিওরেন্স কোম্পানী থেকে এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে ... কী? ... আজ্ঞে হ্যাঁ, ইন্সিওরেন্স কোম্পানী থেকে। আপনার একটা ম্যাচিওর্ড পলিসির ব্যাপারে ... কী বললেন? ... ও আচ্ছা ...ওঁকে তাই বলছি...

বাঁ-হাতে টেলিফোনটা ধরাই রইল, রিসেপশনিস্ট বাসুসাহেবের দিকে ফিরে বললেন, সার, উনি দেখা করবেন না, ওঁর কোনও ইন্সিওর পলিসি ম্যাচিওর করেনি।

বাসু উচ্চ কণ্ঠস্বরে বললেন, কিন্তু পলিসি নাম্বারটা তো আপনি ওঁকে বললেন না : 36-24-36?

ভদ্রমহিলার হাতে ধরা রিসিভারটা কঁক কঁক্ করতে শুরু করেছে ততক্ষণে। ভদ্রমহিলা শুনে নিয়ে বাসুকে বললেন, ঠিক আছে। আপনি উপরে যান। রুম 315; আপনি যে পলিসি নাম্বারটা বলেছেন উনি তা শুনতে পেয়েছেন।

বাসু লিফ্‌টে করে তিনতলায় চলে এলেন। পনেরো নম্বর চিহ্নিত দ্বারে নক্ করতেই ভিতর থেকে সেটা খুলে গেল। বাসু ঘরে প্রবেশ করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন ভিতর থেকে।

দুরন্ত বিস্ময়ে মেয়েটি শুধু বললে : এ কী! আপনি?

— উপায় কী? মহম্মদ যদি রাজি না হন তখন পর্বতকেই মহম্মদের কাছে আসতে হয়!

— কিন্তু কী করে? মানে আপনি কীভাবে ...

— কী আশ্চর্য! তুমি তো সেদিন বলেছিলে 'কৌতূহলী কনের কাঁটা' বইটা তোমার পড়া! সুতরাং তোমার বোঝা উচিত ছিল, তোমার সঠিক পরিচয় আমি পাবই। তা সে যাই হোক, তোমার নাম তাহলে চিত্রলেখা?

— সে তো আপনি জেনেই হোটেলে এসেছেন।

— পুরো নামটা কী? চিত্রলেখা কী?

— ব্যানার্জি।

— এটা তো ঠিক হল না, চৈতালী! অহেতুক মিথ্যা বলছ কেন?

— বিশ্বাস না হয় নিচে গিয়ে কাউন্টারে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

— কাউন্টারে ঘুরেই তো আসছি আমি। কিন্তু তুমিই আমাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাও 'বাঁড়ুজ্জে'র যমজ ভাই কেমন করে 'বসু' হতে পারে? হরিমোহন বসুর অবিবাহিতা যমজ বোন : মিস্ ব্যানার্জি?

মেয়েটি জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, আপনি কি এখন আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে চান?

— কী পাগলের মতো কথা বলছ, চৈতালী। মক্কেলকে বাঁচানোই আমার ধর্ম।

— তাহলে এভাবে আমার অতীত জীবনের অন্ধকারের ঘটনা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছেন কেন?

— যাতে তোমার ভবিষ্যৎ জীবন আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তুমি জান না, আমি জানি — তুমি একটা প্রচণ্ড বিপদের মধ্যে পড়েছ।

— কী বিপদ?

— 'জৈন কিউরিও এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইম্পোর্ট কোম্পানি' কি জানে তুমি কোথায়?

— আমি জানি না। হয়তো ওরা এটুকু জানে যে, আমি শিলিগুড়িতে নেই।

— ঐ অ্যাটাচি কেসটায় কী আছে তা তারা জানে নিশ্চয়?

চৈতালী ব্যাগটা আঁকড়ে ধরে। বলে, অসংখ্য ধন্যবাদ! আপনাকে আর কিছু করতে হবে না। আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এবার যান। য়ু আর ফায়ার্ড!

— তা হয় না চৈতালী। আমাকে ওভাবে বরখাস্ত করা যায় না। হয় তুমি আমার মক্কেল, নয় নও। মক্কেল হলে তখন তোমার সব কথা আমি গোপন রাখতে বাধ্য। যে মুহূর্তে তুমি আমাকে বরখাস্ত করবে সেই মুহূর্ত থেকে আমি একজন আদালতের অফিসার। তৎক্ষণাৎ আমার কর্তব্য হবে পুলিশকে ফোন করে জানানো যে, ঐ ব্যাগটা ব্ল্যাক মানিতে ভর্তি! কী? ভুল বলছি কিছু?

হ্যাঁ, বাসুসাহেব জ্ঞাতসারে ভুলই বলছেন। কুইন্স-বেঞ্চের সিদ্ধান্ত (Bullock vs Crone case) তাঁর স্মরণে আছে। কিন্তু ওঁর আশা পূর্ণ হল। চৈতালী বুঝতে পারল না : এটা ডাহা মিথ্যা কথা। ডাইভোর্স হয়ে গেলেও প্রাক-বিচ্ছেদ বিবাহিত জীবনের গোপন কথা যেমন জীবনসাথীর বিনা অনুমতিতে পুলিশকে জানানো যায় না, ঠিক তেমনি বরখাস্ত হবার পর বাসুও পারেন না ঐ গোপন কথাটা পুলিশকে জানাতে।

কিন্তু চৈতালী সেকথা জানে না। সে মাথা নিচু করে নীরবই রইল।

বাসু পুনরায় বলেন, তুমিই তহবিলটা তছরুপ করেছ?

— না! নিশ্চয় নয়! এসব কী বলছেন আপনি?

— তাহলে তোমার যমজ ভাই হরিমোহন করেছে?

— না! হরি চেষ্টা করলেও ক্যাশ সরাতে পারবে না, পারত না। ক্যাশের তিন সেট চাবি আছে। এছাড়া আছে একটা কোড নাম্বার। এক সেট চাবি থাকে আমার কাছে। আমিই হেড ক্যাশিয়ার। বাকি দু সেট চাবি থাকে কোম্পানির দুই পার্টনারের কাছে। আমরা তিনজন ছাড়া কেউ ক্যাশে হাত দিতে পারে না। ঐ কোড নাম্বারটাও জানি শুধু আমরা তিনজন।

— ঐ ব্যাগটায় কত টাকা আছে?

— পঞ্চাশ হাজার।

— তুমি যদি ক্যাশ থেকে না সরিয়ে থাক, তাহলে ও টাকা তোমার হেপাজতে এল কী করে?

চৈতালী নতনেত্রে ভাবতে থাকে। বাসু বলেন, শোন চৈতালী, সব কথা খুলে বললে আমার কাজের সুবিধা হয়। তুমি যদি আমাকে বল 'আমি টাকাটা ক্যাশ থেকে সরাইনি' — ব্যস। আমি তা বিশ্বাস করব। তুমি যদি বল যে, হরিমোহনকে তুমি চাবিটা হস্তান্তরিত করে সেফ-ভল্টের নাম্বারটা বলে দাওনি, তাহলে আমি তাও বিশ্বাস করব। তারপর আমি এ রহস্যের কিনারায় সর্বশক্তি নিয়োগ করব। সেটাই আমার ধর্ম। 'ধর্ম' মানে এখানে 'রিলিজন' নয়! ধর্ম মানে, 'জাস্টিফিকেশন অব ওয়াল্স এক্সিস্ট্যান্স।' কিন্তু তুমি যদি সব কথা খুলে না বল, তাহলে আমার অর্ধেক শক্তি ব্যয়িত হবে সেই তথ্যগুলো সংগ্রহ করতে। শত্রুপক্ষ হ্যান্ডিক্যাপ পাবে। এমনিতেই দেখ, দু'দুটো দিন আমি নষ্ট করেছি তোমার নাম-পরিচয় সংগ্রহ করতে।

চৈতালী এখনো মনস্থির করে উঠতে পারছে না।

বাসু পুনরায় বলেন, তুমি কি জান যে, তোমার কোম্পানির ক্যাশে একটা বিরাট ঘাটতি ধরা পড়েছে? মালিকেরা অডিট করাচ্ছেন? ক্যাশ মেলাচ্ছেন?

চৈতালী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বলে ওঠে, না, না, তা কী করে হবে?

— সহজেই। হয়তো ঘাটতিটা ঠিক পঞ্চাশ হাজার টাকার। তোমার ঐ অ্যাটাচিতে যত টাকা আছে তার ঠিক সমান।

মেয়েটি মনস্থির করে। বলে, ঠিক আছে! সব কথা খুলে বলব। তারপর আপনি যা ভাল বোঝেন ...

— সংক্ষেপে। মোদ্দা তথ্যগুলো। কারণ হয়তো আমাদের হাতে সময় খুব কম। হয়তো পুলিশে ইতিমধ্যেই তোমাকে খুঁজছে। নাও শুরু কর।

।। চার ।

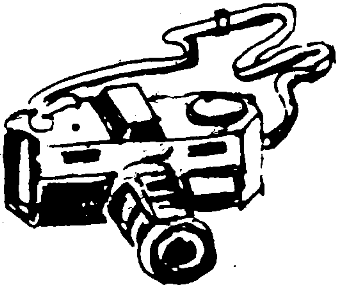

চেতালীর বাবা মহেন্দ্র বোস ছিলেন গয়াবাড়ি টী-এস্টেটের কাছাকাছি একটি চা-বাগানের ম্যানেজার। শহর থেকে দূরে একাই থাকতেন তিনি, খিদমৎগার পরিবৃত হয়ে। ওরা দুই যমজ ভাই-বোন থাকত শিলিগুড়িতে। এক বিধবা মাসির জিম্মায়। দুজনে একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়াশুনা করত। মাতৃহীন ওরা শৈশবেই — যমজ সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়ে ওদের মা মারা যান। জন্ম থেকেই ওরা মাসির কাছে মানুষ। মাত্র বছর পাঁচেক আগে পাঙ্খাবাড়ি রোডে একটা জিপ দুর্ঘটনায় প্রয়াত হলেন মহেন্দ্রবাবু। ওরা দুজনে তখন ক্লাস নাইনে পড়ে। মহেন্দ্রবাবুর অবশ্য মোটা ইন্সিওরেন্স ছিল। ভাই-বোনের পড়াশুনা বন্ধ হল না। কিন্তু দুর্ভাগ্য যখন আসে তখন সার দেওয়া গোগাড়ির মতো আসতে থাকে। বছর না ঘুরতেই দেহ রাখলেন মাতৃপ্রতিম মাসিমা।

জৈন কোম্পানির বড় তরফ — বিজয়রাজ ছিলেন মহেন্দ্রবাবুর বন্ধুস্থানীয়। ওরা দুই অনাথ ভাইবোন ওঁর এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট বিজনেসে চাকরি পেল। চৈতালী প্রথমে ছিল কেরানি। ক্রমে কিছু সোপান অতিক্রম করে ক্যাশিয়ার। প্রচণ্ড দায়িত্ব তার। দুই বিজনেস পার্টনার ব্যতিরেকে একমাত্র তারই বটুয়ার খাঁজে থাকত ক্যাশের চাবি, আর মগজের খাঁজে আয়রন সেফের কম্বিনেশন কোড নম্বর।

হরিমোহনের কাজ ছিল বাইরে বাইরে। তাকে প্রায়ই ট্যুরে যেতে হত পাঁচ-দশ হাজার নগদ নিয়ে — কিছু কিনতে বা বেচতে। নেপাল, ভুটান, মায় তিব্বত পর্যন্ত ঘুরে এসেছে সে, মাধবরাজের সঙ্গে। সেদিক থেকে হরিমোহন হয়ে ওঠে মাধবরাজের ডানহাত। অপরপক্ষে চৈতালী ক্রমে প্রিয়পাত্রী হয়ে ওঠে সিনিয়ার জৈনের।

বাসু বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, জৈন কোম্পানির দুই বড়কর্তার একটু পরিচয় দাও দেখি : বাবা-ছেলে?

— আজ্ঞে না। খুড়ো-ভাইপো। বিজয়রাজ বিপত্নীক ও নিঃসন্তান। প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। খুড়ো-ভাইপো একই বাড়িতে থাকেন। গৃহকর্ত্রী জুনিয়ার পার্টনার মাধবরাজের ধর্মপত্নী। তিনি নেপালি। বস্তুত নেপাল রাজপরিবারের সঙ্গে কী একটা রক্তের সম্পর্কও আছে। বাপের একমাত্র আদুরে মেয়ে। অগাধ সম্পত্তির নাকি একমাত্র ওয়ারিশ।

— প্রেম করে বিয়ে?

— না, না। সম্বন্ধ করে। মিসেস জৈনের বাবা আবার জৈন নন, বৌদ্ধ। তবু বিবাহ আটকায়নি। বোধকরি অর্থকৌলিন্যে।

— মাধবরাজের বয়স কত? সন্তানাদি কী?

— মাধবরাজ চল্লিশের কাছাকাছি। বিয়ে হয়েছে বছর সাতেক। কিন্তু সন্তানাদি আজও কিছু হয়নি।

— মাধবরাজের স্ত্রীর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে?

— না, আলাপ নেই। তবে দূর থেকে দেখেছি। অফিসের কোন কোন অনুষ্ঠানে। বছর ত্রিশ-বত্রিশ বয়স। সুন্দরী নন, কিছুটা পৃথুলা। তবে গায়ের রঙ খুব ফর্সা। শুনেছি শুচিবায়ুগ্রস্তা। স্বভাবেও সন্দেহবাতিক এবং দজ্জাল-টাইপ।

— সেক্ষেত্রে জানতে হয় : তোমাদের অফিসে কতজন মহিলা কর্মী আছে?

— আমাকে নিয়ে পাঁচজন। কিন্তু এ কথা কেন?

— কেন, তা জানতে চেও না। বাকি চারজনের নাম আর পরিচয় দাও দিকি। কত বয়স, বিবাহিত কি না, কী কাজ করতে হয়। সবাই বাঙালি?

— আজ্ঞে না। আমি ছাড়া সবাই অবাঙালি আর বিবাহিতা। সুমিত্রা গর্গ আর ঝরনা তামাং দুজনেই বিবাহিতা, ত্রিশের কোঠায়, সন্তানাদি আছে। এছাড়া আছেন মিসেস্ অ্যাগনেস, প্রৌঢ়া। আর আছেন রঞ্জনাদি — রঞ্জনা থাপা — বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, কিন্তু দেখলে মনে হয় পঁচিশের কম। সুন্দরী সুতনুকা, বিধবা এবং নিঃসন্তানা। তিনি অবশ্য মাস কয়েক আগে ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেছেন গল ব্লাডার অপারেশন করাতে। সুমিত্রা ক্লার্ক, আর ঝরনাদি সেলস্ গার্ল। আমাদের অফিস কাউন্টারে নানান কিউরিও সাজানো আছে। ঝর্ণাদি তার কাউন্টার সেলে আছে। সুমিত্রাদিও তাই — তবে তাকে মাধবরাজ অথবা বিজয়রাজজীর স্টেনোর কাজও করতে হয়।

— সুমিত্রার বয়স কত? দেখতে কেমন? কটি সন্তান?

— বছর সাতাশ। দেখতে সুশ্রী। ওঁর দুটি সন্তান।

— অফিস ছুটির পরেও তাকে মাঝে মাঝে অফিসে বসে কাজ করতে হয় নিশ্চয়? ডিকটেশন নিতে?

— তা তো হয়ই।

— সে সময় খুড়ো-ভাইপোর কেউ কিছু অন্যায় সুযোগ নেবার চেষ্টা করে না? যাকে বলে Pawing?

— তা আমি কেমন করে জানব?

— ন্যাকামি কর না চৈতালী। কী করে জানবে তা তুমি ভাল রকমই জানো। তোমার দিকে ওদের কেউ হাত বাড়ায়নি?

চৈতালী ইতস্ততভাব ঝেড়ে ফেলে বলে, অনেক পুরুষমানুষ অমন করে বলে শুনেছি। আমার অবশ্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই। খুড়ো বিজয়রাজজী একটু টিজ করেন, লেগ পুলিং জাতীয়। কিন্তু ভাইপো মাধবরাজ এ বিষয়ে খুব স্ট্রিক্ট। তাঁর কোনও বেচাল কোনদিন কেউ দেখেনি।

— আর প্রৌঢ় বিজয়রাজজী কী জাতীয় লেগ পুলিং করেন?

— উনি স্বভাবতই ফুর্তিবাজ। মেয়েদের নিয়ে ঠাট্টা-মশ্‌করা করা ওঁর স্বভাব। মেয়েদের সাজপোশাকের প্রশংসা করা ওঁর এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মনেও রাখেন অদ্ভুত — কে কবে কী রঙের শাড়ি পরে এসেছে। নতুন শাড়ি পরে এলে নিউ পিঞ্চ দিতে ভুল হয় না। এই বৃদ্ধ বয়সেও।

— বাহুমূলে?

— গালেও। এমন কি বৃদ্ধা অ্যাগ্‌নেস্‌কেও।

— আর মাধবরাজ?

— মেয়েদের সম্বন্ধ তিনি খুব সতর্ক। যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চলেন। সুমিত্রাদিকে যদি অফিস ছুটির পরে ডিক্‌টেশন নেবার জন্য থেকে যেতে হয়, তাহলে আমাদের মধ্যে অন্য কোনও মহিলা কর্মীকে ছুতো-নাতায় ওভার-টাইম নিতে বাধ্য করেন।

— কেন বল তো? ভয়টা কাকে?

— ঠিক বলতে পারব না। হয়তো নিজেকেই। অথবা ওঁর সন্দেহবাতিকগ্রস্তা দজ্জাল স্ত্রীকে। কিন্তু একটা কথা, স্যার, এসব কথা এত খুঁটিয়ে জানতে চাইছেন কেন?

বাসু ওর প্রশ্নের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে বলেন, ঐ যে বিধবা মেয়েটি, রঞ্জনা থাপা, যে ছুটিতে আছে, ও কী কাজ করত? ওর দেশ কোথায়?

— নেপাল। কাঠমাণ্ডুর কাছাকাছি পোখরা নামে একটা গ্রামে। সেও বড়লোকের মেয়ে। রঞ্জনাদি ঠিক আমাদের স্টাফ ছিল না। সে ছিল কমিশন এজেন্ট। হীরালাল ঘিসিংজীর ডান হাত। হীরালালজী থাকেন কাঠমাণ্ডুতে।

— তোমাদের কোম্পানির কাজটা কী?

— নামেতেই তার পরিচয়। দেশ-বিদেশের আর্ট-গুড্‌স্‌, কিউরিয়ো সংগ্রহ করা এবং দেশ-বিদেশে বিক্রি করা। এজন্য অফিসের বাইরে অনেক স্টাফ আছেন। বিজয়রাজজীর শালা আছেন নিউইয়র্কে। তাঁকে আমি কোনদিন চোখেই দেখিনি। লন্ডনে একজন আছেন, সিঙ্গাপুরে আছে রাঘবন পিল্লাই, নেপালে আছেন, আগেই বলেছি, হীরালাল ঘিসিং, টোকিওতে মিস্টার নোনাগাকি। এঁরা কেউই এমপ্লয়ি নন; কমিশন এজেন্ট। কিউরিও ডিলার।

বাসু বলেন, তোমাদের ক্যাশে সচরাচর দিনান্তে কত ব্যালেন্স থাকে? জেনারালি?

— তার কোনও স্থিরতা নেই। দু-পাঁচ লাখও থাকে।

— বল কী! অত টাকা ক্যাশে নগদ থাকে?

— হ্যাঁ, কারণ প্রায়ই খুব দামী কিউরিও — ছবি, টেরাকোটা মূর্তি, সিল্ক-স্ক্রোল বা অন্যান্য আর্ট গুড্‌স নগদে কিনতে হয়। চেকে লেনদেন হয় না।

— কেন? চোরাই মাল? স্মাগ্‌ল্‌ড?

— তা আমি জানি না। যা দেখেছি তাই বলেছি। এসব দুর্লভ কিউরিও নগদ টাকায় কেনা-বেচা হয়। তাই ক্যাশে সব সময়ই দেড়-দুলাখ কারেন্সি নোটে থাকে। আমাকে মাসে দুবার ক্যাশ মিলিয়ে টাকা গুনতি করতে হয়। কারণ দুজন পার্টনারই স্লিপ রেখে নগদে বিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে যান। যখন-তখন। আমাকে না বলেও হয়তো।

— তুমি শেষ কবে ক্যাশ মিলিয়েছ?

— দিন দশেক আগে। ক্যাশ ঠিক ছিল।

— এই টাকা ভর্তি কালো অ্যাটাচি তুমি কোথায় পেলে?

চৈতালী বিস্তারিত জানায়। ঘটনার দিন, হঠাৎ যেদিন সন্ধ্যায় হরিমোহনকে গাড়িতে ধাক্কা মারে সেদিন, বেলা তিনটা নাগাদ হরিমোহন চৈতালীর সঙ্গে অফিসে দেখা করে। জানায়, হঠাৎ একটা জরুরি প্রয়োজনে দিন পাঁচেকের জন্য অফিসের কাজে তাকে শিলিগুড়ির বাইরে যেতে হবে। প্লেনে করে। সচরাচর সে কাঠমাণ্ডুতে যায় — হীরালালজী অথবা রঞ্জনাদির কাছ থেকে নেপালি কিউরিও সংগ্রহ করতে। তাই চৈতালী জানতে চেয়েছিল, 'নেপাল যাচ্ছিস'? হরিমোহন বলেছিল, 'না, ফিরে এসে সব কথা তোকে বলব।' আর কিছু হরিমোহন বলে যায়নি। অফিস ছুটির পর ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে সদর দরজা খুলতে যাবার সময় ও খবর পায়, হরিমোহন হাসপাতালে। রাত এগারোটা পর্যন্ত সে হাসপাতালে ছিল। এমার্জেন্সি-ওয়ার্ড থেকে ইন্‌টেন্‌সিভ্ কেয়ার য়ুনিটে রোগীকে অপরাসণ করার পর ও বাড়ি ফিরে আসে। তালা খুলে ঘরে ঢোকে। ওরা পাশাপাশি ঘরে শোয়। চৈতালী হরিমোহনের ঘরটা তালাবন্ধ করতে এসে দেখে মেঝেতে মালপত্র সাজানো আছে। হরির স্যুটকেস, বিগ্‌শপার ব্যাগ আর জলের বোতল। ঐ সঙ্গে একটা অচেনা কালো অ্যাটাচি। এটাকে ও আগে কখনো দেখেনি। চৈতালী কৌতূহলী হয়ে পড়ে। ও জানত, হরিমোহন কখনো কখনো অনেক টাকা নগদে নিয়ে ট্যুরে যায়, — অফিসের কাজেই। দামী কিউরিও কিনতে। তাই তার আত্মরক্ষার কথা ভেবে অফিস ওর জন্য একটা রিভলভারের লাইসেন্স করিয়ে দিয়েছে। হরিমোহন সচরাচর সেটা মাজায় বেঁধে ট্রেনে যাতায়াত করে। ফার্স্ট ক্লাসে। কিন্তু আহত রোগীর যে সব জিনিসপত্র হাসপাতালে জমা আছে তার মধ্যে ঐ রিভলভারটা ছিল না। তাই চৈতালী অ্যাটাচিটা খুলবার চেষ্টা করে। অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর অ্যাটাচির স্প্রিং-লকটা খুলে যায়। চৈতালী স্তম্ভিত হয়ে যায়। স্যুটকেসে শুধু টাকা আর টাকা। সব পঞ্চাশ টাকার। গুন্‌তি করে দেখে মোটমাট পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে। এত টাকা ও পেল কোথা থেকে? দুই মালিকের কেউই আজ অফিসে আসেননি। না মাধবরাজ, না বিজয়রাজ। চৈতালী নিজেও ভল্ট খোলেনি। পেটি ক্যাশবাক্সতে যে দেড় দু হাজার টাকা আছে তা নাড়ানাড়ি করেই সেদিনের কাজ চলে গেছে। তাহলে?

দ্বিতীয়ত, হরিমোহনের রিভলভারটা কোথায় গেল?

তখনই ওর নজর হল, স্যুটকেসের ওপরের খাপে একটি টাইপ করা ইংরেজি চিঠি। তাতে যা লেখা আছে অনুবাদ করলে তা দাঁড়ায় : "ওহে ছিপে রুস্তম! আমার ধৈর্যের একটা সীমা

আছে! এই শেষ সুযোগ দিচ্ছি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে প্রতিশ্রুত পঞ্চাশ হাজার নগদে না পৌঁছে দিলে সংবাদটা আর গোপন থাকবে না। দৈনিক সঞ্জয় উবাচ কাগজের পার্সোনাল কলমে জানিও, কখন, কোথায় খেসারতটা দিচ্ছ। ফাঁদ পাতার চেষ্টা করলে তুমি নিজেই ফাঁদে পড়বে কিন্তু।

ইতি 36-24-36।

বাসু বললেন, কই, দেখি সেই চিঠিটা?

চৈতালী চিঠিখানা ওঁর হাতে দিল।

কাগজটা খুলে দেখলেন। মোটা বন্ড পেপার, ইলেকট্রিক টাইপরাইটারে ছাপা। তারিখহীন।

বাসু বললেন, এ কাগজখানা থাক আমার কাছে। হরিমোহনের রিভলভারটার সন্ধান আর তারপর পাওনি?

— আজ্ঞে না।

— তোমার কী ধারণা? — এত টাকা নিয়ে হরিমোহন কোথায় যাচ্ছিল? তোমার অজ্ঞাতসারে দুই পার্টনারের কেউ কি ক্যাশ থেকে টাকাটা বার করে হরিমোহনকে দিয়েছিলেন? কাউকে পেমেন্ট করে আসতে?

চৈতালী বলল, আমার তা বিশ্বাস হয় না। প্রথম কথা, তাহলে ওঁদের দুজনের মধ্যে কেউ না কেউ আমাকে বলতেন, 'খুঁজে দেখ, তোমার দাদার ঘরে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে।' তা কেউ বলেননি। অথচ অ্যাকসিডেন্টের পর দুজনের সঙ্গেই আমার কথা হয়েছে। রিভলভারের কথাও কেউ আমার কাছে জানতে চাননি।

— হরিমোহনের কি কোনও বদ নেশা আছে? স্মাগলার দলের সঙ্গে জানাশোনা আছে?

— আমি তো কোনদিন তা সন্দেহ করিনি। নেশা বলতে 'ড্রাগ-অ্যাডিক্ট' নিশ্চয় নয়। সিগারেট খায়, মদও খায় কখনো-সখনো। জুয়ার নেশা আছে। তিন-চার তাসাড়ু বন্ধুর সঙ্গে তে-তাশ খেলে। বোর্ড মানি পঞ্চাশ টাকা উঠতে দেওয়া হয় না। তাতে মাসে বিশ পঞ্চাশ টাকা হারে অথবা জেতে। তবে দার্জিলিঙে গিয়ে সিজনে দু-একবার রেস খেলেছে। কাঠমাণ্ডুতে একবার রোলে-বোর্ডে সাতশ টাকা হেরে এসেছিল। সব কিছুই ও আমাকে খুলে বলে। কিছু গোপন করে না।

— কোনও মেয়ের সঙ্গে কি ওর সম্প্রতি ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল? প্রেম-ট্রেম?

চৈতালী একটু চুপ করে ভাবল। তারপর বলল, আমার তাই সন্দেহ হয়েছে, কিন্তু ও স্বীকার করেনি। ইদানীং ও মনমরা হয়ে পড়েছিল।

— মেয়েটি 'কে' আন্দাজ করতে পারনি? তোমাদের অফিসের কেউ কি?

— আমাদের অফিসে তো দুজন বিবাহিতা, একজন বৃদ্ধা, একজন বিধবা। — সবাই ওর চেয়ে বয়সে বড়। হয়তো অন্য কোনও মেয়ে, যাকে আমি চিনি না।

— আর কিছু বলবে? কোনও গুরুত্বপূর্ণ খবর দিতে ভুলেছ কি?

— তা আমি জানি না। যা দেখেছি তাই বলেছি। এসব দুর্লভ কিউরিও নগদ টাকায় কেনা-বেচা হয়। তাই ক্যাশে সব সময়ই দেড়-দুলাখ কারেন্সি নোটে থাকে। আমাকে মাসে দুবার ক্যাশ মিলিয়ে টাকা গুনতি করতে হয়। কারণ দুজন পার্টনারই স্লিপ রেখে নগদে বিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে যান। যখন-তখন। আমাকে না বলেও হয়তো।

— তুমি শেষ কবে ক্যাশ মিলিয়েছ?

— দিন দশেক আগে। ক্যাশ ঠিক ছিল।

— এই টাকা ভর্তি কালো অ্যাটাচি তুমি কোথায় পেলে?

চৈতালী বিস্তারিত জানায়। ঘটনার দিন, হঠাৎ যেদিন সন্ধ্যায় হরিমোহনকে গাড়িতে ধাক্কা মারে সেদিন, বেলা তিনটা নাগাদ হরিমোহন চৈতালীর সঙ্গে অফিসে দেখা করে। জানায়, হঠাৎ একটা জরুরি প্রয়োজনে দিন পাঁচেকের জন্য অফিসের কাজে তাকে শিলিগুড়ির বাইরে যেতে হবে। প্লেনে করে। সচরাচর সে কাঠমাণ্ডুতে যায় — হীরালালজী অথবা রঞ্জনাদির কাছ থেকে নেপালি কিউরিও সংগ্রহ করতে। তাই চৈতালী জানতে চেয়েছিল, 'নেপাল যাচ্ছিস'? হরিমোহন বলেছিল, 'না, ফিরে এসে সব কথা তোকে বলব।' আর কিছু হরিমোহন বলে যায়নি। অফিস ছুটির পর ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে সদর দরজা খুলতে যাবার সময় ও খবর পায়, হরিমোহন হাসপাতালে। রাত এগারোটা পর্যন্ত সে হাসপাতালে ছিল। এমার্জেন্সি-ওয়ার্ড থেকে ইন্‌টেন্‌সিভ্ কেয়ার য়ুনিটে রোগীকে অপরাসণ করার পর ও বাড়ি ফিরে আসে। তালা খুলে ঘরে ঢোকে। ওরা পাশাপাশি ঘরে শোয়। চৈতালী হরিমোহনের ঘরটা তালাবন্ধ করতে এসে দেখে মেঝেতে মালপত্র সাজানো আছে। হরির স্যুটকেস, বিগ্‌শপার ব্যাগ আর জলের বোতল। ঐ সঙ্গে একটা অচেনা কালো অ্যাটাচি। এটাকে ও আগে কখনো দেখেনি। চৈতালী কৌতূহলী হয়ে পড়ে। ও জানত, হরিমোহন কখনো কখনো অনেক টাকা নগদে নিয়ে ট্যুরে যায়, — অফিসের কাজেই। দামী কিউরিও কিনতে। তাই তার আত্মরক্ষার কথা ভেবে অফিস ওর জন্য একটা রিভলভারের লাইসেন্স করিয়ে দিয়েছে। হরিমোহন সচরাচর সেটা মাজায় বেঁধে ট্রেনে যাতায়াত করে। ফার্স্ট ক্লাসে। কিন্তু আহত রোগীর যে সব জিনিসপত্র হাসপাতালে জমা আছে তার মধ্যে ঐ রিভলভারটা ছিল না। তাই চৈতালী অ্যাটাচিটা খুলবার চেষ্টা করে। অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর অ্যাটাচির স্প্রিং-লকটা খুলে যায়। চৈতালী স্তম্ভিত হয়ে যায়। স্যুটকেসে শুধু টাকা আর টাকা! সব পঞ্চাশ টাকার। গুন্‌তি করে দেখে মোটমাট পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে। এত টাকা ও পেল কোথা থেকে? দুই মালিকের কেউই আজ অফিসে আসেননি। না মাধবরাজ, না বিজয়রাজ। চৈতালী নিজেও ভল্ট খোলেনি। পেটি ক্যাশবাক্সতে যে দেড় দু হাজার টাকা আছে তা নাড়ানাড়ি করেই সেদিনের কাজ চলে গেছে। তাহলে?

দ্বিতীয়ত, হরিমোহনের রিভলভারটা কোথায় গেল?

তখনই ওর নজর হল, স্যুটকেসের ওপরের খাপে একটি টাইপ করা ইংরেজি চিঠি। তাতে যা লেখা আছে অনুবাদ করলে তা দাঁড়ায় : "ওহে ছিপে রুস্তম! আমার ধৈর্যের একটা সীমা

আছে! এই শেষ সুযোগ দিচ্ছি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে প্রতিশ্রুত পঞ্চাশ হাজার নগদে না পৌঁছে দিলে সংবাদটা আর গোপন থাকবে না। দৈনিক সঞ্জয় উবাচ কাগজের পার্সোনাল কলমে জানিও, কখন, কোথায় খেসারতটা দিচ্ছ। ফাঁদ পাতার চেষ্টা করলে তুমি নিজেই ফাঁদে পড়বে কিন্তু।

ইতি 36-24-36।

বাসু বললেন, কই, দেখি সেই চিঠিটা?

চৈতালী চিঠিখানা ওঁর হাতে দিল।

কাগজটা খুলে দেখলেন। মোটা বন্ড পেপার, ইলেকট্রিক টাইপরাইটারে ছাপা। তারিখহীন।

বাসু বললেন, এ কাগজখানা থাক আমার কাছে। হরিমোহনের রিভলভারটার সন্ধান আর তারপর পাওনি?

— আজ্ঞে না।

— তোমার কী ধারণা? — এত টাকা নিয়ে হরিমোহন কোথায় যাচ্ছিল? তোমার অজ্ঞাতসারে দুই পার্টনারের কেউ কি ক্যাশ থেকে টাকাটা বার করে হরিমোহনকে দিয়েছিলেন? কাউকে পেমেন্ট করে আসতে?

চৈতালী বলল, আমার তা বিশ্বাস হয় না। প্রথম কথা, তাহলে ওঁদের দুজনের মধ্যে কেউ না কেউ আমাকে বলতেন, 'খুঁজে দেখ, তোমার দাদার ঘরে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে।' তা কেউ বলেননি। অথচ অ্যাকসিডেন্টের পর দুজনের সঙ্গেই আমার কথা হয়েছে। রিভলভারের কথাও কেউ আমার কাছে জানতে চাননি।

— হরিমোহনের কি কোনও বদ নেশা আছে? স্মাগলার দলের সঙ্গে জানাশোনা আছে?

— আমি তো কোনদিন তা সন্দেহ করিনি। নেশা বলতে 'ড্রাগ-অ্যাডিক্ট' নিশ্চয় নয়। সিগারেট খায়, মদও খায় কখনো-সখনো। জুয়ার নেশা আছে। তিন-চার তাসাড়ু বন্ধুর সঙ্গে তে-তাশ খেলে। বোর্ড মানি পঞ্চাশ টাকা উঠতে দেওয়া হয় না। তাতে মাসে বিশ পঞ্চাশ টাকা হারে অথবা জেতে। তবে দার্জিলিঙে গিয়ে সিজনে দু-একবার রেস খেলেছে। কাঠমাণ্ডুতে একবার রোলে-বোর্ডে সাতশ টাকা হেরে এসেছিল। সব কিছুই ও আমাকে খুলে বলে। কিছু গোপন করে না।

— কোনও মেয়ের সঙ্গে কি ওর সম্প্রতি ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল? প্রেম-ট্রেম?

চৈতালী একটু চুপ করে ভাবল। তারপর বলল, আমার তাই সন্দেহ হয়েছে, কিন্তু ও স্বীকার করেনি। ইদানীং ও মনমরা হয়ে পড়েছিল।

— মেয়েটি 'কে' আন্দাজ করতে পারনি? তোমাদের অফিসের কেউ কি?

— আমাদের অফিসে তো দুজন বিবাহিতা, একজন বৃদ্ধা, একজন বিধবা। — সবাই ওর চেয়ে বয়সে বড়। হয়তো অন্য কোনও মেয়ে, যাকে আমি চিনি না।

— আর কিছু বলবে? কোনও গুরুত্বপূর্ণ খবর দিতে ভুলেছ কি?

— না, সব কিছুই তো বলেছি।

— না, বলনি। ব্ল্যাকমেলারের নির্দেশ মতো তুমি 'দৈনিক সঞ্জয় উবাচ' পত্রিকার পার্সোনাল কলমে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলে! তাই নয়? সেও একটা বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল। ট্যাক্সিতে অপেক্ষা করবে!

— ও হ্যাঁ। সেকথা আপনাকে বলা হয়নি বটে।

— ব্ল্যাকমেলার লোকটা ট্যাক্সি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল তোমার দোরগোড়ায়, তবু তুমি তার সঙ্গে দেখা করলে না কেন?

— আপনি কেমন করে ... ও, আয়াম সরি ... ও সব প্রশ্ন তো আমার করার অধিকার নেই। কী জানেন, স্যার, গগল্‌স পরা, টুপিমাথায় লোকটাকে দেখে আমার সন্দেহ হল — এ আসল লোক নয়। আসল লোক যদি হয় তাহলে হোটেল রিসেপশনে এসে আমাকে চাইছে না কেন?

— তোমার নাম সে জানে?

— না, জানে না। সম্ভবত হরিমোহনের নাম জানে। অন্তত পক্ষে সে কোড-নাম্বারটা তো জানে — আপনি যে ভাবে এলেন।

— তার মানে তুমিও তাকে চেন না?

— নিশ্চয় না!

বাসু বললেন, তোমার বলা যখন শেষ হয়েছে তখন আমি বলতে শুরু করি এবার। মন দিয়ে শোন : তুমি বর্তমানে একটা প্রচণ্ড বিপদের মধ্যে রয়েছ। শিলিগুড়ির অফিসে অডিটার যদি বলে, ক্যাশে পঞ্চাশ হাজার টাকার ঘাটতি আর হরিমোহনের জ্ঞান যদি আদৌ না ফেরে, তাহলে তোমার অবস্থা বুঝে দেখ। তোমাকে অফিস থেকে ছুটি দিয়েছে হরিমোহনের দেখভাল করার জন্য; অথচ তুমি ছদ্মনামে কলকাতার একটা হোটেলে লুকিয়ে বসে আছ। আর তোমার হেপাজতে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্ল্যাকমানি! ঠিক যে পরিমাণ ঘাটতির কথা বলেছে অডিটার!

চৈতালী মাথা নিচু করে শুনছিল। বলল, আপনি আমাকে কী করতে বলেন?

বাসু টেলিফোনটা তুলে নিয়ে অপারেটারকে ওঁর বাড়ির নম্বর দিতে বললেন। ফোন ধরল কৌশিক। বাসু তাকে বললেন, সুজাতাকে ফোনটা দিতে।

সুজাতা ফোনের ও প্রান্তে এলে বাসু বলেন, তুমি হোটেল পান্নায় চলে এস। শুধু একটা ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে। তোমার কি কোবাল্ট-ব্লু রঙের ব্লাউজ আছে? ...দ্যাটস্ অল রাইট। সেটা নিয়ে এস। দু-একদিন তোমাকে হোটেলে থাকতে হতে পারে। কিন্তু আপাতত কোনও ওভার নাইট ব্যাগ নিয়ে এস না। সোজা এসে 315 নম্বর ঘরে নক্ কর!

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে এবার চৈতালীকে বললেন, আমি হোটেলের বাইরে যাচ্ছি। একটা স্যুটকেস কিনে নিয়ে এখনি ফিরে আসব। তিন তলাতেই একটা ঘর ভাড়া নেব।

তুমি এখানে অপেক্ষা কর, যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি। ইতিমধ্যে যদি টেলিফোন বাজে তুলবে না। যদি কেউ দরজায় নক করে, খুলবে না। অর্থাৎ তুমি ঘরে নেই। আমি এসে দরজায় এই ভাবে নক্ করব টক্. টক্ ... একটু থেমে তিনবার টক্-টক্-টক্! তখন দরজা খুলবে। ও. কে.?

চৈতালী মাথা নেড়ে সায় দিল।

বাসু প্রশ্ন করেন, তুমি বুঝতে পারছ, আমি কী করতে চাইছি?

চৈতালী মাথা নেড়ে জানায় : না!

— তোমাকে ইভাপোরেট করে দিতে। কর্পূরের মতো উবে যাওয়া। জাস্ট ফলো মাই ইনস্ট্রাকশনস্।

।। পাঁচ ।।

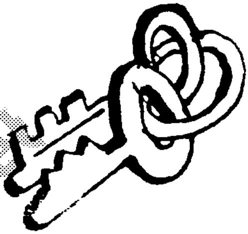

প্রায় একঘণ্টা পরে বাসুসাহেব ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে তিনি সামনের বাজার থেকে একটি বড় স্যুটকেস কিনে হোটেল পান্নায় একটা ঘর ভাড়া নিয়েছেন। নিজের নামে। একতলা বা দোতলায় নাকি রাস্তার শব্দে ওঁর অসুবিধা হয় — আবার পাঁচ-ছয় তলা উঠতে চান না বৃদ্ধ ওঁর ভার্টিগো আছে। জানলা দিয়ে বা বারান্দা দিয়ে নিচের রাস্তায় তাকালে মাথা ঘুরে উঠতে পারে। রিসেপশনিস্ট অনেক বুদ্ধি-বিবেচনা করে তিন তলার একুশ নম্বর ঘরটা ওঁকে দিয়েছে : 321।

বাসুসাহেব স্যুটকেস নিয়ে সেখানে এসে উঠলেন। তোয়ালে, সাবান, চাবি সব নিয়ে ঘর তালাবন্ধ করে এসে নক্ করলেন চৈতালীর ঘরে।

চৈতালী কোড-নক্ শুনে দরজা খুলে দিল।

— ইতিমধ্যে কোন ফোন বা দর্শনার্থী আসেনি?

— আজ্ঞে না। কিন্তু স্যার, আমি এতক্ষণ একটা কথা ভাবছিলাম। আমি আপনাকে মাত্র একশ টাকা রিটেইনার দিয়ে এসেছি ...

— দ্যাটস্ অল রাইট! ঝামেলাটা আগে মিটুক তারপর সে সব কথা হবে। কী জান চৈতালী, তোমার বয়সী আমার একটি মেয়ে ছিল। সে যদি আজ ...

ঠিক সেই সময়েই কে-যেন নক্ করল দরজায়। বাসু বললেন, দাঁড়াও। আমি দেখছি।

চৈতালী চলে গেল বাথরুমের দিকে। বাসু এসে দরজাটা খুলে দিলেন। ঘরে ঢুকল সুজাতা।

— এস সুজাতা, বস। তুমিও এগিয়ে এস চৈতালী, আমি আলাপ করিয়ে দিই। এ হচ্ছে শিলিগুড়ির চৈতালী বসু। এ হোটেলের চিত্রলেখা ব্যানার্জি। যার চরিত্রে দিন কয়েক তোমাকে অভিনয় করতে হবে। চৈতালী বসুর কাছ থেকে একজন ব্ল্যাকমেলার হয়তো টাকা আদায়

করতে চাইবে। তোমার কাজ হচ্ছে যতদূর সম্ভব নাম-ধাম-পরিচয় সংগ্রহ করা। বলবে, টাকাটা এখন তোমার কাছে নেই; কিন্তু দেবার ইচ্ছে না থাকলে ব্ল্যাকমেলারের নির্দেশমতো কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এ হোটেলে তুমি অপেক্ষা করবে কেন — ইত্যাদি।

সুজাতা জানতে চায়, চৈতালী বা আমি তো ব্ল্যাকমেলারকে চিনি না। সে কি চৈতালীদেবীকে চেনে?

— না, সে হয়তো আশা করছে একজন পুরুষমানুষ ব্ল্যাকমেলের টাকা মেটাতে আসবে। তোমায় হয়তো জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে? তুমি নিজের পরিচয় দেবে চিত্রলেখা ব্যানার্জি নামে। তুমি শিলিগুড়ি থেকে আসছ একজনের নির্দেশে। এনি কোশ্চেন?

— আজ্ঞে না।

চৈতালী জানতে চায়, আমি কী করব?

— তুমি আমার এই 321 নম্বর ঘরের চাবিটা নিয়ে ও ঘরে চলে যাও। তোমার কালো অ্যাটাচি সমেত। আমি সুজাতাকে কিছু ইনস্ট্রাকশন দিয়ে তোমার বড় স্যুটকেসটা নিয়ে ওঘরে আসছি। আধঘণ্টার মধ্যেই। তারপর তোমার কাজ হবে ঐ অ্যাটাচিটা নিয়ে নিচে রিপন স্ট্রিটের ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়াতে গিয়ে নিজের নামে একটা ব্যাঙ্ক-ড্রাফ্‌ট বানানো — পে-এবল্ অ্যাকাউন্ট পেয়ি টু চৈতালী বসু। ব্যাঙ্ক-ড্রাফ্‌ট্ হবে শিলিগুড়ির এস. বি. আই.-এর ওপর। চল। আমিও তোমার সঙ্গে ব্যাঙ্কে যাব। যাতে ব্যাঙ্কের দোরগোড়ায় ওটা ছিনতাই না হয়ে যায়।

চৈতালী বলে, কেন? ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট করতে বলছেন কেন?

বাসু ধমকে ওঠেন, বুঝলে না? জৈন কোম্পানি যদি পুলিশে খবর দেয় যে, ওদের ক্যাশিয়ার পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে নিখোঁজ হয়েছে তখন তোমার বিরুদ্ধে একটা পাকা চার্জ খাড়া হবে, যেহেতু এখানে তুমি ছদ্মনামে এসে উঠেছ এক স্যুটকেস টাকা নিয়ে। কিন্তু ব্যাঙ্ক ড্রাফটটা করা থাকলে তোমার ডিফেন্সটা হয়ে যাবে অন্য জাতের। তুমি বলতে পারবে, হরিমোহনকে তুমি এ টাকা ক্যাশ থেকে বার করে দিয়েছিলে কলকাতায় এসে কিছু কেনার জন্য। যেহেতু হরি আহত হয়ে হাসপাতালে তাই তুমি নিজেই চলে এসেছিলে কোম্পানির স্বার্থে। ঘটনাচক্রে লেনদেনটা হল না। তাই টাকাটা তুমি নিজের নামে ব্যাঙ্ক-ড্রাফ্‌ট্ করে শিলিগুড়িতে ফিরে যাচ্ছ। ইন ফ্যাক্ট আজ সন্ধ্যা পাঁচটা সতেরর ফ্লাইটে তুমি আর আমি বাগ্‌ডোগরা যাব। টিকিট আমিই কাটব। কাউন্টারে অপেক্ষা করব। রিপোর্টিং টাইমের মার্জিনের মধ্যে তুমি চলে আসবে। ও. কে.?

— আমি চেক-আউট করব নিজের নামেই ...

— গুড গড! তুমি চেক আউট আদৌ করবে না। তোমার স্যুটকেসের মালপত্র সব আমার খালি স্যুটকেসে ভর্তি করে তুমি খালি হাতে বেরিয়ে যাবে। তোমার ভাড়া নেওয়া ঘরে 315-এর বোর্ডার — চিত্রলেখা ব্যানার্জি তো ঘরের মধ্যেই থাকল। সে মহড়া সুজাতা নেবে। বুঝলে? ও হ্যাঁ, তোমার আর একটা কাজ বাকি আছে। তুমি প্রথম যে দিন আমার কাছে এসেছিলে, সেদিন যে শাড়িখানা পরে এসেছিলে নীল শাড়ি, নীল চুড়ি, নীল লকেট — সে সব সুজাতাকে বার করে দাও। কোন মামলা মোকদ্দমা হলে প্রত্যক্ষদর্শীদের গুলিয়ে দেওয়া দরকার। সুজাতা ...

— বুঝেছি, মামু। পঞ্চতন্ত্রের গল্পটা আমার মনে আছে : "ধূর্ত শৃগাল নীলীবর্ণ সঞ্জাত।"

— আর দেরি কর না চৈতালী, এবার রওনা দাও তুমি।

চৈতালী নির্দেশ-মতো তার কোবাল্ট-ব্লু-রঙের শাড়ি, মালা, চুড়ি, টিপ ইত্যাদি বার করে সুজাতাকে দিল। বাথরুম থেকে টুথব্রাশ, টুকিটাকি গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল।

বাসু সুজাতাকে বললেন, এইগুলো পরে তুমি দু-একবার কাউন্টারে গিয়ে কথাবার্তা বলবে। জানতে চাইবে, মাসিক ভাড়া নিলে ওরা রেট কমাতে রাজি আছে কি না, কারণ তোমাকে চাকরির প্রয়োজনের তিন-চার সপ্তাহ কলকাতাতেই থাকতে হবে। এ হোটেলটা তোমার পছন্দ হয়েছে। কাউন্টার গার্ল হয়তো বলবে, ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করে জানাব। এই সূত্রে অনেকে তোমাকে চিত্রলেখা ব্যানার্জি হিসাবে মনে রাখবে — তোমার চেহারা, নীল সজ্জা আর ঐ সব প্রশ্ন তালগোল পাকিয়ে যাবে কাঠগড়ায় উঠে।

চৈতালী বাসুসাহেবের হাত থেকে 321 নম্বর ঘরের চাবিটা নিয়ে বললে, এবার একটা কথা বলব, মামু?

— মামু? ও সুজাতার দেখাদেখি? বল?

— এখন তো আর আমি অজ্ঞাতকুলশীলা নই। একটা প্রণাম করি?

— কর! মামু বলে ডেকে বসেছ যখন!

চৈতালী প্রণাম করে বিদায় নিল। বাসু দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

।। ছয় ।।

বাসু বিছানার একপ্রান্তে গিয়ে বসলেন। সুজাতাকেও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বললেন। চৈতালী বেরিয়ে যাবার পর দরজার ইয়েল-লকে ঘর আপনিই অর্গলবদ্ধ হয়ে গেছে। বাসু জানতে চাইলেন, কৌশিক কোথায়?

— ঠিক জানি না। কাছেপিঠেই আছে বোধহয়। আমাকে আপনার গাড়িটায় হোটেল থেকে কিছু দূরে নামিয়ে দিয়ে বোধহয় ফুটপাতের ওদিকে কোন চায়ের দোকানে ঢুকেছে।

— রিভলভারটা কার কাছে? তোমার না কৌশিকের?

— আমার কাছে।

সুজাতা নিজে থেকেই জানতে চায়, যে লোকটা আমার কাছে — মানে চৈতালীর কাছে — ব্ল্যাকমেলের টাকা আদায় করতে আসছে সে কি চৈতালীকে চেনে?

— ও পক্ষের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, সুজাতা। তাই তার কাছে তুমি প্রথমটা চিত্রলেখা ব্যানার্জির পরিচয়ে কথা বলবে। ভাবখানা : ও যাকে ব্ল্যাকমেল করতে আসছে তুমি

তার প্রিয়জন। তোমার অনেক টাকা, সেই টাকার কিছুটা দিয়ে তুমি হতভাগ্যটাকে বাঁচাতে চাইছ। কিন্তু টাকাটা তুমি সাহস করে হোটেলে নিয়ে আসনি। ওর সঙ্গে আর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট কর। এই সুযোগে লোকটাকে চাক্ষুষ দেখে রাখা যাবে। ও কোথায় সেকেন্ড অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে সেটাও আমাদের জেনে নেওয়া দরকার। তৃতীয়ত, ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে জানতে চেও — ও যে আবার টাকার দাবি নিয়ে আসবে না, তার গ্যারান্টি কী। এনি কোশ্চেন?

সুজাতা জবাব দেবার সুযোগ পেল না। কারণ ঠিক তখনই বেলটা বেজে উঠল। বাসু হাতের ইঙ্গিতে সুজাতাকে চুপচাপ বসে থাকতে বলে এগিয়ে গেলেন। দ্বার খুলে দেখলেন করিডোরে দাঁড়িয়ে আছেন একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। বেঁটে, মোটা, কালো। কিন্তু বেশবাসের পারিপাট্য নিখুঁত। থ্রি পিস স্যুট। কণ্ঠলগ্ন সিল্কের জোডিয়াক-মার্কা টাই।

বাসু বললেন, ইয়েস? কাকে চাইছেন?

লোকটি বাসুসাহেবকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে, একটা বিজ্ঞপ্তি দেখে এসেছি — দৈনিক সঞ্জয় উবাচ-তে ...

— কে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল?

— 36-24-36!

— বিজ্ঞাপনটা যে এই ঘর থেকে দেওয়া তা জানলেন কী করে?

— বিজ্ঞাপনটা যে এই ঘর থেকে দেওয়া নয়, এটা জানিয়ে দিলেই বিদেয় হই।

বাসু বললেন, ভিতরে আসুন। বসুন।

খর্বকায় আগন্তুক ঢুকতে গিয়েই থমকে গেলেন। বললেন, ও আয়াম সরি। আপনি একা নন দেখছি। এসব আলোচনা তো জনান্তিকে ছাড়া হয় না মিস্টার ...

— নাম-টামও উহ্য থাক না। যে কথা বলতে এসেছেন তা যদি জনান্তিকে বলতে চান তাহলে ওকে আপাতত বিদায় করে দিই?

— এ ছাড়া তো উপায় দেখছি না। তুমি কিছু মনে কর না, মা। আমাদের কিছু বিজনেস-টক আছে। সেটা নিতান্ত ...

সুজাতা বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে।

হঠাৎ বাসুসাহেবের দিকে ফিরে বললে, আমি তাহলে চলি ডক্টর সরকার? বিকালে টেলিফোনে ...

বাসু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সুজাতাকে ধমকে ওঠেন, ইউ গেট আউট।

সুজাতা থতমত খেয়ে যায়। মাথা নিচু করে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

প্রৌঢ় লোকটি বললে, আপনি নাম-টাম উহ্য রাখতে চেয়েছিলেন, ডক্টর সরকার। সেটা এমন কিছু ব্যাপার নয়। আপনি আমার নামটাও জানতে পারেন। আমার নাম : মিঃ ঘিসিং। তাহলে বিজ্ঞাপনটা আপনিই দিয়েছিলেন? কী, ডক্টর সরকার?

— না। আমি নই। আমার মক্কেল। আপনি যার প্রতীক্ষায় আছেন। বলুন, কী বলতে চান?

— মক্কেল! মক্কেল কেন? আপনি কি উকিল?

— দেখুন মিস্টার ঘিসিং, আমি চাইনি যে, আমরা পরস্পরের নাম-ঠিকানা জানি। ঘটনাচক্রে কিছুটা জানাজানি হয়ে গেছে। তাতে খুব কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি। এখন বলুন, আপনি কী জন্য এসেছেন?

— সে কথা নিশ্চয় আপনার মক্কেল আপনাকে বলেছে, ডক্টর ... ওয়েট এ মিনিট ... আপনার মুখখানা তো আমার অচেনা নয়। আমি আপনাকে আগেও কোথাও দেখেছি, অথবা আপনার ফটো ...

— তা তো হতেই পারে। হয়তো খবরের কাগজে দেখেছেন।

— ড্যাম ইট। ঐ মেয়েটি ধোঁকাবাজি না করলে আমি আরও আগেই আপনাকে চিনে ফেলতাম। আপনি পি. কে. বাসু — ব্যারিস্টার।

— দ্যাটস্ কারেক্ট।

— গুড গড। আপনার সঙ্গে তো আমার কোনও কারবার নেই। আপনার মক্কেল যদি আমার সঙ্গে সরাসরি কারবার করতে না চায় তা হলে গুড বাই!

— অল রাইট। গুড বাই।

নাটকে যাকে 'প্রস্থানোদ্যত' ভঙ্গি বলে তেমন একটা ভঙ্গি করে দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরে এল লোকটা। বললে, আপনি জানেন নিশ্চয় দেনাপাওনাটা কিসের, কেন, এবং কী পরিমাণ? আপনার মক্কেল সেই 'ছিপে-রুস্তম'-এর পালানোর সব পথ বন্ধ। আমাকে খুশি করে দিলেই তার গোপন কথা চিরকাল গোপন থাকবে।

— আপনাকে নিশ্চয় মাসে-মাসে চিরটাকাল আমার মক্কেলকে এ ভাবে খুশি করে যেতে হবে?

— না, নিশ্চয় নয়। সেকথা আমি ছুপে-রুস্তমকে আগেই জানিয়েছি। এই ছ্যাঁচড়া কারবার আমার ভাল লাগে না। এতে বিপদও আছে। তাই এবারের এই লেনদেনটাই আমাদের শেষ কারবার। এরপর আমি আর একটা বিজনেস খুলে বসব — যে বিজনেসটা আটকে আছে নগদ টাকার অভাবে। আপনার মক্কেল এসব কথা আপনাকে বলেনি?

— বলেছে। সে রাজিও হয়েছে টাকাটা মেটাতে। ইন ফ্যাক্ট, টাকাটা সে আমাকে হস্তান্তরিত করার পরে ঐ বিজ্ঞাপনটা ছাপতে দিয়েছে।

— তাহলে মাঝে থেকে আপনি বাগড়া দিচ্ছেন কেন?

— আমি শুনে যাচ্ছি। বলে যান।

— দেখুন মিস্টার বাসু। এটা আপনি যা ভাবছেন তা নয় ...

— আমি আবার কী ভাবছি?

— স্পষ্ট করেই বলি : এটা ব্ল্যাকমেলিং আদৌ নয়। খেসারত! জাস্ট কম্পেনসেশন। আপনার মক্কেল তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে মাত্র।

— তাহলে অবশ্য আমার আপত্তি নেই টাকাটা দিতে —

— পুরো পঞ্চাশ? কমিশন না রেখে?

— কিসের কমিশন? মক্কেল যখন ব্ল্যাকমেলিং-এর টাকা দিচ্ছে না, প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে খেসারত দিচ্ছে। তার কাছে ফি যা নেবার তা আমি পৃথকভাবে নেব।

— তাহলে এখনই দিয়ে দিন নগদানগদি!

— এখনই কেমন করে দিই। টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা দিই। আপনার নামে অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক বানিয়ে আনি। খেসারতের ড্রাফটটা বানাই। আপনার তরফের উকিল ...

— কী বকছেন মশাই পাগলের মতো! আপনার মক্কেল আপনাকে কতটা বলেছে বলুন তো? অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেকে আমি এই খেসারতটা নিতে পারি?

— তাহলে আপনি যে আবার নতুন দাবি নিয়ে আমার মক্কেলকে বিরক্ত করবেন না, তার গ্যারান্টি কোথায়?

— কোন ভদ্রলোক তা করে না।

— কারেক্ট! কিন্তু ভদ্রলোকেরা খেসারতের টাকা অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেকে গ্রহণ করে থাকেন!

— আপনি আমাকে ল্যাজে খেলাবার চেষ্টা করলে ঐ পঞ্চাশ হাজার কিন্তু এক লাফে এক লাখে উঠে যাবে।

বাসু একগাল হেসে বললেন, জানি, লেজ নিয়ে যারা খেলে তারা অমন ত্রিং ত্রিং লাফ মারার চেষ্টা করে। মুখ থুবড়ে পড়েও।

লোকটা গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, ঠিক আছে! আপনার সঙ্গে আমার কোনও কারবার নেই। আপনার মক্কেলকে জানাবেন, বাহাত্তর ঘণ্টার ভিতর আমার দাবি পূরণ না হলে আমি যা চেয়েছি তার দ্বিগুণ খেসারত দাবি করব।

— কিন্তু আমার মক্কেল যদি আমার পরামর্শ না শুনে সরাসরি আপনাকে খেসারতটা মেটাতে চায় তাহলে কোথায় আপনার পাত্তা পাবে?

— আপনি বেশি চালাকি করবেন না, মিস্টার বাসু। আপনার ফোন নম্বর টেলিফোন গাইডে আছে। আমিই ফোন করে আপনাকে জানাব কোথায় খেসারতটা পৌঁছে দিতে হবে।

— কখন?

— যখন আমার মন চাইবে ...

— তার চেয়ে সরাসরি আমার মক্কেলকে ফোন করলেই ভাল হয় না কি? ওর ফোন নম্বরটা দেব?

— একবার বলেছি, আবার বলছি, বেশি চালাকি করবেন না।

লোকটা গট্‌গট্‌ করে এবার সত্যিই বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

বাসু টেলিফোনটা তুলে নিয়ে 321 নম্বর ঘরে রিং করলেন। ওপ্রান্তে চৈতালী ধরতেই প্রশ্ন করলেন : আমি বাসু মামু বলছি। শোন চৈতালী, ব্ল্যাকমেলার এসেছিল। তার দৈহিক বর্ণনা আর পোশাকের বিবরণ দিচ্ছি। দেখতো, লোকটাকে চিনতে পার?

চৈতালী ধরতে পারল না।

বাসু বললেন, একটু পরেই আমি তোমার ঘরে আসছি। তুমি তৈরি হয়ে নাও। ব্যাঙ্কে যেতে হবে। টাকাটা জমা দিতে!

ঠিক তখনই আবার কে ডোর বেল বাজালো।

বাসু টেলিফোন নামিয়ে এগিয়ে এসে খুলে দেখেন সুজাতা ফিরে এসেছে। বললেন, তোমার অভিনয়টা ভালই হয়েছিল, কিন্তু কাজে লাগেনি। ডক্টর সরকার সেজে আত্মগোপনের সুযোগ পাওয়া গেল না। লোকটা আমাকে চিনতে পেরে গেল।

— আর আপনি ওকে ...?

— কী করে চিনব? ওর উপাধি নিশ্চয়ই ঘিসিং নয়।

— না, নয়। কিন্তু ওর আসল নাম-ঠিকানা আপনি একটু পরেই জানতে পারবেন।

— কী ভাবে?

— আমি নিচে নেমে যেতেই আপনার ভাগ্নের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমার কাছে সব কথা শুনে সে গাড়িতে গিয়ে বসল। আমাকে বলল, পাশের সিটে বসতে। ঐ লোকটা হোটেল থেকে বেরিয়ে এলেই ওকে চিহ্নিত করে আমি যেন গাড়ি থেকে নেমে যাই। আপনাকে এসে খবর দিই যে, ও লোকটাকে ফলো করতে গেছে।

বাসু খুশি হয়ে বললেন, গুড ওয়ার্ক। তারপর?

— লোকটার সঙ্গে আপনার কী কথাবার্তা হয়েছে জানি না, কিন্তু মনে হল সে খেপে আগুন হয়ে আছে। ডাইনে বাঁয়ে তাকালো না, বুনো মোষের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে ওর মারুতি সুজুকি গাড়িতে গিয়ে বসল। নম্বরটা টুকে এনেছি।

— ভেরি গুড। আমি বরং ওঘরে গিয়ে দেখি চৈতালী কী করছে। এতক্ষণে ওর স্যুটকেস গোছানো হয়ে গেছে নিশ্চয়। ব্যাঙ্ক আওয়ার্সের মধ্যে টাকাটা জমা না দেওয়া পর্যন্ত আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হচ্ছে না। আমি ওকে নিয়ে ব্যাঙ্কে যাচ্ছি। তুমি ইতিমধ্যে এ. এ. ই. আই-তে একটা ফোন কর। কল্যাণকে। কল্যাণ ভদ্র। আমাকে খুব শ্রদ্ধা করে। আমার নাম করে জিজ্ঞেস কর ঐ নম্বরের গাড়ির মালিক কি এ. এ. ই. আই.-এর মেম্বার? আমি জানতে চেয়েছি। তাহলে নাম-ধাম-ফটো সব পাওয়া যাবে।

।। সাত ।।

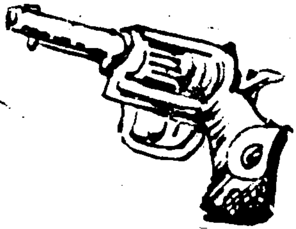

চৈতালী ঘরে তৈরি হয়েই বসেছিল। বাসু তাকে নিয়ে সামনের ব্যাঙ্কে গেলেন। ব্যাঙ্ক ড্রাফটটা বানাতে বেশ সময় লাগল। যা হোক, কাজ সেরে বাসুসাহেব ড্রাফটটা চৈতালীকেই রাখতে দিলেন। বললেন, চল, এবার দুজনে আমার 321 নম্বর ঘরে ফিরে যাই। আমি চাই না তোমাকে এ হোটেলের বেশি লোক মুখ চিনে রাখুক। আমরা ঘরেই কিছু খাবার আনিয়ে খেয়ে নেব। তারপর আমি তোমার নামে বুক করা ঘরে চলে যাব। এ ঘরের চাবিটা নিয়ে। তুমি ঠিক একটা নাগাদ খালি হাতে, অর্থাৎ শুধু ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে, দরজাটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে যেও। নিচে নেমে গিয়ে একটা ট্যাক্সি নেবে। কেউ তোমাকে লক্ষ্য করছে কি না, ফলো করছে কি না, ভ্রূক্ষেপ করবে না। ট্যাক্সি নিয়ে সোজা শেয়ালদহ স্টেশনে চলে যাবে। এ-কাউন্টার ও-কাউন্টার ঘোরাঘুরি করে লেডিজ টয়লেটে ঢুকবে। সেখান থেকে অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবে। একটা ফ্লাইং ট্যাক্সি ধরবে বিকাল সাড়ে তিনটে নাগাদ। সোজা চলে যাবে দমদম এয়ারপোর্ট। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কাউন্টারে গিয়ে আমার নাম-ছাপা এই কার্ডটা দেখালেই তুমি বাগডোগরার একটি টিকিট পেয়ে যাবে। তোমাকে নিয়ে ঐ সাতটা সতেরোর প্লেনে আমি শিলিগুড়ি যাব আজ। এনি কোশ্চেন?

— আজ্ঞে না।

দুজনে সেই মতো 321 নম্বর ঘরে এলেন। খাবারের অর্ডার দিলেন। আহার যখন মধ্যপথে তখন বেজে উঠল টেলিফোন। বাসু ধরলেন। ওপাশের ঘর থেকে সুজাতা ফোন করছে।

— ইয়েস। বল সুজাতা?

— ও টেলিফোন করেছিল। লোকটার নাম সত্যিই ঘিসিং। হীরালাল ঘিসিং। জৈন এক্সপোর্ট-ইম্পোর্টের সঙ্গে জানাশোনা আছে। নেপালি কিউরিও জোগাড় করে। চৈতালী তাকে চেনে না? কমিশন এজেন্টকে?

বাসু টেলিফোনে হাতচাপা দিয়ে প্রশ্নটা চৈতালীকে করলেন। চৈতালী বলল, হ্যাঁ, চিনি বৈ কি। কাঠমাণ্ডুতে থাকেন। রঞ্জনাদি ওর রাখী বহিন। উনি কলকাতায় এসেছেন কবে? কেন?

বাসু সেকথার জবাব না দিয়ে সুজাতাকে প্রশ্ন করেন, কৌশিক কি ওর ঠিকানা জেনে এসেছে?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। লিটল্-রাসেল স্ট্রিটে একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের সাত তলায় থাকেন। অ্যাপার্টমেন্ট 7/3। নতুন অ্যাপার্টমেন্ট হাউস। বাড়ির নম্বর 132/A; বাড়িটার নাম 'স্কাইলার্ক'।

বাসু বললেন, আমি এখনি ওঘরে আসছি, অপেক্ষা কর। টেলিফোন নামিয়ে রাখতেই চৈতালী জানতে চায় মিস্টার ঘিসিং কি এখন কলকাতার বাসিন্দা? আর রঞ্জনাদি?

— রঞ্জনাদির কথা আমি জানতে চাইনি। তবে ঘিসিং থাকেন লিট্‌ল্ রাসেল স্ট্রিটের 'হিলার্কে'। 132/A; তা সে যাই হোক, তুমি স্রেফ ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে এয়ারপোর্টে চলে যাবে। খ, কেউ যেন তোমাকে এয়ারপোর্টে ফলো না করে। তোমার স্যুটকেসটা নিয়ে আমি এ ঘর কে চেক আউট করে যাব। সুজাতা কাল চেক আউট করবে চিত্রলেখা ব্যানার্জির পরিচয়ে।

চৈতালী ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

বাসু ফিরে এলেন 315 নম্বরে। দেখলেন সুজাতাও সাহস করে ডাইনিং হলে যায়নি। তার ক্তাবশিষ্ট প্লেট পড়ে আছে দরজার কাছে। বাসুসাহেব ভিতরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দেবার ব সুজাতা জানতে চায়, ব্যাঙ্কের কাজ মিটল?

— হ্যাঁ। কালো টাকা আবার শাদা টাকা হয়ে গেছে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন।

— আপনার কি মনে হয় মামু, মেয়েটি সত্যিই বিপদে পড়েছে?

— ঠিক বুঝতে পারছি না, সুজাতা। হীরালাল ঘিসিং তাহলে আমার কাছে মিথ্যা পরিচয় য়নি! সে ওদের নেপালের এক্সপোর্ট-ইম্পোর্টের কাজ দেখে। চৈতালী বলল, রঞ্জনা ওর রাখী ইন। সে হরিমোহনকে ব্ল্যাকমেলিং করছে কেন? কী বাবদে? হরিমোহনই বা অত টাকা াথায় পেল? রিভলভারটাই বা তার হেপাজতে ছিল না কেন? অনেক ... অনেকগুলো প্রশ্নের ত্তর পাইনি। তাই বোঝা যাচ্ছে না, চৈতালী কতটা বিপদে পড়েছে ...

সুজাতা কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল তার আগেই কে যেন দ্বারে করাঘাত করল।

সুজাতা বলে, ঘিসিং ফিরে এল নাকি?

বাসু মাথা নাড়লেন, না! সে এলে বেল বাজাত। এ করাঘাতে ঔদ্ধত্যের প্রকাশ। হয় াটেলের হাউস ডিটেকটিভ, নয় পুলিশ। ঘরটা তোমার — তুমিই দরজাটা খুলবে। কিন্তু থাবার্তা আমাকে বলবার সুযোগ দিও।

সুজাতা গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই ঘরে ঢুকল দুজন শাদা পোশাকের পুলিশ। দুজনেরই খচেনা। নাম দুটো মনে পড়ল না বাসুসাহেবের। ওদের মধ্যে বয়স্ক পুলিশ অফিসারটি বলে ঠেন, এ কী! বাসুসাহেব! আপনি এখানে?

বাসু বললেন, প্রশ্নটা আমরাও করতে পারি! আপনারা এখানে?

দুজনে এগিয়ে এল। দরজাটা বন্ধ করে গুছিয়ে বসল দুটি চেয়ারে। বয়স্ক পুলিশ অফিসারটি ক পকেট থেকে সনাক্তিকরণ কার্ডটা দেখিয়ে বললেন, ক্যালকাটা পুলিশ। লালবাজার থেকে াসছি —

বাসু বলেন, কী ব্যাপার?

বয়স্ক অফিসারটি তার সহকারীকে বললেন, কাগজটা পড়ে দেখ তো গণেশ। কী লিখেছে? য়স কুড়ি, রঙ ফর্সা, পাঁচ ফুট দুই, দেড়শ পাউন্ড? শেষ দেখা গেছে — নীল শাড়ি, নীল াউজ, নীল চুড়ি, নীল লকেট। তাই তো?

গণেশ সুজাতাকে আপাদমস্তক একনজর দেখে নিয়ে এক গাল হেসে বললে, ইউক্লিডের ভাষায় 'সমানুপাত'।

বয়ঃজ্যেষ্ঠ পুলিশ ধমকে ওঠেন: ইউক্লিড! সে আবার কে? সেই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান স্মাগলার ছোকরা?

— আজ্ঞে না স্যার। বলছি কি, হুবহু মিলে গেছে।

ইউক্লিড-না-চেনা পুলিশ অফিসারটি এবার সুজাতাকে প্রশ্ন করেন, মালক্ষ্মীর নামটা নিশ্চয় চৈতালী বসু? শিলিগুড়ির বাসিন্দা?

বাসু বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, জাস্ট এ মিনিট। সর্বপ্রথমে বলুন, আপনারা দুজন পুলিশ এ ঘরে কেন হানা দিয়েছেন?

টাকসর্বস্ব রুখে ওঠেন, সে কথা আপনাকে বলতে যাব কেন?

— কারেক্ট। আমাকে বলবেন না, বলবেন ঐ মেয়েটিকে। যাকে প্রশ্নটা করছেন। আপনারা কি আন্দাজ করছেন ও কোন অপরাধ করেছে?

— করে থাকতে পারে, আবার নাও পারে, আমরা জানি না। আমরা এস. পি. শিলিগুড়ির অনুরোধমতো কিছু তথ্য সংগ্রহ করছি মাত্র।

— ঠিক কথা, কিন্তু শিলিগুড়ির পুলিশ কি সন্দেহ করছেন মেয়েটি কোন অপরাধ করেছে?

— কী অপরাধ তা আমরা কেমন করে জানব? ওরা যেটুকু জানতে চেয়েছে তাই আমরা তদন্ত করে জানাচ্ছি।

— সেক্ষেত্রে আপনাদের কর্তব্য হবে মেয়েটিকে তার সাংবিধানিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে প্রশ্নটা পেশ করা।

— উনি যেন তা জানেন না। ন্যাকা?

— ঐ প্রশ্নটা আপনাকে পেশ করতে হবে সুপ্রিম কোর্টে।

— কোন প্রশ্নটা?

— সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের বিচারকদ্বয় 'ন্যাকা' কি না। তাঁরাই বিধানটা পাকা করেছেন।

— অল রাইট, অল রাইট। অবধান করুন, মিস বোস, আমরা বর্তমানে আপনাকে কোন বিশেষ অপরাধে অপরাধী বলে চিহ্নিত করছি না। আপনাকে গ্রেপ্তার করতেও আসিনি। আপনি ইচ্ছে করলে আমাদের প্রশ্নের কোন জবাব নাও দিতে পারেন। বলতে পারেন যে, আপনার উকিলের উপস্থিতি ভিন্ন আপনি আমাদের কোনও প্রশ্নের জবাব দেবেন না। আপনি যদি নিজ ব্যয়ে ...

বাধা দিয়ে বাসু বলেন, মেয়েটির অ্যাটর্নি এখানে উপস্থিত। আমি নিজেই!

— অল রাইট! এবার বলুন মিস্ চৈতালী বাসু — আপনি এ হোটেলে এমন ছদ্মনামে কেন উঠেছেন?

জবাব দিলেন বাসু, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে।

— মিস্ বোস! আপনি কি জানেন যে, যে, কোম্পানিতে আপনি ক্যাশিয়ারের চাকরি করেন, তার তহবিল থেকে একটা বিরাট টাকার অঙ্ক তছরুপ হয়ে গেছে?

— নো কমেন্টস্! — এককথায় থামিয়ে দিলেন বাসুসাহেব।

— আপনি ক্রমাগত ফোড়ন কাটছেন কেন মশাই? আপনি জানেন — কী বিরাট অঙ্কের গরমিল হয়েছে ওঁদের তহবিলে! পাক্কা দু-লাখ! বুঝলেন? টু ল্যাক্স!

এই প্রথম মনে হল বাসুসাহেব একটু ঘাবড়ে গেছেন।

অসতর্কভাবে প্রশ্ন করে বসেন: কী? কী বললেন?

— আপনি কি কানে খাটো নাকি মশাই? আমি বলেছি, দুই লক্ষ তঙ্কা। কেশিয়ার নিরুদ্দেশ হবার সঙ্গে সঙ্গে!

বাসু ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন। বলেন, আপনারা অথবা শিলিগুড়ির পুলিশ কি মনে করেন যে, আমার মক্কেল এই তহবিল তছরুপের জন্য দায়ী?

— আমি এখনো সেকথা বলিনি। আমি শুধু কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে চাইছি ...

— কিন্তু আপনারা একবারও বলেননি যে, এই তহবিল তছরুপের অপরাধে আপনারা আমার মক্কেলকে দায়ী করবেন না।

— আজ্ঞে না, তা বলিনি। আবার একথাও বলিনি যে, তিনিই দায়ী। নর্দার্ন সার্কেলের ডি. সি.-র অনুরোধ অনুসারে আমরা কিছু তথ্য সংগ্রহ করছি মাত্র।

— সে ক্ষেত্রে ওর আইন পরামর্শদাতা হিসাবে আমি ওকে পরামর্শ দেব কোনও প্রশ্নের জবাব না দিতে।

দুই পুলিশ অফিসার উঠে দাঁড়ায়। সুজাতার দিকে ফিরে বলে, কাজটা ভাল করলে না, চৈতালী দিদি। আচ্ছা চলি।

ওরা ঘর ছেড়ে চলে যায়।

বাসু বলেন, সুজাতা! পারতপক্ষে এ ঘরের বাইরে যেও না। কারণ তোমার অনুপস্থিতির সুযোগে ওরা এ ঘরে কনসিল্ড্ মাইক্রোফোন বসিয়ে দিতে পারে। তুমি পারতপক্ষে টেলিফোনও ব্যবহার কর না। ওরা যতক্ষণ বিশ্বাস করবে চৈতালী বসু এ ঘরে বন্দী আছে ততক্ষণই আমরা দুজন নড়াচড়ার সুযোগ পাব। কৌশিক যদি ফোন করে তাকে বলবে, পরে কথা হবে। কারণ ওরা তোমার ফোন ট্যাপ করে ইন-কামিং কল মনিটার করবে। হয়তো টেপরেকর্ড করবে।

— চুপচাপ বসে থাকব? এ ঘরে টি. ভি. পর্যন্ত নেই?

— হোটেল স্টেশনারি তো রয়েছে। বসে বসে পদ্য লেখ না।

— পদ্য? মানে কবিতা? আমি জীবনে লিখিনি! সে আপনার ভাগ্নে হলে পারত।

— ছেলেবেলায় গঙ্গাস্তোত্র কিছু মুখস্ত করেছিলে? তাহলে সেটা ঝালিয়ে নিতে থাক। ভুল না, 'দে অল্‌সো সার্ভ হু ওনলি স্ট্যান্ড অ্যান্ড ওয়েইট।'

।। আট ।।

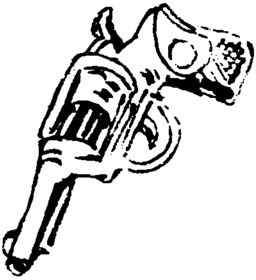

কাল রাত্রে বাসুসাহেব শিলিগুড়ির সেবক রোডের 'নূরজাহান' হোটেলে এসে উঠেছেন। রাত নয়টা নাগাদ। আছেন সাততলার একটা এ. সি. ডিলাক্স সুইটে। হোটেলটা আনকোরা নতুন। এখনো উপরতলায় কাজ হচ্ছে। শিলিগুড়ি ব্যবসাক্ষেত্র হিসাবে দিন দিন ফুলে ফেঁপে উঠছে। সমানতালে লাভজনক হচ্ছে হোটেল ব্যবসায়। হোটেলে 'বার' আছে। বাসু সুটকেসে ওঁর প্রিয় হুইস্কি নিয়েই এসেছেন। 'শিভাস রিগ্যাল' আবার সর্বত্র পাওয়াও যায় না। বেল বয়কে দিয়ে কিছু চিকেন কাবাব আর বরফ আনিয়ে নিয়েছেন। ফোনটা তুলে নিয়ে কলকাতায় বাড়িতে এস. টি. ডি. করলেন। ধরল কৌশিক। জানতে চাইল, শিলিগুড়ির হোটেল থেকে বলছেন তো?

বাসু বললেন, হুঁ। সুজাতা কি এখনো হোটেলে?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। 315 নম্বর ঘরটা সে কুম্ভের মতো রক্ষা করছে।

— কুম্ভ? কোন কুম্ভ? অ্যাকুইরাস?

— আজ্ঞে না। কুম্ভরাশি নয়। 'একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদিগড়।' আমি গেছিলাম। বেল বাজালাম। নো সাড়াশব্দ। টেলিফোন করলাম — নো সাড়াশব্দ। রুদ্ধদ্বার কক্ষে সে নির্বিকল্পে দিব্যি আছে।

— আর তোমার গৃহিণী এ নাটকে যে চরিত্রটা অভিনয় করছে তার খবর কিছু জান?

— সে কী! সে খবর তো আপনিই আমাদের জানাবেন।

— না। জানাতে পারছি না। ঐ ফ্লাইটে ও আসেনি। টিকিটও কালেক্ট করেনি। প্রথম দিনই ও বলেছিল নিরুদ্দেশ হতে চায়। এতদিনে সে সফলকাম হয়েছে মনে হচ্ছে। সে কোথায় জানি না।

— কাল সকালে ওখানকার একটা অফিসে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। সেটা রাখছেন তো?

— হ্যাঁ, এলামই যখন তখন অফিসটা একনজর দেখে যাই। হাসপাতালেও একবার যাব। তারপর বিকাল পাঁচটা পঁচিশের ফ্লাইট ধরে ফিরে যাব। তুমি গাড়িটা নিয়ে দমদম এয়ারপোর্টে এস।

— ঠিক আছে। লাইনটা একটু ধরুন। মামিমা কী যেন কথা বলবেন।

— তিনি আবার কী বলবেন?

একটু পরেই রানী দেবীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল টেলিফোনে, তুমি বোতলটা বার করে ফেলে রেখে গেলে কেন? তুমি চলে যাবার পর দেখি শ্যিভাস-রিগালের বোতলটা স্যুটকেস থেকে বার করে ...

বাসু কথার মাঝপথেই বলে ওঠেন, নাঃ! ভাবলাম বিদেশ-বিভুঁয়ে একরাত না হয় নাই খেলাম! এক-আধ দিন বাদ দিলে অভ্যাসটা ...

ধমক দিয়ে ওঠেন রানী, ন্যাকামী কর না! সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। আমি মেপে দুই পেগ বোতলে ভরে রেখেছিলাম বলে ওটা নামিয়ে রেখে গেছ, এটুকু বুঝবার মতো বুদ্ধি তোমার রানুর আছে। শোন, কলকাতা থেকে উড়বার আগেই কোন খানদানি লিকার শপ থেকে নতুন যে বোতলটা কিনেছ তা থেকে তিন পেগের বেশি খেও না যেন!

বাসু হতাশ হয়ে বলেন, বাড়িশুদ্ধ সবাই যদি গোয়েন্দা হয়ে ওঠে ...

কথাটা শেষ হল না। তার আগেই রানু লাইনটা কেটে দিলেন।

পরদিন সকাল সাড়ে দশটায় একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলেন অফিস কমপ্লেক্সে। ঠিকানা খুঁজে বার করতে অসুবিধা হল না। এটাও বেশ বড় অফিস বাড়ি। — 'সেবক মার্কেন্টাইল বিল্ডিং কমপ্লেক্স'। বড় সাইন বোর্ডে জৈন কিউরিও শপের বিজ্ঞপ্তি। সামনে প্লেট-গ্লাসের ডিসপ্লে উইন্ডো। তার সামনে রোলিং শাটার্স। পাশে বন্দুকধারী পাহারা। ডিস্প্লে উইন্ডোতে নানান জাতের কিউরিও। হাতির দাঁতের কাজ, রূপার উপর ফিলিগ্রি, সিল্ক স্ক্রোল, নানান জাতের পেন্টিং। এদেশী-ওদেশী। হঠাৎ বাসুসাহেবের নজর হল এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে ওঁর মক্কেল চৈতালী সাবধানে বড় রাস্তা পার হচ্ছে। বাসু দু-পা এগিয়ে গেলেন। অফিসের প্রধান প্রবেশদ্বারের থেকে একটু দূরে।

চৈতালী ওঁকে দেখতে পেল। বাসু ভেবেছিলেন প্রচণ্ড একটা ধমক দেবেন। দেওয়া হল না। এক রাত্রে চৈতালী যেন আমূল বদলে গেছে। তাকে চেনাই যায় না। মেরি আঁতোয়ানেতের কর্মবহুল জীবনের শেষ রাত্রিটা যেন ও কাটিয়ে এসেছে। প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই। চুলগুলো ঝড়ে বিধ্বস্ত পাখির বাসা। বাসু ওর দুই বাহুমূল চেপে ধরে বলেন, কী হয়েছে চৈতালী?

— হরি ... হরি ... কাল রাত একটার সময় ...

বাকিটা বলতে পারল না। বৃদ্ধের কাঁধে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল।

বাসু ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, লক্ষ্মীটি, চৈতালী, কাঁদে না। রাস্তার মাঝখানে এভাবে ...

হাত দিয়ে ইঙ্গিত করতেই একটা ট্যাক্সি এগিয়ে এল। লোকটার হাতে একটা বিশটাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললেন, কাছাকাছি কোনও পার্কে নিয়ে চল, সর্দারজী।

পঞ্চাশোর্ধ্ব ট্যাক্সি-ড্রাইভার বিয়োগান্ত নাটকটাতে অভিভূত হয়েছে। নিঃশব্দে ওঁদের দুজনকে নিয়ে এসে দাঁড় করালো একটা ফাঁকা উদ্যানে। বাসু ট্যাক্সিটাকে অপেক্ষা করতে বলে ওকে নিয়ে

নামলেন। বেঞ্চে গিয়ে বসলেন। বললেন, শেষ সময়ে কি তুমি উপস্থিত ছিলে?

চৈতালী ইতিবাচক গ্রীবা সঞ্চালন করলেন।

— ওর জ্ঞান কি ফিরেছিল শেষ পর্যন্ত?

দুদিকে মাথা নেড়ে এবার জানাল : না।

— এখনো কি হাসপাতালে আছে?

এবার রুমালে চোখ মুছে চৈতালী বললে, না। ধ্রুব, সতীশ, নিমাই, মদনলাল — ওরা সবাই ওকে নিয়ে গেছে শ্মশানে। হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়িতে আমাকে যেতে বারণ করল। ধ্রুবই ওর সবচেয়ে প্রাণের বন্ধু ছিল। সেই শ্মশানে ইয়ে করবে ... আমাকে কিছুতেই সঙ্গে নিল না।

— ওরা ঠিকই করেছে। ওরা বোধ হয় হরির বন্ধু ছিল তাই নয়?

— আমারও বন্ধু। আমরা তো যমজ।

— মনটাকে শক্ত কর, চৈতালী। এদিকেও তোমার অনেক কাজ বাকি।

— জানি। সেই জন্যেই তো ছুটে চলে এসেছি। প্লেনটা ধরতে পারলাম না। রাত আটটায় একটা চার্টার্ড প্লেনে এসেছি। একটা টিকিট খামোকা নষ্ট হল। কী আর করা যাবে?

— তা তো বটেই, কিন্তু প্লেনটা তুমি ধরতে পারলে না কেন? যথেষ্ট মার্জিন নিয়ে তো হোটেল থেকে বের হয়েছিলে। আমি যখন হোটেল ছাড়ি তখন বেলা তিনটে দশ। তুমি তো তার আগেই ...

— হ্যাঁ। তার আগেই আমি ... কী জানেন? আমার ক্রমাগত মনে হচ্ছিল কে যেন আমাকে ফলো করছে। তাছাড়া একটা টেলিফোন বুথে গিয়ে আমি এই শিলিগুড়ির হাসপাতালে এস. টি. ডি. করেছিলাম। ওরা বলল ... ওরা জানাল ... হরির অবস্থা ... আমার আর কোন জ্ঞান ছিল না, মামু।

বাসু ওর পিঠে চাপড় মেরে বললেন, লুক হিয়ার, চৈতালী, যা হবার হয়ে গেছে। হরি যে তোমার কতখানি ছিল তা আমি বুঝছি। কিন্তু তোমার বিপদও কাটেনি এখনো। শিলিগুড়ি পুলিশ তোমাকে খুঁজছে ...

— এখন আর আমার কোন ভয় নেই। জেলে যেতে বা ফাঁসি হলে ... তাই তো সোজা অফিসে যাচ্ছিলাম ...

— বোকার মতো কথা বল না, চৈতালী। হরি যে চোর নয়, তুমি যে তহবিল তছরুপ করনি, এটা প্রমাণ না করে তুমি মরেও শান্তি পাবে না। স্বর্গ থেকে তোমার বাবা-মা, মাসিমা এমনকি হরি ...

চৈতালী দুহাতে মুখ ঢাকল।

বাসু বললেন, বাড়ি যাও চৈতালী। দরজা-জানলা বন্ধ করে লম্বা একটা ঘুম দাও। স্লিপিং ট্যাবলেট খেয়ে নিও। ঘণ্টা চার-পাঁচ ঘুমাতে পারলে তোমার শরীর ঠিক হয়ে যাবে। এদিকটা

আমি সামলাচ্ছি, তুমি নিশ্চিন্ত থেক। এস, আগে তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিই।

চৈতালী রাজি হল। ট্যাক্সি করে বাসুসাহেব ওকে পৌঁছে দিলেন ওর বাড়িতে। এস. বি. আই-এর ব্যাঙ্ক ড্রাফট্‌টা ওর কাছ থেকে নিয়ে নিলেন। ঐ ট্যাক্সিতেই ফের ফিরে এলেন অফিসে।

।। নয় ।।

প্লেট-গ্লাসের ডবল-দরজা। ভিতরটা বাতানুকূল করা। পাশেই বিজ্ঞপ্তি : 'রিসেপশন'। একটি মেয়ে বসেছিল — সুমিত্রা গর্গ না ঝরনা তামাং বুঝতে পারলেন না। মেয়েটি যান্ত্রিক হাসি হেসে বললে, মে আই হেল্‌প্‌ য়ু, স্যার?

— জৈন-সাহেব কি দপ্তরে এসেছেন? সিনিয়ার মিস্টার জৈন?

— আজ্ঞে না। তিনি বিজনেস্‌ ট্যুরে বাইরে গেছেন।

— তাহলে আমি মিস্টার মাধবরাজ জৈনজীর সঙ্গে দেখা করব।

— কী নাম জানাব তাঁকে?

— পি. কে. বাসু।

মেয়েটি একটু সচকিত হয়ে ওঠে, এক্সকিউজ মি স্যার, আপনি কাঁটা-সিরিজের ... আই মিন আপনিই কি, ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু?

— হ্যাঁ, পেশায় আমি ব্যারিস্টারই বটে। ক্যালকাটা হাইকোর্টের।

মেয়েটি কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই ভেতরের ঘর থেকে একজন এগিয়ে এসে বললে, বড়বাবু অ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্টারখানা চাইছেন।

মেয়েটি সেটা হস্তান্তরিত করার সঙ্গে সঙ্গে বাসু বলে ওঠেন, তোমার নামটা কী, মা? সুমিত্রা? না ঝরনা?

মেয়েটি অবাক হয়ে যায়। বলে, আপনি কেমন করে ...

বাসু আঙুল তুলে বললেন, মাধবরাজীকে খবরটা জানাও।

— ও ইয়েস, স্যার। ইনডিড।

মেয়েটি ইন্টারকমের দিকে সরে গিয়ে কাকে কী যেন বলল। যন্ত্রটা এমনভাবে বসানো, যাতে কাউন্টারের বাইরে দাঁড়িয়ে বাসু কিছু শুনতে পেলেন না। ওর ওষ্ঠাধরের কম্পনও দেখতে পেলেন না।

একটু পরে হল-কামরার বিপরীতে একটা দরজা খুলে গেল। ইতিমধ্যে আরও দু-চারজন করণিক শ্রেণীর লোক 'হলে' এসেছে। চেয়ারে গিয়ে বসতে শুরু করেছে। ভিতরের দিকে খোলা

boiboi.net

দরজার ও-প্রান্তে এসে যিনি দাঁড়ালেন তিনি নিশ্চয় মাধবরাজজী। দশাসই জোয়ান। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। পাঁচ দশ উচ্চতা। কপালটা চওড়া। সামনের দিকের চুল উঠে যাওয়ায় সেটা আরও প্রকট। দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠাধর। ব্যক্তিত্বময় চেহারা। ওখান থেকেই বললেন, মিস্টার বাসু?

— রাইট।

— আমিই মাধবরাজ জৈন। আমার সঙ্গে কী উদ্দেশ্যে দেখা করতে এসেছেন, মিস্টার বাসু? আই মিন : পার্পাস অব য়োর ভিজিট?

দু'জনের মধ্যে অন্তত দশ ফুটের ব্যবধান।

এপ্রান্ত থেকে বাসু বললেন : চৈতালী বসু।

— তার সম্বন্ধে কী কথা বলতে এসেছেন?

— চৈতালী বসু কি আপনাদের ক্যাশিয়ার?

— হ্যাঁ, কিন্তু সে এ অফিসে নেই। ছুটিতে আছে। ওর ভাইয়ের একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। শিলিগুড়ি সদর হাসপাতালে আছে। চৈতালী সম্ভবত তার ভাইয়ের কাছে আছে। সেখানে গেলে তার দেখা পেতে পারেন। বাট আয়াম নট শ্যিওর।

— আমি তো বলিনি যে, চৈতালীকে আমি খুঁজছি। বলেছি, চৈতালীর বিষয়ে আপনার সঙ্গে জনান্তিকে কিছু কথা বলতে চাই।

— ইজ দ্যাট সো? বলুন?

বাসু অতঃপর উচ্চকণ্ঠে বললেন, অল রাইট। আপনি যদি এখানেই আলোচনাটা এভাবে করতে চান, তাতে আমার তরফে আপত্তি নেই। আদালতে চেঁচিয়ে বক্তৃতা করার অভ্যাস আমার আছে। শুনুন মিস্টার জৈন! চৈতালী বসু, আপনাদের কেশিয়ার, আমার মক্কেল। আমি কলকাতা থেকে ব্যক্তিগতভাবে জানতে এসেছি, আপনারা কেন শিলিগুড়ির পুলিশকে বলেছেন যে, আমার মক্কেল দুই লক্ষ টাকার তহবিল তছরুপ করে নিখোঁজ হয়েছে?

মাধবরাজ দুই হাত সামনে বাড়িয়ে দু-পা এগিয়ে আসেন। বলেন, প্লিজ স্টপ দেয়ার, মিস্টার বাসু! অমন কথা আমরা বলিনি।

— তাহলে 'কেমন কথা' শিলিগুড়ি পুলিশকে বলেছেন? যার ফলে লালবাজার থেকে দুজন পুলিশ হোটেলে এসে প্রকাশ্যে হামলা করে? আমার মক্কেলকে মানহানিকর প্রশ্ন করার সাহস পায়?

— মিস্টার বাসু! প্লিজ। অমন একটা বিষয়ে আলোচনা করার না এটা সময়, না পরিবেশ?

— কেন? সময়টা তো অফিস টাইম! আর পরিবেশটা তো আপনিই বেছে নিলেন। আমার জনান্তিক আলোচনার প্রস্তাবটা অগ্রাহ্য করে। তাই নয়? স্থান-নির্বাচন তো আমি করিনি।

— আয়াম সরি, মিস্টার বাসু। অনুগ্রহ করে আমার ঘরে এসে বসবেন কি?

বাসু মাধবরাজের নির্দেশমতো তাঁর ঘরে ঢুকে ভিজিটার্স চেয়ার দখল করে পাইপ ধরালেন।

মাধবরাজ তাঁর চেয়ারে বসে বললেন, কিছু মনে করবেন না, স্যার। আমার মাথার ঠিক ছিল না। একটু আগে অডিটার আমাকে জানিয়েছেন যে, তহবিলে যে ঘাটতি আছে তার পরিমাণ দুই লক্ষ টাকা।

— আজ্ঞে না। একটু আগে নয়। আপনার মাথা এখনো ঠিক হয়নি। গতকাল দুপুরে ক্যালকাটা পুলিশ জানত যে, ঘাটতির পরিমাণ দুই লক্ষ টাকা।

— হ্যাঁ, তাই বটে। কাল সকালে। ফলে, বুঝতেই পারছেন আমরা কী পরিমাণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি। ক্যাশের চাবি থাকে তিনজনের কাছে। চাচাজী, আমি আর মিস বসু। তা — চাচাজী আজ কদিন শিলিগুড়ির বাইরে, নেপালে। এদিকে মিস বসুকে ছুটি দেওয়া হয়েছে যেহেতু তার ভাই হাসপাতালে মরণাপন্ন। অথচ খোঁজ নিয়ে জানা গেল — মিস বসু শিলিগুড়িতে নেই। এক্ষেত্রে আমরা যদি ব্যস্ত হয়ে ...

— চাবি তো আপনার কাকার কাছেও থাকে। কই? তাঁর পিছনে তো আপনারা পুলিশ লেলিয়ে দেননি।

— মিস্টার বাসু। আমার কাকা এমপ্লয়ি নন। তিনি এ ফার্মের পার্টনার — মালিক।

— তিনি ইচ্ছে করলে কাউকে না বলে ভল্ট থেকে দু-লাখ টাকা বার করে নিয়ে যেতে পারতেন — যেমন আপনিও পারেন — ঠিক কি না?

— ঠিক। কিন্তু ক্যাশ থেকে কোন কারণে তিনি দু-লাখ টাকা বার করে নিলে নিশ্চয় আমাকে বলে যেতেন।

— আপনি নিজে দু-লাখ টাকা বার করে নিলে কাকে বলতেন? কাকাকে না ক্যাশিয়ারকে।

— সম্ভবত দু-জনকেই।

— সম্ভবত! অর্থাৎ রিয়্যাল এমার্জেন্সি থাকলে ...

বাধা দিয়ে মাধবরাজ বলেন, আপনি অহতুক তিলকে তাল করে তুলছেন, মিস্টার বাসু!

— আয়াম সরি স্যার। আপনিই বেগতিক দেখে এখন তালকে টিপে-টুপে তিল করে তুলতে চাইছেন। আপনি কেমন করে জানলেন যে, আপনার কেশিয়ার ছুটিতে থাকা কালে কোলকাতার কোন্ হোটেলে উঠেছে, কী নামে উঠেছে?

— এক্সকিউজ মি, স্যার। সেটা কোম্পানির গোপন ব্যাপার। এ নিয়ে আপনার সঙ্গে আমি আলোচনা করতে পারি না।

বাসু বললেন, অল রাইট! আলোচনা করবেন না। আমি শুধু ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের জানাতে এসেছিলাম যে, মিস চৈতালী বসু আমার মক্কেল। আমরা মনে করি, আপনারা লালবাজারে অভিযোগ করে বলতে চেয়েছেন আমার মক্কেল দু-লাখ টাকা তহবিল তছরুপ করেছে। এটা মর্যাদাহানিকর অভিযোগ। মানহানিকর। আমরা যথারীতি লীগ্যাল অ্যাকশন নেব। এই আমার কার্ড, মিস্টার জৈন। আপনি বা আপনার কোম্পানি যদি আমার মক্কেলের সঙ্গে ঐ

ক্যাশ-তহবিল সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে তা আমার মাধ্যমে করতে হবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?

— আপনি কি বলতে চান যে, মিস বোস এ-চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন?

— সে কথা তো আমি বলিনি। আমি বলেছি, আপনাদের ক্যাশের ঘাটতি বিষয়ে কোনও প্রশ্ন বা আলোচনা যদি আপনারা আমার মক্কেলের সঙ্গে করতে চান তাহলে তা আমার মাধ্যমে করতে হবে।

— প্লিজ মিঃ বাসু! আপনি ব্যাপারটা ওভাবে নেবেন না। পুলিশ যদি হোটেলে কোনও মানহানিকর কথা বলে থাকে, সে তাদের দায়িত্ব। আমরা শুধু খোঁজ নিতে বলেছিলাম। মিস বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে যে, ঐ দুইলক্ষ টাকার ঘাটতি বিষয়ে তিনি কিছু জানেন কি না।

— ক্যাশে আপনাদের দুইলাখ টাকা নগদে থাকে কেন? শিলিগুড়িতে ভাল ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্ক নেই?

— আমাদের ব্যবসায়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নগদ টাকায় কেনাবেচা হয়। চেক বা ব্যাঙ্কড্রাফ্‌ট্ চলে না।

— যাতে কেনাবেচার কোনও প্রমাণ না থাকে? যে বেচছে সে বোধকরি স্ট্যাম্পড্ রসিদও দেয় না। তাই না?

— না, না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। আমরা, মানে ... নগদে কেনাবেচাটা পছন্দ করি। তারপর লেনদেনটা সম্পূর্ণ হলে ... পরে সময় সুযোগমতো খাতাপত্রে ... বুঝেছেন না?

— আজ্ঞে না। আদৌ বুঝছি না। ইনকাম ট্যাক্স বা ওয়েল্‌থ্ ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া ছাড়া এর আর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

— আরে না, না। এটা অন্য ব্যাপার। অনেক দেশ থেকে দুষ্প্রাপ্য মূর্তি, ছবি, ইত্যাদি আসে তো। সে সব দেশে হয়তো সীমান্তের ওপারে এ সব মালপত্র নিয়ে যাওয়াই নিষিদ্ধ ...

— তার মানে স্মাগ্‌ল্‌ড্ গুড্‌স? অথবা চোরাই মাল?

— কী আশ্চর্য। তা কেন হবে? আমরা রাম-শ্যাম-যদুর কাছে এসব দুষ্প্রাপ্য কিউরিও কিনি না বা বেচি না। জেনুইন ডিলার। জেনুইন খদ্দের।

— জেনুইন ডিলার চেকে লেনদেন করতে রাজি নন! কেন?

— তাই তো বোঝালাম এতক্ষণ। আপনি না বুঝলে আমি নাচার।

— ন্যাচারালি। কিন্তু বিচারকও আমার মতো বোকা হলে আপনি 'নাচার' বলে পার পাবেন না মিস্টার জৈন — বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা আপনাকে দিতে হবে: কী কারণে আপনাদের ক্যাশে দু-পাঁচ লাখ টাকা সবসময় নগদে রাখত হয়। কী কারণে চেকে লেনদেন হয় না।

— বিচারক মানে? কোন বিচারক?

— তা তো এখনি বলতে পারছি না। আমরা যখন মানহানির মামলাটা আনব তখন যে বিচারক সেটার বিচার করবেন ...

ঠিক এই সময়েই 'ইন্টারকম' যন্ত্রটা জৈনসাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইল। সুইচ টিপে জৈন বললেন : ইয়েস?

— সরি টু ডিসটার্ব য়ু স্যার! একটা খবর জানাতে বিরক্ত করছি। বড়সাহেব নেপাল থেকে ফিরে এসেছেন। এইমাত্র অফিসে এলেন।

— ও! আচ্ছা, তাঁকে বল, আমার ঘরে একবার পদধূলি দিতে। তাঁকে আরও বোলো যে, ক্যালকাটা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার মিস্টার পি. কে. বাসু আমার ঘরে বসে আছেন — ঐ তহবিলের ঘাটতির ব্যাপারে। আমাদের লিগ্যাল অ্যাডভাইসার মিস্টার শ্রীবাস্তবকে টেলিফোনে পাও কি না দেখ। তাঁকে পেলে আমাকে লাইনটা দিও।

বাসু বললেন, আমিও তাই চাইছি। আপনাদের আইন সংক্রান্ত পরামর্শদাতার সঙ্গেই ঐ মানহানি-মামলাটার বিষয়ে ....

— না, না না! সে জন্য নয়। ... এই যে আমার চাচাজী এসে, গেছেন ।

।। দশ ।।

বাসুসাহেব এপাশে ফিরে দেখলেন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন প্রায় বৃদ্ধ একজন প্রৌঢ় সুপুরুষ। দেখতে পঞ্চাশের নিচে বলেই মনে হয়। নিখুঁত সাজপোশাক। মুখে মিষ্টি হাসি। মিস্টিক হাসিও বটে। যুক্তকরে বললেন, কী সৌভাগ্য আমাদের! আপনি সশরীরে আমাদের অফিসে! কী জানেন বাসুসাহেব? গোয়েন্দা গল্প আমার প্যাশন। ফাদার ব্রাউন বা এডগার এলেন পো থেকে শুরু করে স্ট্যানলি গার্ডনার সব আমার মুখস্থ। বাংলা এবং ইংরেজি। ব্যোমকেশের মহাপ্রয়াণের পর ...

কথার মাঝখানেই মাধবরাজ বলে ওঠেন, আপনি এই চেয়ারটায় বসুন চাচাজী। মিস্টার বাসু এসেছেন আমাদের তহবিল তছরুপ ...

— তছরুপ নয়, মাধব, ঘাটতি। তা সুকৌশলী দম্পতিকে সঙ্গে নিয়ে এলেন না কেন? আদালতের বাইরে ওরাই তো আপনার যাবতীয় ডিটেক্‌টিভগিরি করে ...

আবার কথার মাঝখানেই বাধা দেয় মাধবরাজ। বলে, আপনি ভুল করছেন, চাচাজী। কোম্পানি ওঁকে এনগেজ করেনি। উনি এসেছেন নিজে থেকে। ওঁর মক্কেল চৈতালী বসুর তরফে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে। আপনার মনে আছে নিশ্চয়, দিন পাঁচেক আগে — যেদিন রাত্রে আপনি কাঠমাণ্ডু যান — সেদিন থেকে মিস বসু ছুটিতে আছে ...

— হ্যাঁ, মনে থাকবে না কেন? সেদিন বিকালেই তো ওর ভাই হরিমোহন মোটর কারে ধাক্কা খায়। সে কেমন আছে এখন?

মাধব জবাব দেয়, একই রকম। এখনো জ্ঞান হয়নি —

এতক্ষণে বাসু যোগদান করেন কথোপকথনে : ওটা পুরানো খবর। আপনাদের স্টাফ হরিমোহন বসু গতকাল রাত একটার সময় মারা গেছে।

খুড়ো-ভাইপোর দৃষ্টি বিনিময় হল। মাধবরাজ বললে, কী দুঃখের কথা।

খুড়ো বললেন, আমাদের অফিস থেকে কেউ যায়নি? অফিস কি জানে না? চৈতালী বেচারি একা কী করবে? আই মিন, সৎকারের ব্যবস্থা। মাধব তুমি এক্ষুনি একটা গাড়িতে তিন-চারজনকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও। ক্যাশ থেকে কিছু টাকাও। চৈতালী বোধহয় একেবারে ভেঙে পড়েছে। ঝরনা অথবা সুমিত্রাকেও পাঠিয়ে দাও। ওদের তো আর কেউ নেই এখানে।

মাধব বললে, আমি দেখছি। মানে, সৎকারের ব্যবস্থাটা। তবে ... ইয়ে, চৈতালীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা বৃথা। সে শিলিগুড়িতে নেই ...

বাসু নির্বিকারভাবে বলে ওঠেন, ওটাও পুরানো খবর। হরিমোহনের মৃত্যুর সময় চৈতালী তার শয্যার পাশে ছিল। তারপর হরিমোহনের বন্ধুরা হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়িতে ওর মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করে। এতক্ষণে বোধহয় শ্মশানযাত্রীরা ফিরেও এসেছে। আর চৈতালীকে আমি নিজে তার বাসায় পৌঁছে দিয়ে এসেছি। সে 'হেভি-সিডেশনে' আছে। অনেকগুলো ঘুমের বড়ি খাইয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আমি আপনাদের অফিসে এসেছি। তাকে ঘণ্টা চার-পাঁচ ঘুমাতে দিন।

সিনিয়ার জৈন বললেন, অফ কোর্স। আমি দিন চার-পাঁচ অনুপস্থিত ছিলাম। ইতিমধ্যে অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে দেখছি। তোমার কেন মনে হল, মাধব, যে চৈতালী শিলিগুড়িতে নেই?

— কাল দুপুরেও সে ছিল না। অন্তত কলকাতার লালবাজারের পুলিশ বলছে কাল দুপুরে সে ছিল রিপন স্ট্রিটের এক হোটেলে। ছদ্মনামে।

— ছদ্মনামে? চৈতালী। কেন? আর পুলিশে সে কথা বলবে কেন?

— সে কথা মিস্টার বাসু বলতে পারবেন? আপনি নেপাল রওনা হওয়ার পরেই আমি ক্যাশ থেকে টাকা তুলতে গিয়ে দেখি ক্যাশে কিছু নেই। তারপরেই আমি একটা কুইক-অডিটের ব্যবস্থা করি। ইতিমধ্যে আপনি কাঠমাণ্ডু চলে গেছেন। অডিটার হিসাব করে বলল, রাফ্‌লি স্পিকিং, দু-লক্ষ টাকার ঘাটতি। বুঝতেই পারছেন আমার অবস্থা। আপনি নেই, কেশিয়ার ছুটিতে। ক্যাশের চাবি শুধু আমার কাছে। আর এদিকে দু-লাখ টাকার ঘাটতি।

— তাই তুমি সবার আগে পুলিশে খবর দিলে?

মাধবরাজ চুপ করে রইল। সিনিয়ার জৈন আবার বললেন, তুমি তো জান মাধব, কী ভাবে আমাদের কেনাবেচা হয়। আমরা যখন-তখন ক্যাশ থেকে টাকা বার করি — কখনো স্লিপ রেখে, কখনো শুধু পার্সোনাল ডায়েরিতে লিখে —

মাধবরাজ বাধা দিয়ে বলে ওঠে, কিন্তু সেভাবে টাকা তোলেন আপনি আর আমি, আপনি নেই, আমি তুলিনি — ফলে দু-লাখ টাকা ঘাটতি ...

— কিন্তু পুলিশে খবর দেবার আগে তোমার কেন মনে হল না, যাবার আগে আমিই দু-লাখ টাকা নিয়ে যেতে পারি?

মাধবরাজ নির্বাক তাকিয়ে রইল।

বিজয়রাজজী বললেন, ইন ফ্যাক্ট, আমি সত্যিই এক লাখ টাকা ক্যাশে নিয়ে কাঠমাণ্ডু গিয়েছিলাম। একটা দশম শতাব্দীর জম্ভল-মূর্তির সন্ধান পেয়ে। বজ্রযান আর জৈন বুদ্ধিজম্ আর্টের একটা বিচিত্র মিশ্রণ। লোকটা বেচতে রাজি হল না। এইমাত্র টাকাটা ক্যাশে রেখে দিয়ে তোমার ঘরে এলাম।

মাধবরাজের একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। বলল, তাহলে দু-লাখ নয়। একলাখ টাকা তছরুপ হয়েছে।

বিজয়রাজ ধমকে ওঠেন, আবার বলছ 'তছরুপ'। বল 'ঘাটতি'। ভাল করে হিসাব মেলাও, দেখ, হয়তো সবই ঠিক আছে।

বাসু বুঝতে পারেন পুলিশে খবর দেওয়াটায় সিনিয়ার পার্টনার আদৌ খুশি হতে পারেননি। হয়তো তছরুপ হলেও উনি তা চেপে যেতে চান। তার হেতু একটাই — ওঁদের ব্যবসায়ে এমন সব কাজ-কারবার হয় যার পুলিশি তদন্ত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

বিজয়রাজ ভাইপোর কাছে জানতে চান, তাছাড়া তুমি কেমন করে জানতে পারলে যে, মিস বোস কলকাতায় কোন হোটেলে একটা ছদ্মনামে উঠেছে?

মাধবরাজ ইতস্তত করতে থাকে। বিজয় তাকে তাগাদা দেন, না মাধব, মিস্টার বাসুর কাছ থেকে আমাদের লুকোবার কিছু নেই। সত্যিই যদি দেখা যায় যে, তহবিল থেকে একলাখ টাকার ঘাটতি হয়েছে; তা হলে আমরা সবার আগে পুলিশে যাব না। কেন যেতে পারি না তা তুমি জানো। আবার লাখটাকার ঘাটতি চোখ বুজে মেনেও নিতে পারব না। আমি স্থির করেছিলাম সেক্ষেত্রে 'সুকৌশলী'-কে কাজের দায়িত্বটা দেব। ফলে বাসুসাহেবের কাছে আমাদের লুকোবার মতো কোন তাস নেই।

মাধবরাজ বললে, আমি খবর পেলাম মিস্ বসু ওঁর ভায়ের কাছে কিছুক্ষণ ছিলেন। তারপর ওকে এমার্জেন্সি ওয়ার্ড থেকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে সরিয়ে নেবার পর চৈতালী দেবী বাড়ি চলে যান।

— ন্যাচারালি। রাত্রে ওর মতো একটি কুমারী মেয়ে ওখানে থাকবে কোথায়? হাসপাতালের খোলা বারান্দায়?

— এবং তারপর থেকে মিস্ চৈতালী বসু আর একবারও হাসপাতালে আসেননি। তহবিলে দু-লাখ টাকা ঘাটতি পড়ায় আমি গোপনে খোঁজ নিতে থাকি। জানা গেল, চৈতালী দেবী শিলিগুড়িতে নেই। আমার মনে হল মিস বোস যেখানেই যান না কেন, ভাইয়ের খোঁজ তাঁকে

নিতে হবে। ওদের ভাই-বোনে খুব হৃদ্যতা। তাই হাসপাতালে খোঁজ নিলাম। জানা গেল, কোলকাতার একটা বিশেষ নম্বর থেকে হরিমোহনের বিষয়ে বার বার খোঁজ-খবর করা হচ্ছে। এখানকার সদর থানার একজন ইন্সপেক্টর আমার বন্ধুস্থানীয়। তার মাধ্যমে জানা গেল নম্বরটা কলকাতার রিপন স্ট্রিটের একটা হোটেলের। ফোনগুলো 315 নম্বর ঘরের বোর্ডার করেছেন। সেই বোর্ডারের দৈহিক বর্ণনা হুবহু চৈতালী বসুর মতো; কিন্তু তাঁর নাম নাকি চিত্রলেখা ব্যানার্জি। ... আজ মিস্টার পি. কে. বাসু এসে বলছেন যে, লালবাজার থেকে দুজন পুলিশ এসে হোটেলে তত্ত্বতালাস নিয়েছে — মানে চৈতালী বসু আর চিত্রলেখা ব্যানার্জি একই ব্যক্তি কিনা। তারা কী সিদ্ধান্তে এসেছে তা আমি এখনো জানি না। উনি হয়তো বলতে পারবেন ...

বিজয়রাজ নিঃশব্দে সবটা শুনে বাসুর দিকে ফিরে বললেন, চৈতালী বসু আপনার মক্কেল, ফলে আপনাকে একই ব্যাপারে আমরা এনগেজ করতে পারি না। আর আমি এও জানি, বর্তমান পরিস্থিতিতে 'সুকৌশলী' ডিটেকটিভ এজেন্সি এ তদন্তের ভার নেবে না — নিতে পারে না। আমি শুধু বলব — বিশ্বাস করুন, চৈতালীর মানহানি হয় এমন কোন কাজ আমরা কিছুতেই করব না। চৈতালীকে আমি অত্যন্ত বিশ্বাস করি। অত্যন্ত ভালবাসি। মাত্র পাঁচ বছরে তাকে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক থেকে আমরা চিফ কেশিয়ার করেছি। যে কাণ্ডটা ঘটে গেছে — বিশ্বাস করুন — আমি শিলিগুড়িতে উপস্থিত থাকলে তা ঘটত না। তা সত্ত্বেও যদি আপনি এজন্য মানহানির মামলা আনতে চান, তাহলে আমাদের অনুরোধ — আমার পার্সোনাল রিকোয়েস্ট — হরিমোহনের শ্রাদ্ধের জন্য দশটা দিন সময় দিন। তার পরে ওকাজ করবেন।

বাসু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, থ্যাংক্স্। তাই হবে। তাছাড়া আমার মক্কেল এখনো মামলা করতে রাজি হয়নি। তার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলার সময়ও এটা নয়।

বিজয়রাজও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আপনাকে কোনভাবে আপ্যায়ন করতে পারলাম না এ দুঃখ রইল। আপনি এসেছেন অ্যাগ্রিভ্ড্ পার্টি হিসাবে, তদুপরি আমরা বর্তমানে মোর্নিঙে আছি। আজ আমাদের একজন স্টাফ মারা গেছে। আমরা একটু পরেই অফিস ছুটি দিয়ে দেব। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে আপনাকে যথোচিত মর্যাদায় জৈন-কোম্পানি আপ্যায়ন করবে।

করমর্দন করে বেরিয়ে এলেন বাসু। মাধবরাজ করমর্দন করল না। গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল একপাশে।

হল-কামরা পার হয়ে নির্গমনদ্বারের কাছাকাছি আসতেই কে যেন পিছন থেকে বলে ওঠে: এক্সকিউজ মি, স্যার।

বাসু ঘুরে দাঁড়ালেন। দেখলেন সেই রিসেপশনিস্ট মেয়েটি।

সে বললে, আমার নাম সুমিত্রা। আমাকে যদি কাইন্ডলি একটা অটোগ্রাফ দিয়ে যেতেন।

— ও শ্যিওর। — বুক পকেট থেকে কলমটা বার করে ওর হাত থেকে অটোগ্রাফ খাতাখানা নিলেন। মেয়েটি একটা বিশেষ পাতায় আঙুল দিয়ে রেখেছিল। সেটাই মেলে ধরল। বাসু দেখলেন তার ডানদিকের পাতাটা ফাঁকা; কিন্তু বাঁ দিকের পাতায় গোটা গোটা হরফে পেনসিলে লেখা:

"চৈতালীকে এরা ফাঁসাতে চায়। সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। আপনার শিলিগুড়ি হোটেলের নাম আর রুম নাম্বারটা লিখে দিন। আমি ফোন করে দেখা করব।"

বাসু বাঁ দিকের পাতায় লিখে দিলেন সেবক রোড-এর নূরজাহান হোটেলের নাম আর ঘরের নম্বরটা। ডানদিকের পাতায় দিলেন অটোগ্রাফ।

'থ্যাঙ্কু' বলে মেয়েটি অটোগ্রাফ খাতাখানা তার ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে নিল। বাসু লক্ষ্য করে দেখলেন, অনেকেই ওঁদের দিকে তাকিয়ে আছে।

।। এগারো ।।

বেলা দুটোর সময় টেলিফোন করল মেয়েটি।

— হ্যাঁ, বলো, সুমিত্রা। তুমি কখন আসতে পারবে?

— আপনার অসুবিধা না হলে এখনি। আমাদের অফিসে একটার সময় ছুটি হয়ে গেছে। চৈতালীর অনুপস্থিতিতেই আমরা এক্ষুনি একটা ছোট্ট কনডোলেন্স মিটিং শেষ করলাম।

— তুমি যে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছ সে কথা অফিসের আর কেউ জানে কি?

— আজ্ঞে না।

— ও. কে.। চলে এস। আমি অপেক্ষা করব।

একটু পরেই সুমিত্রা এল নূরজাহান হোটেলে।

বাসু বললেন, কী খাবে বল? আমি তোমার অপেক্ষায় এখনো লাঞ্চ সারিনি।

— ওমা। সে কী কথা। আমি তো সকালে ভাত খেয়ে অফিসে এসেছি।

— এতক্ষণে তা হজম হয়ে গেছে। বস, অর্ডার দিই।

বাসু খাবারের অর্ডার দিলেন। ঘরেই। খেতে খেতে কথাবার্তা হতে থাকে। সুমিত্রার বিশ্বাস : দুই পার্টনারের অগোচরে একটা তৃতীয় পাপচক্র অফিসে কাজ করছে। তারাই তহবিল থেকে এক লাখ টাকা সরিয়েছে। চৈতালী বেচারি মাঝখান থেকে ফেঁসে গেছে। চৈতালী টাকা সরিয়েছে এটা ওরা কেউই বিশ্বাস করে না। তবে মরণাপন্ন ভাইকে হাসপাতালে ফেলে রেখে তার রাতারাতি কলকাতা চলে যাওয়ার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণও ওরা কেউ খুঁজে পাচ্ছে না। সে সত্যিই কোনও হোটেলে ছদ্মনামে উঠেছিল কি না তা সুমিত্রা জানে না। অফিসের কেউ তা বিশ্বাস করে না।

বাসু ফিশ-ফিঙ্গারের প্লেটটা ওর দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, কিন্তু চৈতালী না নিলে ক্যাশ থেকে একলাখ টাকা কে সরালো? মাধবরাজ? যেহেতু বিজয়রাজ অনুপস্থিত?

সুমিত্রা লাইম-উইথ-জিন-এ একটা চুমুক দিয়ে এক পিস ফিশ-ফিঙ্গার তার ম্যানিকিওর করা

আঙুলে তুলে নিয়ে বললে, দেখুন স্যার, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না মাধবরাজজী একলাখ টাকা সরিয়েছেন। কেন সরাবেন বলুন? টাকা তো তাঁরই। বিজয়রাজ বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান। দু'দিন পরেই তো মাধবই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়ে পড়বেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর স্ত্রী নেপাল রাজপরিবারের মেয়ে। বাপের একমাত্র সন্তান। সেই সূত্রেও হয়তো কোটি টাকা আসবে ওঁর হাতে। উনি কেন মাত্র একলাখ টাকা সরিয়ে ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ করবেন?

বাসু বললেন, ঠিক কথা। যুক্তিসঙ্গত কথা। কিন্তু তোমার মতে চৈতালী চুরি করেনি, করতে পারে না। বিজয়রাজ অনুপস্থিত। তিনি যাবার সময় বেহিসাবী এক লাখ টাকা নিয়ে গেছিলেন, ফিরে এসে জমা দিয়েছেন। তাহলে বাকি এক লাখ টাকা ভল্ট থেকে উড়ে গেল কীভাবে? যুক্তিসঙ্গত কারণ তো কিছু দেখাবে?

— দেখাব। শুনুন। মাধবরাজের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর ঝগড়া-ঝাঁটি লেগেই থাকে। শুনেছি, মাঝে মাঝে হাতাহাতি পর্যন্ত হয়। কোন কোন দিন মাধবরাজ সন্ধ্যার পর থেকে প্রচুর মদ্যপান করেন। বেহুঁশ হয়ে গেলে ওঁর দুজন খানসামা ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দেয়। দু-একবার এমনও হয়েছে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে উনি হোটেলে গিয়ে রাত কাটিয়েছেন। সেই সব সুযোগে — যখন মাধবরাজ বেহুঁশ তখন তাঁর খানসামা বা ড্রাইভার অনায়াসে ওঁর চাবির গোছা থেকে ক্যাশভল্ট চাবির মোমের ছাপ তুলে নিয়ে থাকতে পারে ...

— পারে। কিন্তু কম্বিনেশন নম্বরটা?

— ওটা আমরা বুঝতে পারিনি।

— এই কোড-নাম্বারটা কখনো শুনেছ : 3,62,436

— হ্যাঁ শুনেছি। এটা কোন একজন এজেন্টের কোড নম্বর।

— এজেন্ট। কিসের এজেন্ট?

— এখানে যেসব কেনাবেচা হয় তা, সবসময় সরলপথে আসে না। কিছু স্মাগ্‌ল্‌ড, কিছু চোরাই মালও হাত ফিরি হয়। যারা করে, তাদের নাম-ধাম খাতাপত্রে থাকে না। মালিকরা জানেন। তাঁদের চিঠিপত্র আসে 'কনফিডেন্সিয়াল' ছাপ মারা, গালা-মোহর-করা খামে। স্পিড পোস্টে, রেজিস্ট্রি ডাকে অথবা কুরিয়ার সার্ভিসে। সেসব খাম আমরা খুলতে পারি না। ডাকে তার কোনও এন্ট্রিও হয় না। যথাপ্রাপ্তি মাধবরাজের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি কিছু নিজেই ডিসপোজ করেন, কিছু হাতে হাতে দিয়ে আসেন বড়সাহেবকে। এ রকম অনেক কোড নাম্বার লেখা সিল্‌ড্ খামের চিঠি আমরা পাই। তার ভিতর ঐ বিশেষ নম্বরের চিঠিও আসে। টাইপ-করা ঠিকানা, কোণে টাইপ করা 3,62,436।

বাসু বললেন, তোমার স্মরণশক্তি তো ভাল।

দেড়পেগ জিনের আমেজ নিয়ে মেয়েটি হাসল। বলল, আপনি নাম করা ডিটেকটিভ; কিন্তু ঐ বিরাট নম্বরটার বিশাল তাৎপর্যটা ধরতে পারেননি। ওটা তিন লাখ বাষট্টি হাজার চারশ ছত্রিশ নয় স্যার ......

— তবে?

— বলতে একটু সঙ্কোচ হচ্ছে।

— সঙ্কোচ কিসের সুমিত্রা? তোমার নিজের ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স নয় যখন, তখন তো এটা একটা অ্যাকাডেমিক ডিসকাশন। তোমাদের অফিসে যে কয়জন মহিলা কর্মী আছেন তাঁদের মধ্যে কারও মাপের সঙ্গে ওটা মেলে? ঐ 36-24-36?

সুমিত্রা অবাক হল, অপ্রস্তুত হল। জিনের গ্লাসটা নাড়াচাড়া করতে করতে আড়চোখে ঐ নির্বিকার বৃদ্ধকে একনজর দেখে নিয়ে বললে, না, এমপ্লয়ি নয়, এজেন্ট। মহিলা এজেন্ট একজন।

— আই সি! তা রঞ্জনা থাপার কোন ফটোগ্রাফ আছে তোমার অ্যালবামে? বার্থডে পার্টি বা গ্রুপ ফটো?

সুমিত্রা আর এক চুমুক পান করতে যাচ্ছিল। একথায় একটু সচকিত হয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বললে, ফটো দেখার দরকার হবে না, স্যার। ঠিকই ধরেছেন ... কীভাবে আন্দাজ করলেন জানি না। তবে রঞ্জনার মাপ ঐ রকমই বটে।

বাসু মুখ নিচু করে চিকেন কাবাব চিবোতে ব্যস্ত। চোখে চোখে না তাকিয়ে নির্বিকারভাবে বললেন, ছিল। এখন নয়। তাই নয়?

— কী?

— রঞ্জনার ভাইটাল স্ট্যাটিস্‌টিক্স। ও তো গল-ব্লাডার অপারেশন করাতে ছুটি নেয়নি। তাই মাঝের চব্বিশটা এখন আর ...... তাই নয়?

সুমিত্রা রীতিমতো চমকে ওঠে। বলে, কী আশ্চর্য! আপনি তাও জানেন? কিন্তু আমি যদ্দুর জানি। আপনার মক্কেল তো জানে না।

— চৈতালী জানে কি না জানি না। সে আমাকে এ বিষয়ে কিছু বলেনি। আমার মনে একটা সম্ভাবনা জেগেছিল মাত্র। তোমার স্বীকৃতিতে এখন জানলাম। ফলে তোমার স্বীকৃতি মোতাবেক, আমরা তিনজন খবরটা জানি — তুমি, আমি আর রঞ্জনা নিজে। অফিসে আর কেউ জানে?

সুমিত্রা একেবারে অন্য একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করল, আমি আর একটা জিন নেব স্যার ...

— শ্যিওর! — বাসু কলবেল বাজালেন। বেল বয় দরজার ও পাশেই অপেক্ষা করছিল। ইতিপূর্বেই ভাল টিপস্‌ পেয়েছে। হুকুমমাত্র সে এক প্লেট চিজ-ফিশ-ফিঙ্গার আর জিন-লাইম নিয়ে এল।

বাসু ইতিমধ্যে ন্যাপকিনে মুখ মুছে একটা ড্রাই মার্টিনি তুলে নিয়েছেন হাতে। বললেন, আমার প্রশ্নটা মুলতবি আছে, সুমিত্রা। আর কে জানে? তোমার কর্তা?

— না। সে জানে না। অফিসের সিক্রেট আমরা বাড়িতে আলোচনা করি না। ও-ও তার অফিসের কথা বলে না। আমিও বলি না।

— গুড। অফিসের আর কেউ কি জানে?

সুমিত্রা তার গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে বলল, আরও একজন জানত। গতকাল পর্যন্ত। আজ আর সেও জানে না।

ভ্রুকুঞ্চন হল বাসুর। বললেন, আই সী। কিন্তু সে যে জানত তা তুমি কেমন করে জানলে? সে নিজেই স্বীকার করেছিল, না রঞ্জনা?

সুমিত্রা একটা মাথা ঝাঁকি দিল। যেন জিনের আমেজটা ঝেড়ে ফেলতে চাইল। বলল, কী দরকার স্যার, এসব অপ্রিয় আলোচনায়? এর সঙ্গে তহবিল তছরুপের তো কোনও সম্পর্ক নেই ......

বাসু বললেন, আছে কি নেই তা তুমি জান না। তবে সে ছেলেটার সব আনন্দ-বেদনার অবসান হয়ে গেছে। সে এখন নিন্দাস্তুতির ঊর্ধ্বে। রঞ্জনাও বোধহয় তার গল ব্লাডারের স্ফীতি থেকে মুক্তি পেয়েছে। প্রসঙ্গটা আদালতে উঠবে না, কিন্তু আমার জানা দরকার। বল সুমিত্রা, রঞ্জনার অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের জন্য যে হরিমোহনই দায়ী এ কথা তোমাকে কে বলেছিল? রঞ্জনা না হরিমোহন?

— না রঞ্জনা নয়, হরিমোহনও নয়। নিতান্ত ঘটনাচক্রে। মাধবরাজজীর সঙ্গে হরিমোহন নেপালে যায়। — কিউরিও সংগ্রহে। সপ্তাহখানেক ওঁরা দুজনই ছিলেন রঞ্জনার বাড়িতে। কী করে কী হয়েছে ঠিক জানি না — মাসতিনেক পরে হরি আমার মাধ্যমে আমার এক দিদির সাহায্য চায়।

— তোমার দিদি? কে তিনি?

— শিলিগুড়িরই একজন প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার। গাইনি। দিদি ভেবেছিল ওরা স্বামী-স্ত্রী, রঞ্জনা যে বিধবা তা বুঝতে পারেনি। ওরাও কিছু বলেনি। না হলে হয় তো দিদি আমাকেও বলত না। প্রফেশনাল এথিক্সে। হরি বা রঞ্জনা জানত না যে, আমি জানি। রঞ্জনা এখনো জানে না।

— রঞ্জনা যখন এজেন্ট তখন তাকে ছুটি নিতে হল কেন?

— না, এজেন্ট ছিল। এখন নয়। মাস-ছয়েক আগে ও টেম্পরারি হ্যান্ড হিসাবে জয়েন করেছে। পোস্টিং পোখরায়। ছুটি নিতে হয়েছে যেহেতু সে স্টেশন ছেড়ে কলকাতায় গেছে। অপারেশন করাতে।

— বুঝলাম। চৈতালী তাহলে কিছু জানে না?

— চৈতালী হয়তো কিছুটা আন্দাজ করেছিল। সে ভেবেছিল ওর ভাই কারও প্রেমে পড়েছে, কিন্তু মেয়েটি যে কে তা আন্দাজ করতে পারেনি। আমার একটা বিশেষ অনুরোধ স্যার — এসব প্রসঙ্গ আদালতে যেন না ওঠে। দেখুন, আমি আমার স্বামীকে পর্যন্ত এমন মুখরোচক কথাটা

জানাইনি। হরি তো তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেই গেছে। আর সেই বিধবা মেয়েটাকে ...

— হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ, সুমিত্রা। আমি নিজে থেকে ও প্রসঙ্গ আদালতে আনব না। তাছাড়া কেসটা হয় তো আদালতে যাবেই না। তোমাদের বড়কর্তার হাবভাবে তাই মনে হল।

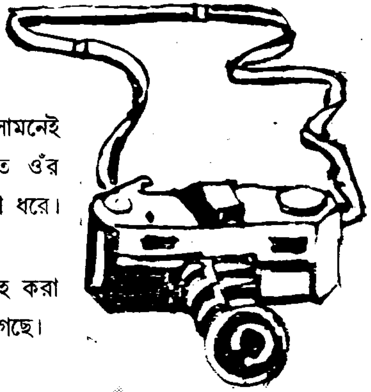

।। বারো ।।

দমদম এয়ারপোর্টে ডোমেস্‌টিক অ্যারাইভাল দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল কৌশিক। রাত তখন নয়টা। ডিকিতে ওঁর সুটকেসটা তুলে দিয়ে কৌশিক রওনা হল নজরুল সরণি ধরে। জিজ্ঞাসা করল, ও দিকে কিছু সুরাহা হল?

— না, সুরাহা কিছু হয়নি। তবে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা গেছে। কিছু দুঃসংবাদও আছে — হরিমোহন কাল মারা গেছে।

— আর চৈতালী?

— হ্যাঁ, তার পাত্তা পাওয়া গেছে। আরও জানা গেছে ঘাটতির পরিমাণ দুই লাখ নয়। এক লাখ। কারণ সিনিয়ার পার্টনার স্বীকার করেছেন কাউকে কিছু না বলে তিনি এক লাখ টাকা ক্যাশ থেকে বার করেছিলেন। ফেরত দিয়েছেন।

— ওমা! এমনও হয় নাকি?

— হয়! ওদের কারবারটা অদ্ভুত। এদিককার খবর কী বল?

— সুজাতার ধারণা সে নজরবন্দি হয়ে আছে। সে ফোন করেছিল নিজে থেকেই। একবার দুপুরে ট্যাক্সি নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরেছিল। ওর মনে হল কেউ ওকে ক্রমাগত অনুসরণ করে চলেছে একটা জিপে চেপে।

বাসু বললেন, ঠিক আছে। তুমি সরাসরি হোটেল পান্নায় চল। আমাকে নামিয়ে দিয়ে লিটল রাসেল স্ট্রিটে গিয়ে হীরালাল ঘিসিং-এর সঙ্গে দেখা কর। আমার নাম করে বল, তার রাখী বহিন রঞ্জনা থাপার একটা প্রচণ্ড বিপদের আশঙ্কা করছি আমি। রঞ্জনাকে একটা বিষয়ে সাবধান করা দরকার। রঞ্জনার ঠিকানা অথবা টেলিফোন নাম্বারটা সংগ্রহ করার চেষ্টা কর।

কৌশিক ওঁকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল লিটল রাসেল স্ট্রিটের দিকে। বাসু উঠে এলেন লিফটে করে 315 নম্বর ঘরে। কোড-নক্‌-এর সঙ্কেত জানানোই ছিল। সুজাতা দরজা খুলে দিল।

বাসুকে দেখে নিশ্চিন্ত হল সুজাতা। বলল, আমার এই বিনাশ্রম কারাদণ্ডের মেয়াদ কখন কাটবে?

— এখনই। পুলিশ আর চৈতালীকে খুঁজছে না। সে আছে শিলিগুড়িতে। তুমি গুছিয়ে নাও। চল, চেক-আউট করে আমরা বেরিয়ে যাই।

— আমি চেক-আউট করব চিত্রলেখা ব্যানার্জির পরিচয়ে?

— অফ কোর্স। এ ঘরটা তো চিত্রলেখার নামে বুক করা।

— কিন্তু আমার সই হয়তো মিলবে না।

— ন্যাচারালি। কিন্তু এ তো আর চেক নয়। চিত্রলেখার নামটা লিখে দিলেই হবে। টাকা যখন তুমি নগদে মিটিয়ে দিচ্ছ তখন ওরা সই মেলাবে না। তাছাড়া আমি তো সঙ্গে থাকবই।

ঠিক তখনই কে যেন কড়া হাতে দরজায় করাঘাত করল। বাসু বললেন, ঘরটা তোমার নামে ভাড়া নেওয়া ......

সুজাতা এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল। দুজন শাদা পোশাকের পুলিশ অফিসার প্রবেশ করল ঘরে। সেদিনের সেই দুজন নয়। একজন একটা কার্ড বাড়িয়ে ধরল সুজাতার দিকে। বললে, এটা আপনার? খোয়া গেছিল?

সুজাতা হাত বাড়িয়ে প্লাস্টিক-খাপে মোড়া ছোট্ট কার্ডটা নিল। সুজাতা জবাব দেবার আগেই পুলিশ অফিসারের নজর পড়ল বাসুসাহেবের দিকে। সুজাতাকে জিজ্ঞেস করে, এ ভদ্রলোকটি কে?

সুজাতা বললে, আপনি দুটি প্রশ্ন পর-পর করেছেন। কোনটার জবাব আগে চান? — বলতে বলতেই সে লাইব্রেরি-কার্ডটা বাসুসাহেবের হাতে গুঁজে দেয়। বাসু দেখলেন সেটা হাতে নিয়ে। 'শিলিগুড়ি কেন্দ্রীয় সাধারণ পাঠাগার'-এর মেম্বারশিপ কার্ড। চৈতালী বসুর নামাঙ্কিত।

অফিসারটি বললে, অলরাইট, প্রথমে প্রথম প্রশ্নটার জবাব দিন, এটা আপনার কার্ড? আপনি শিলিগুড়ি সাধারণ পাঠাগারের সভ্য?

বাসু বললেন, অফিসার! এ প্রশ্ন আপনি কেন জিজ্ঞেস করছেন?

অফিসার বাসুসাহেবের মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, আপনি কে মশাই হরিদাস পাল? পুলিশি তদন্তে নাক গলাচ্ছেন?

বাসু বললেন, কারেক্ট! পুলিশি তদন্ত! আপনারা তাহলে শাদা-পোশাকি পুলিশ-পুঙ্গব। তা অপরাধটা কী জাতীয় সে কথা তো বলতে হবে। অর্থাৎ ঐ মেয়েটিকে কোন্ অপরাধে অভিযুক্ত করতে চান ওর জবাব শুনে?

— আপনি কি উকিল?

— আজ্ঞে না, উকিল নই আমি। কিন্তু আপনি তো হবুচন্দ্র লালবাজারের গবুচন্দ্র পুলিশ নন; আপনার তো জানা উচিত প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকারের সীমা।

এতক্ষণে দ্বিতীয় অফিসারটি এগিয়ে আসে। প্রথম অফিসারকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলে, সরি মিস্টার বাসু। আমার সঙ্গী আপনাকে চিনতে পারেনি। ইয়েস, আমরা দুজন হোমিসাইড থেকে আসছি। এ মহিলাটি নিশ্চয় আপনার মক্কেল। আমরা এখনই ওঁকে গ্রেপ্তার করছি না; আমরা কিছু খবর সংগ্রহ করতে এসেছি মাত্র। কথা বলতে বলতেই অফিসারটি তার ইনসাইড পকেট থেকে সনাক্তিকরণ কার্ডটা বার করে বাসুসাহেবকে দেখালো।

বাসু বললেন, ও. কে.! হোমিসাইড! তা খুনটা কে হয়েছে?

প্রথম অফিসার বললে, সেকথা বলতে আমরা বাধ্য নই!

বাসু বললেন, কারেক্ট! সেটা আপনাদের পুলিশি অধিকার। যেমন এই মেয়েটির সাংবিধানিক অধিকার কোনও প্রশ্নের জবাব না দেওয়া। যতক্ষণ আপনারা না জানাচ্ছেন যে কে খুন হয়েছে!

— কেন? ওঁর লিগল কাউন্সেল তো হাজির?

— সে তো আপনারা ধরে নিয়েছেন। উনি বা আমি তো তা বলিনি। আপনারা সহযোগিতা না করলে আমরাও করব না।

দ্বিতীয় অফিসার প্রথমকে ধমক দেন, তুমি চুপ করবে, দত্ত? কথাবার্তা যা বলার তা আমাকে বলতে দাও। ইয়েস স্যার, খুন হয়েছেন হীরালাল ঘিসিং, কাল বিকালে বা সন্ধ্যায় লিটল রাসেল স্ট্রিটে — নিজের অ্যাপার্টমেন্টে। একটি মাত্র বুলেট উন্ড। এবার কি আমরা আমাদের প্রশ্নের জবাবটা পাব? উনি আপনার মক্কেল তো?

বাসু বললেন, হ্যাঁ, ও আমার লোক। তুমি তোমার আইডেন্টিটি কার্ডটা ওঁদের দেখাও, সুজাতা।

সুজাতা হাত বাড়িয়ে তার ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলবার উপক্রম করতেই অফিসারটি ঝাঁপিয়ে পড়ে বাধা দিল। বললে, ধীরে, দিদি, ধীরে। আমি ব্যাগটা এক নজর দেখে নিই প্রথমে।

ব্যাগটা সে খুলল না। তপ্‌সে মাছের পেট টিপে খদ্দের যেমন বুঝে নেয় সেটা 'অ্যান্ডালা' কি না, সেভাবে অফিসারটি সমঝে নিল ব্যাগের ভিতরে পিস্তল আছে কি না। বলল, এবার দেখান।

সুজাতা তার ব্যাগ থেকে সনাক্তিকরণ কার্ডটা বার করে দেখাল। লালবাজারের ছাপ মারা 'সুকৌশলী ডিটেকটিভ এজেন্সির' পার্টনারের আইডেন্টিটি কার্ড।

বাসু বললেন, একটা অপরাধের বিষয়ে তদন্ত করতে আমি সুজাতাকে এই ঘরটিতে লুকিয়ে থাকতে বলেছিলাম চিত্রলেখা ব্যানার্জির ছদ্ম পরিচয়ে ...

— আর চিত্রলেখা ব্যানার্জি হচ্ছে শিলিগুড়ির বাসিন্দা শ্রীমতী চৈতালী বসুর ছদ্মনাম। তাই তো?

— আমি সে কথা বলিনি।

— আপনার বলার অপেক্ষায় আর নেই ও তথ্যটা। এবার বরং বলুন সুকৌশলীর সুজাতাকে কী কারণে এই হোটেলে আপনি ছদ্মনামে লুকিয়ে থাকতে বলেছিলেন?

— নো কমেন্টস!

— শিলিগুড়ির শ্রীমতী চৈতালী বসুও নিশ্চয় আপনার মক্কেল?

— প্রশ্নটা উঠছে কেন? শিলিগুড়ির শ্রীমতী চৈতালী বসুকে কি আপনারা কোন কারণে খুঁজছেন?

— লুক হিয়ার মিস্টার বাসু। পুলিশ যখন তদন্তে আসে তখন প্রশ্ন তারাই করে। জবাব দেয় না। এবার বলুন, চৈতালী বসু কি আপনার মক্কেল?

— নো কমেন্টস।

— অলরাইট, স্যার। শুনে রাখুন: হীরালাল ঘিসিং-এর হত্যাকাণ্ডের জন্য আমরা চৈতালী বসুকে খুঁজছি। আপনাকে জানিয়ে রাখছি — তার পূর্বে আপনি যদি তার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করেন তবে সেটাকে পুলিশের কাজে বাধা দান করা হচ্ছে বলে গণ্য করা হবে।

বাসু কোনও জবাব দিলেন না। ওরা দুজন চলে যেতেই বাসু টেলিফোনটা তুলে নিলেন। বললেন, দিস্ ইজ রুম নম্বর 315, আমাকে শিলিগুড়ির একটা নম্বর দিন এস. টি. ডি.-তে।

— 315 স্যার? ও ঘরটা তো মিস্ ব্যানার্জি বুক করেছেন।

— হ্যাঁ তাই। এই নিন্, মিস্ ব্যানার্জির সঙ্গে কথা বলুন। বাসু রিসিভারটা সুজাতার হাতে দিলেন।

টেলিফোন অপারেটার বললে, সরি ম্যাডাম! পুলিশের অর্ডারে এই ফোন থেকে কোনও আউটস্টেশন কল করা যাবে না। আপনি নিচে নেমে এসে এখন থেকে ফোন করতে পারেন।

সুজাতা বলল, দরকার নেই। সেক্ষেত্রে আমি এখনই চেক-আউট করব। আমার বিলটা রেডি রাখুন।

— ইয়েস মিস ব্যানার্জি!

— মিস ব্যানার্জি নয়। মিস চিত্রলেখা ব্যানার্জি আমাকে টাকা মিটিয়ে দিয়ে অনেক আগেই চলে গেছেন। আমি তাঁর তরফে পেমেন্টটা করছি মাত্র। আমার নাম মিসেস সুজাতা মিত্র। আজ্ঞে হ্যাঁ ... লালবাজারের পুলিশ তা জানে।

টেলিফোন রিসিভারটা নামিয়ে রাখল সুজাতা।

সুজাতাকে বাসু বললেন, লেটস্ গো।

boiRboi.net

।। তের ।।

পরদিন সকালে লালবাজার হোমিসাইড সেকশন থেকে বাসুসাহেব একটি ফোন পেলেন, সরি টু ডিসটার্ব য়ু স্যার, কাল হোটেল পান্নায় যখন জানতে চেয়েছিলুম, মিস চৈতালী বসু আপনার মক্কেল কি না, তখন আপনি বলেছিলেন 'নো কমেন্টস' অথচ আজ লক-আপে ঐ মিস বসুই বলছেন যে, আপনি ওঁর অ্যাটর্নি। আপনার উপস্থিতি ভিন্ন উনি আমাদের কোনও প্রশ্নের জবাব দেবেন না। এখন আমরা কী করি বলুন, স্যার?

বাসু বললেন, 'হোল ট্রুথ অ্যান্ড নাথিং বাট দ্য ট্রুথ' বলা অভ্যাস করুন। কাল যখন আপনি জানতে চেয়েছিলেন চৈতালী আমার মক্কেল কি না তখন

আপনি জানাতে চাননি চার্জটা কী। কী কারণে তাকে খুঁজছেন। আজ গ্রেফতারের পর কি সেটা দয়া করে জানাবেন?

— ইয়েস স্যার। ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার চার্জ। হীরালাল ঘিসিংকে।

— ধন্যবাদ। সে ক্ষেত্রে চৈতালী আমার মক্কেল। আমি আধঘণ্টার ভিতরেই আসছি।

জেল-হাজতের একান্তে আবার দেখা হল মেয়েটির সঙ্গে। কেঁদে কেঁদে এখনো তার চোখ দুটি লাল হয়ে আছে। বাসু জানতে চাইলেন, শিলিগুড়ি থেকে আসবার সময় পুলিশ কি কিছু দুর্ব্যবহার করেছে? এ কী চেহারা হয়েছে তোমার!

চৈতালী মাথা নেড়ে বললে, না। এমনিতেই হরির মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছিলাম। সামলে উঠতে না উঠতে এই হয়রানি। তাতেই হয় তো আমাকে পাগলী-পাগলী দেখাচ্ছে।

— তুমি কি পুলিশের কাছে কোনও জবানবন্দি দিয়েছ?

— না। আপনি তো প্রথম দিনই বারণ করেছিলেন।

— তা করেছিলাম। কিন্তু তুমি তো আমার সব নিষেধ মেনে চল না, চৈতালী। আমি তোমাকে বলেছিলাম হোটেল পান্না থেকে শেয়ালদহ স্টেশনে ট্যাক্সি করে যেতে। সেখানে ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে। তারপর একটা ফ্লাইং ট্যাক্সি ধরে দমদম চলে যেতে। তা তো তুমি যাওনি চৈতালী। তুমি প্রথম সুযোগেই চলে গেলে লিট্‌ল রাসেল স্ট্রিটে। কেন?

চৈতালী জবাব দিল না। গোঁজ হয়ে বসে রইল।

বাসু বললেন, তুমি বুদ্ধিমতী। সব কথা যদি আমাকে খুলে না বল তাহলে আমি কেমন করে তোমার কেস ডিফেন্ড করব, বল? তুমি হীরালালের অ্যাপার্টমেন্টে গেছিলে। না?

চৈতালী স্বীকার করল।

— তুমিই তাকে খুন করেছ?

সোজা হয়ে বসল চৈতালী। বলল, নিশ্চয় নয়!

— তাহলে?

আবার চুপ করে যায়।

বাসু বলেন, অল রাইট। আমি বলছি, তুমি শুনে যাও। যদি ভুল কিছু বলি তুমি প্রতিবাদ কর। ঠিক এক্ষণি যেমন বললে : নিশ্চয় নয়। কেমন?

অশ্রুআর্দ্র দুটি চোখ মেলে চৈতালী তাকিয়ে থাকে।

— তুমি সন্ধ্যার ফ্লাইটটা ধরতে পারনি এজন্য নয় যে, তোমার মনে হয়েছিল কেউ তোমাকে ফলো করছে। আমি হীরালালের নাম-ঠিকানা তোমাকে বলে গেছিলাম। তুমি ভেবেছিলে দমদমে প্লেন ধরার আগে নিজেই একবার হীরালালের সঙ্গে দেখা করবে। তোমার কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকার অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেকটা তখন ছিল। তুমি ভেবেছিলে সেটা দেখিয়ে

ওকে বলবে টাকার অভাব তোমার নেই; তবে ধীরে-ধীরে-মেটাবে। তুমি ওর কাছে কিছু সময় চেয়ে নেবে। তাই নয়?

এবার উপর-নিচ মাথা নেড়ে মেয়েটি স্বীকার করল।

— তাহলে তাই চাইলে না কেন? হীরালাল রাজি হল না?

হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ে চৈতালী।

অনেক সান্ত্বনা দিয়ে, অনেক মিষ্টি কথা বলে ধীরে ধীরে ওর জবানবন্দিটা সংগ্রহ করলেন বাসুসাহেব। হ্যাঁ, সে ভেবেছিল হীরালালকে রাজি করাতে পারবে। হীরালালজীর 'রাখী-বহিন' রঞ্জনা ওর বিশেষ বন্ধু। প্রয়োজন হলে রঞ্জনাকে দিয়ে রাজি করাবে। হরি যখন টাকাটা ওকে দিতেই আসছিল তখন টাকাটা দিয়ে দেওয়াই মঙ্গল, অন্তত কিছু সময় চেয়ে নিয়ে চেষ্টা করতে দোষ কী?

স্কাইলার্ক অ্যাপার্টমেন্ট মস্ত প্রাসাদ। দুদিকে দুটো লিফট্। চৈতালী যখন ওখানে গিয়ে পৌঁছায় তখন বেলা সওয়া তিনটে। এলাকাটা ফাঁকা ফাঁকা। তবে লিফট্‌ম্যান ছিল। চৈতালী নিচের বোর্ডে হীরালাল ঘিসিং-এর অ্যাপার্টমেন্ট নম্বরটা খুঁজছিল। লিফট্‌ম্যান নিজে থেকেই জানতে চাইল, নাম কেয়া? বাধ্য হয়ে ওতে বলতে হল নামটা, লিফট্‌ম্যান বললে, আইয়ে। সাত তলা। তিন নম্বর অ্যাপার্টমেন্ট।

সাততলায় প্যাসেজে নেমে চৈতালী জনমানব দেখতে পেল না। লিফট্‌টা নেমে গেল। ও করিডর দিয়ে একটু এগিয়েই দেখল একটা দরজায় তিন নম্বর লেখা। চৈতালী বার দুই বেল বাজায়। কোন সাড়া জাগে না। তবে হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে ঠেলতেই দরজাটা খুলে গেল। ও ঘরের ভিতরে ঢুকে একবার বলে, 'ভিতরে কে আছেন? শুনছেন?'

ভিতরটা আলো-আঁধারী। পর্দাগুলো টানা। হঠাৎ ওর নজর হয় ঘরের ও প্রান্তে একটা খাটে চিত হয়ে কে যেন শুয়ে আছে। ও কাছে এগিয়ে যেতে গিয়ে দেখল মেঝেটা পিছল। রক্ত! তখনই ও বুঝতে পারল লোকটা চিত হয়ে শুয়ে নেই। মরে গেছে।

বাসু জানতে চাইলেন, তুমি কী করে বুঝলে লোকটা মরে গেছে?

— ওর গায়ে হাত দিয়ে। একেবারে ঠাণ্ডা!

— তারপর?

— আমি পালিয়ে এলাম।

— না, চৈতালী! ঐ সময় তুমি তোমার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলেছিলে। না হলে তোমার ব্যাগ থেকে লাইব্রেরি কার্ডটা ও ঘরে পড়ে থাকত না। কেন খুলেছিলে ব্যাগ?

— ব্যাগ খুলেছিলাম? তা হবে। হয়তো রুমাল বার করতে। কপালের ঘাম মুছতে।

বাসুসাহেব ধমকে ওঠেন, অহেতুক মিছে কথা বল না, চৈতালী। সেই মর্মান্তিক মুহূর্তে কপালের ঘাম মুছবার প্রয়োজন হলে তুমি আঁচল ব্যবহার করতে, রুমাল নয়। বল? কেন খুলেছিলে তোমার হাতব্যাগ?

— কী আশ্চর্য! আমি আদৌ ব্যাগ খুলেছিলাম কি না তা আমার মনেই পড়ছে না।

— তাহলে শিলিগুড়ি-লাইব্রেরির মেম্বারশিপ কার্ডটা ও ঘরে পাওয়া গেল কী করে? ও ঘরে ঐ মর্মান্তিক মুহূর্তে তুমি তোমার হাতব্যাগ খুলতে পার দুটো হেতুর যে কোন একটাতে। হয় রিভলভারটা ব্যাগ থেকে বার করতে, অথবা সেটা ভিতরে ঢোকাতে। বল, কোনটা?

— ওটা ব্যাগে ঢোকাতে।

— দ্যাটস্ বেটার। ওটা মেঝেতে পড়েছিল?

— হ্যাঁ। রক্তের মধ্যে।

— তুমি কী করে চিনতে পারলে যে ওটাই হরির রিভলভারটা?

চৈতালী স্বীকার করল, দেখেই ও চিনতে পেরেছিল। তুলে নিয়ে ও সংলগ্ন বাথরুমে যায়। আলো জ্বেলে নম্বরটা দেখে। বুঝতে পারে এটাই হরির হারানো রিভলভারটা। সেটাকে জলে ধুয়ে নিয়ে ও হাতব্যাগে ভরে ফেলে। ফেরার সময় ও লিফট্ দিয়ে নামে না। সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে নামে। আর কারও সঙ্গে ওর দেখা হয়নি। তারপর ও একটা ট্যাক্সি নিয়ে দমদমের দিকে যায়। মাঝপথে একটা টেলিফোনের বুথ দেখতে পেয়ে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দেয়। শিলিগুড়িতে ফোন করে। ডাক্তার সামন্তের সঙ্গে ওর কথা হয়। সামন্ত নাকি ওকে ধমকের সুরে শিলিগুড়ি ফিরে যেতে বলেন। হরি কেমন আছে জানতে চাওয়ায় রূঢ় স্বরে বলেন, এখনো বেঁচে আছে।

এই প্রথম ওর মনে হল হরি তাহলে বাঁচবে না। হরি যে মারা যেতে পারে এটা — কী জানি কেন — ওর অন্তর থেকে বিশ্বাস হয়নি। যদিও ডাক্তারবাবু বলেছিলেন কেসটা খুবই খারাপ।

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার পর চৈতালী সামনের পার্কের বেঞ্চিতে গিয়ে বসেছিল। কতক্ষণ সেখানে বসে বসে আবোল-তাবোল চিন্তা করেছে তা ওর মনে নেই। ইতিমধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। ওকে পার্কের বেঞ্চিতে ঐভাবে অনেকক্ষণ একা বসে থাকতে দেখে হঠাৎ একজন গুণ্ডামতো লোক ঘনিয়ে এসে বেঞ্চির অপরপ্রান্তে বসে। তখনই সংবিত ফিরে পায় চৈতালী। দেখে, সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা বাজে। তৎক্ষণাৎ ও ট্যাক্সি নিয়ে দমদমে এয়ারপোর্টের দিকে ছোটে; কিন্তু ইন্ডিয়ান-এয়ারলাইন্স কাউন্টারে গিয়ে খবর পায় বাগ্‌ডোগরার প্লেন মিনিট দশেক আগে ছেড়ে গেছে।

চৈতালী দিশেহারা হয়ে ঝর্‌ঝরিয়ে কেঁদে ফেলে, কাউন্টারে তখন লোকজন বিশেষ ছিল না। এয়ারলাইন্স-এর কাউন্টারে বসা মেয়েটি জানতে চায়, ওর কী হয়েছে। কেন এভাবে ভেঙে পড়েছে সে।

চৈতালী তাকে জানায় যে, দুনিয়ায় তার কেউ নেই — একমাত্র আছে এক যমজ ভাই। ও খবর পেয়েছে যে, সেই ভাইটি শিলিগুড়ি হাসপাতালে মরণাপন্ন। মটোর অ্যাকসিডেন্ট কেস। এইমাত্র ডাক্তারবাবুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছে। আজ রাত্তিরটা কাটে কি না কাটে।

কাউন্টারের মেয়েটির করুণা হয়। ওকে অপেক্ষা করতে বলে। বলে, দেখি আপনার জন্যে কী করতে পারি।

চৈতালী বলে, কী আর করবেন! বাগডোগরা যাবার প্লেন তো আবার কালকে পাব।

— জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড সি। কথা দিতে পারছি না, কিন্তু ...

নিতান্তই ভাগ্য। উত্তরবঙ্গে টী-বোর্ড আর টী-প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে কী একটা অধিবেশন হচ্ছে। এজন্য ঐ সংস্থার তরফে একটা ছোট প্লেন চার্টার্ড করা হয়েছে। কাউন্টারের মেয়েটি তা জানত। সেটা রাত আটটায় ছাড়বে। ছোট প্লেন ত্রিশজনের আসন; কিন্তু ওঁরা যাচ্ছেন মাত্র তেইশ জন। ফলে স্থানাভাব হবে না। তবে অনুমতি জোগাড় করতে হবে।

কাউন্টার গার্ল মেয়েটি সত্যিই ভাল। যাঁরা প্লেনটা চার্টার করেছেন তাঁদের বড় কর্তাকে গিয়ে চৈতালীর বিপদের কথা সে জানায়। ইন্ডিয়ান টি বোর্ড-এর বড়কর্তার দয়া হয়। তিনি ওকে তাঁদের প্লেনে তুলে নিতে রাজি হয়ে যান। চৈতালী জানতে চেয়েছিল তাকে ভাড়া বাবদ কী দিতে হবে। জবাবে ওঁরা জানান যে, যেহেতু প্লেনে এখনো পাঁচ-ছয়টি ফাঁকা আসন আছে এবং যেহেতু চৈতালীর জন্য ওঁদের সংস্থাকে বাড়তি কিছু খরচ করতে হচ্ছে না, ফলে ওঁরা চৈতালীর কাছ থেকে কিছুই নেবেন না। চৈতালী ঐ প্লেনেই বাগ্‌ডোগরা চলে আসে। ওঁদের একটি গাড়ি শিলিগুড়ি হাসপাতালের দিকে আসছিল। তাতেই ওঁরা চৈতালীকে লিফ্‌ট্‌ দেন। রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ চৈতালী হাসপাতালে এসে পৌঁছায়। হরিমোহন তখনো বেঁচেছিল, যদিও তার জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান ওর আদৌ হয়নি এই কয়দিনে।

বাসু জানতে চাইলেন, তোমার স্টেটমেন্ট অনুযায়ী যখন তুমি দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছাও তখনো তোমার ভ্যানিটি ব্যাগে ছিল হরিমোহনের রিভলভারটা। সিকিউরিটি চেকিং-এর আগে সেটা নিশ্চয় তুমি সরিয়ে ফেলেছিলে। কোথায়?

— লেডিজ টয়লেটে লিটারবিনে।

জেলখানার মেট্রন এগিয়ে এসে বলল, আপনাদের কথা কি এখনো শেষ হয়নি? সময় কিন্তু হয়ে গেছে, স্যার।

বাসু উঠে দাঁড়ান। বলেন, না, আমাদের কথাবার্তা শেষ হয়ে গেছে।

চৈতালীর দিকে ফিরে বলেন, মনকে শক্ত কর চৈতালী। আমাদের শেষ পর্যন্ত লড়তে হবে!

চৈতালী নতনয়নে নীরব রইল।

।। চৌদ্দ ।।

দায়রা জজ রামেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে সেদিন কৌতূহলী মানুষের ভিড় মন্দ হয়নি। খবরটা মুখরোচকরূপেই সংবাদপত্রে প্রাকশিত হয়েছিল। হীরালাল ঘিসিং-এর হত্যা মামলার বিবরণ।

দায়রা জজ এজলাসে এসে বসলেন। আদালতের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে টেবিলের উপরে রাখা ফাইলটা তুলে নিয়ে বললেন, আজকের প্রথম মামলা হীরালাল ঘিসিং-এর অস্বাভাবিক মৃত্যু

সম্পর্কিত। স্টেট ভার্সেস মিস চৈতালী বসু। প্রতিবাদী জামিন পাননি, এবং আদালতে উপস্থিত আছেন দেখছি। তাঁর তরফে ওকালতনামা দাখিল করেছেন ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু। ইজ দ্য ডিফেন্স রেডি, কাউন্সেলার?

বাসু ডান হাত তুলে গাত্রোত্থানের একটা উদ্যোগ দেখিয়ে বললেন, ইয়েস য়োর অনার।

ওপাশ থেকে এ. পি. পি. শিবেন গুহও উঠে দাঁড়ান। বলেন, প্রসিকিউশনও প্রস্তুত, হুজুর।

জজ-সাহেব বললেন, অল রাইট। আপনি কি কোনও প্রারম্ভিক ভাষণ দিতে চান মিস্টার এ. পি. পি.?

একটি 'বাও' করে অ্যাডভোকেট গুহ বললেন, কেসটি জটিল নয় য়োর অনার। কোনও প্রারম্ভিক ভাষণ নিষ্প্রয়োজন। আদালত অনুমতি করলে আমি সরাসরি প্রথম সাক্ষীকে ডাকতে পারি।

— বেশ, ডাকুন।

বাসুসাহেবের কর্ণমূলে কৌশিক প্রশ্ন করে, বাদীপক্ষ প্রারম্ভিক ভাষণ না দিলে কি প্রতিবাদী পক্ষও দিতে পারেন না।

বাসু বললেন, থামো না বাপু। পরে জিজ্ঞেস কর। এখন শুধু শুনে যাও।

পুলিশপক্ষের প্রথম সাক্ষী স্কাইলার্ক অ্যাপার্টমেন্টের জনৈক লিফ্‌ট্‌ম্যান : হরিকিষণ দোবে। শুক্রবার এগারোই ফেব্রুয়ারি রাত সাতটার সময় সেই প্রথম মৃতদেহ আবিষ্কার করে। এ. পি. পি. কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে সে নিজের পরিচয় দেয় এবং কীভাবে মৃতদেহ আবিষ্কার করে সে কথা বিস্তারিত জানায়। তার জবানবন্দি অনুযায়ী পোস্টাল পিয়ন স্কাইলার্ক অ্যাপার্টমেন্টের ঘরে ঘরে অথবা পৃথক পৃথক লেটার বাক্সে চিঠি ফেলে যায় না। সে কাজটা দুজন লিফটম্যানকে ভাগ করে করতে হয়। পোস্টাল পিয়ন একটা বড় লেটার বাক্সে সব চিঠি ঢেলে দিয়ে যায়। দোবে তালা খুলে সেগুলি ফ্লোর-ওয়াইজ সাজায়। যাঁদের নামে লেটার বাক্স আছে তাঁদের বাক্সে তাঁদের চিঠি ফেলে দেয়। ঘটনার দিন সন্ধ্যার ডাকে সাততলার বাসিন্দা হীরালাল ঘিসিং-এর নামে একটি চিঠি এসেছিল। হীরালাল ঘিসিং-এর কোনও লেটার বক্স নেই। অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানায় তাঁর চিঠিপত্র আসেও কদাচিৎ। এলে, লিফ্‌ট্‌ম্যান ওঁর দরজার তলা দিয়ে চিঠিখানা ভিতরে ঠেলে দেয়। সেদিনও সে তাই করতে গিয়েছিল; কিন্তু ওর নজর হয় সদর দরজাটা বন্ধ নেই। ইঞ্চিখানেক ফাঁক হয়ে আছে। তাই সে বেল বাজায়। দু-তিন বার। কেউ সাড়া দেয় না। তখন সে ঠেলে দরজাটা খোলে। ঘর অন্ধকার। দেওয়ালের বাঁদিকে সুইচ-বোর্ডটা কোথায় তা জানা ছিল দোবেজীর। সে আলোটা জ্বালে। তৎক্ষণাৎ দেখতে পায় বীভৎস দৃশ্যটা।

দোবেজী জানত পাশের অ্যাপার্টমেন্টেই থাকেন একজন ডাক্তারবাবু। ঘটনাচক্রে তিনি বাড়িতে ছিলেন। দোবেজী তাঁকে ডেকে নিয়ে আসে। তিনি হীরালালকে স্পর্শমাত্র করেই বলেন, অনেকক্ষণ মারা গেছেন।

ডাক্তারবাবুর ঘর থেকেই অ্যাপার্টমেন্টের কেয়ারটেকার এবং থানায় টেলিফোন করা হয়। পুলিশ এসে পৌঁছায় আধঘণ্টার মধ্যে।

শিবেন গুহ জিজ্ঞাসা করেন, হীরালাল ঘিসিংকে তুমি জীবিতাবস্থায় শেষ কখন দেখেছ?

— ওহি রোজ। সুবে করিব সাড়ে নও বাজে হজৌর। যব উন্‌হোনে দফতর গ্যয়ে —

— তারপর তিনি কখন ফিরে আসেন তা জান না? দেখনি?

— জী নহি।

শিবেন প্রশ্ন করেন, আসামীকে সাক্ষী পূর্বে কখনো দেখেছে কি না।

সাক্ষী বলে, হ্যাঁ দেখেছে। ঐ শুক্রবার এগারো তারিখেই, বেলা তিনটে সাড়ে তিনটার সময়। বর্ণনা দেয়, মাইজী নিচের বোর্ডে কোনও আবাসিকের নাম-ঠিকানা খুঁজছিলেন। দোবেজী তাঁকে প্রশ্ন করে জানতে পারে যে, তিনি হীরালালজীকে খুঁজছেন। সে মেয়েটিকে সাততলায় নামিয়ে দেয়। মাইজী কখন চলে যান তা সে জানে না। হয়তো তিনি লিফ্‌ট্ দিয়ে নামেননি।

শিবেন গুহ বাসুসাহেবের দিকে ফিরে বলেন, য়োর উইটনেস।

বাসু বলেন, নো কোশ্চেন্স।

পরবর্তী সাক্ষী সাব-ইন্সপেকটার নৃপেন চৌধুরী। সে স্থানীয় থানা থেকে এসেছিল। সে জানায় যে, মৃতদেহ আবিষ্কার করা মাত্র সে লালবাজার হোমিসাইড সেকশনে খবর দেয়। আধঘণ্টা খানেকের মধ্যেই পুলিশ ফটোগ্রাফার আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টকে নিয়ে উপস্থিত হন হোমিসাইডের ইন্সপেক্টার কামাল হুসেন। তিনি কামরার একটি ম্যাপ আদালতে দাখিল করেন, বিভিন্ন আসবাবপত্রের অবস্থান দেখিয়ে। হীরালাল খাটের উপর কীভাবে পড়েছিল, তা এঁকে দেখানো হয়েছে। অনেকগুলি আলোকচিত্রকে সে দাখিল করে।

অ্যাডভোকেট গুহ প্রশ্ন করেন, আপনি কি ঘরের মেঝেতে আসামীর নামাঙ্কিত কোনো কিছু খুঁজে পান?

বাসুসাহেব আপত্তি দাখিল করেন : অবজেকশন য়োর অনার। লিডিং কোশ্চেন।

শিবেন বলেন, আমি আদালতের সময় সংক্ষেপ করতে চাইছি মাত্র। প্রশ্নটা আমি উইথড্র করে নতুনভাবে জানতে চাইছি: রক্তের মধ্যে আপনি অপ্রত্যাশিত কোনো বস্তু কি দেখতে পান?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। শিলিগুড়ির একটি লাইব্রেরির কোনও একজনের সভ্য-কার্ড।

— সেটি কি আপনি সঙ্গে করে এনেছেন? তাহলে কার্ডটা পড়ে দেখুন কার নামে ঐ সভ্যকার্ড ইস্যু করা হয়েছিল।

সাক্ষী তাঁর ব্রিফ-কেস খুলে প্লাস্টিকে জড়ানো একটি লাইব্রেরি কার্ড বার করে বলেন, এটি বর্তমান মামলার আসামী শ্রীমতী চৈতালী বসুর নামাঙ্কিত কার্ড। তাঁর এবং লাইব্রেরিয়ানের একাধিক স্বাক্ষর আছে।

বাসুসাহেবকে দেখিয়ে সেটি বাদীপক্ষের এগ্‌জিবিট হিসাবে আদালতে নথিবদ্ধ করা হল।

ইন্সপেক্টার কামাল হুসেনকেও বাসু কোনও প্রশ্ন করলেন না। এরপর ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট তাঁর সাক্ষ্যে জানালেন, ঐ ঘরে অনেকগুলি লেটেন্ট্ ফিঙ্গারপ্রিন্ট তিনি পেয়েছেন। হীরালালের, লিফটম্যান দোবেজীর এবং কয়েকটি অজানা ব্যক্তির।

— বর্তমান মামলার আসামী শ্রীমতী চৈতালী বসুর কোনও আঙুলের ছাপ কি পেয়েছেন?

— পেয়েছি। দুইটি। একটি বাথরুমের আয়নায় দ্বিতীয়টি ঐ ঘরের ডোর নবে! প্রথমটি আসামীর ডানহাতের মধ্যমার, দ্বিতীয়টি তাঁর ডানহাতেরই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের।

— আপনি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। যতগুলি পয়েন্ট অব সিমিলারিটি পাওয়া গেলে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়, তার চেয়ে বেশিই পাওয়া গেছে। আমি ফিঙ্গারপ্রিন্টের আলোকচিত্র সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছি। আপনারা চাইলে আদালতে দাখিল করতে পারি।

বাসুসাহেবের অনুমতি নিয়ে তাই করা হল।

এরপর সাক্ষী দিতে এলেন অটোপ্সি-সার্জেন। তাঁর মতে মৃত্যুর কারণ একটি পয়েন্ট টু-টু রিভলভারের বুলেট। বাঁ-চোখের প্রায় পাঁচ সেন্টিমিটার উপরে তা কপালে আঘাত করে। তাতে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়।

— মৃত্যু কখন হয়েছিল বলে মনে হয়?

— আমার মতে ঘটনার দিন অর্থাৎ এগারোই ফেব্রুয়ারি বেলা দুটো থেকে সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে উনি মারা যান।

— গুলিবিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে?

— না। আমার তা মনে হয় না। গুলিবিদ্ধ হয়ে হীরালালজী জ্ঞান হারিয়ে খাটের উপর লুটিয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর হৃদপিণ্ডের কাজ বন্ধ হয় না — অন্তত পনের মিনিট! না হলে এত রক্তপাত হত না। রক্ত বালিশ ভিজিয়ে মেঝেতে অনেকখানি জায়গা জুড়ে পড়েছিল।

— আপনি কি মৃতদেহের মস্তিষ্কের ভিতর থেকে বুলেটটি উদ্ধার করতে পেরেছিলেন?

— হ্যাঁ, দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে আমি তা ব্যালিস্‌টিক এক্সপার্টকে দিয়েছিলাম।

শিবেন গুহ এবার বাসুসাহেবের দিকে ফিরে বললেন, আপনি এবার জেরা করতে পারেন।

বাসু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, একটা কথা আমাকে বুঝিয়ে বলুন, ডক্টর সান্যাল। আপনার মতে হীরালাল ঘিসিং যখন গুলিবিদ্ধ হন তখন আততায়ী তাঁর থেকে আন্দাজ কতটা দূরে ছিল?

— তা আমি কেমন করে জানব? হত্যামুহূর্তে আমি তো সেখানে উপস্থিত ছিলাম না।

— তা ছিলেন না, কিন্তু এক্সপার্ট হিসাবে আপনি কি বলতে পারেন না যে, আততায়ীর রিভলভারটা ছয়-ইঞ্চি বা একফুট দূরে ছিল না?

— তা বলা যায়। কারণ অত কাছ থেকে ফায়ার হলে ক্ষতস্থানের আশেপাশে বারুদের চিহ্ন পাওয়া যেত।

— তার মানে দূরত্ব আন্দাজ মিটার-খানেক হবে?

— হ্যাঁ। অন্তত মিটার-খানেক। তার বেশি হতে পারে, কম নয়।

— দ্যাটস্ অল য়োর অনার।

পরবর্তী সাক্ষী দমদমে বিমানপোতাশ্রয়ে অবস্থিত ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কাউন্টারের মহিলা কর্মী। সে তার সাক্ষ্যে জানাল, আসামীকে সে ঘটনার দিন সন্ধ্যা সাতটা পনেরো মিনিট প্রথম দেখে। আসামী নাকি কাউন্টারে এসে জানতে চেয়েছিল সন্ধ্যা সাতটার বাগ্‌ডোগরার প্লেনটা ছেড়ে গেছে কি না। আসামীর সঙ্গে তার যে কথোপকথন হয় তা সে বিস্তারিত জানায়। বাসু-সাহেব লক্ষ্য করলেন, চৈতালী তার জবানবন্দিতে যা বলেছিল এ মেয়েটি ঠিক তাই বলে যাচ্ছে। চৈতালী কিছু মিছে কথা বলেনি।

শিবেন গুহ জানতে চান, আপনি আসামীকে ভাল করে দেখুন। তারপর বলুন: মানুষ চিনতে আপনার ভুল হচ্ছে না তো? এঁকেই দেখেছিলেন সেদিন সন্ধ্যায়? ইনিই টি বোর্ডের চার্টার্ড প্লেনে রাত আটটায় বাগডোগরায় চলে যান?

— হ্যাঁ, তাই। মানুষ চিনতে আমার কোনো ভুল হচ্ছে না। ওঁর যমজ ভাইয়ের অ্যাক্‌সিডেন্টের কথা শুনে আমি ওঁকে বেশ লক্ষ্য করে দেখেছিলাম। তাছাড়া একটু পরে টী বোর্ডের অফিসার আমাকে জনান্তিকে যখন বললেন ...

— অবজেকশন, য়োর অনার। আসামীর অনুপস্থিতিতে সাক্ষীকে যেকথা তৃতীয় ব্যক্তি বলেন তা 'হেয়ার-সে'।

— অবজেক্‌শন সাস্‌টেইন্ড!

এ. পি. পি. জানতে চান, চৈতালীর সঙ্গে লাগেজ কী ছিল?

— লাগেজ কিছুই ছিল না, ছিল শুধু একটা কালো ভ্যানিটি ব্যাগ।

— সেই ভ্যানিটি ব্যাগটিকে আপনি কি কোনো কারণে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন?

— আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার মনে হয়েছিল সেই ভ্যানিটি ব্যাগটায় ঠেলে ঠুলে এমন একটা কিছু ঢোকানো হয়েছে যার জন্য ওর শেপটাই বেঢপ হয়ে গেছে। আমার মনে হয়েছিল, সেটা একটা ...

বাসুসাহেব বলে ওঠেন, অবজেকশন! সাক্ষীর অনুমান ...

কিন্তু সাক্ষী সেকথায় কর্ণপাত না করে তার বাক্যটা শেষ করে : রিভলভার!

বিচারক প্রতিবাদীর আপত্তি মেনে নেন। মামলার নথি থেকে সাক্ষী-উচ্চারিত শেষ বাক্যটি কেটে বাদ দেওয়া হয়।

পরবর্তী সাক্ষী টি বোর্ডের সেই অফিসার, যাঁর অনুমতি অনুসারে চৈতালী সে রাত্রে চার্টার্ড প্লেনের আরোহী হিসাবে দমদম থেকে বাগ্‌ডোগরা যায়। তিনি ধুরন্ধর ব্যক্তি। বোধকরি আইনজ্ঞ। প্রতিবাদী 'অবজেকশন' দিতে পারেন এমন কথা তিনি আদৌ বললেন না; কিন্তু তাঁর সাক্ষ্যে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন আসামীকে তিনি প্রথম যখন ওঁদের সঙ্গে চার্টার্ড প্লেনে বাগ্‌ডোগরা যাবার অনুমতি দিলেন তার পরমুহূর্তেই ওঁর মনে হয়েছিল মেয়েটির ভ্যানিটি ব্যাগে এমন কিছু আছে যাতে সিকিউরিটি আপত্তি করবে। যাহোক, উনি অনুমতি দেবার পরেই মেয়েটি মহিলাদের চিহ্নিত টয়লেটে ঢুকে যায়। একটু পরে যখন সে টয়লেট থেকে বার হয়ে আসে তখন উনি লক্ষ্য করে দেখেন ভ্যানিটিব্যাগ ঐ রকম বিসদৃশভাবে বেঢপ হয়ে ছিল না।

পরবর্তী সাক্ষী এয়ারপোর্টের জনৈক জমাদার। সে তার সাক্ষ্যে জানালো যে, ঘটনার দিন রাত আটটার সময় সে লেডিজ টয়লেটের লিটার বিন থেকে একটি রিভলভার উদ্ধার করে। সে জানায়, ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের কাউন্টারে যে দিদিমণি সে সময় বসেছিলেন তিনিই ওকে ঐ টয়লেটে লিটার বিনটা তল্লাশ করতে বলেছিলেন। সে আরও জানায় যে, দিদিমণির নির্দেশে সে এয়ারপোর্টের জনৈক সিকিউরিটি অফিসারকে মারণযন্ত্রটা হস্তান্তরিত করে।

পরবর্তী সাক্ষী এয়ারপোর্টের জনৈক সিকিউরিটি অফিসার। সার্জেন্ট পরেশ পাল। সে তার সাক্ষ্যে জানায় যে, ইন্ডয়ান এয়ারলাইন্স কাউন্টার থেকে জরুরি টেলিফোন পেয়ে সে ঐ কাউন্টারে এসে দেখে লেডিজ টয়লেটের লিটার বিন থেকে একটি রিভলভার পাওয়া গেছে। জমাদারের হাত থেকে সে যন্ত্রটা নেয়। চেম্বারটা খুলে দেখে ছয়টি বুলেটের একটি মাত্র ব্যয়িত, বাকি পাঁচটি স্বস্থানে রয়েছে। কিন্তু প্রতিটি বুলেটই জলে ভেজা। যেটি ব্যয়িত বুলেট তার খালি কেসটা ইজেক্ট করা হয়নি। সার্জেন্ট পাল রিভলভারের নম্বরটা নোট করে নেয় এবং ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কাউন্টারের মহিলাটিকেও বলে নম্বরটা তার ডিউটি বুকে টুকে রাখতে। এ. পি. পি. জানতে চান : রিভলভারটায় কি বারুদের গন্ধ পেয়েছিলেন?

— না। ময়লার টিনে থাকায় কিছু দুর্গন্ধই পাওয়া যাচ্ছিল।

— রিভলভারটিতে আর কিছু লক্ষ্য করেছিলেন কি?

— তখনই বোঝা যায়নি। পরে আমার 'বস'-এর কাছে শুনেছি, ল্যাবরেটারিতে টেস্ট করে বোঝা যায় রিভলভারটা রক্তের মধ্যে অনেকক্ষণ পড়েছিল। তার চারদিকেই রক্তের চিহ্ন ছিল। শাদা চোখে তা দেখা যাচ্ছিল না; কিন্তু মাইক্রোস্কোপিক টেস্টে ধরা যাচ্ছিল।

— রক্তটা কোন্ জীবের তা কি পরীক্ষায় বোঝা গেছিল?

— অফ কোর্স। হিউম্যান ব্লাড — মানুষের রক্তই।

হেয়ার-সে অজুহাতে বাসুসাহেব কোনও আপত্তি দাখিল করেন না। সময় সংক্ষেপ করতে। যে বিজ্ঞানী পরীক্ষা করেছেন তাঁকে পুলিশ অনায়াসে আদালতে হাজির করতে পারবে।

— রিভলভারটা কি আপনি সঙ্গে করে এনেছেন?

— না! উপরওয়ালার নির্দেশে আমি সেটা হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে ব্যালিসটিক এক্সপার্টকে হস্তান্তরিত করে রসিদ নিয়েছিলাম।

এবারেও বাসু সাহেব জেরা করলেন না।

ব্যালিসটিক এক্সপার্ট জীতেন বসাক তাঁর সাক্ষ্যে জানালেন যে, কম্পারেটিভ মাইক্রস্কোপের পরীক্ষায় তিনি নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে, হীরালাল ঘিসিং-এর মৃত্যুর হেতু যে বুলেট সেটি ঐ মারণযন্ত্র থেকেই নিক্ষিপ্ত। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও আলোকচিত্র তিনি আদালতে দাখিল করলেন।

এ. পি. পি. জানতে চান, রিভলভারটির লাইসেন্স কার নামে তার কোনও খোঁজ কি পাওয়া গেছে?

— হ্যাঁ, পাওয়া গেছে। লাইসেন্সহোল্ডার ছিলেন আসামীর যমজ ভাই লেট হরিমোহন বসু।

এ. পি. পি. এবার বাসুসাহেবকে বললেন, আপনি জেরা করতে পারেন।

বাসু জানতে চান, আপনি কি খোঁজ নিয়ে দেখেছেন হরিমোহন বসু কোন্ দোকান থেকে ঐ রিভলভারটি খরিদ করেছিল?

— হ্যাঁ, সে খোঁজও নিয়েছি আমরা। এটা রুটিন ব্যাপার। কোনও হত্যা মামলায় রিভলভার পাওয়া গেলে তার পূর্ণ ইতিহাস সংগ্রহ করা হয়। আমরা জেনেছি অস্ত্রটা কলকাতার সি. সি. বিশ্বাসের দোকান থেকে প্রায় তিন বছর আগে খরিদ করেন শিলিগুড়ির জৈন কিউরিও এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইম্পোর্ট কোম্পানি। তাঁদের কর্মচারী হরিমোহনের জন্য।

— তার মানে হরিমোহন ওটা নিজের টাকায় কেনেনি।

— আজ্ঞে না।

— তার মানে কি এই দাঁড়ালো যে, রিভলভারের লাইসেন্সটা কর্মচারী হরিমোহন বসুর নামে হলেও সেটার মালিকানা শিলিগুড়ির জৈন কিউরিও এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইম্পোর্ট কোম্পানির?

— তা আমি ঠিক জানি না।

— সে কী! মামলা খতম হলে রিভলভারটা কাকে ফেরত দেবেন? হরিমোহন বসুর ওয়ারিশকে না ঐ কোম্পানিকে?

— সেটা আমার জানার কথা নয়। আমার উপরওয়ালা স্থির করবেন সেটা।

— দ্যাটস অল, য়োর অনার।

এই পর্যায়ে এ. পি. পি. জানালেন যে, তাঁদের সাক্ষীর তালিকায় আর কেউ বাকি নেই।

দায়রা জজ বললেন, নুন রিসেস-এর সময় হয়ে গেছে। ও-বেলা আমার কিছু রুটিন কেস আছে। কাল-পর্শু আদালত বন্ধ। সোমবার বেলা দশটায় যদি পরবর্তী হিয়ারিঙ-এর দিন ধার্য করা হয় তাহলে আপনাদের আপত্তি নেই নিশ্চয়?

দু পক্ষই রাজি হলেন। আদালত বন্ধ হয়ে গেল। চৈতালী ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে জামিন পায়নি। তাকে জেনানা ফাটকে যেতে হল। যাবার আগে বাসুসাহেবের দিকে ফিরে বললে, কী বুঝছেন?

— হতাশ হবার কিছু নেই। অপরাধটা তুমি যখন করনি তখন ভয় কী? বেকসুর ছাড়া পাবে নিশ্চয়।

।। পনের ।।

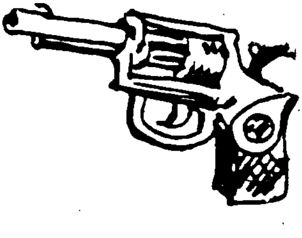

শুক্রবার সন্ধ্যায় আদালতে থেকে ফিরে এসে সবাই বসেছেন সান্ধ্য আড্ডায়। রানী আদালতে যেতে পারেন না। সচরাচর বাসুসাহেব আদালতে কী ঘটল তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাখিল করেন। কিন্তু আজ কী জানি কেন তিনি বেশ নিরুৎসাহ। কৌশিকই আদালতের ঘটনা বিস্তারিত জানালো। এবং সক্ষেদে নিজের ক্ষোভটাও প্রকাশ করল : জানি না, মামিমা, কেন

এমনটা হলো। মামু আজ কাউকেই তেমনভাবে জেরা করলেন না। কিছু মনে করবেন না, মামু, আমার মনে হচ্ছিল কোনও তৃতীয় শ্রেণীর আইনজীবীকে নিয়োগ করেছে ঐ হতভাগিনী ফাঁসির আসামী।

বাসু আজ পাইপ ধরাননি। বললেন, আই এগ্রি! আমি বিশ্বাস করেছি যে, চৈতালী খুনটা করেনি। কিন্তু এ ডিলে একটাও অনার্স কার্ড নেই আমার হাতে। ট্রাম্প কার্ডও নেই। সারিবদ্ধ দুরি-তিরি-ছক্কা! কী করে খেলব?

সুজাতা বলে, আমার কিন্তু বিশ্বাস চৈতালীই খুনটা করেছে। সে যে ঐ ঘরে ঢুকেছিল তার অকাট্য প্রমাণ আছে। রিভলভারটা তার ভায়ের। আর পঞ্চাশ হাজার টাকা তছরুপ করে সে যে ছদ্মনামে হোটেলে এসে উঠেছিল এটাও প্রতিষ্ঠিত।

বাসু বললেন, হুঁ! কিন্তু ওদের তহবিলে ঘাটতি শুধু পঞ্চাশ হাজার নয়, পুরো এক লাখ!

— সেটা চৈতালীই সরিয়েছে। আপনার ধমক খেয়ে পঞ্চাশ হাজারের ড্রাফট বানাতে বাধ্য হয়েছিল। বাকি পঞ্চাশ হাজার সে গায়েব করেছে। ও যেমন ডাইনে-বাঁয়ে মিথ্যে কথা বলে তাতে ওর একটা কথাও বিশ্বাস হয় না।

বাসুসাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কিন্তু ওর সলিসিটর হিসাবে আমাকে যে ধরে নিতে হবে ও অন্তত শেষ পর্যায়ে আমাকে মিথ্যা কথা বলেনি। দিস ইস্ অন প্লিডার্স এথিক্স।

কৌশিক বললে, ও, ভাল কথা! একটা বিষয়ে আপনাকে অবহিত করা হয়নি। রবিকে মনে আছে? ইন্সপেক্টার রবি বোস?

— শ্যিওর। 'ঘড়ির কাঁটা'য় যে লটারির টাকাটা পেয়েছিল। সে আমার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। কেন? রবি কিছু ক্লু দিতে পারছে?

— হ্যাঁ, একটা মাইনর ক্লু। 'সিজার লিস্ট'এ একটা ডাকব্যাকের রেইন কোট আছে, যেটা আদালতে দাখিল করা হয়নি।

— কী? ডাকব্যাক কোম্পানির রেইন-কোট? জাস্ট এ মিনিট। সেটি কি ঘর সার্চ করার সময় ডিভানটার উপর পড়েছিল?

— হ্যাঁ তাই ছিল। আপনি কী করে জানলেন?

— বাঃ! ফটোগ্রাফে দেখলাম যে! প্রসিকিউশন একসিবিট নম্বর থার্টিওয়ান! ফটোটা দরজার কাছ থেকে তোলা। মনে হল, ডিভানের উপর পড়ে আছে একটা রেনকোট। ডাকব্যাকের কি না অবশ্য বোঝা যাচ্ছিল না। তখন মনে হয়নি; এখন মনে হচ্ছে — ওটা 'ইনকমপ্যাটিবল'! স্থান-কালে একটা অসঙ্গতি। মাসটা ফেব্রুয়ারি। তিন-চার মাস কলকাতায় বৃষ্টি হয়নি। এমন সময়ে হীরালাল তার বর্ষাতিটা কেন বার করে ডিভানের ওপর রাখবে?

— না, মামু। সমস্যাটা আরও গভীর। রেনকোটটা হীরালালের নয়। হতে পারে না।

— তুমি কেমন করে জানলে?

— হীরালাল ঘিসিং-এর উচ্চতা পাঁচফুট দুই ইঞ্চি, মানে একশ সাতান্ন সে.মি.। রেন-

কোটটার ঝুল তার চেয়ে বেশি। মানে, হীরালাল ওটা গায়ে দিলে এক বিঘৎ পরিমাণ মাটিতে লুটাতো। ওটা অন্য কারও।

তড়াক করে উঠে পড়েন বাসুসাহেব। প্রতিবর্তী প্রেরণায় হাতটা চলে যায় পকেটে। বার হয়ে আসে পাইপ আর পাউচ। ধীরে ধীরে কক্ষান্তরে চলে যান তিনি।

কেউ অবাক হয় না। এটা ওঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যবহার। এখন মিনিটদশেক উনি পদচারণা করবেন নির্জন ঘরে। 'কার্য-কারণ ঘটনা' পরম্পরার বিষয়ে যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্তে আসবেন। বাসু লাইব্রেরি ঘরে চলে গেলেন।

বিশে এসে জানালো খাবার তৈরি। জানতে চাইল, টেবিল সাজাবে কি না।

রানী দৃঢ় স্বরে বললেন, না। সব কিছু ঢাকা দিয়ে রাখ। রুটিগুলো ক্যাসারোলে। মনে হচ্ছে আজ রাত হবে।

তা হল না কিন্তু। মিনিট দশেক পরেই ফিরে এলেন বাসু। তাঁর হাতে ধূমায়িত পাইপ। বললেন, শিলিগুড়িতে একটা এস. টি. ডি. কর তো রানু। জৈন কিউরিও এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইম্পোর্টের বড় তরফ বিজয়রাজ জৈনের রেসিডেন্সে। হিয়ার্স দ্য নাম্বার।

রানী তাঁর অভ্যস্ত আঙুলে ধীরে ধীরে শিলিগুড়িতে এস. টি. ডি. করতে থাকেন। বাসু-সাহেব সুজাতার দিকে ফিরে বলেন, লেটস্ হোপ দা ওল্ড ম্যান ইজ অ্যাট হোম্।

সে আশা সাফল্যমণ্ডিত হল। অচিরেই ও প্রান্তে ভারী গলায় শোনা গেল, ইয়েস। বিজয়রাজ স্পিকিং।

বাসু বললেন, গুড ইভনিং মিস্টার জৈন। দিস ইজ পি. কে. বাসু ফ্রম ক্যালকাটা।

— গুড ইভনিং। বলুন ব্যারিস্টার-সাব, কী ভাবে আপনার সেবা করতে পারি?

— না, আমার নয়। আপনি সেবা করবেন জৈন এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইম্পোর্ট কোম্পানিকে। আপনাদের কোম্পানির কেশিয়ার আজ ফাঁসির আসামী। তাকে বাঁচানোর কর্তব্য আপনাদেরই। নয় কি?

বিজয়রাজ গম্ভীর ভাবে বললেন, দ্যাট ডিপেন্ডস্। লুক হিয়ার, ব্যারিস্টার-সাব। চৈতালীকে আমি খুবই স্নেহ করতাম। কিন্তু সে যদি সত্যিই খুনটা করে থাকে তাহলে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা আমি আদৌ করব না। হীরালালও আমার প্রিয়পাত্র ছিল।

— কারেক্ট! কিন্তু খুনটা চৈতালী করেছে কি করেনি সেটা তো স্থির করবেন বিচারক। আপনি-আমি নই। যতক্ষণ বিচারক তাকে অপরাধীরূপে চিহ্নিত না করছেন ততক্ষণ সে 'বেনিফিন-অব-ডাউটের' খাতিরে আমার কাছে ক্লায়েন্ট, আপনার কাছে এমপ্লয়ি।

— হতে পারে। আমি কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারছি না যে, ঐ মেয়েটি ক্যাশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা সরিয়ে কলকাতার একটা হোটেলে ছদ্মনামে উঠেছিল এমন একটা মর্মান্তিক সময়ে যখন তার যমজ ভাই শিলিগুড়িতে মৃত্যুশয্যায়!

— দ্যাটস্ কারেক্ট। কিন্তু কেন? কী মর্মান্তিক হেতুতে?

— আমি জানি না। একটি বিশ-বাইশ বছরের অবিবাহিতা মেয়ে কোন মর্মান্তিক হেতুতে ক্যাশ থেকে পঞ্চাশ হাজার ...

— জাস্ট আ মিনিট — ফিগারটা কি পঞ্চাশ হাজার টাকা? এক লাখ নয়?

— না, পঞ্চাশ হাজার।

— স্ট্রেঞ্জ! প্রথম শুনলাম দু লাখ, পরে আপনি বললেন ক্যাশ থেকে আপনিই এক লাখ নিয়ে গেছলেন, তাহলে ...

বাধা দিয়ে জৈন বললেন, বাকি পঞ্চাশ হাজারেরও হিসাব পাওয়া গেছে। মাধো নিয়েছিল। ওর মনে পড়ে গেছে।

বাসুসাহেব লুইস ক্যারলের সেই অনবদ্য ব্যাকরণ-বহির্ভূত বিস্ময়সূচক ধ্বনিটা উচ্চারণ করে বলেন — 'কিউরিঅসার অ্যান্ড কিউরিঅসার।' তার মানে ক্যাশে এখন কোন ঘাটতিই নেই। তাই তো? যে হেতু চৈতালী তার পঞ্চাশ হাজারের ড্রাফটটা নিশ্চয় এতদিনে জমা দিয়েছে।

— সেটা বড় কথা নয়, বাসুসাহেব। আপনার মক্কেল যে কেন ক্যাশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদে সরিয়েছিল তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ সে দেখাতে পারেনি। ফলে এটাকে 'এম্বেজ্‌ল্‌মেন্ট' বলা যাবে না। বাট ইট সার্টেনলি অ্যামউন্টস টু অ্যান অ্যাটেম্পট টু ইট।

— আপনি কি চান প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হোক?

— কেন চাইব না? যদি প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হলে বুঝতে পারি আমার ধারণাটা ভুল — চৈতালী যা করেছে, তার পিছনে কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না, তাহলে নিশ্চয় আমি খুশি হব। কিন্তু আপনি আমাকে হঠাৎ ফোনটা করলেন কেন বলুন তো?

— আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী।

— কী জাতীয় সাহায্য, বলুন? আমার ক্ষমতার মধ্যে হলে নিশ্চয় করব।

— আগামী সোমবার মামলার নেক্সট হিয়ারিং ডেট। সেদিন সকাল দশটায় আমি আপনাদের কর্মী সুমিত্রা গর্গকে সাক্ষীর মঞ্চে তুলতে চাই।

— সুমিত্রা? সুমিত্রা কী জানে? কী সাহায্য করবে আপনাকে?

— সেটা আমার বিবেচনাতেই ছেড়ে দিন না কেন?

— অল রাইট। তাকে ছুটি দিতে আমার আপত্তি নেই। তার যাতায়াতের ভাড়া আর রাহা-খরচের দায়িত্ব যদি আপনি নেন তবে সে যাবে, অবিশ্যি তার নিজের যদি কোনও আপত্তি না থাকে। সে তো আদালতের কোনও সমন পায়নি —

বাধা দিয়ে বাসুসাহেব বলেন, সেটুকু উপকার আপনাকে করতে হবে। তাকে রাজি করানোর কাজটা। শুধু তাই নয়, ঐ সঙ্গে আপনারা দুজনও আদালতে উপস্থিত থাকবেন এটাই আমার প্রার্থনা।

— আমরা 'দুজন' মানে?

— আপনি এবং আপনার জুনিয়ার পার্টনার, মাধবরাজ।

— দ্যাটস ইমপসিবল। সোমবার আমার অনেক কাজ। তাছাড়া ...

— আই নো, আই নো। আপনারা দুজনেই অত্যন্ত কর্মব্যস্ত মানুষ। কিন্তু আপনাদের প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে আমি সাজেস্ট করব আপনারা দুজন আপনাদের সব জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল করে সোমবার ভোরের ফ্লাইটে কলকাতায় চলে আসবেন। এয়ারপোর্টে আমার লোক থাকবে, আপনাদের হোটেলে পৌঁছে দেবে। তারপর আদালতে নিয়ে আসবে।

বিজয়রাজ একটু দম ধরে বললেন, "প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে" মানে?

— দেখুন মিস্টার জৈন, মক্কেলকে বাঁচাতে আমাকে সব রকম চেষ্টাই করতে হবে। আপনাদের তিনজনকে সাক্ষী হিসাবে পেলে আমার কাজটা সহজ হবে। না পেলে, আমাকে অন্য দিক থেকে অনুসন্ধান করতে হবে। আমাকে দেখতে হবে হীরালাল খুন হবার দু চারদিন আগে হঠাৎ কেন দুইলাখ টাকা আপনাদের ক্যাশে ঘাটতি হয়েছিল, কী ভাবে সে টাকা ভল্টে ফিরে আসে, কী কারণে আপনাদের ক্যাশে সচরাচর ঐ জাতীয় বিশাল টাকার অঙ্ক জমা থাকে। আপনাদের কেনাবেচার কত শতাংশ চেকে হয়। কতটা ক্যাশে। কেন বেচাকেনার সিংহভাগ নগদে হয়ে থাকে। ইত্যাদি ...

বিজয়রাজ বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, কিন্তু আমরা তো কোনো অভিযোগ করিনি যে আমাদের ক্যাশে কখনো কোনও ঘাটতি হয়েছে, বা এখনো আছে।

— করেছেন। মৌখিকভাবে। আমার কাছে। প্রথমে আপনার পার্টনার বলেন দু-লাখ। পরে শুনলাম এক-লাখ, এখন শুনছি ঘাটতি নেই। কিন্তু আপনার পার্টনারের মৌখিক অনুরোধে ঐ তহবিল তছরুপের ব্যাপারে ডি. আই. জি. নর্দার্ন রেঞ্জ লালবাজারে ফোন করেছিলেন, এটা ফ্যাক্ট। দুজন শাদা-পোশাকের পুলিশ সেই অনুসারে রিপন স্ট্রিটের হোটেল পান্নায় আমার মক্কেলকে জেরা করতে যায়, এটাও ফ্যাক্ট। তাই নয়?

— আপনি ঠিক কী চান বলুন তো?

— গিভ অ্যান্ড টেক। কিছু দেওয়া কিছু নেওয়া। আপনারা তিনজনে সোমবার সকালে আদালতে উপস্থিত হন। যাতে আমি চেষ্টা করতে পারি আপনাদের বিজনেসের ঐ সব খুঁটিনাটি আদালতে না আলোচিত হয়। বুঝতেই পারছেন তাতে ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে আপনার কম্পিটিটর ফার্ম সবাই অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে পড়বে —

— অল রাইট! য়ু উইন। সোমবার সকালে আমরা যাচ্ছি।

— তিনজনেই?

— আমার কথার নড়চড় হয় না, মিস্টার বাসু।

— থ্যাঙ্কু। অ্যান্ড গুড নাইট।

।। ষোলো ।।

সোমবার সকালে কৌশিক আর সুজাতা বাসুসাহেবের গাড়িটা নিয়ে দমদম এয়ারপোর্টে এসে হাজিরা দিল। ওরা দুজনে নিউ আলিপুরের বাড়িতে ফিরে এল বেলা নয়টা নাগাদ। কথা ছিল জৈন খুড়ো-ভাইপোকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে সুমিত্রাকে নিয়ে ওরা বাড়িতে ফিরে আসবে। তাই এল ওরা। ওঁরা তিনজনেই এসেছেন। বিজয়রাজ জানিয়েছেন যে, নির্দিষ্ট সময়ে তিনি ভাইপোকে নিয়ে দায়রা জজের আদালতে উপস্থিত থাকবেন।

সুমিত্রা গাড়ি থেকে নেমে এসে বাসুসাহেব এবং রানীকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। বাসুসাহেবকে বলল, আমাদের কখন আদালতে যেতে হবে?

— আধঘণ্টার মধ্যেই। তুমি ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিলেই ...

— আমি তো প্লেনেই সে পর্ব সেরেছি। আর কিছু খাব না এখন। কিন্তু আপনি তো আমাকে তালিম দেবার সময় পাবেন না ...

বাসু বললেন, তালিম আবার কী? তোমাকে আমি সাক্ষীর মঞ্চে তুলব। তারপর একের পর এক প্রশ্ন করে যাব। তুমি তোমার জ্ঞানমতো তার জবাব দিয়ে যাবে — ট্রুথ, হোল ট্রুথ অ্যান্ড নাথিং বাট দ্য ট্রুথ। তারপর হয়তো পুলিশের পক্ষ থেকে তোমাকে ক্রস-একজামিন করবে। সেখানেও সত্য কথা বলে যাবে। কোনও কিছু গোপন করার চেষ্টা কর না।

— আপনাকে দু-একটা কথা গোপনে বলতে চাই।

— বেশ তো। চল আমরা লাইব্রেরি ঘরে গিয়ে বসি।

দুজনে লাইব্রেরি ঘরে এসে বসলেন।

বাসু বলেন, এবার বল।

— আপনি কি আমার দিদির সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করবেন? আই মিন, হরিমোহন আর রঞ্জনাদি তাঁর চেম্বারে এসেছিল — দিদি যে ওদের স্বামী-স্ত্রী ভেবেছিল ... মাঝপথেই সুমিত্রা থেমে যায়।

বাসু বললেন, এখনই কিছু বলতে পারছি না। বাস্তবে ঠিক কী ঘটেছে তার সঠিক ধারণা এখনো করে উঠতে পারিনি। তার একটা ক্ষীণ সন্দেহ জেগেছে মনে। আমার মনে হয় আদালতে বিভিন্ন লোকের সাক্ষী চলতে থাকা কালে ...

সুমিত্রা বাধা দিয়ে বললে, আমার বদলে যদি আপনি রঞ্জনাদিকে সাক্ষী হিসাবে পেতেন তাহলে খুব সুবিধা হত। তাই নয়? আমি যতটা জানি, রঞ্জনাদি আমার চেয়ে অনেক অনেক বেশি খবর রাখে। নেপাল থেকে অনেক দামী জিনিস সে হীরালালজীর মাধ্যমে স্মাগল করেছে। ওরা দুজনেই বিজয়রাজজীর খুব প্রিয়পাত্র।

— আর মাধবরাজজী? তার সঙ্গে রঞ্জনার সম্পর্কটা কেমন ছিল?

— ভাল নয়। তার একমাত্র কারণ রঞ্জনা ছিল বড়কর্তার পেয়ারের। তাছাড়া মাধবরাজজী তাঁর স্ত্রীকে দারুণ ভয় পান। কোনও মহিলা কর্মী বা এজেন্টের সঙ্গে একটু মেলামেশা করলেই সন্দেহবাতিক মিসেস ওর হেনস্থা শুরু করেন।

বাসু বলেন, সে যাই হোক, তুমি আমাকে এ ঘরে ডেকে নিয়ে এলে কেন? গোপন কথাটা কী?

— রঞ্জনা থাপা এখন কোথায় আছে আপনি জানেন?

— নিশ্চয় না। তা জানলে তো তাকে সমন ধরাতাম।

— শুনুন স্যার! তার প্রয়োজন হবে না। রঞ্জনাদি এখন কলকাতায় আছে। শুধু তাই নয়, আজ আদালতে সে উপস্থিত থাকবে।

রীতিমতো অবাক হয়ে যান বাসুসাহেব। বলেন তুমি কেমন করে জানলে?

— আমার সঙ্গে তার আজ সকালে দেখা হয়েছে। ঐ দমদম এয়ারপোর্টেই। ও আজই কাঠমাণ্ডু-কলকাতা ফ্লাইটে কলকাতায় এসেছে। লেডিজ টয়লেটে ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে গেল। হীরালালজী যে খুন হয়ে গেছে এ খবরটা ও পোখরা গ্রামে বসে সে সময় জানতে পারেনি। মাত্র গত পরশু জানতে পারে। ও হীরালালজীর রাখী-বহিন।

— তা রঞ্জনা কলকাতা এসেছে কেন?

— ভাইয়ের শ্রাদ্ধশান্তি করে যাবে। ও আমাকে বলেছে, ওর দৃঢ় বিশ্বাস চৈতালী ওর দাদাকে খুন করেনি। কে করেছে ও জানে না, আন্দাজ করতে পারে মাত্র। ও আমাকে আরও বলেছে — আজ সকালে সে আদালতে উপস্থিত থাকবে প্রথম থেকেই। আপনি যদি প্রয়োজন বোধ করেন এবং নকিবকে দিয়ে ওর নাম ঘোষণা করেন তাহলে সে সাক্ষী দিতেও উঠবে। ওর ভাইকে যে খুন করেছে তাকে যদি আপনি খুঁজে বার করতে পারেন তাহলে ও আপনাকে সব রকম সাহায্য করতে প্রস্তুত।

বাসু অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। বলেন, এ তো দারুণ খবর। তা সে তোমার সঙ্গে এখানে চলে এল না কেন?

— কারণ ও চায় না বিজয়রাজ বা মাধবরাজ জানতে পেরে যান যে, ও সাক্ষী দিতে ইচ্ছুক।

— আই সি। কিন্তু সেটাই বা কেন?

— আমি জানি না। কারণটা সে আমাকে জানায়নি।

এই সময়ে লাইব্রেরির বদ্ধদ্বারে কে টোকা দিল।

বাসু দরজা খুলে মুখ বাড়াতেই কৌশিক বললে, আর দেরি করা চলবে না, মামু। ট্রাফিক-জ্যাম হলে আদালতে পৌঁছাতে দেরি হয়ে যাবে —

— অল রাইট। লেটস প্রসিড।

কৌশিক, সুজাতা আর সুমিত্রাকে নিয়ে যখন বাসুসাহেব দায়রা-জজের আদালতে এসে পৌঁছালেন তখনও আদালত বসতে মিনিট দশেক বাকি। প্রবেশদ্বারের বাইরেই ওঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ইন্সপেক্টর রবি বসুর। দু'হাত তুলে নমস্কার করল সে। বাসু বললেন, থ্যাঙ্কস।

রবি বুঝল। বলল, এ আর এমন কী? আপনি আমার যে উপকার করেছেন ... আরও যদি কোনো প্রয়োজন হয় —

— হ্যাঁ, আজই কিছু নাটকীয় ঘটনা আদালতে ঘটতে পারে। চারিদিকে নজর রেখ। মানে ...

— বুঝেছি স্যার, কেউ পালাবার উপক্রম করলেই আদালত চৌহদ্দির বাইরে ...

কথাটা তার শেষ হল না। বাসুসাহেব বললেন, জাস্টিস গাঙ্গুলি এসে গেলেন মনে হচ্ছে।

ঠিক তাই। একটা ঝকঝকে অ্যাম্বাসাডার এল দাঁড়ালো আদালতের দোর-গোড়ায়। কোর্টের এক উর্দিধারী পেয়াদা মস্ত সেলাম করে গাড়ির পিছনের পাল্লাটা খুলে ধরল। জজসাহেব নামলেন। ডানে-বাঁয়ে তাকালেন না। নিজের চেম্বারের দিকে এগিয়ে গেলেন। আর্দালি পিছন পিছন গেল থার্মো টিফিন ক্যারিয়ারের ঝোলা আর জলের বোতলটা নিয়ে।

বাসুসাহেবের সঙ্গে দোরগোড়াতেই দেখা হয়ে গেল বিজয়রাজের। দুজনে করমর্দন করলেন। বিজয়রাজ অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, আমি আমার কথা রেখেছি স্যার। আশা করি ...

বাসু হেসে বললেন, উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বসুন গিয়ে দর্শকের আসনে। আমিও আমার কথা রাখব। গিভ অ্যান্ড টেক।

দর্শকদলের সামনের সারিতেই বসেছিল মাধবরাজ। লক্ষ্য করছিল সবই; কিন্তু না-দেখার একটা ভান করে বসেই রইল। ইতিমধ্যে কৌশিক, সুজাতা আর সুমিত্রা বসেছে দর্শকাসনে। বাসু দর্শকদের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে দেখলেন। রঞ্জনা থাপাকে চেনেন না। শনাক্ত করতে পারলেন না।

ওপাশে শুধু এ. পি. পি. নন, আজ পাবলিক প্রসিকিউটার নিরঞ্জন মাইতি স্বয়ং এসে বসেছেন। তাঁর মতে মামলাটা ক্রমশ বাসুসাহেবের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাই তাঁর উৎসাহ ক্রমবর্ধমান।

বাসুসাহেবের সঙ্গে সুমিত্রার চোখাচোখি হল। উনি তাকে কাছে ডাকলেন। সুমিত্রা এগিয়ে এল। বাসু তার কর্ণমূলে প্রশ্ন করেন, মাথা না ঘুরিয়ে আমার প্রশ্নের জবাব দাও। দর্শকদলে কি রঞ্জনা থাপা এসে বসেছে?

সুমিত্রা বলল হ্যাঁ, প্রায় পিছনের সারিতে। একটা শাদা সিল্কের ...

কথাটা শেষ হল না তার। জজসাহেব তাঁর খাশ কামরা থেকে আদালতে প্রবেশ করলেন। সবাই উঠে দাঁড়ালো। জাস্টিস গাঙ্গুলী আসন গ্রহণ করে প্রথামাফিক জেনে নিলেন নির্ধারিত প্রথম মামলার বাদী-প্রতিবাদী উপস্থিত কি না, আসামী আদালতে হাজির আছে কি না। তিনি লক্ষ্য করলেন আজ পি. পি. স্বয়ং এসেছেন। জজসাহেব বললেন, স্টেট ভার্সেস শ্রীমতী চৈতালী

বসুর মামলা। আগের দিন প্রসকিউশন তাঁদের তালিকা শেষ করেছিলেন। এখন প্রতিবাদী তাঁর সাক্ষীদের একে একে ডাকতে পারেন।

বাসু বললেন, তার পূর্বে আমি প্রসিকিউশনের একজন সাক্ষীকে ক্রস করতে চাই।

তড়াক করে লাফিয়ে ওঠেন পি. পি. মাইতি সাহেব। বলেন, দিস ইজ প্রিপস্ট্রাস্, য়োর অনার। বাদীপক্ষ তাঁদের সাক্ষীদের একে একে তুলেছেন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই মাননীয় সহযোগীকে আদালত সুযোগ দিয়েছেন জেরা করবার জন্য। উনি তা করেননি। এখন তা করতে চাইলে সেটা বে-নজির হয়ে যাবে। হি হ্যাজ মিস্‌ড্ দ্য বাস!

বাসু আদালতকে সম্বোধন করে বললেন, ইতিমধ্যে প্রতিবাদী পক্ষ কয়েকটি তথ্য জানতে পেরেছেন যে-কথা পূর্বদিন জানা ছিল না। প্রথমে ক্রস না করে বিশেষ কারণে পরে ক্রস একজামিন করা আদৌ বে-নজির নয়। আমি হাফ-এ ডজন নজিরের তালিকা নিয়ে এসেছি আশঙ্কা করে যে মাননীয় সহযোগী আপত্তি করতে পারেন। তার ভিতর একটি মাসছয়েক আগে এই আদালত থেকেই মঞ্জুর করা হয়েছিল যখন বিচারকের আসনে বসেছিলেন য়োর অনার হিমসেলফ এবং আমি ছিলাম প্রতিবাদী : স্টেট ভার্সেস নবীন খাশনবিশের মামলা — এ. পি. নওলখার মার্ডার কেসে।

বিচারক বলেন, অল রাইট! আদালত অনুমতি দিচ্ছেন। আপনি বাদীপক্ষের কোন্ সাক্ষীকে জেরা করতে চান?

— হোমিসাইড ইন্সপেক্টর মিস্টার কামাল হুসেন, যিনি লোকাল থানার অনুরোধে সরেজমিনে তদন্তের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

আদালতের নির্দেশে কামাল হুসেন পুনরায় সাক্ষীর মঞ্চে উঠে দাঁড়ায়। বিচারক তাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, ইতিপূর্বেই সে হলফ নিয়েছে বলে দ্বিতীয়বার তাকে দিয়ে হলফনামা পড়ানো হল না। বাস্তবে সে জেরায় যা বলবে তা হলফ নিয়ে জবানবন্দি বলেই ধরা হবে।

কামাল মাথা নেড়ে বলল, আই নো, য়োর অনার।

মাইতি আর নিজেকে সামলাতে পারেন না। দাঁতে দাঁত চেপে স্বগতোক্তি করে ওঠেন : দিস ইজ রিডিকুলাস!

জাস্টিস গাঙ্গুলী তৎক্ষণাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, বেগ য়োর পার্ডন পি. পি.। কী বললেন আপনি?

মাইতি ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন। বললেন, না, কিছু নয়!

জাস্টিস গাঙ্গুলী বলেন, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন এটা আদালত, অভিনয়-মঞ্চ নয়। দ্বিতীয়বার কোনও স্বগতোক্তি আদালতের কানে এলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইয়েস, য়ু মে প্রসিড মিস্টার ডিফেন্স কাউন্সেল।

বাসু উঠে দাঁড়ালেন। কামালকে প্রশ্ন করলেন, হীরালাল ঘিসিং-এর ঘর থেকে আপনি যেসব জিনিস থানায় নিয়ে যান, তার ভিতর একটা ডাকব্যাকের রেইন-কোট ছিল কি?

মাইতি গর্জে ওঠেন, অবজেকশন! দ্যাটস্ এ লিডিং কোশ্চেন!

জজসাহেব বলেন, অবজেকশন ওভাররুল্ড। নাউ মিস্টার পি. পি. আই সাজেস্ট আপনি একটু মুখে-চোখে জল দিয়ে আসুন। ডোন্ট লুজ য়োর টেম্পার! সাক্ষী বাদীপক্ষের। প্রতিবাদী জেরায় তো লিডিং কোশ্চেন করতেই পারেন, আন্ডার সেকশন 143।

মাইতি রুমাল দিয়ে মুখটা মুছতে মুছতে বলেন, আয়াম সরি, য়োর অনার।

জজসাহেব সাক্ষীর দিকে ফিরে বলেন, সওয়ালের জবাব দিন।

সাক্ষী বললে, আমার স্মরণ হচ্ছে না, হুজুর।

বাসুসাহেব একখণ্ড কাগজ বাড়িয়ে ধরে বলেন, এইটা আপনার সিজার লিস্ট, যার এক কপি আপনি কেয়ারটেকারকে দিয়ে এসেছিলেন। ওর তের নম্বর আইটেমটা দেখুন তো? কিছু মনে পড়ছে?

কামাল এতক্ষণে স্বীকার করে, ও হ্যাঁ মনে পড়েছে। ছিল বটে।

— আপনি সেটা থানায় নিয়েই বা গেলেন কেন, আর যদি নিয়ে গেলেন তো আদালতে দাখিলই বা করলেন না কেন?

কামাল চট-জলদি জবাব দিল, আমি ওটা 'সিজ' করেছিলাম ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখতে যে, ওতে রক্তের কোন দাগ লেগেছে কি না। পরে দেখা গেল যে, বর্ষাতিটাতে কোনও রক্তের দাগ লাগেনি। ফলে ওটা মামলায় উপস্থাপিত করা হয়নি।

— আপনি ঐ রেইন কোট-এর উপস্থিতিতে অস্বাভাবিক কিছু দেখেছেন কি?

— অস্বাভাবিক? না। অস্বাভাবিক কিছু দেখব কেন? ওটা কিছু লেডিজ ওয়াটার প্রুফ নয়। একজন সিউডো-ব্যাচিলারের এককামরা ঘরে বর্ষাতি বস্তুটাকে অস্বাভাবিক মনে হবে কেন?

— আপনার মনে হয়নি যে ওঠা হীরালালজীর বর্ষাতি নয়?

— আজ্ঞে না। তা মনে হবে কেন?

জজসাহেব এখানে বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, মিস্টার ডিফেন্স কাউন্সেল, হত্যা মামলার সঙ্গে ঐ বর্ষাতিটা কীভাবে সংশ্লিষ্ট তা যদি একটু বুঝিয়ে বলেন ...

বাসু বললেন, মৃত হীরালাল ঘিসিং-এর দেহ-দৈর্ঘ্য ছিল পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি। আমার অনুমান ঐ বর্ষাতিটা যার মাপে কেনা সে অন্তত পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা। সেটা আকারে এত বড় যে, হীরালালজী সেটা পরলে এক বিঘৎ পর্যন্ত মাটিতে লোটাতো। এটা কীভাবে হোমিসাইড ইন্সপেক্টার লক্ষ্য করলেন না, তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। আদালতের কাছে আর্জি পেশ করছি ঐ বর্ষাতিটা এখানে উপস্থাপিত করা হোক, প্রতিবাদীর একজিবিট হিসাবে।

বিচারক সেইভাবে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু প্রশ্ন করলেন, ধরা যাক বর্ষাতিটা মৃতব্যক্তির নয়। তাতেই বা কী প্রমাণ হল?

বাসু বললেন, বর্ষাতিটা আসুক, তারপর সে বিষয়ে আলোচনা করা যাবে। আপাতত আদালত যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি বর্তমান সাক্ষীকে পরবর্তী প্রশ্নটা পেশ করতে পারি।

জজ বললেন, শ্যিওর! য়ু মে প্রসিড!

— আপনি হীরালাল ঘিসিং এর হত্যা-মামলার তদন্তকারী অফিসার। দমদম এয়ারপোর্টে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কাউন্টারের সেই মহিলার এবং টি বোর্ডের অফিসারের জবানবন্দি আপনি নিশ্চয় নিয়েছেন? তাই নয়?

— নিয়েছি।

— তাঁরা কি দুজনেই বলেছিলেন আসামীর হ্যান্ডব্যাগে এমন কিছু ছিল যাতে সেটা বেঢপ হয়ে গেছিল?

— বলেছিলেন। দুজনেই। 'এমন-কিছু' নয়, স্পষ্টাক্ষরে বলেছিলেন ওঁদের ধারণা সেটা একটা রিভলভার।

— তদন্তকারী অফিসার হিসাবে আপনার থিয়োরি তাহলে এই যে আসামী ভ্যানিটি ব্যাগে তার ভাইয়ের রিভলভারটি ভরে নিয়ে হীরালালের ঘরে ঢুকেছিল। তাই নয়?

— তা তো বটেই। তবে সেখানেই শেষ নয়। ঐ ভ্যানিটি ব্যাগ থেকেই রিভলভারটি বার করে সে ঘিসিং-কে হত্যা করে।

— এই আপনার থিয়োরি?

— থিয়োরি নয়। এটাই বাস্তব ঘটনা।

বাসু নীরবে এগিয়ে গেলেন। আদালতের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের অনুমতি নিয়ে তিনি বাদীপক্ষের জমা দেওয়া দুটি জিনিস উঠিয়ে নিয়ে এলেন। রিভলভারটি এবং চৈতালীর ভ্যানিটি ব্যাগটা। রিভলভারের চেম্বার খুলে দেখে নিলেন যে তাতে কোনও টোটা ভরা নেই। এবার তিনি সাক্ষীর কাছে ফিরে এসে বললেন, মিস্টার হুসেন, আপনি কি পরীক্ষা করে দেখেছেন এই ব্যাগে ঐ রিভলভারটা আদৌ ঢোকানো সম্ভবপর কি না?

— আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখেছি এবং এও লক্ষ্য করে দেখেছি যে তখন ব্যাগটা সত্যিই বেঢপ দেখায়।

—আপনি অনুগ্রহ করে এই রিভলভারটা ঐ ভ্যানিটি ব্যাগে ঢুকিয়ে আদালতকে দেখাবেন কি যে কতটা বেঢপ দেখায়?

— ঠিক আছে, দিন দেখাচ্ছি।

রিভলভারটা প্লাস্টিক ভ্যানিটি ব্যাগে ঢোকাতে রীতিমতো কসরৎ করতে হল। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ঢোকানো গেল। জিপচেন টেনে ব্যাগটা বন্ধও করা গেল। কামাল হুসেন সেটা বাড়িয়ে ধরে বললে, এই দেখুন।

বাসু বললেন, অল রাইট! প্রমাণ হল, অস্ত্রটা ঐ ব্যাগে ঢোকানো যায়। এবার আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওটা ব্যাগ থেকে টেনে বার করুন দেখি। দেখি, আপনার কতটা সময় লাগে।

হাতঘড়ির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বাসু বলেন, নাউ স্টার্ট!

হোমিসাইড ইন্সপেক্টর জিপটা খুলবার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যাগটা এমনই বেঢপ হয়ে গেছে

যে একটানে তা খোলা গেল না। বাসু বলে চলেছেন, পাঁচ সেকেন্ড ... দশ সেকেন্ড ... এগারো, বারো সেকেন্ড! এই তো আপনি বার করে ফেলেছেন, কিন্তু রিভলভারের বাঁটটা যে উল্টো দিকে ধরা। ওটা ঘুরিয়ে ফায়ার করতে আরও তিন-চার সেকেন্ড লাগবে আপনার। তাই নয়?

জজসাহেব অসহিষ্ণু হয়ে বলেন, আপনি ঠিক কী প্রমাণ করতে চান বলুন তো, মিস্টার ডিফেন্স কাউন্সেল?

বাসু বিচারকের দিকে ফিরে বললেন, বাদীপক্ষের বক্তব্য, আসামী ডোর বেল বাজানোতে হীরালাল এসে দরজা খুলে দেয়। সে ক্ষেত্রে যদি আসামী তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে রিভলভারটা বার করতে দশ-পনের সেকেন্ড সময় নেয় তাহলে হীরালাল তখন কী করছিল? স্বাভাবিকভাবেই সে কি আততায়ীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না? বাধা দেবে না? হীরালালের মতো একটা জোয়ান মানুষ লেম-ডাকের মতো অপেক্ষা করবে কখন অস্ত্রটা বার করে ফায়ার করা হবে?

জজসাহেব বললেন, আই সি!

মাইতি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, বাট আই ডোন্ট! বাস্তবে হয়তো আসামী ডোর বেল বাজানোর আগেই নির্জন করিডোরে তার ভ্যানিটিব্যাগ খুলে রিভলভারটা বার করে বাগিয়ে ধরেছিল। তার পরে সে ডোর বেল বাজায়। দোর খুলেই হীরালাল উদ্যত রিভলভারের সামনে পড়ে।

বাসু সহাস্যে বললেন, সে ক্ষেত্রে — একনম্বর : আততায়ী আর নিহত ব্যক্তির মধ্যে দূরত্ব এক মিটারের চেয়ে কম হত যেটা বাদীপক্ষের ব্যালিস্টিক এক্সপার্টের মতের সঙ্গে মেলে না। দুনম্বর : হীরালালের মৃতদেহ দোরগোড়াতেই পড়ে থাকত। ব্যাক-গিয়ারে পাঁচ-পা গিয়ে নিজের বিছানায় উঠে মরার সৌভাগ্য তার হত না।

এই সময়ে বর্ষাতিটা আদালতে এসে পৌঁছালো।

বাসুসাহেব বললেন, উইথ য়োর পার্মিশন, য়োর অনার, আমি বর্তমান সাক্ষীর জেরা সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে আমার পরবর্তী সাক্ষীকে ডাকতে চাই। যাতে বর্ষাতিটার প্রাসঙ্গিকতা বোঝা যায়।

বিচারক অনুমতি দিলেন। বাসুসাহেব মাধবরাজ জৈনকে সাক্ষীর মঞ্চে উঠে আসতে বললেন।

তৎক্ষণাৎ সামনের সারির একটি চেয়ার ছেড়ে গাউন পরা একজন উকিল বিচারকের মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলেন। একখণ্ড সিলমোহর করা কাগজ বাড়িয়ে ধরে বললেন, হুজুর আমি হচ্ছি প্রাণনাথ পতিতুণ্ড — আডভোকেট। আমাকে আমমোক্তারনামা দিয়েছেন বর্তমান সাক্ষী মিস্টার মাধবরাজ জৈন, তাঁর এবং তাঁর কোম্পানির স্বার্থ দেখবার জন্য।

আদালত কাগজটি গ্রহণ করলেন।

বাসু সাক্ষীকে প্রথম প্রশ্নটিই করলেন একটু বেয়াড়া ধরনের : মিস্টার জৈন, আপনি একটি

হত্যা মামলায় সাক্ষী দিতে এসেছেন, এক্ষেত্রে আপনার স্বার্থ দেখবার জন্য একজন কাউন্সেলার নিযুক্ত করার প্রয়োজন হল কেন?

মাধবরাজ বললেন, আসামী আমাদের কোম্পানির এমপ্লয়ি এবং নিহত ব্যক্তি আমাদের কোম্পানিরই একজন এজেন্ট — সংগ্রাহক। এ ক্ষেত্রে কোম্পানি এবং তার মালিকের স্বার্থ দেখবার জন্য একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তিকে নিয়োগ করাই তো স্বাভাবিক।

বাসু জানতে চান, আসামীর যমজ ভাই — হীরালালজীর মৃত্যুর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে শিলিগুড়ির হাসপাতালে মারা যায় — সেই হরিমোহন বসুও কি আপনাদের কোম্পানির এমপ্লয়ি ছিল?

মাধবরাজ সেকথা স্বীকার করলেন। বাসুসাহেবের প্রশ্নোত্তরে প্রতিষ্ঠিত হল ওঁদের কোম্পানির নাম এবং তাঁরা কী জাতের কাজ করেন। হরিমোহনকে কী জাতীয় কাজ করতে হত। সে কত টাকা মাইনে পেত। মাধবরাজ একথাও স্বীকার করলেন যে, হরিমোহন প্রায়ই শিলিগুড়ি থেকে কোম্পানির নির্দেশে কলকাতা যেত দামী কিউরিও ডেলিভারি দিতে এবং নগদ টাকা সংগ্রহ করে আনতে। অথবা নগদ টাকা নিয়ে কলকাতা যেত নিলাম থেকে দামী কিউরিও ক্রয় করে আনতে। এজন্য হরিমোহনকে রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর ভাড়া কোম্পানির থেকে দেওয়া হত এবং তার নিরাপত্তার জন্য তাকে একটি রিভলভারও কিনে দেওয়া হয়েছিল। মাধবরাজ আদালতে দাখিল করা তথাকথিত 'মার্ডার ওয়েপন'টা পরীক্ষা করে, এবং তার নম্বর নোটবুক দেখে মিলিয়ে নিয়ে শনাক্ত করলেন যে, ঐটাই হরিমোহনের রিভলভার।

তারপর বাসু-সাহেব জানতে চান, গতবছর গ্রীষ্মকালে এপ্রিল-মে-জুন মাস-নাগাদ আপনি কি কিছু নেপালি কিউরিও কিনতে হরিমোহনকে নিয়ে প্লেনে করে কাঠমাণ্ডু গিয়েছিলেন?

— হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।

— সে সময় হরিমোহনের রিভলভারটা কোথায় ছিল? প্লেনে করে সে তো সেটা কাঠমাণ্ডু নিয়ে যেতে পারেনি?

— আমি জানি না। আমার জানার কথাও নয়। হয়তো সে কোম্পানির স্ট্রং রুমে অস্ত্রটা জমা দিয়ে গেছিল।

— ঐ সময় কাঠমাণ্ডু থেকে বাই রোড আপনি কিছু কিউরিও দেখতে পোখরা গ্রামে গিয়েছিলেন কি?

মাধবরাজ তাঁর উকিলের দিকে দৃক্‌পাত করেন। তড়াক করে লাফিয়ে ওঠেন অ্যাডভোকেট প্রাণনাথ পতিতুণ্ড: অবজেকশন, য়োর অনার। ইররেলিভ্যান্ট অ্যান্ড ইন্‌কম্পিট্যান্ট। আলোচ্য হত্যা মামলার সঙ্গে এ প্রশ্নের কোনও সম্পর্ক নেই। নো ফাউন্ডেশন হ্যাজ বিন লেইড। তাছাড়া এটি লিডিং কোশ্চেনও বটে।

বিচারক বাসুসাহেবের দিকে ফিরে বলেন, আপনি প্রশ্নটার প্রাসঙ্গিকতা একটু বুঝিয়ে বলবেন?

বাসু হেসে বলেন, প্রশ্নটার প্রাসঙ্গিকতা পরবর্তী প্রশ্নে নিশ্চয় বোঝা যাবে। কিন্তু প্রশ্নটা ওঁদের কাছে এত আপত্তিকরই বা মনে হচ্ছে কেন? পোখরা গ্রাম নেপালের একটা টুরিস্ট স্পট। কোন নিষিদ্ধ এলাকা নয়। সাক্ষীর জবাব হতে পারে, হ্যাঁ, না, অথবা মাত্র একবছর আগেকার নেপাল ভ্রমণের কথা আমার স্মরণে নেই!

বিচারক বললেন, অবজেকশন ওভাররুলড!

মাধবরাজ বললেন, না, আমার স্মরণে আছে। আমি পোখরা গ্রামে কিছু কিউরিও খরিদ করতে গেছিলাম।

বাসুসাহেব এবার তাঁর আক্রমণের গতিমুখ পরিবর্তন করলেন। জানতে চাইলেন, পথদুর্ঘটনায় যেদিন হরিমোহন বসু শিলিগুড়ির রাস্তায় মারাত্মকভাবে আহত হন সেদিন সন্ধ্যায় কি অফিসের কাজে তাঁর কলকাতা আসার কথা ছিল?

এবারও আপত্তি জানালেন অ্যাডভোকেট পতিতুণ্ড। বাসুসাহেব প্রশ্নটির প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, য়োর অনার, হরিমোহনকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তার পকেটে ঐ সন্ধ্যার ফ্লাইটে শিলিগুড়ি-বাগডোগরার একখানা এয়ার-টিকিট ছিল, প্যাসেঞ্জার লিস্ট-এও ওর নাম ছিল। এগুলি ফ্যাক্ট। আমরা প্রমাণ দেব। হরিমোহনের যা উপার্জন তাতে নিজের পয়সায় সে প্লেনে করে কলকাতা যাবে না। ফলে সে নিশ্চিতভাবে অফিসের খরচেই কলকাতা আসছিল। আমি জানতে চাইছি তথ্যটা কি সাক্ষী জানতেন?

অ্যাডভোকেট পতিতুণ্ডের আপত্তি গ্রাহ্য হল না। মাধবরাজ জৈনকে স্বীকার করতে হল, হ্যাঁ তিনি জানতেন অফিসের একটা কাজে হরিমোহন কলকাতা যাচ্ছে—

— আপনি তো জানতেন, কিন্তু অফিস বোধহয় জানত না। কারণ হরিমোহন আপনার গোপন নির্দেশে কলকাতা আসছিল। তাই নয়?

এবার অ্যাডভোকেট পতিতুণ্ডের আপত্তি গ্রাহ্য হল। মাধবরাজকে জবাব দিতে হল না।

বাসুর পরবর্তী প্রশ্ন : এবারও তো হরিমোহন প্লেনে করে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। তাহলে তার রিভলভারটা সে কোথায় রেখে গেল?

মাধবরাজ অসহিষ্ণুর মতো মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, আমি জানি না। আমার জানার কথাও নয়!

বাসুসাহেব হাসি-হাসি মুখে বললেন, এবার তো ঐ তৃতীয় পংক্তিটা আপনি যোগ করলেন না, মিস্টার জৈন? অর্থাৎ 'হয়তো সে কোম্পানির স্ট্রংরুমে অস্ত্রটা জমা দিয়ে গেছিল।' — কেন জৈন সাহেব? যেহেতু আপনার কাকার অনুপস্থিতিতে স্ট্রংরুমের চাবিটা আপনার জিম্মায় ছিল?

বলা বাহুল্য, এ প্রশ্নটাও বাতিল হয়ে গেল। তা হোক, দেখা গেল সাক্ষী ক্রমশ নার্ভাস হয়ে পড়ছেন। বারে বারে পকেট থেকে রুমাল বার করে কপাল আর ঘাড়ের ঘাম মুছছেন।

বাসুসাহেব সেটা লক্ষ্য করে হঠাৎ সাক্ষীর দিকে এগিয়ে এলেন। টেবিলের উপর থেকে ঐ ওয়াটার-প্রুফটা তুলে নিয়ে সাক্ষীর দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। বললেন, মিস্টার জৈন, আপনি কি দয়া করে এই ওয়াটার প্রুফটা গায়ে দিয়ে দেখবেন? এটা আপনাকে কেমন ফিট করে?

সাক্ষী রীতিমতো চমকে ওঠে। উত্তেজনায় সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, কেন? হঠাৎ ওটা আমি গায়ে দিতে যাব কেন? ... না! সার্টেনলি নট! অপরের জামা আমি গায়ে দেব না। আই কান্ট ওবলাইজ য়ু। আয়াম সরি।

বাসু হাসিমুখেই বললেন, তাহলে বরং আমিই না হয় এটা গায়ে দিয়ে দেখি, আমাকে এটা কেমন ফিট করে। বাই দ্য ওয়ে, আমার হাইট পাঁচ ফুট দশ। আপনার হাইট কত? মিস্টার জৈন?

ইতিমধ্যে বাসুসাহেব ওয়াটার-প্রুফটা গায়ে চড়িয়েছেন।

পতিতুণ্ড যথারীতি আপত্তি দাখিল করেন। প্রশ্নটি নাকি অপ্রাসঙ্গিক। জজসাহেব তাঁর মতামত জানানোর পূর্বেই বাসু বলেন, আমি প্রশ্নটা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। আদালতসুদ্ধ সবাই স্বীকার করবেন যে, আপনার উচ্চতা পাঁচ-নয়ের কম নয় এবং পাঁচ এগারোর বেশি নয়। আপনি দাঁড়িয়ে ওঠায় আমাদের আন্দাজ করতে সুবিধা হল, থ্যাংকস্!

বিচারক বাসুসাহেবের দিকে ফিরে বললেন, মিস্টার ডিফেন্স কাউন্সেল, আপনি বারে বারে বলছেন, ঐ ওয়াটারপ্রুফটার প্রাসঙ্গিকতা আদালতকে বুঝিয়ে বলবেন। কিন্তু সেটা নানান কারণে মুলতবি হয়ে যাচ্ছে। এবার কি সেটা ব্যাখ্যা করে বলবেন?

— বলব, য়োর অনার। তার আগে মিস্টার জৈনকে জানাই যে, তাঁর সাক্ষী দেওয়া শেষ হয়েছে। বাদীপক্ষ তাঁকে জেরা করতে না চাইলে তিনি দর্শকদের আসনে গিয়ে বসতে পারেন।

বাদীপক্ষ জৈনকে ক্রস করলেন না। মাধবরাজ জৈন মাথা নিচু করে দর্শকাসনে ফিরে এলেন। তাঁর কাকার পাশের আসনটিতে কী জানি কেন এবার এসে বসলেন না। অ্যাটাচি কেসটা উঠিয়ে নিয়ে পিছনের একটা আসনে গিয়ে বসলেন। বাসু বিচারকের দিকে ফিরে বললেন, য়োর অনার, বর্ষাতিটার প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করতে হলে এ আদালতের টেবিলে আমার সবগুলি তাস চিত করে বিছিয়ে দিতে হবে। আমার স্ট্রাটেজির ব্যাখ্যা দিতে হবে। বর্তমান অবস্থায় তাতে আপত্তি নেই। আমি আদালতকে এই পর্যায়ে জানিয়ে দিতে চাই আমি কী প্রমাণ করতে চাইছি। বাদীপক্ষ তা জানুন, আমার থিয়োরিটাকে ভুল প্রমাণিত করে যদি সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন আমি খুশি হব। আমার সিদ্ধান্ত : আসামী চৈতালী বসু ঘটনার দিন বেলা তিনটে সওয়া তিনটার সময় হীরালালের অ্যাপার্টমেন্টে যায়। বেল বাজানোর প্রয়োজন হয় না তার। কারণ সে দেখতে পায়, দরজাটা ইঞ্চিখানেক ফাঁক হয়ে আছে। সে নক করে ঘরে ঢোকে এবং দেখতে পায় খাটের উপর গুলিবিদ্ধ হয়ে হীরালাল ঘিসিং মরে পড়ে আছে। মেঝেতে জমাট-বাঁধা রক্তের মধ্যে পড়ে আছে তার ভাইয়ের রিভলভারটা। সেটা সে কুড়িয়ে নেয়। বাথরুমে গিয়ে রক্তের দাগটা ধুয়ে ফেলে। তার ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে নেয়। এই সময়ে তার ব্যাগ থেকে লাইব্রেরি কার্ডটা অসতর্কভাবে পড়ে যায়। তারপর নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। দরজাটা আগের মতোই খোলা পড়ে থাকে। ইন ফ্যাক্ট, আমার মক্কেল আমাকে এই জবানবন্দিই দিয়েছে, এবং আমি সেটা বিশ্বাস করেছি।

মাইতি বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, সহযোগী কি তাঁর ডিফেন্সটা আর্গু করছেন? আমরা 'সাম-আপ' করার আগেই?

বাসু জবাব দেবার আগেই জাস্টিস গাঙ্গুলী বলে ওঠেন, না। উনি আদালতের নির্দেশে ঐ বর্ষাতিটার প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন শুধু।

মাইতি বলেন, কিন্তু সহযোগী তো বর্ষাতির কথা আদৌ কিছু বলছেন না?

বাসুসাহেব বললেন, এবার বলব। এ পর্যন্ত যা বলেছি তা আমার থিয়োরির ফাউন্ডেশন মাত্র। আমি যা বলেছি, তা ধরে নিতে হলে এটাও ধরে নিতে হবে যে, চৈতালী ঐ ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে বেলা তিনটার আগে — আর একজন ঐ ঘরে ঢুকেছিল। যে ব্যক্তি খুনটা করে। সে এসে ডোরবেল বাজায়। কারণ তখন দরজা ছিল বন্ধ। হীরালাল ম্যাজিক-আই দিয়ে দেখে কে এসেছে। আগন্তুক হীরালালের পরিচিত। তাই সে দরজার লক খুলে আগন্তুককে ভিতরে আসতে দেয়। নিজে গিয়ে খাটে বসে এবং আগন্তুক বসে ডিভানে। দুজনের মধ্যে ব্যবধান — ব্যালিসটিক এক্সপার্ট যা বলেছিলেন — এক মিটারের কিছু বেশি। কী কথাবার্তা হয় আমরা জানি না। মত-পার্থক্য কিছু হয়েছিল। একেবারে আচমকা তার পরিকল্পনামতো আগন্তুক হাতটা তোলে এবং ফায়ার করে। রিভলভারটা তার ডান হাতে ধরাই ছিল!

মাইতি বলেন, ও! এবার বুঝি 'লেম ডাক' হতে হীরালালের আপত্তি হল না। আগন্তুকের হাতে রিভলভারটা দেখে সে আত্মরক্ষার কোনও চেষ্টাই করল না?

বাসু মাইতির দিকে ফিরে বললেন, এইখানেই বর্ষাতিটার প্রাসঙ্গিকতা। আগন্তুকের হাতে ছিল কক্‌ড্ রিভলভার, কিন্তু তার নিজের বর্ষাতিতে হাতের রিভলভারটা সযত্নে ঢাকা দেওয়া ছিল। হীরালাল তা জানত না, দেখতে পায়নি। হীরালাল দুর্ভাগ্যবশত খেয়াল করে দেখেনি আকাশ নির্মেঘ হওয়া সত্ত্বেও আগন্তুক কেন ঐ বর্ষাতিটা হাতে করে এনেছে।

আদালতে আলপিন-পতন নিস্তব্ধতা। বাসুই আবার কথা বলে ওঠেন, আমার এ অনুমান সত্য হলে — এক : আগন্তুক হীরালালের পরিচিত ব্যক্তি। দুই : আগন্তুকের উচ্চতা পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চির কাছাকাছি। তিন : সে পুরুষমানুষ। চার : হীরালালজীকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার একটা জোরালো ইচ্ছা আগন্তুকের ছিল। প্রসঙ্গত বলি, আসামীর হত্যা-উদ্দেশ্য নিয়ে বাদীপক্ষ কোনও ইঙ্গিত এখনো পর্যন্ত দেয়নি। আদালত অনুমতি করলে আমি ঐ অজ্ঞাত আগন্তুকের হত্যা-উদ্দেশ্যটা এবার প্রতিষ্ঠা করব — যা থেকে আগন্তুকের পরিচয়টাও ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। শুড আই প্রসিড উইথ দ্য কেস, য়োর অনার?

— নিশ্চয়ই। আপনি পরবর্তী সাক্ষীকে এবার ডাকতে পারেন।

মাইতি নিম্নকণ্ঠে কামাল হুসেন আর শিবেন গুহর সঙ্গে কী সব আলোচনা করতে থাকেন। বাসুসাহেবের নির্দেশে কোর্ট পেয়াদা হাঁকল: মিসেস্ রঞ্জনা থাপা হা — জি—র?

দর্শকদলের পিছন থেকে একটি সুতনুকা মহিলা ধীরপদে মঞ্চের দিকে এগিয়ে এলেন। তাঁর পরিধানে শাদা শিল্কের শাড়ি, শাদা ব্লাউজ। কিন্তু তাঁর দক্ষিণ বাহুমূলে একটা কালো রঙের

রিবন জড়ানো। সুন্দরী। খুব ফর্সা। নেপালি। বয়স আন্দাজ ত্রিশ। ভারপ্রাপ্ত কর্মী তাঁকে দিয়ে শপথবাক্য পাঠ করালো। রঞ্জনা বসল সাক্ষীর চেয়ারে।

বাসু জানতে চাইলেন, আপনার হাতে একটা কালো রিবন জড়ানো রয়েছে — আপনি কি মোর্নিঙে আছেন, মিসেস থাপা?

— ইয়েস স্যার। আমার কাজিন ব্রাদার হীরালাল ঘিসিং-এর আকস্মিক মৃত্যুতে।

— আপনি কি শিলিগুড়ির ঐ জৈন কিউরিও শপের স্টাফ?

— আজ্ঞে না। ছিলাম। এখন নই। মাসতিনেক আগে ছুটি নিই। তারপর রেজিস্ট্রি ডাকে রেজিগনেশন লেটার পাঠিয়ে দিই। সেটা ইতিমধ্যে গৃহীত হয়েছে কি না আমি জানি না বটে, কিন্তু আমি নিজেকে ওঁদের এমপ্লয়ি বলে মনে করি না।

— মাস-তিনকে আগে আপনি ছুটি নিয়েছিলেন কেন?

— মেডিক্যাল গ্রাউন্ডস্-এ।

— গল-ব্লাডার অপারেশন করাতে কি?

পতিতুণ্ড আপত্তি করেন : লিডিং কোশ্চেন। জজসাহেব মতামত জানানোর আগেই বাসু বলেন, অল রাইট! আই উইথড্র। বলুন, অসুখটা কী ছিল?

— 'অসুখ' কিছু নয়। 'ন্যাচারাল ফেনোমেনা।' আমি 'মা' হতে যাচ্ছিলাম। ছুটি নিয়ে দেশে চলে যাই। কাঠমাণ্ডুতে একটি নার্সিং হোমে সন্তান প্রসব করি।

বাসু একটু ইতস্তত করে প্রশ্ন করেন, আপনার স্বামী কোথায়?

অসঙ্কোচে রঞ্জনা জবাব দেয়, প্রায় পাঁচ বছর আগে তিনি স্বর্গে গেছেন।

— সে ক্ষেত্রে আপনার সন্তান হওয়ায় কোনও সামাজিক আলোড়ন কি হয়নি?

— না! আমি যে সমাজের মেয়ে সেই পাহাড়িয়াদের কাছে কুমারী বা বিধবার সন্তানকে বলা হয় "ভুলা-হুয়া" : ভুল-করে হওয়া। ভুল ভুলই, কোনও অপরাধ নয়। মায়ের পরিচয়েই সন্তান সমাজে স্বীকৃতি পায়।

— আপনার এই সন্তানের পিতা কে তা আমি জানতে চাইছি না, কিন্তু বাস্তব সত্যটা কি আপনি হীরালালজীকে জানিয়েছিলেন?

— হ্যাঁ, জানিয়েছিলাম। সে বলেছিল, আমাকে খেসারত আদায় করে দেবে। পঞ্চাশ হাজার টাকা! আমি আপত্তি করি। কিন্তু ও আমার কথা বোধহয় শোনেনি, আর সেই ভুলের জন্যই ...

কান্নায় বুজে এল সাক্ষীর কণ্ঠস্বর।

বাসু ওকে সামলে নিতে দিয়ে বললেন, আপনার সন্তান এখন কোথায় আছে?

— আমার গ্রামে। আমার মায়ের কাছে। পোখরায়।

— পোখরা? আপনাদের আদি নিবাস কি নেপালের 'পোখরা' গ্রাম?

— ইয়েস স্যার।

— আপনার শিশুসন্তানটি ছেলে না মেয়ে?

— মেয়ে।

— তার বাবা কি মোটর অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন?

— আজ্ঞে না। তিনি বহাল তবিয়তে জীবিত আছেন।

— তিনি কি এই আদালতে আছেন?

রঞ্জনা তৎক্ষণাৎ বলে, পাঁচ মিনিট আগেও তাঁকে দেখেছি। কিন্তু এখন দেখছি তাঁর চেয়ারটা ফাঁকা।

বাসু কিছু বলার আগেই আদালতের বাইরে থেকে একটা ধস্তাধস্তি চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দ ভেসে এল। বিচারক ঘন ঘন তাঁর হাতুড়িটা টেবিলে ঠুকলেন। তাতে দর্শকদলের চাঞ্চল্য আদৌ প্রশমিত হল না। যারা দরজার কাছাকাছি ছিল তারা ছুটে বেরিয়ে গেল, বাইরে কী হয়েছে জানতে।

একজন কোর্ট-পেয়াদা দৌড়ে এসে বিচারকের কর্ণমূলে কী যেন নিবেদন করল। তিনি উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করলেন : কোর্ট ইজ অ্যাডজর্নড ফর হাফ-অ্যান-আওয়ার!

দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি নিজের চেম্বারের দিকে এগিয়ে গেলেন। চৈতালী ঝুঁকে পড়ে জানতে চাইল, বাইরে গণ্ডগোলটা কিসের?

বাসু মৃদু হেসে বলেন, যে ব্যক্তি তোমার কাছ থেকে চার্জ বুঝে নিয়ে তোমার চেয়ারে বসবে!

— মানে?

— সম্ভবত আদালত থেকে কেউ পালাতে চাইছিল, আর আদালত চৌহদ্দির বাইরে যেতেই পুলিশে তাকে পাকড়াও করেছে!

চৈতালী চোখ বড় বড় করে জানতে চায় : রঞ্জনাদির মেয়ের বাবা?

বাসু কাগজপত্র গুছিয়ে নিতে নিতে বলেন, সেই সামান্য কৃতিত্বটুকুই পলায়মানের একমাত্র পরিচয় নয়। এখনি তোমাকে বললাম না, এ আদালত এলাকায় তার চেয়ে বড় পরিচয়: মাধবরাজ জৈনই হীরালাল ঘিসিং-এর হত্যাকারী!

* * *

পরদিন সকালে প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ফিরে এসে বাসু দেখলেন, যথারীতি শীতের সকালের রোদটুকু উপভোগ করতে সবাই বাগানে বসেছে চায়ের টেবিল পেতে। ইতিমধ্যে খবরের কাগজ দিয়ে গিছে। কাগজের বান্ডিলটা কুড়িয়ে নিয়ে বাসু এসে বসলেন তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারে। রানী বললেন, খবরের কাগজ থাক। ও তো পালিয়ে যাচ্ছে না। কাল সুজাতা আর কৌশিকের মুখে সব কথা বুঝতে পারিনি। রাতে আর জিজ্ঞেস করিনি — তুমি ক্লান্ত ছিলে। আর তাছাড়া ওরা দুজনও যে একই রকম কৌতূহলী।

— তোমাদের কী বিষয়ে সন্দেহটা রয়েছে এখনো?

— প্রথম কথা তুমি মাধবরাজকে সন্দেহ করতে শুরু করলে কখন থেকে?

— সে প্রশ্ন করলে বলব : 'ল্যাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট'! ওর অফিসের দোরগোড়াতেই। সে যেন আমাকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। ঠিক তখনি আমার মনে খটকা বাধল। তারপর সুমিত্রার চিরকুট — চৈতালীকে 'এরা' ফাঁসাতে চায়! 'এরা' তো গৌরবে বহুবচন — একবচনে সেটা কে? সুমিত্রার মাধ্যমেই জানতে পারি রঞ্জনা মা হ'তে বসেছিল। হরিমোহন যদি অজ্ঞাত সন্তানের পিতা হয়, আর রঞ্জনা যখন ভ্রূণহত্যা করতে চায় না, তখন হরিমোহন তো অনায়াসে রঞ্জনাকে বিয়ে করতে চাইতে পারত। আপত্তিটা কিসের? বয়সের? সেটা তো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। দেখা গেল সুটকেসে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে, রিভলভারটা অফিসের স্ট্রংরুমে জমা দিয়ে হরিমোহন প্লেনে করে কলকাতা যাচ্ছিল। নিজের পয়সায় নয়, অত টাকা তার নেই। আবার অফিসের অফিশিয়াল নির্দেশেও নয়। তাহলে কার নির্দেশে? বিপত্নীক বিজয়রাজের নির্দেশেও নয়। তিনি রঞ্জনার সন্তানের পিতা হলে পুনর্বিবাহ করতেন। একজন বিধবা অপরজন বিপত্নীক — কোনও তরফেই আপত্তি হত না।

নেতি-নেতি করতে করতে ছাঁকনিতে পড়ে রইল মাধবরাজ। তার স্ত্রী বর্তমান। ধর্মান্তর করে মুসলমান না হলে সে রঞ্জনাকে বিবাহ করতে পারে না। ধর্মান্তরিত হলে সে নির্ঘাৎ প্রথম স্ত্রীর ডিভোর্সের সম্মুখীন হত। ভবিষ্যতে অগাধ সম্পত্তির আশা — মানে শশুরমশায়ের দেহান্তে যেটা সে প্রত্যাশা করছে, — বিসর্জন দিতে হয়। মাধবরাজ চেয়েছিল অ্যাবর্শন — সন্তান তার কাছে অবাঞ্ছিত আপদ। বঞ্চিত মাতৃত্ব রঞ্জনার দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐ 'ভুলা-হুয়া' এক কাঙ্ক্ষিত সম্পদ। যে কোনও কারণেই হোক রঞ্জনা পুনর্বিবাহ করতে চায় না। অথচ সে সন্তান চায়। ওর ভুল হয়েছিল হীরালালের কাছে সত্যিকথাটা স্বীকার করা। কী জানি — হয়তো টাকার প্রয়োজনটাও ছিল। হীরালাল ব্ল্যাকমেলিং করছিল — এটাও আন্দাজে বলা — হয়তো রাখী বহিনের উপকার করতেই। নিজের স্বার্থে নয়। সে যা হোক, হরিমোহন মাধবের ডান হাত। শিলিগুড়িতে সে লেডি গাইনোকলজিস্ট দিয়ে রঞ্জনাকে পরীক্ষা করায়। মাধবের নির্দেশানুসারে। সুমিত্রা ভুল বোঝে। চৈতালী তো জানতেই পারে না। ... হীরালালের তাগাদায় মাধবরাজ ভল্ট থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলে হরিমোহনকে দিয়ে তাকে প্লেনে করে কলকাতা পাঠানোর ব্যবস্থা করে। দুর্ভাগ্যবশত হরিমোহন অ্যাকসিডেন্টে পড়ে। মাধব অ্যাটাচি কেসটার সন্ধান পায় না। আন্দাজ করে, সেটা নিয়ে চৈতালী কেটে পড়েছে। তাতেই ও পুলিশে খবর দিয়ে চৈতালীকে টাকাসহ ধরবার চেষ্টা করে। নিজে ভল্ট থেকে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলে, মালখানা থেকে হরিমোহনের রিভলভারটা নিয়ে কলকাতা চলে যায়! ... বাকিটা তোমরা জানই!

রানী বললেন, না, জানি না। সে ফিরল কেমন করে? সন্ধ্যার প্লেনে তুমি দমদম বাগডোগরা ফ্লাইটে গেছ, রাত্রের চার্টার্ড প্লেনে গেছে চৈতালী, কিন্তু তোমরা তো কেউ ওকে দেখতে পাওনি।

ঠিক তখনই বেজে উঠল টেলিফোনটা।

আজকাল সবার আগে টেলিফোনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিশে। শুনে নিয়ে বললে, সাহেবের ফোন। লালবাজার থেকে। বাসু ইতিমধ্যে একটা কর্ডলেস অ্যাটাচমেন্ট নিয়েছেন। বিশু টেলিফোনটা উঠিয়ে নিয়ে বাগানে এলো। বাসু তার 'কথা মুখে' বললেন, বাসু স্পিকিং।

— গুড মর্নিং স্যার। আমি রবি। ইন্সপেক্টার রবি বসু। দু-দুটো ভাল খবর আছে, স্যার। শুনবেন?

— বল? শুভ সংবাদ শীঘ্রই শুনতে হয়।

— এক নম্বর : আপনার মক্কেলকে জেনানা-ফাটক থেকে এইমাত্র ছেড়ে দেওয়া হল। জামিন নয়। পার্মানেন্টলি। কেসটা আমরা উইথড্র করছি। দু-নম্বর খবর : মাধবরাজ থার্ড ডিগ্রিতে ভেঙে পড়েছে। বড়লোকের ছেলে, আদরে-গোবরে মানুষ — চাপ সহ্য করতে পারল না। সে আদ্যন্ত কবুল করেছে। হীরালাল তাকে ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছিল। হরিমোহনের হাতে মাধবরাজ পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠাবার ব্যবস্থাও করেছিল। কিন্তু বিধি বাম। হরিমোহন গেল হাসপাতালে আর তার যমজ বোন অ্যাটাচি কেসটা উঠিয়ে নিয়ে উধাও! মাধবরাজ ভল্ট থেকে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা বার করে নিয়ে, স্ট্রং রুম থেকে হরির রিভলভারটা সংগ্রহ করে ট্রেনে করে কলকাতা চলে আসে। হীরালালের ঘরে ঠিক কী নিয়ে দুজনের ঝগড়া-বিবাদ হয় জানি না। সম্ভবত টাকার অঙ্ক নিয়ে। যাই হোক, মাধব ওর ব্ল্যাকমেলিঙের খেলা চিরতরে খতম করে দিয়ে ফিরে যায়।

— কিন্তু সে পরদিন সকালে শিলিগুড়িতে ফিরল কী করে? সন্ধ্যার ফ্লাইটে আমি নিজে গিয়েছি। লেট নাইট চাটার্ড প্লেনে এসেছে চৈতালী। আমরা কেউই তো ওকে মিট করিনি।

— এর তো সহজ উত্তর, স্যার। মাধব খুনটা করে দুপুরে। শেয়ালদহ থেকে অনায়াসে রাত সাতটার দার্জিলিঙ মেল ধরে পরদিন ভোরবেলা পৌঁছায় নিউ-জলপাইগুড়ি। সেখান থেকে বাই রোড ট্যাক্সি করে অফিস টাইমের আগেই শিলিগুড়ি। অসুবিধাটা কী?

বাসু বললেন, থ্যাঙ্কু! আমার মক্কেল এখন কোথায়?

— ট্যাক্সি নিয়ে আপনার বাড়ির দিকেই রওনা দিয়েছে। আর মিনিট পনেরোর ভিতরেই পৌঁছে যাবে আশা করি।

যন্ত্রটা বিশের হাতে দিয়ে বাসুসাহেব সুখবরটা সবাইকে জানাতে গেলেন। কিন্তু আবার বাধা পড়ল। আবার বেজে উঠল টেলিফোন।

— বাসু স্পিকিং।

— গুড মর্নিং মিস্টার বাসু। দিস ইজ জেন, দ্য সিনিয়ার ওয়ান — বিজয়রাজ।

— ইয়েস? বলুন? আপনি কি আপনার ভাইপোর ডিফেন্স বিষয়ে ...

হঠাৎ বাধা দিয়ে বিজয়রাজ বলে ওঠেন : নো! অ্যান এমফ্যাটিক নো। যতদিন ছোট ছিল বুকের পাঁজরের মতো তাকে আগলে রেখেছিলাম। এখন সে সাবালক। আমার বিজনেস

পার্টনার। নিজের ভাল-মন্দ সে নিজেই স্থির করে। প্রাণনাথ পতিতুণ্ডকে সে এমপ্লয় করেছিল আমাকে না জানিয়ে! নো — ব্যারিস্টার-সাহেব — ভাইপোর ডিফেন্সের জন্য এই সাত-সকালে আপনাকে বিরক্ত করিনি।

— তাহলে?

— আমি আজই সন্ধ্যার ফ্লাইটে বাগডোগরায় ফিরে যাব। ভাইপোটা অপোগণ্ড, কিন্তু তার স্ত্রীর, বৌমার দায়িত্বটা তো এখন আমার! আপনি আজ সারাদিনে আমাকে কিছু সময় দিতে পারবেন?

— কেন? কাজটা কী?

— দুটো কাজ। এক নম্বর আমার উইলটা পালটাতে চাই। আমার সমস্ত সম্পত্তি ভাইপোর বদলে তার স্ত্রীকে দিয়ে যেতে চাই।

— দুটো কাজ বলেছিলেন। দ্বিতীয়টা?

— চৈতালী বসুর একটা হেভি ড্যামেজ ক্লেম ডিউ হয়েছে। টাকার অঙ্কটা আপনি নির্ধারণ করবেন। হীরালালের কোনও নিকট আত্মীয় আছে কি না জানি না — খোঁজ নিচ্ছি। সে ক্ষেত্রে তাকেও খেসারত দিতে হবে। বলুন, কখন আপনার সময় হবে?

— এখনই। আপনি সোজা আমার অফিসে চলে আসুন। আপনার এমপ্লয়ি চৈতালী বসুও আসছে। সামনা-সামনি কথা হয়ে যাবে।

— থ্যাঙ্ক!

গ্রন্থাগার